চতুর্থ খণ্ড
নিবেদিতা
লোকমাতা
শঙ্করীপ্রসাদ বসু

নিবেদিতা লোকমাতা

চতুর্থ খণ্ড

(নিবেদিতা ও ভারতের শিল্প-আন্দোলন)

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৪০১
প্রচ্ছদ প্রবীর সেন
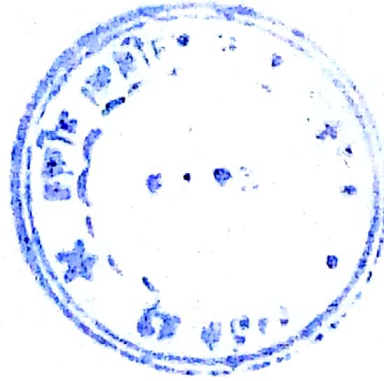
ISBN 81-7215-125-X

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৭৫·০০

নিবেদন

'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের এই বিশেষ খণ্ডটি প্রসঙ্গে (যার পরিচায়ক নাম 'নিবেদিতা ও ভারতের শিল্প-আন্দোলন') কয়েকটি কথা স্পষ্ট ক'রে বলে নেওয়া উচিত। এই লেখা আধুনিক ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের (যা 'নিউ বেঙ্গল স্কুল', 'বেঙ্গল স্কুল' ইত্যাদি নামে ইদানীং পরিচায়িত) পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার যোগ, আন্দোলনের অগ্রগতিতে তাঁর প্রচেষ্টার রূপ দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। তবে আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক এমনই ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক ছিল যে, প্রাসঙ্গিক প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য এই রচনার মধ্যে এসে গেছে।

দ্বিতীয়ত, শিল্প-বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি এই লেখা লিখেছি, এমন দাবি করতে পারিনা। ভারতীয় জীবনের ব্যাপক বিকাশে নিবেদিতার ভূমিকার পর্যালোচনাকালে শিল্প-আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার বিষয়টি বড় হয়ে উঠেছে। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে নিবেদিতা শিল্প-জাগরণকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তাঁর নিজস্ব শিল্পপ্রীতিও ছিল অসাধারণ। তাই এই আন্দোলনের গতিবৃদ্ধিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যাঁরা উনিশ শতকীয় জাগরণকে এদেশের কিছু মানুষের কিছু ক্ষেত্রে নড়াচড়া-মাত্র মনে করেন, তাঁরা নিবেদিতার এই মনোভাব ও চেষ্টার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারেন— যিনি কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন না— একই সঙ্গে বিজ্ঞান, শিক্ষা, ইতিহাস এবং চারু ও কারুশিল্পের বিকাশ যাতে ঘটে— সে বিষয়ে তৎপর হয়েছিলেন।

'স্বদেশী যুগে'র চারুশিল্প বিষয়ে তথ্য জানা আরও প্রয়োজন এইজন্য যে, স্বাধীনতার পরে 'স্বদেশী' ব্যাপারটা রীতিমতো কটাক্ষ, এমন কি নিন্দালক্ষ্য, হয়ে উঠেছে। এরই ঢেউয়ে স্বদেশী যুগের শিল্পকলার বিরুদ্ধে কটু সমালোচনা আধুনিকতার কলমে ইদানীং অনর্গল নির্গত। নবপ্রেরণার মহাবেগে এমনটি ঘটছে, তা আমরা ধরে নিতে পারি ; পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আছে প্রাণশক্তির প্রমাণ— সভয়ে সবিনয়ে তাতেও অগ্রিম সম্মতি জানিয়ে রাখছি। তবু— এখন যাঁরা অপরের মুখে 'বেঙ্গল স্কুলে'র সবিশেষ নিন্দা শুনছেন, তাঁরা এই স্কুলের পত্তন ও প্রাথমিক বিকাশের ইতিহাসটা জেনে নিলে নিজেরাই ব্যাপারটার ঔচিত্য বিচার ক'রে নিতে পারবেন। একদা-সম্মানিত লেখক হ্যাভেল, নিবেদিতা এবং কুমারস্বামী (১৯১০ পর্যন্ত), সেই সঙ্গে বন্দিত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রমুখরা, একালীন সমালোচনার ঘূর্ণিপাকে যখন কৃতকর্মের ফলভোগ করছেন, তখন ওঁরা অন্তত ঠিক কী করেছিলেন, সেটুকু জানার মর্যাদা পেতে পারেন। নিবেদিতা-সূত্রে তেমন কিছু সংবাদ দানও এই রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য নিবেদিতার শিল্পভাবনা আবশ্যিকভাবে এই রচনার বড় অংশ অধিকার ক'রে আছে।

নির্দ্বিধায় বলতে পারি, বিশেষ কালের শিল্প অবশ্যই বিশেষ কালের অধীন—সেই কালের মুখ্য ভাব-ভাবনা ও অনুভূতিকে উপযুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারলে তা প্রশংসার্হ। আর যদি প্রাণশক্তিতে সেই কালেরও পরে সেসব রসিকজনের কাছে সমাদরযোগ্য মনে হয়, তাহলে তো 'চিরায়ত', 'কালজয়ী' ইত্যাদি উত্তম-উত্তম শব্দখচিত মাল্যলাভের অধিকারী হয়ে পড়ে। একেবারে শুরু থেকে দেশ-কালের বিধ্বংসী কালাপাহাড় হলেই কেউ আন্তর্জাতিক পুরুষ হয়ে পড়বেন— এমন উদার চেতনা আমাদের মতো আবদ্ধ মানুষের অনায়ত্ত।

'নব্যবঙ্গীয় শিল্পীকুল', এবং তাঁদের সমর্থক লেখকগণ সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য এখনকার সময়ে দেখি, তাতে মনে হয়, ওঁদের শিল্পসৃষ্টি ও চিন্তাভাবনার গোটা চেহারা সমালোচকদের নখচিত্রে এসে গেছে— তদনুযায়ী ওঁদের অঙ্গে বিশেষ বিশেষ ছাপ দেগে দিয়ে সাধনোচিত ধামে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এখানে আমাদের বিনীত নিবেদন, যিনি যে-প্রকার, তাঁকে তাই রেখেই যেন তাঁর বিচার করা হয়, তিনি যা নন তাই বানিয়ে যেন বিচারকাজ সেরে ফেলা না হয়।

নব্যভারতীয় শিল্পের কিছু নমুনা সম্বন্ধে নিবেদিতা অতিপ্রশংসা করেছেন, এমন সমালোচনা শুনতে পাই। বলা বাহুল্য উক্ত শিল্পগুলির রচনাগৌরব স্বীকারে অনিচ্ছুক মানুষেরাই এমন কথা বলে থাকেন। নিবেদিতার সমুচ্চ ভাব ও কল্পনাময় রচনাগুলি, তাঁর দ্বারা আলোচিত শিল্প-নিদর্শনকে দূরে অতিক্রম ক'রে গেছে, এমন সন্দেহ জেগেছে। এক্ষেত্রে বক্তব্য, সমালোচকরা দেশ ও কালের হিসাবটা খেয়াল করেন নি। কোনো আন্দোলনের একেবারে সূচনাপর্বের কিছু সৃষ্টিকে যদি কেউ ঈষৎ অতিরিক্ত প্রশংসা করেন, তাহলে তার পিছনে শিল্পীর মধ্যে উন্নততর সৃষ্টির জন্য প্রেরণাদানের অভিপ্রায়ও সক্রিয় থাকতে পারে। নিবেদিতা-কৃত অনেক প্রশংসার মূলে এমন মনোভাব ছিল। তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও সতর্কবাণীও তিনি শুনিয়েছেন। তবে সমালোচনাকে সর্বাঙ্গে রূঢ় বাক্যের শলাকাবেষ্টিত করার মতো সজারু-সমালোচক তিনি ছিলেন না।

নিবেদিতা ছবি মোটে বুঝতেন না— এমন সরল সাহসী উক্তিও শুনেছি। সরলতা, সাহস আমাদের বে-শ লাগে।

একটি বিষয়ে অগ্রিম ত্রুটি স্বীকার ক'রে রাখছি। বিদেশী শব্দের উচ্চারণ নির্ধারণে অশিক্ষিত বাঙালী ব্যাপার এই লেখায় আছে। আমার জানা দু'-একজন ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। অনেক সময়ে (সব সময়ে নয়) তাঁরা কিছু পরামর্শ দিয়েই সাবধান ক'রে দিয়েছেন—এক ভাষার শব্দের উচ্চারণ অন্য ভাষায় আনা যায়না; এমনকি ঠিক উচ্চারণ কী, সে সম্বন্ধে সেই ভাষারই মানুষদের মধ্যে মতভেদ থাকে। তাছাড়া এদেশে পরিচিত বিদেশী নামের প্রচলিত উচ্চারণে বেশি ওলটপালট ঘটালে পাঠকমন ধাক্কা খাবে। এইসব নানা কথা ভেবে, নামে-কি-এসে-যায় জাতীয় মনোভাব নিয়েছি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। বিদগ্ধ পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন।

পুরনো কালের বিষয়ে লেখার মধ্যে তথ্যগত ভুলও থাকতে পারে— সবকিছুর সঠিক পাঠোদ্ধার ও অর্থগ্রহণ সম্ভব হয়নি বলে। সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কৃতজ্ঞ হব।

তথ্যসন্ধান ও রচনাকালে বহু মানুষের সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। ধারাবাহিক সাহায্য পেয়েছি আমার শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য। সাহায্য করেছেন, ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, অধ্যাপক নিত্যানন্দ ভকত, অধ্যাপক কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য, শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীগৌতম হালদার, ডঃ স্বপন বসু, শ্রীসুনীল মণ্ডল, শ্রীরতনকুমার দাস। এই লেখা যখন দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখন চিত্রসজ্জা, সুষ্ঠু বিন্যাস ইত্যাদি ব্যাপারে অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন কথাসাহিত্যিক শ্রীহর্ষ দত্ত ও শ্রীঅরুণ ঘোষ। প্রখ্যাত লেখক শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যের কথা মনে পড়ছে। আলোকচিত্র গ্রহণ ও মুদ্রণে ভূমিকা ছিল শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন রক্ষিতের।

নানা গ্রন্থাগারে কাজ করেছি। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক), রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আনন্দবাজার সংস্থার গ্রন্থাগার বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি। এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের, বিশেষত 'কালচার'-এর গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী অভয়া দাশগুপ্ত এবং আনন্দবাজার সংস্থার মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রীশক্তিদাস রায়ের অকুণ্ঠ সাহায্য সর্বদাই পেয়েছি। সাহায্য করেছেন শ্রীসুনীল দাশ।

এই গ্রন্থের বড়ো অংশ দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (৪ নভেম্বর ১৯৮৯ থেকে ৯ জুন ১৯৯০) প্রকাশিত হয়েছিল। দেশ-এর মতো সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিপুল ঐতিহ্যশালী পত্রিকায় এই দীর্ঘ লেখাটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল সুবিখ্যাত দেশ-সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের আনুকূল্যে। ভারতীয় শিল্প-আন্দোলন সম্পর্কে তিনি অতিশয় আগ্রহী এবং নিবেদিতা সম্পর্কে একান্ত শ্রদ্ধাশীল।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দের স্নেহময় আনুকূল্যের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার লেখা সম্বন্ধে স্বামী তত্ত্বঘনানন্দের বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস আমাকে যুগপৎ লজ্জিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রেরণা পেয়েছি অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তের বিচারশীল মন্তব্যে।

সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের পূজনীয়া সন্ন্যাসিনীদের কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণ। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা নিবেদিতার কাগজপত্র সযত্নে রক্ষা করেছেন। তাঁদের সংগ্রহে নিবেদিতা ও তাঁর ছাত্রীদের করা নানা অলঙ্করণ-চিত্র আছে; নিবেদিতা কর্তৃক আনীত বহু পাশ্চাত্ত্য চিত্রের প্রতিলিপিও রয়েছে। এই সংগ্রহ ব্যবহার করতে পেরেছি বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের উদার আতিথ্যে। প্রতিষ্ঠানের সকল সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীর স্নেহযত্ন পেয়েছি। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা, প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা এবং প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণার কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

গ্রন্থের প্রকাশন-কর্তারা বিরক্ত হন তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করলে। কিন্তু আমার বইয়ের মতো ঝঞ্ঝাটের বই অল্পই হয়, এবং প্রকাশকালে নানা অনুরোধে সর্বদাই উত্ত্যক্ত করি। শ্রীবাদল বসু অবিচলিত দৃঢ়তার সঙ্গে সেসব সহ্য করেন এবং শ্রীশোভন বসু অব্যাহত সহিষ্ণুতায় গ্রন্থবস্তু সম্বন্ধে মনোযোগ বজায় রাখেন। অন্য প্রয়োজনাদিতে

সাহায্য পাই শ্রীশঙ্কর বসুমল্লিক এবং শ্রীরঞ্জনকুমার সরকারের কাছ থেকে।

গবেষণামূলক গ্রন্থ অনেক সময় পারিবারিক প্রযত্নের ফল। অন্তত আমার ক্ষেত্রে তাই। পরিবারের সকলেই— সহধর্মিণী শ্রীমতী মায়া বসু, এবং দুই পুত্র, শ্রীসুদীপ বসু (অধ্যাপক) এবং শ্রীশঙ্খ বসু সর্বদাই সহায়ক।

নিবেদিতার বিষয়ে লেখার কালে 'কী পেয়েছি' তার হিসাব মেলানো সম্ভব নয়, কারণ প্রাপ্তি— বিপুল ও বিচিত্র। গ্রন্থের এই খণ্ড সম্পর্কে তেমনই একটি প্রাপ্তির কথা বলতে পারি। বেশ কিছু বছর আগে (১৯৭০) 'ক্ষুদ্র পট রুদ্র প্রাণ' নামে একটি বই আমার হাতে এসে পৌঁছয়, যার ছদ্মনামা লেখক—সমুদ্রগুপ্ত। বইটি আমাকে উৎসর্গ করা। ছদ্মনামা লেখক সামান্য ব্যক্তি নন—শিল্পী, কবি, কথাকার এবং চলচ্চিত্রকার, ইত্যাদি নানা পরিচয়ে ভূষিত শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী। পরিচিত প্রিয়জনকে বই উৎসর্গ করা অভিনব ব্যাপার নয়, সে অভিজ্ঞতা আমারও আছে, কিন্তু পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে আমার সে ঘনিষ্ঠতা নেই। তাহলে হঠাৎ ওই ব্যাপারটি ঘটল কেন? পূর্ণেন্দুবাবু তার ব্যাখ্যায় চিত্তচমৎকারা কিছু কথা বলেছেন। "মাত্র একদিনের কিছুক্ষণের আলাপের উজ্জ্বল স্মৃতিকে মনে রেখে" তিনি বইটি উৎসর্গ করেছেন। কথাগুলি পড়ে হতবাক্। আমি জানতাম না, আমার বাক্যের ওহেন তেজ! কিন্তু অপরপক্ষে জানা উচিত ছিল একটি কথা— যত অপটু হোক আমার বাচনভঙ্গি, শিথিল হোক ভাষা— বিষয় যখন নিবেদিতা, তখন তার আলোক যে-কোনো জিনিসকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে।

হ্যাঁ, শুধু ভাবছি, কী অপূর্ব অপরিমেয় সেই নারী, যাঁর আলোকের প্রতিফলনে সামান্য বস্তু কিছু সময়ের জন্য অন্তত অসামান্য রূপ নেয়!

১বি, ওলাবিবিতলা লেন, — শঙ্করীপ্রসাদ বসু
হাওড়া-৭১১১০৪
৪ঠা জুলাই, ১৯৯৩

সূচী

চিত্রসূচী

নন্দলালের 'উমার তপস্যা'।
নন্দলালের 'মথুরার কারাগারে সদ্যোজাত কৃষ্ণ'।
নন্দলালের 'অহল্যা উদ্ধার'।

৬৪ পৃষ্ঠার পরে

স্বামী বিবেকানন্দের 'কালী দি মাদার' কবিতার নিবেদিতা-কৃত অনুলিপি।
নিবেদিতার 'দি এনসেন্ট অ্যাবী অব অজন্তা' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি-চিত্র।
নিবেদিতার স্কেচ-বই।
নিবেদিতার-পরিচালনাধীন বিদ্যালয়-ছাত্রীদের আঁকা ছবি।
নিবেদিতার 'নোটস অব সাম ওয়ান্ডারিংস্ উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ' বইয়ের চিত্রিত পাণ্ডুলিপির দুই পৃষ্ঠা।
নন্দলাল-অঙ্কিত রেখাচিত্র : নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে নিবেদিতা, সিস্টার ক্রিস্টিন, নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
নন্দলাল-অঙ্কিত রেখাচিত্র : অবনীন্দ্রনাথের দক্ষিণের বারান্দায় সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী ও নন্দলাল।
নিবেদিতার চিঠিতে তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় পুরস্কার ও 'বিবেকানন্দ মেড্যালে'র বিভিন্ন রেখাচিত্র।
নিবেদিতা-পরিকল্পিত ও সূচিত এবং কুমারস্বামী কর্তৃক সমাপ্ত 'দি মিথস্ অব দি হিন্দুজ্ অ্যান্ড বুদ্ধিস্টস্' গ্রন্থের প্রচ্ছদ।
মডার্ন রিভিউ-এ নিবেদিতার 'অজন্তা' রচনায় উনিশ সংখ্যক গুহার সম্মুখ-চিত্র।
মডার্ন রিভিউ-এ নিবেদিতার 'জাতীয় পতাকা' বিষয়ে প্রবন্ধে বজ্র-চিত্র।
নিবেদিতার 'ক্র্যাডল্ টেলস অব হিন্দুইজম্' বইয়ে অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত বজ্র-চিত্র।
১৯০৬ কংগ্রেসে প্রদর্শিত নিবেদিতা-পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা।
নিবেদিতা-অঙ্কিত বজ্র। (দুটি)
লিঙ্গোপাসনার উৎপত্তি বিষয়ে হ্যাভেলকে লেখা নিবেদিতার চিঠি। (৪ পৃষ্ঠা)।
প্রিয়নাথ সিংহকে লেখা নিবেদিতার চিঠি। (২ পৃষ্ঠা)।
প্রিয়নাথ সিংহকে লেখা হ্যাভেলের চিঠি। (২ পৃষ্ঠা)।

৯৬ পৃষ্ঠার পরে

কাশ্মীরে বিবেকানন্দ।
গ্রীস থেকে সিস্টার ক্রিস্টিনকে লেখা স্বামীজীর পিকচার-কার্ড।
নিবেদিতার ছাত্রীদের করা অশ্বত্থ পাতার উপরে বিবেকানন্দ-চিত্র।
রদ্যাঁর ছাত্রী মালভিনা হফম্যান-কৃত বিকোনন্দের ব্রোঞ্জমূর্তি।
মিস ম্যাকলাউডকে লেখা স্বামীজীর চিঠি—যাতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক-চিত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত।

প্রথম ধর্মোপদেশরত বুদ্ধ। সারনাথ।
দণ্ডায়মান বুদ্ধ। মথুরা।
উপবিষ্ট বুদ্ধ। তক্ত্-ই-বাহি।

ধর্মপালের ব্রোঞ্জমূর্তি। জাভা।
ধর্মপালের ব্রোঞ্জমূর্তি। জাভা।
বাংলায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি।

আঁটপুরের আটচালায় কাঠখোদাই।
আঁটপুরের মন্দির-গাত্রে টেরাকোটায় কালীমূর্তি।

মডার্ন রিভিউ-এ হ্যাভেলের বইয়ের উপর নিবেদিতার সচিত্র রচনা। (দুই পৃষ্ঠা)
ভারতে লিঙ্গোপাসনার উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্ধানের জন্য নিবেদিতার নির্দেশে গণেন্দ্রনাথ-সংগৃহীত ফোটোচিত্র। (তিনটি ছবি)।

ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থের প্রকাশকালে নিবেদিতার নির্দেশাদি।
জাপানের ড্রাগন চিত্র।
ইংলন্ডের স্টুডিও পত্রিকায় জাপানের শিল্প আন্দোলন সম্বন্ধে ওকাকুরার প্রবন্ধ। প্রবন্ধ-মধ্যে নিবেদিতার ব্যক্তিগত সংগ্রহের অন্তর্গত নাকাজিমা রেইসেন-অঙ্কিত পদ্মচিত্র।
ওকাকুরার পূর্বোক্ত গ্রন্থের সম্পাদনাকালে নিবেদিতার নির্দেশাদি।
জাপানী অক্ষর ও রেখাচিত্র। নিবেদিতার পত্রমধ্যে প্রাপ্ত।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
রবীন্দ্রনাথ ও আনন্দ কুমারস্বামী।
রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত।
অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গ।

১৪৪ পৃষ্ঠার পরে

রাজা রবিবর্মা।
রবিবর্মার 'অশোকবনে সীতা'।
রবিবর্মার 'প্রতীক্ষা'।
রবিবর্মার 'জটায়ুবধ'।
রবিবর্মার 'অহল্যা'।
রবিবর্মার 'দময়ন্তীর হংসদূত'।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
অবনীন্দ্রনাথের 'বুদ্ধ ও সুজাতা'।
অবনীন্দ্রনাথের 'নিশাভিসার'।
অবনীন্দ্রনাথের 'কথক ঠাকুর'।
অবনীন্দ্রনাথের 'সীতা'।
হ্যাভেলের প্রবন্ধ স্টুডিও পত্রিকায় (১৫.১০.১৯০২)—'Some Notes on Indian Pictorial Art', যার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর বিশেষ সমাদর।

নন্দলালের 'কালী'।

নন্দলালের 'সমাধিস্থ শিব' । (চিত্রাংশ) ।
নন্দলালের 'পার্থসারথি কৃষ্ণ' । (চিত্রাংশ) ।
নন্দলালের 'মৃত্যুশয্যায় দশরথ' ।
নন্দলালের 'কৈকেয়ী' ।
নন্দলালের 'জগাই মাধাই' ।
নন্দলাল-অঙ্কিত কামারপুকুরের আলপথে সমাধিস্থ গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণ) ।
নন্দলালের 'গোপালপুরের ধীবর' । (দুটি ছবি)
নন্দলালের 'হরিপুরা কংগ্রেস চিত্রাবলী' ।
নন্দলালের 'হিমালয়'—উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণ ।
নন্দলালের 'জননী' ।

১৯২ পৃষ্ঠার পরে

লিপ্পি-র 'অ্যানানসিয়েশন' ।
বতিচেল্লী-র 'ম্যাডোনা অব দি ম্যাগনিফিসান্ট' ।
বাইজানটাইন শিল্পধারার 'মেরী ও যীশু' ।
জিয়ত্তো-র 'ম্যাডোনা অ্যান্ড ডিভাইন চাইল্ড' ।
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-র 'পরিত্রাতার মুখাকৃতি' ।
মিকেলাঞ্জেলো-র 'আদম' ।
ফ্রা আঞ্জালিকো-র 'ম্যাডোনা অব হিউমিলিটি' ।
বতিচেল্লী-র 'ম্যাডোনা উইথ দি বুক' ।
রাফায়েল-এর 'ম্যাডোনা ডেল গ্রান্ডডুকা' ।
রাফায়েল-এর 'ম্যাডোনা উইথ দি ইনফ্যান্ট ক্রাইস্ট অ্যান্ড ইনফ্যান্ট সেন্ট জন' ।
রসেটি-র 'অ্যানানসিয়েশন' ।
ভেরোনেজ-এর 'সেন্ট হেলেনাজ্ ভিশন অব দি ইনভেনশন অব দি ক্রশ' ।
প্রাচীন শিল্পীর আঁকা 'সীতা ও রামের রাজ্যাভিষেক' ।
এল গ্রেকো-র 'আত্মার নগরী টোলেডো' ।
জন রাস্কিন ।
উইলিয়ম মরিস ।
মিকেলাঞ্জেলো-র 'দি টুম্ব অব দি লোরেঞ্জো দ্য মেডিসি' ।
প্যুভি দ্য শ্যভান-এর 'সেন্ট জেনভিভ ওয়াচিং ওভার প্যারিস' ।
প্যুভি দ্য শ্যভান-এর 'দুঃখী প্যারিসবাসীর কাছে জেনভিভ খাদ্য এনে দিচ্ছেন' ।
ফ্রাঙ্কো রূদ-এর 'লা মার্সাই গাইতে গাইতে স্বেচ্ছাসৈনিকদের যুদ্ধযাত্রা' ।
প্যুভি দ্য শ্যভান-এর ম্যুরাল 'বিদ্যার পবিত্র অরণ্য' ।
রদ্যাঁ-র 'দি প্রডিগ্যাল' । ('গেটস্ অব হেল'-এর অন্তর্গত) ।
রদ্যাঁ-র 'স্পর্ধিত প্রাগৈতিহাসিক মানুষ' । ('এজ্ অব ব্রোঞ্জ') ।
রদ্যাঁ-র 'প্রচাররত সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট' ।
জুল বের্তঁ-র 'কৃষক তরুণী' ।
রদ্যাঁ-কৃত প্যুভি দ্য শ্যভান-এর আবক্ষ মূর্তি ।

নি বে দি তা লো ক মা তা

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শিল্প-আন্দোলনে নিবেদিতার ভূমিকা বিষয়ে কিছু কথা

জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানসাধনায় নিবেদিতার সাহায্যের কথা দেশ পত্রিকায় কয়েক বৎসর পূর্বে ধারাবাহিক এক রচনায় বলে এসেছি। (দেশ পত্রিকায় ২৩ অক্টোবর ১৯৮২ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত আট সংখ্যায় প্রকাশিত)। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বেও (২য় সংস্করণ) তা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। বিজ্ঞান-আন্দোলন থেকে শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে চলে এসে দেখব, নিবেদিতার ভূমিকা অনুরূপ বা অধিক। এক কথায় বলতে গেলে, নব্য ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের তিনি বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিক। কথাগুলি যে অতিকথন নয় বরং অতিসত্য, তার পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। সূচনা অংশে কেবল প্রত্যক্ষদর্শী, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মন্তব্য উৎকলন করব।

মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে যদুনাথ বলেছিলেন :

"১৯১১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় প্রায়শই মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। এমন কি তাঁর শোকদায়ক মৃত্যুর পরেও এই পত্রিকায় তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলী বেরিয়েছে। শিক্ষিত ভারতবাসীকে তিনি শিল্পের খাঁটি তত্ত্ব স্বীকারে প্রণোদিত করেছেন। এবং তিনি তাঁর প্রাজ্ঞ সমালোচনার দ্বারা বাংলার 'ভারতীয় চিত্রকলা'-শিল্পীগোষ্ঠীর চিত্রাবলীকে শিক্ষিত সমাজে পরিচায়িত করেছেন। এই নব্য ভারতীয় চিত্রকলা মর্ডান রিভিউ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"[১]

যদুনাথ অন্য এক স্থানে বলেছেন :

"নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পের মস্ত সমর্থক। ভারতবাসীর কোনো মৌলিক দান সর্বদাই তাঁর সমাদর ও উৎসাহ পেয়েছে।...তিনি তরুণ শিল্পীদের ছবির সমালোচনা লিখতেন, তাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতেন, শিল্পের উত্তম সমঝদার ছিলেন, পাশ্চাত্ত্য শিল্পের ব্যাপক অনুশীলন করেছিলেন। ভারতীয় ভাবধারার অনুগামী বাঙালী শিল্পীরা তাঁর বিচক্ষণ নির্দেশে বিশেষ উপকৃত হয়েছেন। অজন্তার ছবি তাঁকে আত্মহারা ক'রে দিত।...অজন্তার ভিত্তিচিত্রে তিনি খাঁটি ভারতীয় শিল্পের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন এবং এলিফ্যান্টার ত্রিমূর্তির মধ্যে

হিন্দুধর্মের সমন্বয়ভাবনার প্রস্তর-রূপায়ণ রয়েছে, একথাও বলেছেন।"[২]

সংক্ষেপে বলতে গেলে বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় চিত্রশিল্পক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সৃষ্টিশীলতা দেখা যায়, যার প্রভাব কিছুদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সর্ব ভারতে, এবং তা ভারতের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে স্বীকৃত হয়। এই আন্দোলনের একেবারে সূচনাপর্বে সংগঠনের দিক দিয়ে অন্তত, সেই সঙ্গে আন্দোলনের মূল ধারাকে বেগবান করার ক্ষেত্রেও, নিবেদিতার অনন্য ভূমিকা। তারপরে যখন আন্দোলন নিজ শক্তিতে অগ্রসর হবার শক্তি অর্জন করল, এবং দেখা গেল যে, তার অনেক সহায়ক ও সমর্থক উপস্থিত হয়েছেন—তখন নিবেদিতা নিজেকে ওই ক্ষেত্র থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, যা ছিল তাঁর অভ্যস্ত রীতি।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ Sir Jadunath Sarkar, "Ramananda Chatterjee: India's Ambassador to the Nations", Modern Review, reprinted in **Amrita Bazar Patrika**, 31 May, 1956.

২ Jadunath Sarkar, "Reminiscences of Sister Nivedita, "**Prabuddha Bharata**, January 1943.

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবেদিতার ভারত-পূর্ব জীবনে শিল্প

ভারত-পূর্ব জীবনেও নিবেদিতা শিল্প-ব্যাপারে উৎসুক। তাঁর বোন মিসেস উইলসন এবং ভাই রিচমন্ডের স্মৃতিকথায় তা পেয়েছি। নিজ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায় দৃঢ় বালিকা মার্গারেট বিদ্যালয়ে একদিকে যেমন "সাতটি মর্মান্তিক বছর" কাটিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ঐ বছরগুলি, মিসেস উইলসন লিখেছেন, ['নিবেদিতা লোকমাতা', ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব, ২য় সং পৃঃ ৪০৭], "অল্পবয়সী মেয়েটির অন্তর্জীবনে সবিশেষ বলাধান করেছিল—তাকে নিয়ে গিয়েছিল গ্রন্থ, শিল্প ও ধর্মজগতের মধ্যে—সেইগুলিই ছিল তার আত্মমুক্তির পথ।" "সহজাত সৌন্দর্য ও শিল্পবোধের কারণে সে কিছু সময়ের জন্য রোমান ক্যাথলিক মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়"—একই সূত্র থেকে আমরা জেনেছি। "কিছু সুপণ্ডিত অ্যাংলো-ক্যাথলিকের সংস্পর্শ তাকে প্রাচীন শিল্প ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনুশীলনের প্রেরণা দিয়েছিল।" নিবেদিতার মনোজীবনে বিভিন্ন খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাই রিচমন্ড নোবল ট্রাকটারিয়ানদের কথা বলেছিলেন যাঁরা "ঐতিহ্যধারাকে বহুমূল্য জ্ঞান করেন", "অর্চনার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতাকে বাড়িয়ে তোলেন', এবং সেসব এমন "শিল্পসুষমার দ্বারা করেন যে, ক্ষেত্রবিশেষ রোমক নমুনাকে পর্যন্ত ছাপিয়ে যায়।" এই মতবাদের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে [রিচমন্ড আরও লিখেছেন] মার্গারেট "ধর্মার্চনায় কেবল বর্ণগরিমা ও নাটকীয়তার রূপ দর্শন করেনি, তার মন সর্বদাই শিল্পের ভাবাকৃতিতে পূর্ণ থাকত—সে যুক্ত হতে পেরেছিল অতীত সন্তগণের যুগের সঙ্গে।"

ধর্মীয় প্রাচীন চিত্রকলার বিশেষ অনুশীলনের সঙ্গে, আমরা ধরে নিতে পারি, লন্ডনের এক উৎসাহী সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মার্গারেট সমকালীন শিল্পের চর্চাও করেছিলেন, অন্তত সে-বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন শিল্পী এবেনজার কুক। রাসকিনের অনুগামী এই শিল্পী বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষাদানের ব্যাপারে আগ্রহী—নিবেদিতার উইম্বলডনের বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িতও ছিলেন। শিল্পকে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যাপারে এঁর ক্ষমতার বিষয়ে শ্রদ্ধা ছিল নিবেদিতার।

শিল্পের প্রতি নিবেদিতার আকর্ষণ কেবল শিল্পের তত্ত্বচর্চা বা শৈলীচর্চাতে আবদ্ধ ছিল না—তা তাঁর মজ্জাগত—জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত। তাঁর অপরিসীম নিসর্গপ্রীতি,

সৌন্দর্যপ্রীতি, প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহ, অনিবার্যভাবে তাঁকে শিল্পভুবনে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। তাঁর প্রথম পর্বের লেখাগুলিতে দেখা যায়, কোনো কিছুর বর্ণনার সময়ে সেটিকে অনেক সময়ে চিত্ররসাত্মক করে তুলতেন। ২০ বছর বয়সে খ্রীস্ট সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর কলমে এসে গিয়েছিল এই ছবিটি :

"ইতিহাসের উপরে স্থাপিত বেথ্‌লিহেম—যেন সুমহান মর্মরপট্ট—তাতে খোদিত পবিত্র নারী ও পবিত্র শিশু।[৮]"

প্রথম দর্শনে স্বামীজীর "ললাটে ও আননে" তিনি দেখেছিলেন "রাফায়েলের আঁকা শিশু খ্রীস্টের কোমলতা ও মহিমা।" ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন সিস্টিন ম্যাডোনার ছবি তাঁর কাছে ভারতে পাঠানো হয়, এবং স্বামী সদানন্দ শিশু খ্রীস্টের মুখের সঙ্গে স্বামীজীর মুখের সাদৃশ্যের কথা অবিলম্বে বলে ওঠেন, তখন নিজের খুশির কথা নিবেদিতা এক পত্রে লিখে পাঠিয়েছিলেন। (৩১-৫-১৮৯৯)। ইংলন্ডে থাকাকালে মার্গারেটের বয়স যখন একুশ তখন নারীর অধিকার বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর একটিতে (সৌন্দর্যে নারীর অধিকার) বলেছিলেন, "ফ্যাশানের পুতুলের দল বোঝেনা আর্টের সঙ্গে ফ্যাশানের তফাত কোথায় ? আর্ট দিয়েছে—গ্রীক দেবদেবীদের স্থায়ী লাবণ্য, রাফায়েলের সেন্টদের নারী-মডেল, দিয়েছে রুবেন্সের সৃষ্টি-সন্ততিদের। আর ফ্যাশান থেকে পাওয়া গিয়েছে ভিক্টোরিয়া যুগের কোমরে দড়ি-বাঁধা পোশাকের খ্যাপামিকে।"

ভারতে আসার পরে নিবেদিতা যখন এদেশের জনজীবন, উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির বর্ণনা করতে গেছেন—ফুটে উঠেছে ছবির পর ছবি। ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর আলোচনার মধ্যেও তাই ঘটেছে।

ভারতের নিজস্ব শিল্পধারা সম্বন্ধে নিবেদিতার উদ্দীপনার মূলে কেবল পূর্বতন ইউরোপীয় শিল্পধারা সম্বন্ধে সানুরাগ বোধই ছিলনা, দুটি অধিক কারণ ছিল। প্রথমত, তাঁর ভাই রিচমন্ড নোবল যে-কথা বলেছেন, আইরিশ জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি আয়ারল্যান্ডের লোকসংস্কৃতি ও শিল্পের পুনর্জাগরণ যেমন চেয়েছিলেন, তেমনি তাঁর আকর্ষণকেন্দ্র ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত হলে একই বস্তু চেয়েছেন ভারতের ক্ষেত্রেও। (নরওয়ের ক্ষেত্রে মিঃ ওলি বুলের মধ্যে একই ধরনের প্রবণতা ও প্রয়াস লক্ষ্য করে তার সাদর বর্ণনা করেছেন)। দ্বিতীয়ত, স্বামীজীর কাছ থেকে তিনি অবিলম্বে শুনেছিলেন—ভারতবর্ষে ধর্ম ও শিল্প অঙ্গাঙ্গি।

নিবেদিতার ভারতীয় শিল্প-দীক্ষা স্বামীজীর কাছেই হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বামীজীর কাছে নিবেদিতার শিল্পশিক্ষা

নব্য ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে নবচেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ অন্যতম প্রেরণাপুরুষ, একথা ব্যাপকভাবে না হলেও একাধিক সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।[১] বিবেকানন্দের অনেক আগেই ভারতীয় শিল্প, বিশেষত তার স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও কারুশিল্প বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল—সে কাজ করেছিলেন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা। ভারতের বৃটিশ আমলাদের কেউ-কেউ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারাদির বিবরণ দেবার কালে শিল্প-বিষয়ে মন্তব্য বা আলোচনা জুড়ে দিতেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে ভারততাত্ত্বিকরাও যোগ দিয়েছিলেন। ভারতে শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে শিক্ষানীতিতে ভারতীয় শিল্প বা শিল্পতত্ত্বের স্থান ছিল গৌণ, ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণ-শিক্ষাই মুখ্য। কখনো কখনো ভারতীয় অলঙ্কারশিল্প ও কারুশিল্পের প্রশংসা ওইসব মহল থেকে এসেছে, কিন্তু ভারতীয় শিল্পের মর্মবাণী বুঝবার চেষ্টা দেখা যায়নি। কোনো দেশের শিল্প যে, সেই দেশের ইতিহাস ও ভূগোলের স্বাক্ষর নিয়ে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তা তার সংস্কৃতির উৎপাদন, এবং ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশের পক্ষে সেকথা বিশেষভাবে সত্য—তা ভারতীয় শিল্পকে বাইরের চোখে বিচার করার কালে ওইকালের ইউরোপীয় সমালোচকরা বিবেচনাযোগ্য মনে করেন নি। তাঁরা তাঁদের জানা ইউরোপীয় নমুনার পাশে ফেলে ভারতীয় নমুনাগুলির বিচার করতেন এবং নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিমতো নিন্দা বা প্রশংসাবর্ষণ করতেন। একটি ধারণাকে তাঁরা জলবায়ুর মতো সত্য বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন—এই পৃথিবীতে গ্রীক শিল্পের তুল্য অন্য কিছু হয়নি, হতেও পারেনা—এবং সবকিছুর মূল্য নির্ধারিত হবে গ্রীক শিল্পের বা তার অনুকারী শিল্পের সঙ্গে তুলনামুখে। এক্ষেত্রে তাঁদের বিচারবুদ্ধিতে স্বচ্ছতা অপেক্ষা তেজেরই প্রাধান্য, আর তা হতেই পারে, কেননা তাঁরা পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবিস্তার-যুগের সম্মানীয় পাশ্চাত্ত্য লেখক।

ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিবাদে উত্থিত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির যথার্থ মহিমময় অংশগুলি সম্বন্ধে স্বীকৃতি দাবির কালে তিনি কেবল বিশুদ্ধ ধর্মের কথা বলেন নি—প্রাচীন ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞানের কথা যথেষ্টই বলেছিলেন। আর, তিনি ভারতীয় শিল্পের প্রকরণ ও মর্মসত্যের কথা সাধারণ বক্তৃতা-সভায় যত-না বলেছেন, তার

চেয়ে অনেক বেশি বলেছেন ব্যক্তিগত আলোচনায়, এই বিশ্বাসে যে, সে আলোচনায় উপকৃত ও উদ্দীপিত তাঁর অনুরাগীরা ভারতশিল্পের রূপ ও সত্যের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হবেন। সে দায়িত্ব একজন বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন—ভগিনী নিবেদিতা।

শিল্প সম্বন্ধে বলবার অধিকার বিবেকানন্দের অবশ্যই ছিল। সে বিষয়ে বাসনাময় ভালবাসায় আক্রান্ত তিনি, দারুণ আগ্রহে ভারতের ও বহির্ভারতের শিল্প-নিদর্শন দেখেছেন—তার দ্বারা তিনি সেকালের ভারতীয়দের মধ্যে—অন্তত বিখ্যাত ভারতীয়দের মধ্যে—যাঁরা পৃথিবীর শিল্পনিদর্শনের প্রধান প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, এমনও বলা যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি বছরের পর বছর ভারতভ্রমণের সময়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা ও লোকশিল্পের নিদর্শনগুলি দেখেছেন। আগ্রহভরে দেখেছেন রাজপুত চিত্রকলা ও রবিবর্মার চিত্রাবলী। মুসলিম স্থাপত্য সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম অনুরাগের বিষয়ে বহু তথ্য আছে। সিংহলে তিনি অনুরাধাপুরসহ নানা শহরের প্রত্নকীর্তি দেখেছেন। চীনের ক্যান্টন শহরের এবং জাপানের একাধিক শহরের শিল্পকীর্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছে। আমেরিকায় বিভিন্ন সংগ্রহশালায় গিয়ে শিল্পনমুনা দেখা তাঁর অভ্যাস ছিল। ইংলন্ডের সম্বন্ধেও সেকথা সত্য। প্যারিসের লুভারে একাধিকবার গেছেন বিভিন্ন সময়ে। কন্টিনেন্ট ভ্রমণকালে জার্মানীর একাধিক শহরের শিল্প দেখেছেন, খুঁটিয়ে দেখেছেন রোম, ফ্লোরেন্স। নেপলস্ গেছেন এবং পম্পেই। গ্রীস তাঁকে আত্মহারা করেছে, ভিয়েনার নানা সংগ্রহশালায় ঘুরেছেন। গেছেন কনস্টান্টিনোপল, মিশর, তুরস্ক—সব জায়গাতেই শিল্পনমুনা দেখা তাঁর অবশ্যকৃত্য। স্বামীজী যে-বিপুল পরিমাণ শিল্প-নিদর্শন প্রত্যক্ষে দেখেছেন তার অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বিবরণই মেলে—তাও এখানে দেওয়া সম্ভব নয়—অসম্পূর্ণ তালিকাই বৃহৎ হয়ে দাঁড়াবে। তাই যখন শিল্পী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে স্বামীজী বলেছিলেন, "পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশের শিল্পনিদর্শন দেখে এলুম"—তখন সে কথায় এতটুকু অতিরঞ্জন ছিলনা।

শিল্পবিষয়ে বিপুল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বামীজীর ব্যাপক প্রাসঙ্গিক পড়াশোনা। তদুপরি তাঁর ছিল প্রতিভার সহজাত অন্তর্দৃষ্টি যা বস্তুসত্যের মর্মভেদ করে যায়। এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে অসামান্য তাঁর ক্ষমতা—রামকৃষ্ণের এই শিষ্য প্রতীকের তাৎপর্য জানতেন। শিল্পজগতে প্রতীকের মূল্য সম্বন্ধে তাঁর বোধ যেমন গভীর, সমর্থন সুদৃঢ়, অন্যদিকে তেমনি অতিপ্রতীকী হয়ে পড়লে শিল্প কিভাবে প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে, সে-বিষয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ সচেতনতা। প্রতীক বিষয়ে বহু কথা তাঁর রচনাবলীর নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে।

স্বামীজীর কাছেই যে নিবেদিতার ভারতীয় শিল্পদীক্ষা, তা নিবেদিতার রচনায় প্রায়শ উল্লিখিত। কাশ্মীরে থাকাকালে স্বামীজী কিভাবে সেখানকার মন্দিরস্থাপত্য ও ভাস্কর্য বুঝিয়েছিলেন, সেকথা নিবেদিতা 'নোটস্ অব সাম ওয়ান্ডারিংস্ উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ' বইয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। তাঁর 'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' বইয়ে পাই—স্বামীজী তাঁদের কাছে কেবল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শিল্পনিদর্শনগুলির সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেন নি, তাঁর ছিল সেই চির আধুনিক ও সর্বাত্মক দৃষ্টি যার দ্বারা তিনি আর্যাবর্তের বিস্তৃত ক্ষেত খামার এবং গ্রামবহুল সমতল প্রদেশগুলির দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সৌন্দর্যও খুলে ধরেন। এই প্রাপ্তির ভাগ্যের ফলে নিবেদিতা শুধু অজন্তা, ইলোরা, আগ্রা, দিল্লী, বিহার, কাশী ও

চিতোরের শিল্পসৌন্দর্যের ব্যাখ্যাতা হননি—ভারতীয় জীবনের অব্যাহত ছন্দের মহান দ্রষ্টা ও স্রষ্টাও হতে পেরেছিলেন—'দি ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ', 'স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম', 'দি ফুটফলস্ অব ইন্ডিয়ান হিস্টরি' বইগুলিতে সে সকলের ভূরি ভূরি নিদর্শন মিলবে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে স্বামীজীর কাছে নিবেদিতার শিক্ষা শুরু হয়েছিল ১৯ জুলাই ১৮৯৮ তারিখে কাশ্মীরে প্যান্ড্রেস্থান মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে। নিবেদিতা লিখেছেন, "স্বামীজীকে বাদ দিলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে আমাদের সকলের সেই প্রথম অনুপ্রবেশ। তাই স্বামীজী তাঁর দেখা শেষ করার পরে আমরা তাঁর কাছ থেকে শিখে নিলাম কিভাবে অভ্যন্তরভাগ পর্যবেক্ষণ করতে হয়।" স্বামীজীর কাছে নিবেদিতার শিল্পশিক্ষা অব্যাহত ছিল। ১ ডিসেম্বর ১৮৯৯, শিকাগোয় এক সভায় নিবেদিতাকে 'ভারতের চারুশিল্প ও কারুশিল্প' বিষয়ে বক্তৃতা করতে হয়। নিবেদিতা মেরী হেলকে চিঠিতে লিখেছেন (২৫-১১-১৮৯৯), "ভারতীয় চারুশিল্প ও কারুশিল্প বিষয়ে আমি তো কিছুই জানিনা।" মুশকিল আসান অবশ্যই স্বামীজী। "যদি তুমি [মেরী হেল] রাজি থাকো তাহলে তোমাদের ওখানে শনিবার সন্ধ্যায় গিয়ে স্বামীজীকে ওই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করতে পারি। ...আমার স্থির বিশ্বাস, স্বামীজী আমাকে সাহায্য করবেন। ...তিনি ওই বিষয়ে যথার্থই অনেক কিছু জানেন।"

স্বামীজীর শিল্পবক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রলোভন ত্যাগ করে, এখানে যেসব বিষয়ে তাঁর চিন্তা পরবর্তীকালে নিবেদিতাকে প্রভাবিত ও চালিত করেছে, সেগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ক'রে নিতে পারি। স্পষ্টভাবে বলা ভালো—পর-পর্বে ওকাকুরা, হ্যাভেল, কুমারস্বামী ও অরবিন্দের শিল্পবক্তব্যের অনেকগুলির মূল সূত্র বিবেকানন্দ পূর্বাহ্ণে নির্দেশ ক'রে গেছেন—সেসব হয় সরাসরি তাঁর রচনা থেকে, না-হয় নিবেদিতা-মারফত, ওঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল (অবশ্য স্বাধীন উদ্ভবের সম্ভাবনাকে বাদ দিচ্ছি না)।

স্বামীজীর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিল্পপ্রত্যয়গুলি প্রধানত এই :

(ক) হিন্দুশিল্প বস্তুরূপ অপেক্ষা ভাবরূপের উন্মোচনে অধিক যত্নশীল। প্রতীকী ভাষায় ঘটেছে হিন্দুশিল্পের আত্ম-উন্মোচন।

(খ) প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দুশিল্প ধর্মকেন্দ্রিক। ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে শিল্পকে অঙ্গাঙ্গি বিবেচনা করা হতো।

(গ) শিল্পের প্রতীকী ভাষা যেমন হিন্দুশিল্পের শক্তিভিত্তি, তেমনি অতি-প্রতীকী হওয়ার ফলে তা হয়ে গেছে দুর্বোধ্য ও উদ্ভট। হিন্দুশিল্পের পতনের কারণ তার প্রাণহীন আলঙ্কারিকতা।

(ঘ) হিন্দুশিল্প ভারতীয় সভ্যতারই সৃষ্টি। তার উপরে বাইরের প্রভাব পড়লেও মূলগত ভারতীয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। হিন্দুশিল্পের উপরে গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে ইউরোপীয় দাবি অতিরঞ্জিত। যেমন তাদের আর একটি অনুচিত বক্তব্য শিবলিঙ্গ পূজার উদ্ভবের মূলে আছে যৌন উপাসনা—শুধু তাই নয়, শালগ্রাম শিলার উপাসনাও নাকি একই প্রবর্তনাজাত!

(ঙ) ভারতশিল্প কেবল হিন্দুশিল্প নয়—মধ্যযুগের মুঘলশিল্পও তার অন্তর্গত। মুঘলশিল্প নিছক বহিরাগত ইসলামী ব্যাপার নয়—তার মধ্যে পূর্বতন ভারতীয় ধারার অনুপ্রবেশ

ঘটেছে। এই শিল্পের অসামান্য বিকাশ ভারতবর্ষে হয়েছে।

(চ) যদিচ ভারতবর্ষে রাজ-পৃষ্ঠপোষিত শিল্পনিদর্শন প্রভূত, তবু ভারতশিল্প প্রধানাংশে বুর্জোয়া নয়—তা গণশিল্প। ভারতীয় জীবনের সর্বস্তরে এই শিল্পবোধ সঞ্চারিত। দৈনন্দিন জীবনের সৌন্দর্যরূপের গৌরব ভারতবর্ষ করতে পারে।

(ছ) আধুনিককালে রবিবর্মা প্রভৃতির পাশ্চাত্ত্য-অনুকারী চিত্রাবলী শিল্প হিসাবে অসার্থক।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ বিবেকানন্দের ভূমিকার মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কালিদাস নাগ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নন্দলাল বসু। বর্তমান লেখকের 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে 'স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা' অধ্যায়ে (পৃঃ ৬৪-১৩৪) এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

চতুর্থ অধ্যায়

নিবেদিতার কালী-বক্তৃতায় শিল্পতত্ত্ব

স্বামীজীর এইসকল বক্তব্যকে নিজ বোধমতে গ্রহণ করে, কিভাবে সেগুলিকে প্রমাণসিদ্ধ, সেইসঙ্গে অন্যের গ্রহণযোগ্য করবার চেষ্টা নিবেদিতা করেছেন, তার কিছু সংবাদ আমরা ক্রমে দেব। তার আগে কিভাবে শিল্পের প্রতীকী ভাষা স্বামীজীর কাছে তিনি শিক্ষা করেছিলেন—তার সংবাদ নেওয়া যেতে পারে। এইখানে পাঠকদের তারিখের দিকে বিশেষ নজর দিতে অনুরোধ করব, কারণ তারিখগুলি ভারতীয় শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ দিকে নিবেদিতার অগ্রবর্তিতা দেখিয়ে দেয়।

নিবেদিতা ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯, কলকাতার অ্যালবার্ট হলে 'চাঞ্চল্যকর' কালী-বক্তৃতা করেন। ওই বক্তৃতায় কালীর প্রতীকী রূপের অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় ব্যাখ্যা ছিল, যাকে কুমারস্বামী-সহ অনেকেই পাশ্চাত্ত্য-জগতের কাছে কালীর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা মনে করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মদের, বিশেষত ঠাকুর-পরিবারের কারো-কারো পক্ষে, ভয়ঙ্করী কালীকে স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা বড়ো জোর সুন্দরী সরস্বতীকে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। পূজাই যদি করতে হয় তাহলে বিকট কালীমূর্তি কেন ?—তাঁরা বলেছিলেন। ধর্মবোধ যখন মানুষের নিজস্ব ব্যাপার তখন সে-বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীন মত থাকতেই পারে ; কিন্তু নন্দন-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-স্বীকৃত মান আছে। সেখানে ওহেন আপাত-সৌন্দর্যের অর্চনা লঘু অগভীর ব্যাপার বলে নিবেদিতার মনে হয়েছিল। তিনি কালীঘাট মন্দিরে ২৮ মে ১৮৯৯ তারিখে আর একটি কালী-বক্তৃতা করেন ; তার মধ্যে তাঁর পূর্ব-বক্তৃতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি—যথা ভয়ঙ্করী কালী সুকুমারমতি মানুষের সৌন্দর্যচেতনায় আঘাত করে—এই সকল কথার উত্তর ছিল। তাঁকে আতঙ্কে একথা শুনতে হয়েছিল—"ইউরোপীয় ভাস্কর্য অনেক উচ্চস্তরের।" উত্তরে নিবেদিতা সতর্ক করে বলেন :

"যদি ভারতীয়রা গভীরভাবে নিজেদের সৃষ্টির তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা না করেন, তাহলে তাঁরা বিদেশী সৃষ্টির বহিরঙ্গ সৌন্দর্যটুকু দেখেই বিভ্রান্ত হবেন—কদাপি সে সৌন্দর্যের পিছনকার গভীর প্রেরণা ও আদর্শের কথা বুঝবেন না। ফলে তাঁরা নিজেদের শিল্পকে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন করতে গিয়ে অধিক স্থূল ও নিম্নমুখী ক'রে তুলবেন।"

কালীর বীভৎস মূর্তির পূজা, শিল্প ও ভাস্কর্যের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হবে—এই বক্তব্যকে

চ্যালেঞ্জ ক'রে নিবেদিতা বলেন :

"সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করদের সময় থেকে সমগ্র গ্রীস তীর্থযাত্রা ক'রে উপস্থিত হতো ডেলফি-র মন্দিরে, যেখানে ছিল প্রায় বেঢপ চেহারার এক উপাসনার মূর্তি—সেই কালের মানুষেরা সে মূর্তির পাদমূলে প্রণত হতো। এঁরাই জন্ম দিয়েছেন ফিডিয়াসের।"

ম্যাডোনা-মূর্তির সৌন্দর্যরসিকদের তিনি সচেতন করেছেন এই বলে :

"একথা সত্য, ইউরোপে একযুগে ধর্মার্চনা ও কলাশিল্পের উন্নতি পাশাপাশি চলেছিল, যার ফলে ধর্ম-ব্যাপারে বাহ্যিক চাকচিক্য ও আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার দ্বারা কেউ যেন মনে না করেন, মেরী ও তাঁর শিশুর প্রতিমূর্তি সব সময়েই সুন্দর ছিল। বাইরের মানুষ, যাঁর মনের মধ্যে খ্রীস্টানভক্তের ভাবানুভূতির বিষয়ে সচেতনতা নেই, তাঁর পক্ষে প্রথম যুগের বাইজান্টীয় চিত্রাবলী এবং খোদাই-কাজ প্রাণহীন কুৎসিত ঠেকবে—ইউরোপীয় ভাবাপন্ন সমালোচকের কাছে কালীমূর্তি যেমন ঠেকে।"

এর পর নিবেদিতা শেষ মর্মচ্ছেদী ঘা দিলেন—যা ওইসকল আপাত সৌন্দর্যসুখী ব্যক্তিদের বাস্তবিকপক্ষে শিল্পবোধহীন বলে দাঁড় করিয়েছে। ধর্মপ্রতীকের প্রসঙ্গে তিনি ভাবানুষঙ্গের কথা তুললেন। তথাকথিত "নিষ্ঠুর", "কুৎসিত", "অবাস্তব"—এসব হলো অপরিচয়ের উৎসাহিত উক্তি। জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা অনুযায়ী মানুষ প্রতীককে বিভিন্নভাবে দর্শন ও গ্রহণ করে। খ্রীস্টান ভক্ত যখন "রক্তপূর্ণ উৎসের" কথা বলে তখন কিন্তু সে খাঁটি বাস্তব ছবিটা চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলে ভাববিহ্বল হয়না। রক্তপিপাসু কালীর ক্ষেত্রেও ভক্তের অনুরূপ মনোভাব। নিবেদিতা তারপর বললেন :

"কিন্তু এমন-কি ইউরোপীয় শিল্পের মাপকাঠিতে বা ওই শিল্পের আলোচকদের দৃষ্টিতে কালীমূর্তি অসাধারণ নাটকীয় চরিত্রসম্পন্ন, যা কোনোমতে চোখ এড়িয়ে যাবার জিনিস নয়। প্রথম পর্যায়ে সকল শিল্পই চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ-চেষ্টায় আঁকুপাঁকু করেছে, যেহেতু প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম তার আয়ত্তে ছিলনা। এই কালীমূর্তির প্রগাঢ় অর্থদ্যোতকতা এমন-কি বারবার দেখে অভ্যস্ত চোখেও সুস্পষ্ট ও চমকপ্রদ আকার নিয়ে ধরা পড়ে। যে-অভিযোগকারীরা ইউরোপীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেছেন, তাঁরা যদি ইউরোপীয় হতেন তাহলে কালীমূর্তি বিষয়ে ওই কথা [তার অসাধারণ নাটকীয় রূপের কথা] স্বীকার করতেন। এখানে এইটুকুই বলতে চাই, ভারতীয়রা নিজেদের পুরাণ-কথা বা সৃষ্টি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য থেকে চোখ সরিয়ে, তাদের সঙ্গে অযথা তুলনাদির ব্যাপারে বিরত থাকলেই ভালো করবেন।"

এই দ্বিতীয় কালী-বক্তৃতার ৬ মাস পরে, মিসেস বুলকে ২৫ নভেম্বর ১৮৯৯ তারিখে লেখা চিঠিতে, নিবেদিতা শিকাগোর পূর্বোক্ত 'ভারতীয় চারুশিল্প ও কারুশিল্প' বক্তৃতার প্রয়োজনে চেয়ে পাঠান—"কালীমূর্তির প্রতিলিপি এবং ইউরোপীয় অনুকরণের দ্বারা অধোগত কিছু আধুনিক হিন্দুশিল্পের নমুনা।" তার আগে, আমেরিকা যাবার পথে যখন লন্ডনে আছেন তখন সেখানকার মিউজিয়াম ঘুরে এসে মুর্শিদাবাদে অবস্থিত স্বামী অখণ্ডানন্দকে ১০ আগস্ট ১৮৯৯ তারিখে লেখেন :

"সেদিন মিউজিয়ামে গিয়ে হাতীর দাঁতের খোদাই-করা এক অতি সুন্দর দুর্গামূর্তি দেখেছি। স্বামীজী বলেছেন, এ-ধরনের জিনিস মুর্শিদাবাদে সহজেই পাওয়া যায়। সেসব কি খুব দামী ? আমার ইচ্ছা, পাশ্চাত্ত্যে গিয়ে আমাদের হিন্দু প্রতীকগুলির তাৎপর্য কিছু

ব্যাখ্যা করব। আর যদি পেতলের কিংবা কাঠের দুর্গামূর্তি অসম্ভব দামী না হয় তাহলে তা পেলে খুবই আনন্দিত হবো। হাতীর দাঁতের মূর্তির কথা বলাবাহুল্য ওঠেনা।"

নিবেদিতা এই সময়েই স্বামীজীকে বলতে শুনেছিলেন :

"হিন্দু চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, জাতীয়-প্রবণতা অনুযায়ী আত্মিক ও মানসিক বিষয়কে বাহ্য অবয়বসংস্থানের মধ্যে প্রকাশ করতে গিয়ে উদ্ভট রূপ নিয়েছে। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অধিকাংশ দৈহিক ও মানসিক বস্তুর ভাবপ্রতীক আছে, যা প্রায়শ আপাতদৃষ্টিতে তার বাইরের দেহরূপের পাশে উদ্ভটভাবে পৃথক দেখায়।" (মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি, ১৬·৭·১৯০০)।

পঞ্চম অধ্যায়

নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা : বয়নশিল্প প্রসঙ্গ

॥ ১ ॥

ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের শিল্পবিষয়ে অসাড় ধারণার এই পটভূমিকায় যখন দেখি—নিবেদিতা তাঁর শিশু বিদ্যালয়ে শুরুতেই শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিলেন, তখন সে ব্যাপারটা রীতিমতো বৈপ্লবিক বলে মনে হয়।

সত্যই বৈপ্লবিক! তা কী আকারে বৈপ্লবিক, বুঝতে পারা যাবে সমকালের ইংলন্ডে শিশুশিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্পের সকরুণ অবস্থার কথা জানলে। নিবেদিতাই সেকথা জানিয়েছেন।

১৮৯৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর শিকাগো ট্রিবিউন কাগজে 'পাবলিক স্কুলগুলিতে শিল্পশিক্ষা' প্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি চিঠি বেরোয়। নিবেদিতা তখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ঘোরাফেরা করছেন তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে। সেই সময়ে তিনি শিকাগোর পাবলিক স্কুলগুলিতে শিল্পশিক্ষার সুব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন, এবং খুবই দুঃখের সঙ্গে এই বিষয়ে ইংলন্ডের বিদ্যালয়গুলির পশ্চাদ্‌গামিতার তুলনাও করেন। ইংলন্ডে তিনি গণতন্ত্রের অনেক কথা শুনেছেন, কিন্তু কার্যকালে তার চিহ্ন দেখেন নি, অথচ আমেরিকায় দেখলেন খাঁটি গণতন্ত্রকে, অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রে। তুলনার ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার প্রসঙ্গ এনেছেন। এ-বিষয়ে ইংলন্ডের মানুষকে সচেতন করতে প্রয়াসী রাসকিনের শিষ্য এবেনজার কুক—তিরিশ বছর আগে থেকে সে চেষ্টা তিনি করে যাচ্ছেন। কুক বোঝাতে চেয়েছেন, সকল মানুষের পক্ষে অক্ষরজ্ঞান যেমন প্রয়োজন তেমনই সকল শিশুর পক্ষে প্রয়োজন চিত্রাঙ্কন-শিক্ষা। তাঁর বহু বৎসরের চেষ্টার ফলে অভিজাতমহলে কিছু নড়াচড়া দেখা যায়, তাঁরা অনেকে তাঁদের ছোট ছেলেমেয়েদের শিল্পশিক্ষার ভার দেন ওই শিল্পীর উপর। কিন্তু সরকার তথাপি উদাসীন। অনেক চেষ্টার পড়ে সরকারের ঈষৎ তন্দ্রাভঙ্গ হয়, তাঁরা কুকের উপরে বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষাসূচী রচনার ভার দেন। তার আগে পর্যন্ত এই

ধারণা বলবৎ ছিল—শিশুরা গতানুগতিক রীতিতে কালো রেখায় ড্রইং শিখবে, তাই যথেষ্ট, তাদের কোনো রঙ ব্যবহার করার দরকার নেই। রঙের ভাষায় নিজের মনকে শিশুরা খুলে ধরবে—এ ছিল চিন্তার বাইরে। এবেনজার কুক-এর শিল্প-শিক্ষাসূচী গৃহীত হবার পরে তবে নিম্নতম শ্রেণীর শিশুরা পর্যন্ত রঙ ও তুলি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে ইংলন্ডে। তাও ব্যাপক প্রসারলাভ করেনি, কারণ রক্ষণশীল ইংলন্ডের পাশ ফিরতে সময় লাগে।

এই পটভূমিতে নিবেদিতা দেখে চমৎকৃত—শিকাগোতে এবেনজার কুক-এর মতোই একজন আগে থেকে অনুরূপ কাজ শুরু করেছেন—মিস জোসেফিন লক। [প্রসঙ্গত জানাই, এঁর সঙ্গে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে স্বামীজীর আলোচনাদি হয়েছিল]। এখানকার বিদ্যালয়গুলিতে শিল্পবিষয়ে উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়া হয়, অথচ সে-কাজকে আহা-মরি ব্যাপার মনে করাও হয়না। ও তো খুবই স্বাভাবিক কাজ! মিস লক নিবেদিতাকে বলেছিলেন, শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্য হলো—নগরবাসীদের মধ্যে প্রকৃতি-জীবনের সংরক্ষণ। আলোচ্য বিষয়ে এই কথাগুলি অসাধারণ প্রজ্ঞায় পূর্ণ—নিবেদিতার মনে হয়েছিল। তিনি দেখলেন, পৃথিবীর নানা দেশের শিশু আমেরিকায় জুটেছে, একত্র বসে ছবি আঁকছে, তার মানে তারা সৃষ্টি করছে, আর তার মধ্য দিয়ে অজান্তে আমেরিকাগত হয়ে যাচ্ছে। রচনার সুখে মিলিত হয়েছে শিশুগুলি, স্ব-স্ব দেশের সংস্কৃতিকে মিশিয়ে দিচ্ছে এক স্রোতে, তার দ্বারা অন্তর্গত হয়ে যাচ্ছে আমেরিকার জাতীয় চেতনায়। ওই শিল্পশিক্ষাকে বস্তীবাসী শিশুদের মধ্যে পর্যন্ত প্রসারিত করেছে যে-আমেরিকা, তাকে এই বিশেষ ক্ষেত্রে ধন্য দেশ বলে নিবেদিতা মেনেছেন—সেই সঙ্গে বিষাদের সঙ্গে স্মরণ করেছেন এক্ষেত্রে তাঁর জন্মভূমি ইংলন্ডের অনগ্রসরতার কথা। [সংযোজন অংশে নিবেদিতার পত্রটি মুদ্রিত]

শিকাগো ট্রিবিউনে এই লেখার কিছু-বেশি এক বছর আগে, ১৩ নভেম্বর ১৮৯৮, নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয় শুরু করেন ১৬ নং বোসপাড়া লেনে—সেদিন শ্রীমা সারদাদেবী স্বয়ং এসে পূজা ও প্রার্থনা ক'রে যান। সেই পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ে, কয়েকটি শিশুকে যেখানে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছিল—তেমন জায়গায় শুরুতেই শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো! অল্পদিনের মধ্যে নিবেদিতা লিখেছেন :

"এখানে যে-বাচ্চাগুলিকে তুমি [মিসেস বুল] চিনতে, তাদের শিল্পক্ষমতা এতাবৎ সেরা যা দেখেছি তার মতোই। এখানে তাদের সীমিত সুযোগের কথা মনে রাখতেই হয়। তাদের তুলির কাজ অদ্ভুত ভালো, আর রঙের ব্যবহার চমৎকার। তারা কী সুন্দরভাবে যে সেলাই ও কারুকাজ করে, কি বলব!"

একথা কোনোভাবে মনে কারণ নেই যে, নিবেদিতা অশিক্ষিত পটুত্বের সমাদরে উৎসাহী। প্রেরণার সঙ্গে তিনি আঙ্গিকনৈপুণ্য চাইতেন। যে-উইলিয়ম মরিসের সিভিক শিল্পের তিনি অনুরাগী, তাঁর বিষয়ে নিবেদিতার বক্তব্য :

"উইলিয়ম মরিসের ডিজাইন তাঁর জ্ঞানেরই সৃষ্টি। তদনুযায়ী যখন তিনি কিছু সৃষ্টি করেছেন তখন তা কেবল মৌলিক হয়েছে তাই নয়, একই সঙ্গে মুদ্রণশিল্পের সর্বোচ্চ ধারাবাহী। তিনি বিরাট কারিগর।" (মিসেস লেগেটকে, ২০-৪-১৯০০)

এই প্রসঙ্গকে টেনে নিয়ে নিবেদিতা একই চিঠিতে বলেছেন :

"যতক্ষণ না কোনো কিছু নিখুঁত হচ্ছে ততক্ষণ অনলস পরিশ্রম ক'রে যেতে হবে। এই গুণকে রামকৃষ্ণ স্কুলের অন্তর্গত আমরা, আমাদের প্রকাশ করতেই হবে—নচেৎ সবই ভস্মে ঘি ঢালা। সস্তার কারুশিল্প, আজেবাজে হাতের কাজ—সেসব কদাপি টেকে না। তাই

একটা সময়ে একটি কাজই করণীয়—আর সে-কাজ করবার সময়ে চাই অসীম যত্ন।"

নিবেদিতা তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার বিষয়ে এমনই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে, ওই বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদনযুক্ত যে-পুস্তিকা প্রকাশ করেন ('Project of The Ramakrishna School for Girls', 1900), তার মধ্যে, অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে থাকবে "এমন সব হস্তশিল্প যাদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কুটীরশিল্পের পুনর্জাগরণের সম্পর্ক আছে"—একথাও বলা হয়। এই সময়ের আগেই তিনি তাঁর প্রায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সূচীশিল্প ইত্যাদির "চমৎকার ছোট্ট প্রদর্শনীর" ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর বাসস্থানে। (৭-৬-১৮৯৯ চিঠি)।

সূচীশিল্প সম্বন্ধে নিবেদিতার অপরিসীম আগ্রহের কথা তাঁর চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে। ২৪-২-১৯০৪ তারিখের চিঠিতে মিস ম্যাক্লাউডের কাছে তিনি ফ্লোরেনটাইন থিম্বল্ চেয়ে পাঠিয়েছেন, সস্তায় মিললে পুরনো সূতীর কাজ বা ছাপা কাপড় পাঠাতে বলেছেন। এই সঙ্গে লিখেছেন, "ক্রিস্টিন আমার স্বপ্ন পূরণ করেছে—সে আমাকে সূচীশিল্পের ক্লাস নিতে দিচ্ছে—আর তাতে কী-যে সুখ পাচ্ছি কি বলব ! কিন্তু আমার চাই আইডিয়া—বিশেষত রঙ সম্বন্ধে।" ৮-২-১৯০৫ তারিখের চিঠিতে কিভাবে জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করেছিলেন তার প্রসঙ্গ ছিল। তিনি আরও বলেন, "আমি অবিরাম লেখার কাজ করছি, সেইসঙ্গে শিক্ষকদের তৈরী করতে চেষ্টা করছি এবং সূচীশিল্পের ডিজাইন প্রস্তুত করছি। শেষের কাজটি আমি বিশেষ ভালবাসি।" একই চিঠিতে : "মাদারকে [মিসেস লেগেটকে] দুই পাউন্ড পাঠিয়ে কিছু বাছা-বাছা রঙ কিনে পাঠাতে বলব ভাবছি। তিনি আমাকে কৃষকশ্রেণীর তাঁতশিল্পীদের কাছ থেকে কিছু চমৎকার হলুদ এবং সবুজ রঙে ছোপানো কাপড়ের টুকরো কিনে পাঠিয়েছিলেন। আমি কালো টুকরোগুলোর বেশির ভাগ ব্যবহার করেছি, কিন্তু চড়া হলদে, সবুজ এবং বেগুনি লিনেনগুলি খুব চিত্তাকর্ষক নয়। সেগুলি এত উজ্জ্বল যে, আচ্ছাদনী হিসাবে ব্যবহার করা যায়না, আর লাইনিং করার পক্ষে শক্ত জিনিস। আমি তাঁকে এই বৎসর 'Liberty scraps' চাইব ভেবেছিলাম, কিন্তু তার পক্ষে খুব দেরী হয়ে গেছে।"

কারুশিল্প সম্বন্ধে একান্ত ঔৎসুক্যের পরিচয় নিবেদিতার চিঠিপত্রে দেখা যায়। তিনি অর্ডার দিয়ে মিসেস লেগেটের জন্য শাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে ১৯০৫ ইস্টার সপ্তাহে এক চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, "রূপো সম্বন্ধে তোমার আপত্তির অর্থ বুঝলাম না। পাড় ও আঁচলা রূপোরই, তা নানাভাবে বার্নিশ করা হয়; কিন্তু সেসব বুনটের বদল করা যায়না।...আমার কথা হলো, ও-জিনিস পৃথিবীর কারুশিল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ও সর্বোত্তমের মধ্যে পড়ে। ধোয়ার পরে এদের রঙ হয় তুষারশুভ্র। কিন্তু যতই দিন যায়, সোনার পাড়ের রঙ বদলায়। একথা জেনেছি যে, সমঝদাররা (প্রতিটি ভারতীয় কৃষক বয়নশিল্পের সমঝদার) নতুন বস্ত্রে যেমন সৌন্দর্য দেখে তেমনি পুরনো বস্ত্রে উপভোগ করে ভিন্ন ধরনের সৌন্দর্য।" একই প্রসঙ্গে মিসেস বুলকে ২৪ মে ১৯০৫, লিখেছেন, "ভারতীয় শাড়ির সুন্দর বুনটকে ঠিক যেমন আছে সেইভাবে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে—যেমনটি করা হয় তুরস্কের কার্পেট বা পারস্যের টালির ক্ষেত্রে। না-হলে একে অগ্রাহ্য করে দেওয়াই উচিত।" ১৯০৬ ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে শিল্পপ্রদর্শনীতে দেবার জন্য "যথার্থ যোগ্য একটি-দুটি সূচীশিল্প-দ্রব্য তৈরী হয়ে আছে," একথা নিবেদিতা ২৮-১১-১৯০৬ তারিখের চিঠিতে জানিয়েছেন। কংগ্রেস প্রদর্শনী প্রসঙ্গে মিস ম্যাক্লাউডকে ১৫-১২-১৯০৬ তারিখের চিঠিতে ভারতের গৃহশিল্প সম্বন্ধে আরও কিছু কথা

লিখেছিলেন : "র‍্যাটক্লিফরা [স্টেটসম্যানের সম্পাদক ও তাঁর স্ত্রী] ফিরেছে। ...আমার জন্য তারা অতি মনোরম রঙিন লিনেন [ইংলন্ড থেকে] এনেছে। সপ্তাহখানেক কি সপ্তাহদুয়েকের মধ্যে তাদের কিছু-কিছু প্রদর্শনীতে যাবে, আর যাবে অলিভ কাঠের বাতিদান ও জপমালা। কিছু সহজ ভারতীয় জিনিস জোগাড় ক'রে সর্বত্র বন্ধুদের সবসময়ে পাঠাতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু এদেশে সবই সহজ ব্যাপার হলেও ওই বিশেষ ইচ্ছা সিদ্ধ করার জিনিস নেই। ডাকে তো আর ছোট মাটির প্রদীপ কিংবা ছোট পাথরের জিনিস পাঠাতে পারিনা—পারি কি ? আর ক্রিসমাস-স্মারক হিসাবে অগণিত মালা পাঠানো সস্তা ব্যাপার দাঁড়াবে না। ভারতের ঝুটো অলঙ্কার সম্পদবিশেষ—সৌন্দর্যের ভাণ্ডার—কিন্তু তার ওজন এমন যে, খুব ব্যয়সাধ্য দাঁড়াবে।" ভারতীয় ডিজাইন সম্বন্ধে উৎসাহী নিবেদিতা ১-৯-১৯০৯ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন : "ভারতীয় নারীদের তৈরী করা ডিজাইনের উৎসসন্ধান এখনো করা হয়নি। ওদের ডিজাইন অপূর্ব বিস্ময়ের বস্তু। ভারত নানা ধরনের প্যাটার্নে ভর্তি—এখনো সেগুলি কী-যে সুন্দর।" মিসেস বুলের কাছ থেকে "রাশিয়ান সূচীশিল্প সম্বন্ধে চমৎকার এক চিঠি" পাবার পরে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে ২-৯-১৯০১ তারিখের চিঠিতে জানান, "ভারতীয় নারীদের মধ্যে যে-ধরনের ডিজাইন চলিত আছে তাদের গভীর অনুশীলন করছি। দারুণ একটি বিষয়।"

॥২॥

বয়নশিল্প সম্বন্ধে নিবেদিতার নিবিড় মনোযোগের উৎকৃষ্ট প্রকাশ দেখি কাশ্মীরী শাল সম্বন্ধে রচিত প্রবন্ধটিতে।[১] ঈষৎ প্রসঙ্গান্তরে সরে গিয়ে নিবেদিতার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করছি।

প্রবন্ধ সূচনায় তিনি বলেছেন, শ্রীনগর প্রায় দু' হাজার বছর আগে রাজনৈতিক দিক থেকে গৌরবান্বিত ছিল—যখন সে এক বৌদ্ধ নরপতির শাসনাধীনে থেকে ভারতের বৃহৎ অংশের রাজধানী। সেই রাজনৈতিক গৌরব এখন শ্রীনগরের নেই। কিন্তু যেহেতু রাজনৈতিক গৌরব অপেক্ষা শিল্পগৌরব নিবেদিতার দৃষ্টিতে কোনো অংশে ন্যূন নয়, তাই তাঁর দৃষ্টিতে, বিচিত্র রমণীয় পুরাতন এই নগরীটি নূতন ও বৃহত্তর গৌরবলাভ করেছে—তা এখন পৃথিবীর সেরা এক কারুশিল্প—কাশ্মীরী শালের সৃষ্টিশালা। তাতাররা চারশো কি পাঁচশো বছর আগে শ্রীনগরে শাল বোনার কৌশল আমদানী করে, পরে তা ভারতীয় রুচির উজ্জীবক প্রভাবের অধীন হয়, এবং দ্রুত ঘরোয়া কারুশিল্প থেকে চারুশিল্পে বিকাশ লাভ করে।

কী ধরনের উপাদানে এই শাল প্রস্তুত হয়, সে-বিষয়ে উল্লেখের পরে, নিবেদিতা বলেন, তিন মাথা এক হয়ে এই শিল্প সৃষ্টি করে—এক, ডিজাইন-কারক, দুই তার নকল-কারক, তিন, বয়ন-কারিগর। প্রথমজন পায় মাত্র কয়েক শিলিং। দ্বিতীয়জন যেহেতু মূল পরিকল্পনা থেকে প্যাটার্ন তৈরি ক'রে দেয় তাই তার কাজের দাম মূল শিল্পীর চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। এটা নিবেদিতার কাছে "খুবই দুঃখজনক", কেননা একজন প্রতিভাবান শিল্পীকে এর দ্বারা যতসব মাঝারিদের পালে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। "তাছাড়া এর ফলে আমরা ব্যক্তিত্বের মনোহর স্পর্শটুকু থেকে বঞ্চিত হই, যা পাই, ধরা যাক, হোকুমাই-এর কোনো খেলনার ছবির বইয়ে কিংবা ডেলা রবিয়াস্-এর মডেল করার কাজে।" এর পরে নিবেদিতার আলোচনা ঘুরে গিয়েছিল শিল্পীর জীবনে যশ নামক ব্যাপারের উজ্জীবক কিংবা অধোগতিকর প্রভাবের আলোচনায়। তিনি তাঁর স্বভাবমতো আদর্শের মহান যুগের কথা বলেছেন যেখানে সর্বোচ্চ

শিল্পচেতনার কাছে শিল্পীর যশোলিপ্সার নিঃশেষ আত্মদান ঘটেছে।

কাশ্মীরী শালের উত্থান-পতনের ইতিহাসে প্রবেশ ক'রে নিবেদিতা স্মরণ করেছেন ইউরোপে একদা এর দারুণ সমাদরের যুগের কথা ; তারপরে ফরাসি রাজবংশের পতনের সঙ্গে নেমে-আসা দুর্দিনের কথাও। কিভাবে বিশ্বের বাজারে পুনশ্চ উপযুক্তভাবে প্রবেশ করা যাবে ? নিবেদিতার বক্তব্য, এক্ষেত্রে শালের নির্মাণে স্বাধীন ও মৌলিক ভাবনা আনতে হবে, তার নতুন ব্যবহারের ক্ষেত্রও তৈরি করতে হবে, গৃহসজ্জা ইত্যাদিতে ট্যাপেস্ট্রি বা ড্রেপারি-রূপে তাদের কাজে লাগাতে হবে।

পুরনো কাশ্মীরী শালের শিল্পসৌন্দর্য সম্বন্ধে নিবেদিতা অবশ্যই অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, এবং তাদের লুপ্তপ্রায় রূপগুলি জানবার জন্য কিভাবে পুরনো নমুনা সংগ্রহ ক'রে মিউজিয়ামে রাখা প্রয়োজন সে-বিষয়ে আলোচনাও করেছেন ; তাই বলে পুরাতন শাল থেকে পরবর্তীকালের শালের রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথাও বলতে ভোলেন নি :

"দুশো বছর আগেকার শালের সঙ্গে আজকের শালের তুলনা করলে দেখা যাবে, আধুনিক নমুনাগুলিতে নকশার রেখায় অনেক বেশি সাহস ও স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটেছে, সেই সঙ্গে বর্ণসমন্বয়ের ক্রমবর্ধিত শক্তি। পূর্বের বিশুদ্ধ জ্যামিতিক আঙ্গিক ছেড়ে দিয়ে নিসর্গপ্রকৃতি থেকে নেওয়া আকারকে রীতিবদ্ধ করার সুস্পষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আগে যেখানে ছিল একঘেয়ে বক্ররেখা ও বৃত্ত, সেখানে এসেছে লতিয়ে-ওঠা, পাক-খাওয়া অলঙ্করণ। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে জীবজন্তুর চিত্রণ নিষিদ্ধ, তাই আমরা [শালের অলঙ্করণের] পুষ্পরাশির মধ্যে কাশ্মীরের বুলবুল, মাছরাঙা, হুপো ইত্যাদি সুন্দর পাখিদের পাইনা। ইদানীং রঙের ক্ষেত্রে অদ্ভুত শক্তিনৈপুণ্যের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। কিছু-কিছু পুরনো শাল অবশ্য অদ্ভুত সুন্দর। কিন্তু সব জড়িয়ে বলতে গেলে, তখনকার সেরা সৃষ্টিগুলিতেও এখনকার সচরাচর-নির্মিত শালের মতো আলোছায়ার বিন্যাস দেখা যায়না। এক্ষেত্রে কী-ধরনের রীতি নেওয়া হয়েছে তা উইলিয়ম মরিসের কীর্তির পাশে রাখলেই ইংরেজরা কিছুটা বুঝতে পারবেন। দেখা যাবে, এইসব কাশ্মীরী সুকুমার বস্তুগুলির তুলনায় মার্টন অ্যাবীর ছাপানো পর্দা, ছাপানো সূতী কাপড়, দেওয়ালে ঝোলানো পর্দা, ঝালর ইত্যাদি স্থূল ও শ্রীহীন।"

সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের সম্পর্কের প্রসঙ্গে চলে এসে নিবেদিতা বলেছেন :

"মণ্ডনশিল্পীর কাছে ভারতীয় রুচির তিন দাবি—সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি কারুকার্য, ঝলমলে ভাব এবং বস্তু-প্রাচুর্যের গরিমা। এদেশের জলবায়ুর প্রভাবে নিসর্গ প্রকৃতিতে এমনই ছেদহীন সৌন্দর্যের সমারোহ দেখা যায় যে, শিল্পক্ষেত্রে ওই প্রকার প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পুষ্পৈশ্বর্যভরা উপত্যকাই কাশ্মীরের জাতীয় শিল্পে প্রতিফলিত। এইভাবে, যে-শিল্পীরা তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন কিংবা আমেদাবাদে মর্মরপ্রস্তর ছিদ্র করার শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের চোখ ও হাত তৈরি হয়েছে বনাঞ্চলের প্রাচুর্য দেখার অভিজ্ঞতা থেকে।

"এখানে স্মরণ রাখা ভালো, যে-কারণে প্রাচ্য অলঙ্করণে চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্য, সেই একই কারণে [পাশ্চাত্যদেশে নিসর্গ প্রকৃতিতে প্রাচুর্য ও বর্ণোজ্জ্বলতার অভাব থাকায়] ভাব-বিকাশের প্রতি পাশ্চাত্য-শিল্পকে অধিক নজর দিতে হয়েছে। পাশ্চাত্যের দেওয়াল সৌন্দর্যহীন ঠিক, তবু সেখানে রয়েছে উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য, রাফায়েলের মতো শিল্পী, রসেটির মতো শিল্পীও। সেখানে জাঁকজমকভরা প্রাসাদ নেই, কিন্তু প্রাচীন ক্যাথিড্রালগুলি ? দিল্লির রক্তগোলাপ-রঙের প্রাচীরগুলি আরও ভেঙে গেলে পৃথিবী যেমন আরও দীন হয়ে যাবে তেমনি তা দীন হবে ইংলন্ডের পুরাতন গ্রাম্য গির্জার ধ্বংসে। গোটা মানবসমাজের কাছে
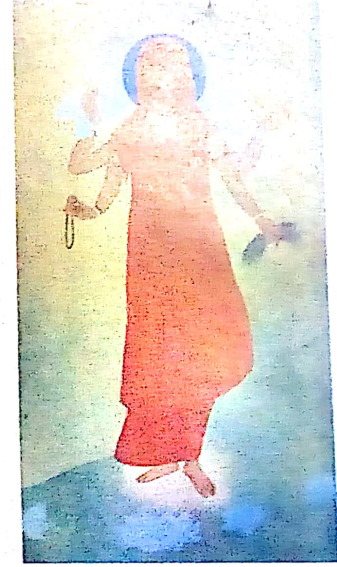
অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা'। নিবেদিতা কর্তৃক আলোচিত।

অসিতকুমার হালদারের 'ভারতমাতা'।
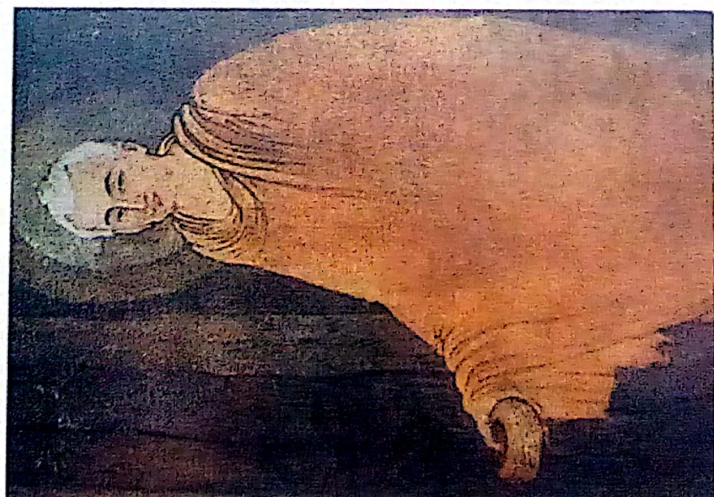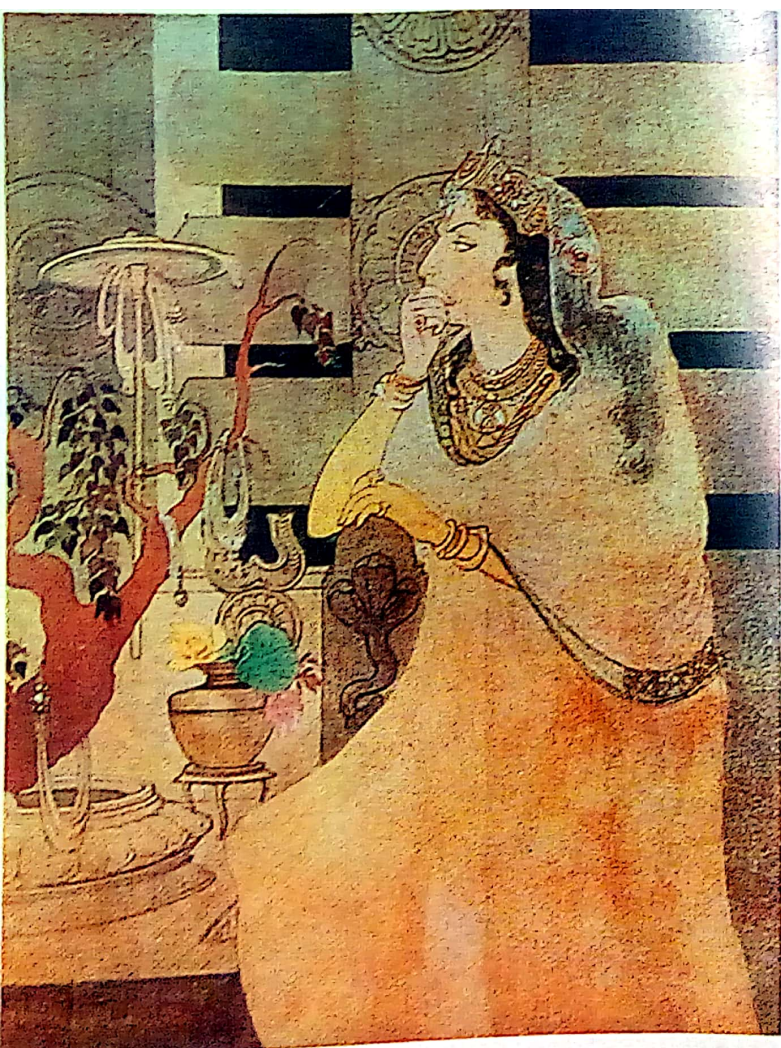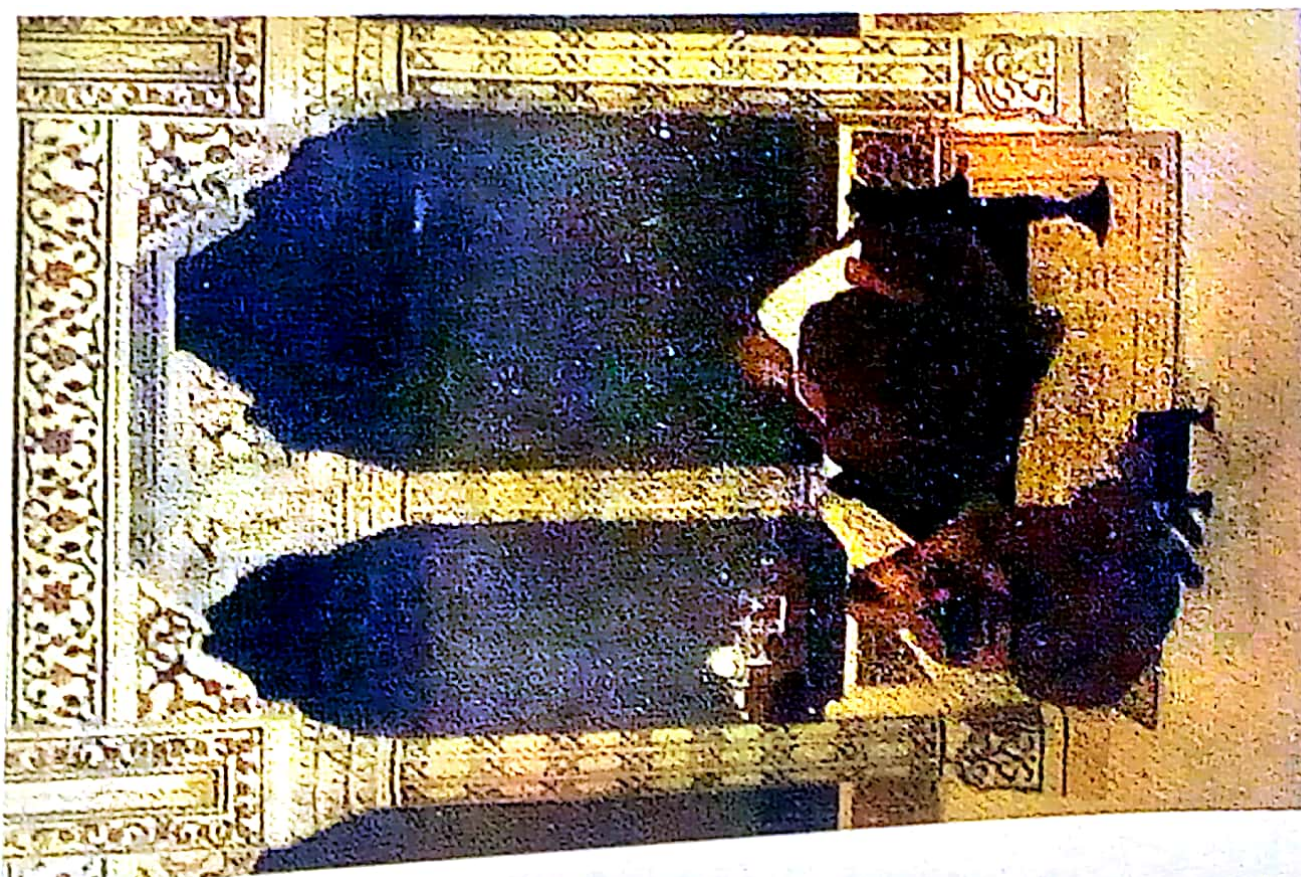
অবনীন্দ্রনাথের 'সাজাহানের শেষ শয়ন'। নিবেদিতা কর্তৃক আলোচিত।
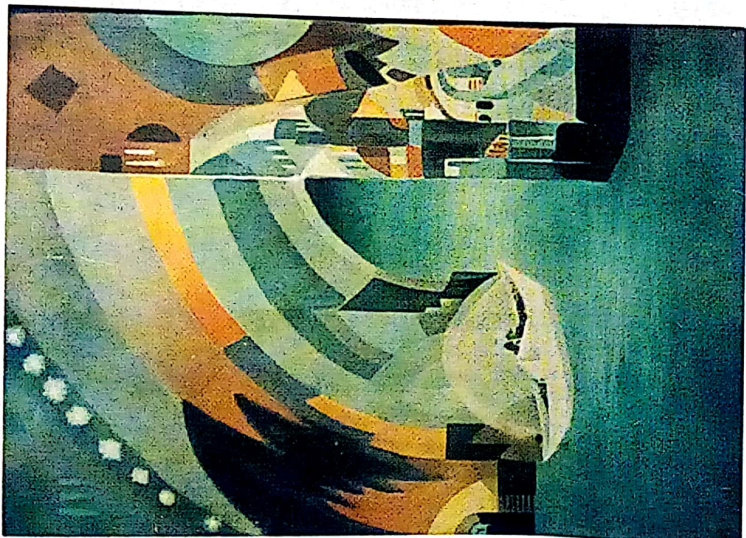
গনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপন তরণী'।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'রামায়ণ রচনারত বাল্মীকি'।

Scanned by CamScanner

সুখলতা রাওয়ের 'ইন্দ্রসভায় দেবতা'।

অসিতকুমার হালদারের 'সরাইখানা'।
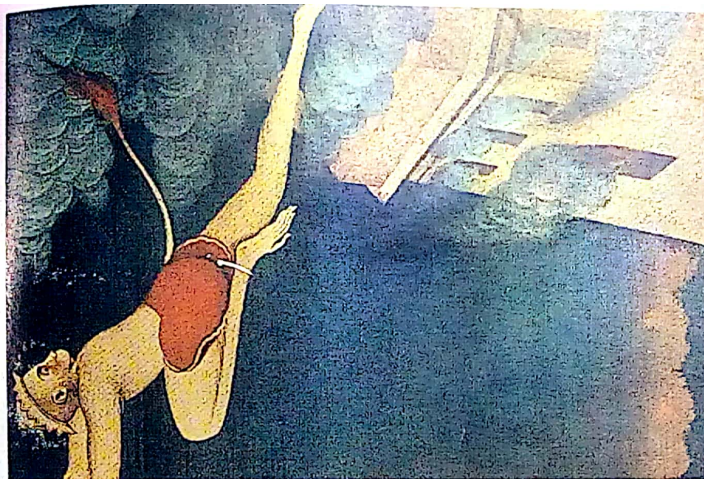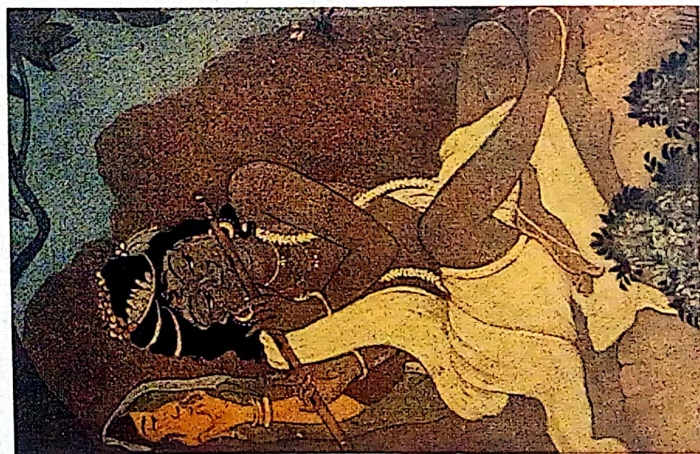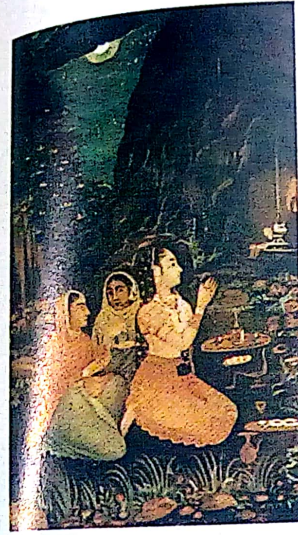
সন্ধ্যায় প্রার্থনা। প্রাচীন ভারতীয় চিত্র। হ্যাভেলের 'ইন্ডিয়ান স্কালপচার অ্যান্ড পেন্টিং' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।
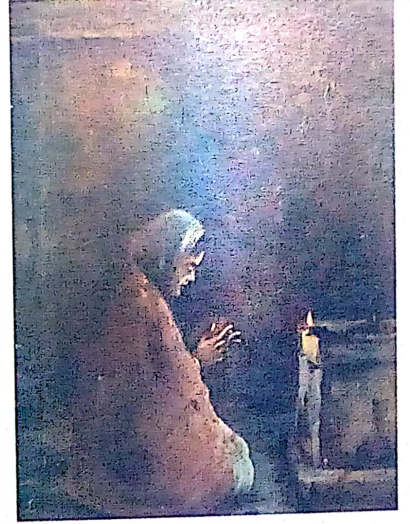
সন্ধ্যায় প্রার্থনা। শিল্পী যামিনীভূষণ রায়। 'চ্যাটার্জিস্ অ্যালবাম' থেকে গৃহীত।
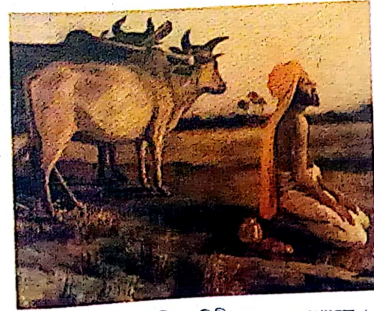
সন্ধ্যায় প্রার্থনা। শিল্পী যামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। (চ্যাটার্জিস্ অ্যালবাম)।

সন্ধ্যায় প্রার্থনা। মিলে-র (Millet) 'অ্যাঞ্জেলাস'। নিবেদিতা কর্তৃক আলোচিত।
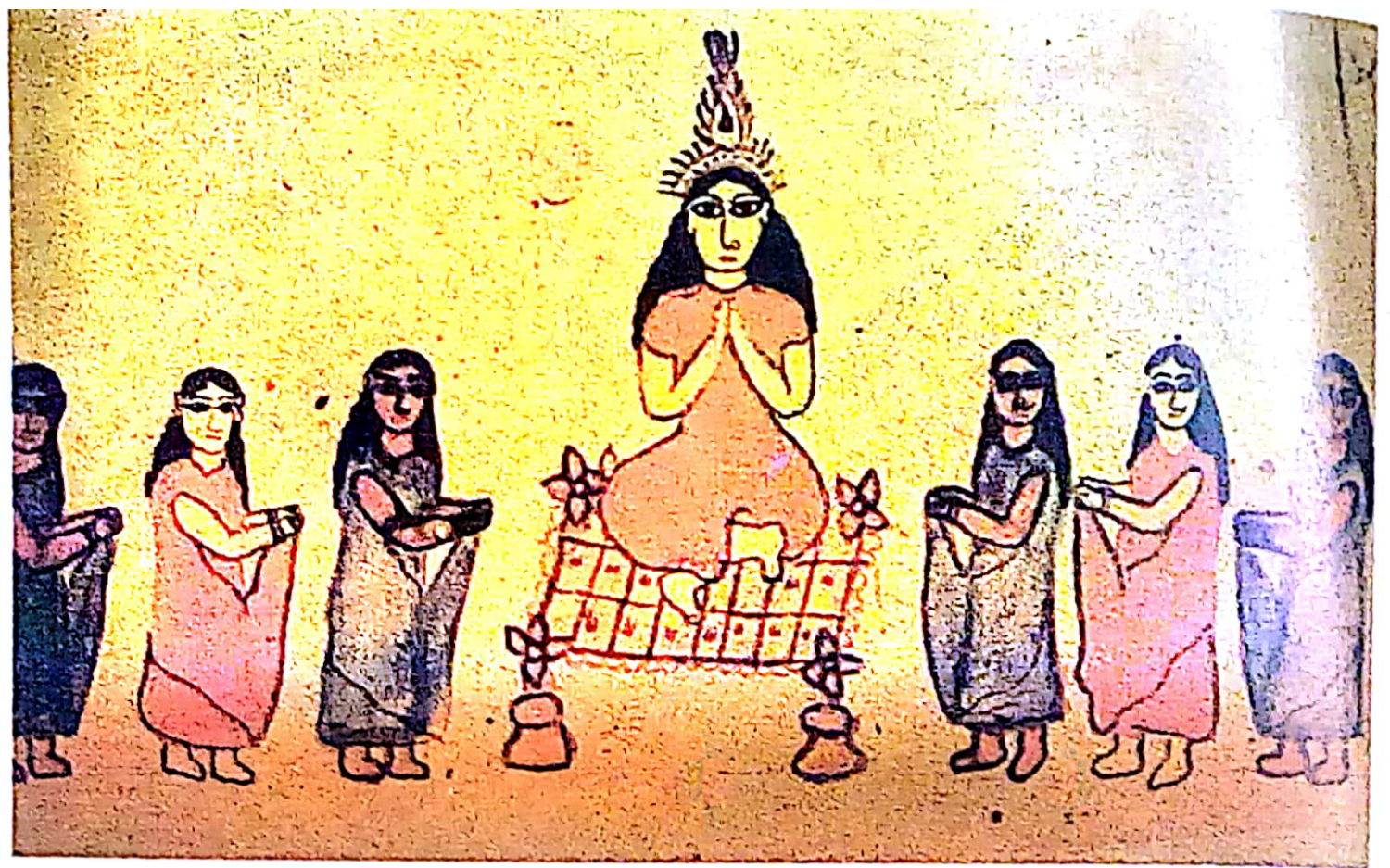
নিবেদিতার পরিচালনাধীন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আঁকা ছবি ।
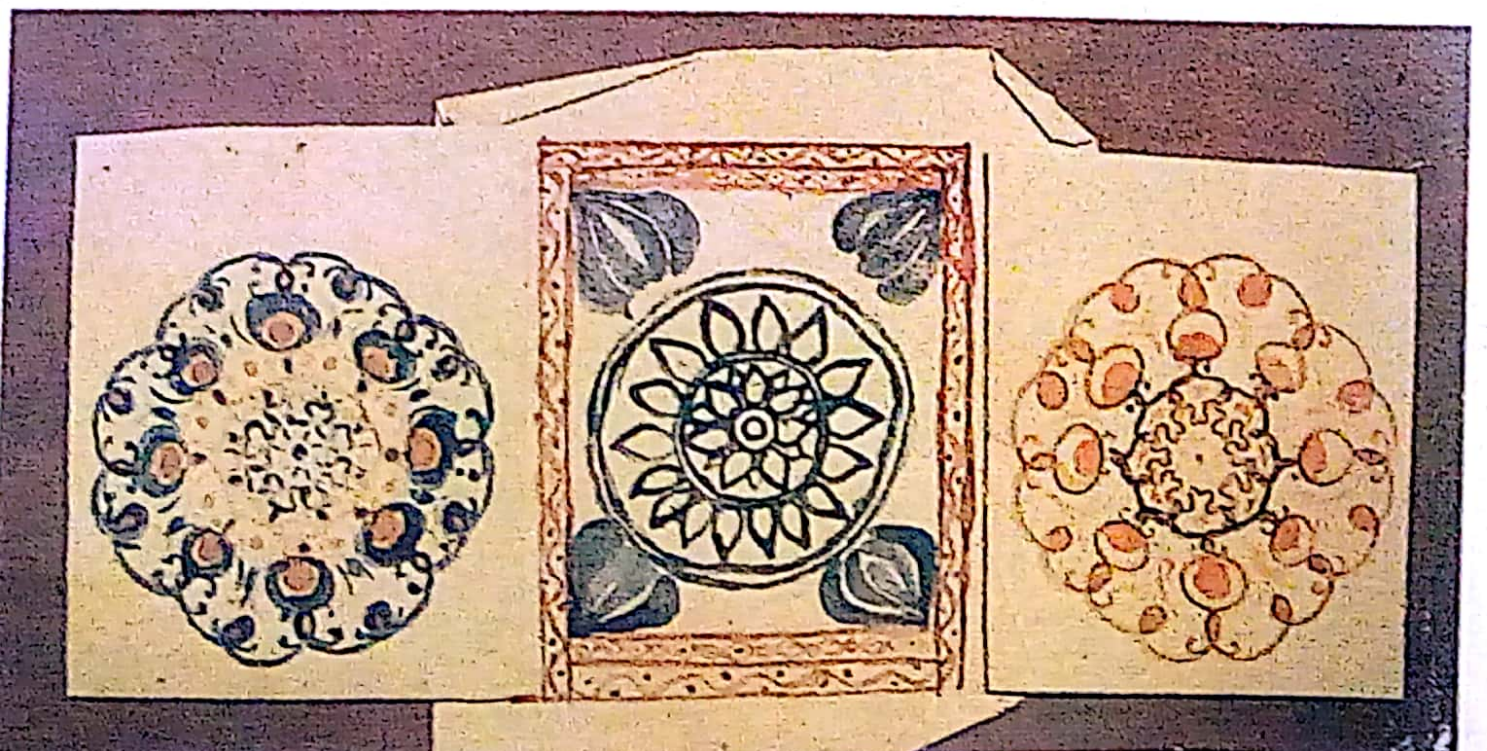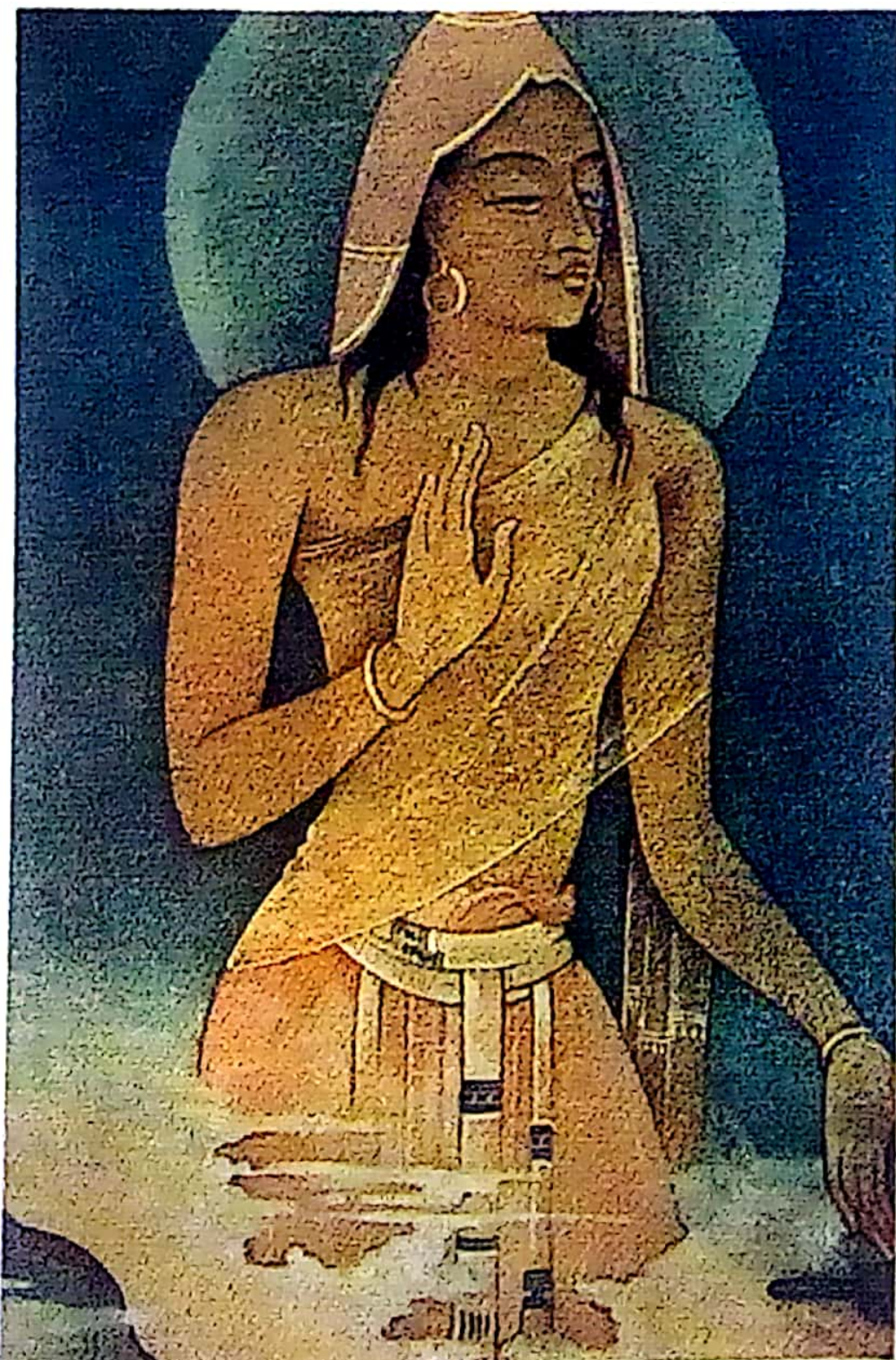
নন্দলালের 'মথুরার কারাগারে সদ্যোজাত কৃষ্ণ'। নিবেদিতার 'মিথস্' বইয়ের জন্য অঙ্কিত।
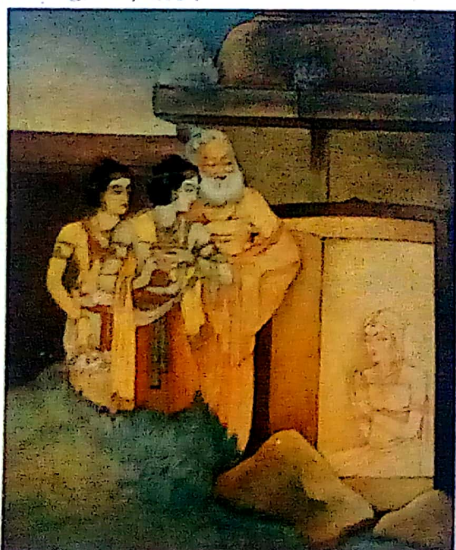
যে-কোনো স্থানের উৎকৃষ্ট শিল্পের সমমূল্য স্বীকারের মধ্যে নিবেদিতার ধর্মদর্শনাত্মক বোধ সক্রিয় ছিল। অদ্বৈত তাঁকে শিখিয়েছে—"সকল পথ এক জায়গায় মিশে যায়—তার দ্বারা মানুষের কাছে ধরা দেয় অভেদ।"

শ্রীনগরে একটি শাল-কারখানা দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা নিবেদিতা এই প্রবন্ধ-মধ্যে বলেছেন। দোতলায় কারখানাটি—তিনটি তাঁত জানালার ধারে সমকোণে বসানো, ৯ জন কর্মী কর্মরত। বয়নের কাঠামোর আকার, মাকুর চেহারা, বুননের কৌশল, যন্ত্রের উপরে দ্রুত সঞ্চারিত আঙুল—এই সকলের সুন্দর বর্ণনা তিনি করেছেন। কারিগরদের সামনে ঝুলছে চমৎকার রঙ-করা সুতোর গোছ এবং ডিজাইন। একটানা সুরে গান গাইতে-গাইতে কারিগররা কাজ করে চলেছে। তা দেখ নিবেদিতার মনে হলো :

"কাশ্মীরী তাঁত—যথার্থ একটি ছোট্ট অর্কেস্ট্রা ; প্রতিটি শাল—রঙের সিমফনি ; আর কারিগরের সীবনকর্ম যেন সমবেত গির্জা-সংগীতের একটানা সুর। ভারতীয় শিল্প-বস্ত্র-বুনানির ক্ষেত্রে বর্ণ ও শব্দের সম্পর্ক মৌলিক ব্যাপার।"

এ সকলই মানুষের সৃষ্টি। সে মানুষ পুরাতন এবং নতুন। সবকিছুর পিছনে নিবেদিতা মানুষের মুখ—নারীর মুখ—দেখেছেন। শাল-কারখানা থেকে নেমে এসে তিনি দেখলেন, নীচে উঠোনে দেওয়াল ঘেঁষে ছায়ায় বসে আছেন তিন নারী। দুই পুত্রবধূকে দুই পাশে নিয়ে শ্বশ্রূমাতা, হাতের চরকায় সুতো বুনে চলেছেন। মূর্তির মতো রূপবতী সেই তিন নারীকে দেখে মনে হয় যেন তিন গ্রীক দেবী। বোরখার নীচে বৃদ্ধার মুখে লেখা আছে—নিবেদিতার গভীর চোখে ধরা পড়ল—ইনি ভালবেসেছেন, জীবনে যন্ত্রণা পেয়েছেন, শেষে জয়ী হয়েছেন রাজ্ঞীর মতো।

॥৩॥

ভারতীয় নারীর অধিকারসীমা বিস্তৃত করার জন্য নিবেদিতার অপরিমেয় উদ্যম। কল্পনার সঙ্গে ছিল তাঁর প্রখর বাস্তববোধ। ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী তিনি একথা ভাববার অবস্থায় ছিলেন না যে, নারী তখনই উচ্চশিক্ষিত হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করবে। যাঁকে রক্ষণশীল বাঙালী গৃহকর্তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে তাঁর বাড়ির মেয়েটিকে বিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য ভিক্ষা করে আনতে হয়েছিল, সেই নিবেদিতার পক্ষে একটিই পথ ছিল—তখনকার মতো নারীর যথাসম্ভব শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তারই মধ্যে হস্তশিল্পকে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে শিল্পসৌন্দর্য ও অর্থোপার্জন একই প্রযত্নে সম্ভব হয়। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, নিবেদিতার বিদ্যালয়ে কেবল বালিকারাই ছিলেন না, বয়স্ক নারীরাও আসতেন। "নারী ও শিল্প" নামক এক রচনায় নিবেদিতা কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে নারীর সক্রিয় সম্পর্কের কথা তুলেছিলেন। অন্য কারুশিল্প অপেক্ষা সূচীশিল্পের দিকটাই রচনাটিতে প্রাধান্য পেয়েছিল, কারণ বাড়ির মেয়েদের পক্ষে এই শিল্পটি উপযুক্তভাবে গ্রহণ করা তখনই সম্ভবপর ছিল। নিবেদিতা তাঁর স্বভাব অনুযায়ী গোটা বিষয়টি বৃহত্তর জাতীয় সমস্যার সঙ্গে জড়িত করেন। সতর্ক করে বলেছিলেন, কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন যেন অতীতের অন্ধ অনুকৃতিতে না পৌঁছয়। "অতীতে যে-শক্তি সঞ্চিত আছে [নিবেদিতা বলেছিলেন] তারই দ্বারা নতুন প্রয়োগক্ষেত্র খুঁজে নিতে হবে।...প্রাচীন কারুশিল্পগুলি একদা আমাদের মধ্যে যে-ধরনের কারিগরি-নৈপুণ্য এবং

লক্ষ করেছেন, পুরাতন রীতির বদল হচ্ছে, "খোদাই মাটির পাত্র, পূজার মূর্তি, দোরগোড়ার সুন্দর আলপনার প্রয়োজন ক্রমেই জীবন থেকে সরে যাচ্ছে।" "কিন্তু যে-শক্তিতে এদের উদ্ভব হয়েছিল," নিবেদিতা দাবি করলেন, "সেই শক্তি অতঃপর শিল্প-নকশা ও তার্কর্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যমুখী মহান ভারতীয় শিক্ষাগারসমূহের জন্মদাত্রী হয়ে উঠুক।" নব নব উচ্চাশার দিকে মন উন্মুক্ত না রাখলে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। উচ্চাশার সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই শিক্ষা। "যদি বিরাট কোনো সূচী-শিক্ষালয় সৃষ্টি করতে হয় তাহলে ইতিমধ্যে ভারতের শত-শত কারুশিল্পী-সম্প্রদায়ের মধ্যে চোখ ও হাত ব্যবহারের যে-জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে আছে—যা কিছুটা আছে প্রতিটি অন্তঃপুরের হিন্দুনারীর মধ্যেও—তার সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে বুদ্ধিশক্তির উদ্দীপনা।" তিনি প্রশ্ন করলেন, "এই বুদ্ধিশক্তি সরবরাহের চিন্তা কি আদৌ করেছে কেউ? কেউ কি ভেবেছে, এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই ইতিহাসের শিক্ষা এবং ভূগোলের জ্ঞান?" এই রচনাতেই সেই ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞানের সম্পর্কে তিনি কিছুটা এগিয়ে এসেছিলেন। "প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে তাদের ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ও ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে সহানুভূতির সঙ্গে বুঝতে চাইলেই তবে তাকে উপলব্ধি করা যাবে। বেলজিয়ামের কনভেন্টের সূচীশিল্পের সঙ্গে তুরস্কের অবরোধবাসিনীদের কিংবা চীনা পরিবারের নারীদের সূচীশিল্পের কোন্ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য বর্তমান? গভীর ও জীবন্ত জ্ঞান এবং অনুভূতির দ্বারাই কেবল বিশেষ-বিশেষ শিল্প-প্রতীকের তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব। ভুলভাবে শিল্প-প্রতীকের ব্যবহার করলে ভুল কাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। বোখারার রক্তগোলাপ, চীনের সোনালি পদ্ম—এদের সাহায্যেই সূচীশিল্পের রাজনৈতিক বা জাতীয়তামূলক ব্যবহার করা হয়েছে।" নিবেদিতা দেখেছেন, একালেও ইউরোপে সূচীশিল্প জীবন্ত, কারণ গির্জার জন্য তার অবিরাম প্রয়োজন হচ্ছে। ভারতীয় নারীরা যেন "সুন্দরতম অথচ অবহেলিত এই শিল্পটির মর্যাদারক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে ভরিয়ে দেন কল্পনার ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে।" ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায়, মধ্যযুগীয় দুর্গপ্রাসাদের অলঙ্কৃত দেওয়াল-পর্দাবলি প্রস্তুত করেছেন অজস্র নারী নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমে, যুগ-যুগ ধরে। তিনি প্রশ্ন করলেন, হিন্দুনারীরা কেন সেই ধরনের যৌথ কাজ করবেন না দুর্গাপূজার শোভাযাত্রার সময়ে ধ্বজ-পতাকা নির্মাণ করে—কিংবা বৈষ্ণব সংকীর্তনের পতাকার ক্ষেত্রে? মুসলমান নারীরা প্রিয়জনের কবরের উপরে ফুলের চাদর বিছিয়ে দেন; নানা সুন্দর সূচীকর্ম-করা রঙিন চাদর কেন তাঁরা সেই উদ্দেশ্যে তৈরি করবেন না? স্বামীদের প্রতি ভক্তি-ভালবাসায় যে-মেয়েরা এদেশে পশমের বা সুতীর পাদুকা তৈরি করতেন, তাঁরা তো এখন সেই নৈপুণ্য নিয়ে মূল্যবান বইয়ের বা টেবিলের আচ্ছাদনী তৈরি করতে পারেন, ইত্যাদি। নিবেদিতার গভীর বিতৃষ্ণা ছিল "জার্মানীতে প্রস্তুত" জঘন্য নিম্নস্তরের ডিজাইনের অনুকরণ সম্বন্ধে। "কী বেদনাদায়ক ব্যাপার, যে-বাঙালী নারীদের অন্য ক্ষেত্রে বিশেষ রুচিশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন দেখা যায়, তাঁরাই আবার বার্লিনে তৈরি পশমীকাজ, রঙিন গোলাপ, ফরগেট-মি-নট ফুল ইত্যাদি-ছাপা রঙিন কাগজের উপর সূচীকর্ম করে সময়ক্ষেপ করছেন।" যদি উত্তম পুরানো নমুনা সামনে রাখতে হয় তাহলে বেনারস বা রাজপুতানা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা ভালো। বিদেশের ক্ষেত্রে—চীনা বা মুসলমানী নমুনার অনুকরণ শ্রেয়। কিন্তু কদাপি "জার্মানীতে প্রস্তুত নিকৃষ্ট দ্রব্যের" অনুকরণ নয়।[৪]

সেই চিত্রই তাঁহার অধিক প্রিয় হইত। বিশেষত যেগুলি অশিক্ষিত হস্তে রচিত, কলাকুশলতার অভাবে সেই সকল শিল্পের বাহ্যসৌন্দর্যের হানি হইলেও তাহাতে ভাবের কিঞ্চিন্মাত্র বিকাশ থাকিলে তাহাতেই তিনি পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। বৈদেশিক অনুকরণে সুনিপুণ চিত্রকরের হস্তাঙ্কিত আজকালকার চিত্র অপেক্ষা মেয়েদের হাতের আঁকা পিঁড়ি, আলপনা ইত্যাদি তাঁহার নিকট অধিক আদরের পদার্থ ছিল। একটি মেয়ের হাতের আঁকা আলপনা তিনি তাঁহার শয়নগৃহে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলেন ; ওই আলপনার মধ্যে একটি বড় শতদল পদ্ম ও চারিপাশে ছোট-ছোট যুঁইফুলের মতো ফুল আঁকা ছিল। ওই আলপনা তাঁহার এত ভালো লাগিয়াছিল যে, চিত্রকলা-বিচারক্ষম যে-কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাকে তিনি ওই আলপনা দেখাইতেন। একদিন মহা আনন্দে ছাত্রীদিগের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'কুমারস্বামী আজ এই আলপনার অনেক প্রশংসা করিলেন।' কুমারস্বামী যে তাঁহার ছাত্রীর অঙ্কিত আলপনার প্রশংসা করিয়াছেন, এ আনন্দ তাঁহার আর রাখিবার যেন স্থান নাই, তাঁহার মুখ দেখিয়া তখন এইরূপ বোধ হইতে লাগল। পদ্মফুলের চিত্র, বিশেষত সহস্রদল শ্বেতপদ্মের চিত্র, তাঁহার বড়োই প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন, 'এই ফুল ভারতবর্ষীয় চিত্রকর ভিন্ন অন্য কেহ আঁকিতে জানে না।' পূর্বোক্ত আলপনার পদ্মের চারিপাশের ছোট-ছোট ফুলগুলি দেখাইয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'কি সুন্দর সাদা ছোট-ছোট ফুলগুলি। সকলেই ওই বড়ো ফুলের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, যেন বলিতেছে—আমরা তোমার কাছেই যাইতে চাই।' নিবেদিতা মেয়েদের পাথরে ও মাটিতে ছাঁচ-কাটা শিখাইবার অত্যন্ত পক্ষপাতী দিলেন। ছাঁচ কাটিবার জন্য একরাশি মাটি ও নরুন আনিয়া মেয়েদের সঙ্গে লইয়া 'আমরা সকলেই শিখিব' বলিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছাঁচ কাটিতে বসিতেন। তাঁহার ওইরূপ উৎসাহে তখন অনেক মেয়ে ছাঁচ কাটিতে অভ্যাস করিতেছিল। তাহাদের কেহ প্রথমে যে-ছাঁচটি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিত, সেটি যতই খারাপ হউক না কেন, তিনি অতি আদরের সহিত তাহা লইতেন এবং দেবতার প্রসাদ যেমন লোকে মাথায় ধারণ করে সেইরূপভাবে মাথায় ছোঁয়াইয়া নিজের ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন। ছোট মেয়েরা তাঁহাকে ছোট-ছোট পুতুল গড়িয়া আনিয়া দিত ; সে পুতুলগুলি তিনি একটি বাক্সে করিয়া রাখিতেন। এইরূপ তাঁহার ঘরে মেয়েদের হাতে প্রস্তুত ওইরূপ দ্রব্যসকল স্তরে-স্তরে সাজানো থাকিত। এক-একদিন সব মেয়েদের একত্র করিয়া ওই সকল দ্রব্য দেখাইয়া তাহাদের হাতের শিল্প কেমন ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা তিনি দেখাইতেন ও বুঝাইয়া দিতেন। এক সময়ে মেয়েদের সপ্তাহের মধ্যে একদিন করিয়া সংস্কৃত শিখানো হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। নিবেদিতা তাহাতে বলেন, 'যেদিন মেয়েদের হাতে তালপাতে লেখা সংস্কৃত শ্লোক আমার ঘরে শোভা পাইবে সেদিন কী আনন্দের দিনই হইবে।"[৪]

পূর্বোক্ত 'উইমেন অ্যান্ড দি আর্ট' রচনায় নিবেদিতা ভারতীয় নারীদের সম্ভাব্য শিল্প-ভূমিকার বিষয়ে যেসব কথা বলেছিলেন, তাদের অনেকখানি অংশকে তিনি কিভাবে নিজ বিদ্যালয়ের বালিকাদের দ্বারা বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট ছিলেন, তার বিবরণ সরলাবালার লেখায় খানিক পেলাম। নিবেদিতা কেবল প্রথমশ্রেণীর শিক্ষাতাত্ত্বিক নন, স্বয়ং আশ্চর্য চরিত্রের শিক্ষিকা, যিনি শিক্ষাকার্যের মধ্যে উত্তম জীবনচেতনা সঞ্চার করে দিতে পারতেন, তাও ওই বর্ণনা থেকে জানা গেছে। উল্লিখিত প্রবন্ধে নিবেদিতা জাতীয় শিল্প-প্রতীকের কথা বলেছেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পদ্ম অন্যতম শিল্প-প্রতীক—সেই জন্য পদ্ম সম্বন্ধে

নিবেদিতার অতখানি অনুরাগ। ভারতীয় ধারায় চিত্রাঙ্কনের উপর গুরুত্ব দিতেন বলে তিনি শিক্ষাদানের সময়ে একটানে রেখাঙ্কন শেখাতেন। গৃহশিল্প ও লোকশিল্পের প্রতি তাঁর একান্ত ভালবাসার রূপও সরলাবালা চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন। সংস্কৃতির সঙ্গে শিল্পের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে নিবেদিতার ধারণা প্রসঙ্গে সরলাবালা আরও লিখেছেন ;

"আত্মবিস্মৃত মহাজাতির পূর্ব-গৌরবের স্মৃতি তাহাদের মনে জাগ্রত করিতে হইলে ইতিহাস যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ আরও কতকগুলি বিষয়ের অনুশীলন প্রয়োজন—সেগুলি [হইল] বিগতকালের চিত্র-ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাশিল্প সম্বন্ধে অনুশীলন। কলাশিল্প মাত্রই সমধর্মাবলম্বী গ্রন্থিজটিল কতকগুলি গূঢ় মহান ভাবের প্রতীকস্বরূপ।...ভারতের মনোবিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে গেলে যেমন বেদ উপনিষদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ প্রয়োজন, যেমন রামায়ণ, মহাভারত ও পরবর্তী যুগের কাব্য ও কথাসাহিত্যের সহিত বিশেষ পরিচয়ের প্রয়োজন, সেইরূপ আবার ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলার প্রণালী এবং ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যে প্রকাশিত ভঙ্গির মধ্যে যে-সকল গভীর ভাব মূর্তরূপ ধারণ করিয়াছে, অনুভবের দ্বারা তাহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টারও বিশেষ প্রয়োজন আছে—নিবেদিতার ইহাই মত ছিল।"[৫]

মায়ের ভালবাসা দিয়ে যেন নিবেদিতা আঁকড়ে ধরতে চাইতেন শিল্প-সম্ভারকে। সঞ্চয় করতে চাইতেন খণ্ড সৌন্দর্যগুলিকে। তার ফল কী দাঁড়িয়েছিল তার এক অনবদ্য ছবি সরলাবালার রচনায় :

"নিবেদিতার শয়নগৃহে নানা বিচিত্র সংগ্রহ শোভা পাইত। মাটির ছোট-ছোট পুতুল, দুর্গাপ্রদীপ, পাথরের উপর নরুন দিয়া কাটা ছাঁচ ও আলিপনার অঙ্কন, কাপড়ের উপর প্রাচীনকালের নানারূপ সূচীশিল্প ও চিত্রাঙ্কন, প্রাচীন চিত্র এবং বৌদ্ধযুগের প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি সমান আদরে তাঁহার ঘরে স্থান পাইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় দেবমন্দির-সমূহের গঠনপ্রণালী, প্রস্তরের উপর নানা বিচিত্র কারুকার্য, কোজাগর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার আলোকে উঠান-জোড়া শুভ্র আলিপনা, অজন্তার গুহায় খোদিত নর্তকীর নৃত্যভঙ্গি এবং যুক্ত-কর অঙ্গুলির বিশেষ ভঙ্গিটি—এই সমস্তের মধ্যেই তিনি সমভাবে যেন কোনো এক অপূর্ব অনুভূতির আস্বাদ পাইতেন এবং ভাবমগ্ন হইয়া মৃদু-মৃদু উচ্চারণ করিতেন—'পূজা ! পূজা।'"[৬]

সংযোজন

শিকোগো ট্রিবিউন পত্রিকায় ১৫·১২·১৮৯৯ তারিখে প্রকাশিত নিবেদিতার পত্র, যাতে এবেনজার কুক-এর বিশেষ উল্লেখ আছে।

ART IN THE PUBLIC SCHOOLS

Margaret G. [E.] Noble of London and Calcutta Contrasts
Advantages in England and America

Chicago. Dec. 14–[Editor of the Tribune]–As an English woman who has made a study of primary education both in my own country and in India, may I take this opportunity to record my appreciation of some of the work

done in your Chicago public schools ?

The first thing that must strike an English visitor to these schools is the beauty of the decoration. The casts and photographs there considered appropriate are such as in Britain we should never dream of seeing outside the homes of the highly privileged few. It is, therefore, with great joy that one realizes how much the word 'democracy' really does mean in this country. The same recognition is renewed as we come in contact with the teachers and discover that they number amongst them women of the highest and finest type. Words cannot measure the benefit which obviously accrues to the children of the city from the influences with which they are thus surrounded in their earliest and most formative years.

But, perhaps, the most amusing parallel of all between the privileges accorded to the children of our English aristocracy and those of the American plebs lies in the art teaching. For thirty years past a man who began his career as a disciple of John Ruskin–Ebenezer Cooke–has been urging in London the claim of the child to learn painting as all mankind learns writing. But for long years, for more than two decades, only the higher classes have had ears to hear him and to understand. Many of these have shown the impression made on them by placing their children assiduously under Mr Cooke's training. But up to the period of the last Liberal ministry, his art education had had no means of reaching the elementary schools. Just before the dissolution of the Government, however, an opportunity was taken of getting Mr Cooke to draw up what is called 'the alternative art syllabus,' for elementary schools, and for the first time since we adopted popular education the dead hand of the South Kensington had its pressure slightly mitigated. Up to this time, it will be understood the children had had nothing but black and white drawing, and their work had been absolutely conventional in kind. There had been no room whatever for the development of a mind through manual expression and no room for that most necessary growth, the inner joy of creativeness in freedom. From the moment that the alternative syllabus was published, however, it became possible for children of the lowest classes to obtain the use of brush and colors, and to have their faculty of free expression used to some extent. Possible, but not always probable. For the leaven works slowly in conservative England, and while every teacher declares the desirability of it, only one or two here and there feel themselves competent to tackle the difficulties of so vast and so new a subject.

Picture my astonishment, therefore, when I find that this great Western city has also its Mr Ebenezer Cooke–in the person of Miss Josephine Locke–and that a high degree of proficiency in painting is treated in your schools as a simple matter of course! Miss Locke explains that a main motive of the teaching is to restore the life of nature to the dwellers in the city. This is surely one of the profoundest statements ever made on that subject.

Yet, it suggests itself, as I stand and watch the groups of little foreigners busy with their colors, that another process is going on here. We become,

not by virtue of that which we receive, but of that which we create and do. And these children–through a creative activity that is rousing and absorbing every energy of their natures–are being Americanized. It is the national idea that is laying hold of them. Freedom and the joy of life are being made real to them. Here is the heart of the secret that turns a man in one generation from a foreigner into the genuine article.

The instinct that makes you in America (and perhaps, above all, in this city) place education in the forefront of your corporate interests is an instinct that must command the admiration of the world. Still more admirable is the generous will to spare neither effort nor expense in the art education of the children of the slums.

MARGARET G. NOBLE
Of London, England and Calcutta

এবেনজার কুককে লেখা নিবেদিতার ৫ মে ১৮৯৭ সালের পত্রের মধ্যে শিল্পপ্রসঙ্গ আছে। কুকের জীবনের গভীর নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতার কথা জেনে তাঁকে মার্গারেট নোবল ওই তারিখে (তখনো তিনি ভারতে আসেন নি) লেখা চিঠিতে অন্যান্য কথার সঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন—কুকের আত্মমুক্তির উপায় রয়েছে শিল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানোর মধ্যে। মার্গারেট নোবল ও এবেনজার কুক উভয়েই তখন সমাজতান্ত্রিক ভাবাবহের মধ্যে ছিলেন। কুকের মতো শিল্পীর ক্ষেত্রে সেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার রূপ কী হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে মার্গারেট নোবল লিখেছেন :

"তোমার সমাজতন্ত্র এই মানসিক চিন্তাসূত্র থেকে এসেছে—কোনো মানুষ নিজের মধ্যে বাঁচে না। সেকথা খুবই খাঁটি, কারণ নতুন কমনওয়েলথ-কে অবশ্যই উদ্‌গত হতে হবে ভিতর থেকে ; সেজন্য অন্য অনেকে তোমার মতোই বিরূপ অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত ; সেই কাজের মধ্যেই নবসৃষ্টির সূচনা হয়ে গেছে—সুনিশ্চিতভাবে একদিন তার পূর্ণতা ঘটবে। এক্ষেত্রে, আশা সাহস ও উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করে যাওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়—আর তুমি তা করছ না, সেকথা ভাবতেই পারিনা। ...[লেখায়] চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করার মতো অসাধারণ ক্ষমতা তোমার আছে। কিন্তু আমি এও আশা করি, তুমি কলমকে নয়, কেবল তুলি ও কালিকে নিয়োগ করবে জনগণের সামনে নিজেকে খুলে ধরার জন্য—তার দ্বারা প্রকাশ করবে জনগণের অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর—যেভাবে একটি পতাকা করে থাকে। আমার মনে হয়, সেক্ষেত্রে জনগণকে এমন একটি অপূর্ব প্রতীকী রূপ দেওয়া যাবে, যা সর্বোচ্চ শ্রেণী থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত সকলকে অখণ্ড জাতীয়তাবোধের শিক্ষা দেবে, এবং মানুষ হিসাবে তারা শিখবে যথার্থ সৌন্দর্য কাকে বলে ; সেইসঙ্গে তাদের তা সর্বমানবের জন্মাধিকার অর্জনের শিক্ষা দেবেই—উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার পক্ষে, দারুণ আঘাত হানার শিক্ষা। সকল জাতির মধ্যে—আমরা ইংরাজ, আমরাই সর্বপ্রথম সে শিক্ষা দান করতে পেরেছি—এই গৌরবের ঘোষণা তার দ্বারা করতে পারব।" ['লেটারস্ অব সিস্টার নিবেদিতা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫৫-৫৬]

এই লেখা থেকে দুটি জিনিস পেয়ে যাই। এক, এবেনজার কুক যে, ইংলন্ডের নিম্নশ্রেণীর বালক বালিকাদের রঙ ও তুলি ব্যবহারের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তার মূলে ছিল কুকের পূর্বোক্ত সমাজতান্ত্রিক ভাবনা। দুই, নিবেদিতা তাঁর ইংলন্ড-জীবনের শেষ পর্বে নিজের এই সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে এই বিশ্বাসেও আনন্দিত ছিলেন—ইংলন্ড

বিশ্বজগতে উৎপীড়ন-বিরোধী মঙ্গলশক্তি ; এমন-কি বৃটিশ সাম্রাজ্য একই উদ্দেশ্যবিধায়ক। এমন একটা ধারণা ভারতে আসার পরেও অল্প কিছুদিন পর্যন্ত নিবেদিতার মধ্যে বজায় ছিল, একথা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তথ্যযোগে উপস্থিত করেছি। কিছুদিন পরে অবশ্য স্বামীজীর সান্নিধ্যে থেকে ভারত-দর্শনের ফলে তাঁর মোহভঙ্গ হয়—ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের রূপ তাঁর সামনে পুরো খুলে যায়। এখানে সংশোধনী মন্তব্য এই করতে পারি, ইংলণ্ডের উচ্চবর্গের শোষক রূপ সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন না তা নয়—তার প্রতিবাদী রূপেরই তিনি জয়ধ্বনি দিয়েছেন। যাই হোক, একথা স্বীকার্য, শোষক ইংরাজ অপেক্ষা মহান মুক্তিদাতা ইংরাজকে আপেক্ষিক অধিক গুরুত্ব দেবার জন্য তাঁর এইকালের বিচার যতটা আদর্শদ্যোতক ততখানি বাস্তবতাবাহী নয়।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ Complete Works of Sister Nivedita, Vol. II. p.p. 387-92.

২ Sister Nivedita's Lectures and Writings, 'Women and the Arts', pp. 37-40.

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, 'নিবেদিতা বিদ্যালয়ে' নিবেদিতার নিজের তৈরি করা কিংবা ছাত্রীদের দিয়ে তৈরি করানো সূচিশিল্পের যেসব নমুনা এখনো অবশিষ্ট আছে, তাদের পরিমাণ ও রূপ দেখলে চমৎকৃত হয়ে যেতে হয়। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এইসব নমুনা অতি যত্নে সংরক্ষণ ক'রে রেখেছেন। এই সংগ্রহে বিদেশ থেকে সংগৃহীত পাশ্চাত্য শিল্পীদের প্রচুর চিত্র-প্রতিলিপি রয়েছে। আমরা এও জানি, নিবেদিতা বাইরে থেকে আনা পাশ্চাত্য শিল্পের অনেক প্রতিলিপি কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্রদের দিতেন। সব জড়িয়ে আমরা তাঁর উদ্দীপনা ও সংগ্রহের বিপুলতার ঠিক মাপ যেন ধারণাতে আনতে পারিনা।

৩ সরলাবালা সরকার, 'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি', পৃ. ২৪-২৫। এই বইটি প্রথমে 'নিবেদিতা', এই নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু একই নামে পরে একাধিক বই বেরিয়ে যাওয়ায় নাম-বিভ্রাট এড়াতে সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুলের কর্তৃপক্ষ এই নূতন নামকরণ ক'রে (১৯৬৭) বইটি প্রকাশ করেছেন।

৪ ঐ, পৃ. ১৯-২১।

৫ সরলাবালা সরকার, 'নিবেদিতা, বিদ্যালয় ও তাহার আদর্শ', নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকা, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৭৭, বাংলা বিভাগ, পৃ. ৮।

৬ ঐ, পৃ. ৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিল্প-আন্দোলনে ওকাকুরা ও নিবেদিতা : বিবেকানন্দের প্রেরণা

॥ ১ ॥

কাকুজো ওকাকুরা শিল্পবিষয়ে নিজ রচনা এবং সাক্ষাৎ নির্দেশনার দ্বারা নব্য ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা নানা সূত্র থেকে জানা যায়। তাঁর 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থ কিভাবে স্বদেশী যুগে জাতীয় চেতনাকে উদ্দীপিত করেছিল সে-বিষয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৭৯-১২৩) অনেক তথ্য দিয়েছি। সেখানে উদ্ধৃত করেছি সি এফ এন্ডরুজ, বিনয় সরকার, ও সি গাঙ্গুলী প্রমুখের প্রাসঙ্গিক উক্তি। ভারতের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে এক খণ্ডকালে ওকাকুরা-নিবেদিতা সহযোগের বিষয়ে তথ্য দানই ছিল সেই রচনার উদ্দেশ্য। সেখানে এই প্রচলিত ধারণার খণ্ডনও করেছি—ওকাকুরা নাকি ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ভারতে এসেছিলেন। না, তিনি ভারতে আসেন স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে পরিকল্পিত এক ধর্মমহাসভায় নিয়ে যাবার জন্য। ওকাকুরা ছিলেন মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু। মিস ম্যাকলাউডই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন।[১] ভারতীয় রাজনীতিতে ওকাকুরার সন্দেহজনক অংশগ্রহণ বিতর্কযোগ্য হতে পারে, কিন্তু শিল্পভুবনে তাঁর রাজকীয় উপস্থিতি নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। প্রাচ্য সংস্কৃতির রসে নিমগ্ন তিনি—এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভাবৈক্যকে শিল্পসূত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী—সে কারণে মনে করেছিলেন, এশিয়ার অগ্রণী অধ্যাত্মনেতা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করা অবশ্যকর্তব্য। ভারতে এসে বেলুড়মঠে তাঁর অবস্থান, স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি বিষয়ে আগে অল্পবিস্তর সংবাদ দিয়েছি; এখানে স্বামীজীর সঙ্গে শিল্প বিষয়ে তাঁর ভাববিনিময়ের বিষয়েই বিশেষ উল্লেখ করতে চাই।

ওকাকুরার সঙ্গে জাপান যাত্রার বিষয়ে যোগাযোগ হওয়ার পর স্বামীজী ১৮-৬-১৯০১ তারিখে বেলুড়মঠ থেকে ওকাকুরাকে লেখেন: "জাপান আমার কাছে স্বপ্নের

দেশ—সারাজীবন মনে শিহরণ জাগাবার মতোই সুন্দর।" জাপানে অবস্থিত মিস ম্যাকলাউডকে তিনি লেখেন, ১৪-৬-১৯০১ তারিখে :

"জাপানকে—বিশেষত জাপানী শিল্পকে—উপভোগ করছ, এতে আমি খুবই আনন্দিত। তুমি ঠিকই বলেছ—জাপানের কাছে আমাদের অনেককিছু শেখার আছে। জাপান যে-সাহায্য করবে তাতে থাকবে গভীর সহানুভূতি এবং সম্মান, অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের সাহায্য সহানুভূতিশূন্য, সেইসঙ্গে ধ্বংসকারী। ভারত ও জাপানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।"

একই জনকে ৮-১১-১৯০১ তারিখে : "তুমি তোমার জাপানী বন্ধুদের নিয়ে [ভারতে] আসছ, এতে খুব খুশি। সাধ্যে যতটা কুলায় তাঁদের খাতির-যত্ন করব।...তবে জানিনা, তোমার জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে ওড়িশার মন্দিরগুলি দেখা সম্ভব হবে কিনা? আমাকেই ঢুকতে দেবে কিনা জানিনা—আমি যে 'ম্লেচ্ছাহার' করেছি! লর্ড কার্জনকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি।"

ওকাকুরা ১৯০২ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় আসেন। বেলুড়মঠে ৬ জানুয়ারি তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর যেন মনে হয়েছিল, "বহুদিনের হারানো ভাইকে ফিরে পেলেন," এবং ওকাকুরার মনে হয়েছিল, "বিবেকানন্দ সমগ্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় পুরুষ।" ওকাকুরা বেলুড়মঠে বাস করেছেন। তিনি যখন স্বামীজীর সঙ্গে বুদ্ধগয়া গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন স্বামীজী সানন্দে বলেন, "তথাগত যেখানে বোধিলাভ করেছিলেন সেখানে আপনার সঙ্গে গভীর আনন্দের সঙ্গেই গমন করব। তারপর যাব বারাণসীতে তীর্থযাত্রায়—সেখানেই বুদ্ধদেব সাধারণের কাছে তাঁর বাণী প্রথম প্রচার করেন। তাছাড়া বারাণসী সম্বন্ধে আমার বিশেষ এক আকর্ষণ আছে।"

২৭ জানুয়ারি ১৯০২, স্বামীজী ওকাকুরাকে নিয়ে বুদ্ধগয়া যাত্রা করেন। তার আগে ২৩ জানুয়ারি তিনি সিস্টার ক্রিস্টিনকে পত্রে লিখেছেন : "মিস ম্যাকলাউড তাঁর জাপানী বন্ধুদের নিয়ে এসে গেছেন। এখকজন হলেন, মিঃ ওকাকুরা—শিল্পশাস্ত্রের অধ্যাপক, অন্যজন হোরি—ব্রহ্মচর্য ব্রতাবলম্বী।...প্রথমজন এসেছেন ভারত-দর্শনে—কেননা ভারত হলো জাপানী সংস্কৃতি ও শিল্পের মাতৃভূমি।"

ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর বুদ্ধগয়া ও কাশী ভ্রমণের খণ্ড বিবরণ আছে। তাদের মধ্য থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ উৎকলন করব।

বুদ্ধগয়া ও বারাণসী ভ্রমণে স্বামীজীর অল্পবয়সী সঙ্গী নরেশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতিচারণ করেছেন :

"স্বামীজীর দলের সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় চলেছি।...জাপান থেকে ওকাকুরা এসেছেন—তাঁকে নিয়ে বুদ্ধগয়া দেখাতে স্বামীজী যাচ্ছেন। মিস ম্যাকলাউডও সঙ্গে।...সাত-আটদিন বুদ্ধগয়ায় থাকা হলো। স্বামীজী প্রত্যহ [বুদ্ধগয়া] মন্দিরে যেতেন। আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেক প্রস্তরমূর্তির ভাব, শিল্পনৈপুণ্য, ঐতিহাসিকতা, সব বুঝিয়ে দিতেন। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ঘরে জাপানী বুদ্ধমূর্তি ছিল—সেটি অবিকল স্বামীজীরই বসা-চেহারার মতো লাগল। মনে হলো, বুদ্ধের মতনই একজন—পাথরের সুন্দর নিস্পন্দ এক বুদ্ধকে দেখাচ্ছেন। [স্মর্তব্য, স্বামীজীর প্রথম আমেরিকা গমনকালে জাপানে অবস্থানের সময়ে জামসেদজী টাটাও সেখানে ছিলেন। তিনি পরে নিবেদিতাকে বলেন, জাপানে সকলেই বুদ্ধের চেহারার সঙ্গে স্বামীজীর চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্যে চমকিত হয়েছেন। আমেরিকাতেও স্বামীজীর মুখের সঙ্গে বুদ্ধমুখের সমরূপের কথা বলা

হয়েছে।]। তারপর একদিন কয়েকমাইল দূরে বৌদ্ধ গুহাগুলি দেখতে যাওয়া হলো। স্বামীজী ডান্ডিতে ; ম্যাকলাউড, ওকাকুরা ও আমি হাতীতে।...স্বামীজী বিশ্রাম করে গুহা দেখতে উপরে পাহাড়ে উঠলেন। তিন-চারটি গুহা খুব সুন্দর। ভিতরে দেওয়ালের গায়ে বেশ চমৎকার সব খোদিত মূর্তি।...

"শেষ তীর্থ শ্রীকাশী, তীর্থের সার। গয়া থেকে কাশী যাওয়া হলো। ম্যাকলাউড কলকাতা ফিরে গেলেন।...স্বামীজী ও ওকাকুরা সেকেন্ড ক্লাসে।...[কাশীতে পৌঁছবার] পাঁচ-সাতদিন পরে ওকাকুরাকে কালাপেড়ে ধুতি, সিল্কের পাগড়ি ইত্যাদি পরিয়ে সাজালেন। লোকে দেখে মনে করল, নেপালের রাজবংশীয় হয়ত কেউ এসেছেন। তাঁকে বিশ্বনাথ দর্শন করতে পাঠালেন। ওকাকুরার সঙ্গে পনের-কুড়িজন গেলেন। স্বামীজী নিজে গেলেন না। চার-পাঁচখানা ঘোড়ার গাড়ি করে ওকাকুরার দল যাত্রা করল বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য।"[২]

স্বামী সদাশিবানন্দের স্মৃতিকথায় দেখা যায়, স্বামীজী বারাণসীতে থাকাকালে শিল্প-বিষয়ে আলোচনা করতেন। কালিদাস মিত্র নামক এক যুবকের সঙ্গে (ইনি কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রের পুত্র) শিল্পকলা বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তার সংবাদ আছে, তবে এই আলোচনাকালে ওকাকুরা উপস্থিত ছিলেন না। "কালিদাস মিত্র চিত্র ও কলাবিদ্যা লইয়া চর্চা করিতেন [সদাশিবানন্দ বলেছেন]। মিত্র-মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে...স্বামীজী যেন একজন চিত্রকর, কলাবিদ্যা লইয়া সর্বদা চর্চা করেন—এইরূপ ভাবে পরিবর্তিত হইলেন। তিনি চিত্র, আলেখ্য, প্রাকৃতিক চিত্রের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে লাগিলেন।...বর্ণসংযোগ, বর্ণের তারতম্য, সৌষ্ঠব, অধিষ্ঠান, নেত্রাদির বহুপ্রকার দৃষ্টি, কটিদেশ ও বক্ষস্থল, এবং বক্রভাবে বা অন্যভাবে দাঁড়াইলে যে-নানাপ্রকার ভাবব্যঞ্জনা হয়, তদ্বিষয়ে বহুপ্রকার কহিতে লাগিলেন।...তাহার পর তিনি ইটালি, ফ্রান্স, চীন, জাপান ও ভারতের বৌদ্ধযুগের, মুঘল পারস্য প্রভৃতি সময়ের, চিত্রের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। [এরপর স্বামীজী কিভাবে একবার ফ্রান্সে নাট্যাভিনয় দর্শনকালে বিশিষ্ট শিল্পীদ্বারা অঙ্কিত দৃশ্যপটের আলেখ্যচিত্রের ত্রুটি দেখিয়ে দেন, তার কাহিনী বর্ণিত আছে।]।"[৩]

কালিদাস মিত্র স্বামীজীর জাপান গমন সম্ভাবনার কথা তুলেছিলেন। স্বামীজী বলেন : "ওকাকুরা সেইজন্যই আসিয়াছেন। জাপানটি বেশ দেশ। তাহারা শিল্পবিদ্যা দৈনন্দিন কার্যেতেও পরিণত করিয়াছে। আমি আমেরিকা যাইবার কালে জাপান দেখিয়া যাই। দেখিলাম, গৃহগুলি বংশনির্মিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সম্মুখে একটি করিয়া বাগান, তাহাতে ফুলের গাছ। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জাতটি খুব উন্নতি করিতেছে।"[৪]

কাশী থেকে স্বামীজী—ওকাকুরার পরবর্তী ভ্রমণ প্রসঙ্গে মিস ম্যাকলাউডকে ৭ ফেব্রুয়ারি লিখেছেন :

"নিরাপদে বেনারসে পৌঁছেছি। মিঃ ওকাকুরা ইতিমধ্যেই বেনারস দেখা সাঙ্গ করেছেন। তিনি আজ প্রাচীন বৌদ্ধভূমি সারনাথ দেখতে যাবেন। কাল অপরাপর ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়বেন। নিরঞ্জনকে [স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ] তিনি সঙ্গী হতে বলেছেন, নিরঞ্জন রাজি হয়েছে।"

একই চিঠিতে স্বামীজী আনন্দের সঙ্গে বলেছেন : "এখানকার প্রধান মন্দিরে [বিশ্বনাথ মন্দিরে] আমার বন্ধুর [ওকাকুরার] প্রবেশের ব্যাপারে কোনো আপত্তি হয়নি—শিবলিঙ্গ স্পর্শ করা এবং পূজার ব্যাপারেও নয়। বোঝা গেল, বৌদ্ধদের জন্য এই মন্দির সর্বদাই

উন্মুক্ত।"

শেষোক্ত প্রসঙ্গে স্বামীজী মিসেস বুলকে ১০ ফেব্রুয়ারি লিখেছেন : "ওকাকুরা জাপানী বলে [এখানে] কোনো মন্দিরে তাঁর প্রবেশ নিয়ে কেউ আপত্তি করেনি। মনে হয়, তিব্বতী ও অন্য উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ বরাবরই শিবপূজার জন্য এখানে এসে থাকেন। মন্দিরে তাঁকে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করতে ও পূজা করতে দিয়েছে। মিসেস অ্যানী বেশান্ত একবার তা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বেচারী মহিলা, যদিও খালি পায়ে, শাড়ি পরে, পুরোহিতদের সামনে মাটিতে লুটিয়েছিলেন, তবু তাঁকে এমনকি মন্দির-চত্বরের মধ্যেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমাদের দেশের কোনো প্রধান মন্দিরে বৌদ্ধদের অ-হিন্দু বিবেচনা করা হয়না।"

নিরঞ্জনানন্দকে সঙ্গী করে ওকাকুরার শিল্প-ভারত দর্শনের সংবাদ আছে মিসেস বুলকে লেখা স্বামীজীর ১০ ফেব্রুয়ারির চিঠিতেই : "মিঃ ওকাকুরা ছোটখাট ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁর ইচ্ছা—আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, এলোরো, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখবেন।" স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা স্বামীজীর ১২ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে ওকাকুরা ও নিরঞ্জনানন্দের আগ্রা গমনের সংবাদ পাই। মিস ম্যাকলাউডকে তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে জানিয়েছেন, ওকাকুরা গোয়ালিয়রের পথে আগ্রা দেখে নিয়েছেন। ব্রহ্মানন্দকে লেখা স্বামীজীর ১৮ ফেব্রুয়ারির চিঠি থেকে জেনেছি, ওকাকুরা ও নিরঞ্জনানন্দ গোয়ালিয়র থেকে তাঁকে চিঠি লিখেছেন।

মিসেস ওলি বুলের ইচ্ছা ছিল, ওকাকুরা ইত্যাদির সঙ্গে অজন্তা এলোরা ইত্যাদি দেখবেন। ২১ ফেব্রুয়ারি কাশী থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক চিঠিতে স্বামীজী এ-বিষয়ে নিষেধ করে পাঠান : "মিসেস বুলকে আমার হয়ে বলবে, এলোরা এবং অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ খুবই কষ্টসাধ্য ; তাছাড়া ওই জায়গাগুলি এখন অত্যন্ত গরম। তাঁর শরীর এখন এতই ক্লান্ত যে, ওই ভ্রমণ উচিত হবেনা।"

মিস ম্যাকলাউড কিন্তু অদম্য। অজন্তা ইত্যাদি ভ্রমণে ওকাকুরার সঙ্গী হবার জন্য তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। নিবেদিতা ২৮-২-১৯০২ তারিখের চিঠিতে সোচ্ছ্বাসে তাঁকে লেখেন :

"আজ শুক্রবার, তুমি অজন্তায় আছো। ...সাঁচী না-জানি কী সুন্দর! অজন্তা যে অপূর্ব ব্যাপার, তা প্রায়ই শুনেছি। আমি খুবই সুখী যে, মিঃ ওকাকুরা সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গ করছেন—এবং তুমি বৌদ্ধ-ভারতের সবকিছু দেখছ তাঁর সাহচর্যে।"[৫]

॥ ২ ॥

শিল্পক্ষেত্রে ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর আত্মিক সম্পর্কের অন্যতম হেতু অবশ্যই শিল্পসুন্দর জাপান সম্বন্ধে স্বামীজীর মুগ্ধতা। স্বামীজীর ধারণামতো—এশিয়ার সভ্যতার এক বিশেষ মহিমা-লক্ষণ—শিল্প। শিল্প এশিয়াবাসীর জীবনের অঙ্গাঙ্গি বস্তু। জাপানের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের প্রাচুর্য লক্ষ্য করে তিনি তাঁর শিল্পী-বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে [এঁর কথা পরেও আসবে] বলেছিলেন :

"ওই আর্টের জন্যই ওরা [জাপানীরা] এত বড়। তারা যে এশিয়াটিক। ...এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করেনা।"

একই কথাসূত্রে স্বামীজী বলেন : "ওরে, আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভালো আলপনা দিতে পারে তার কত কদর। ঠাকুর নিজে একজন কতবড় আর্টিস্ট ছিলেন।"

শিল্প বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গ এসে গিয়েছিল। প্রিয়নাথ, সাহেবদের [ব্রিটিশদের] শিল্পের প্রশংসা করায় স্বামীজী ধিক্কার দিয়ে বলেন : "দূর মূর্খ! আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঙটা সোনা দেখছে। এটা হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেলকি।"

এশিয়ার সংস্পর্শে আসার পরে ইউরোপ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে শিল্প ঢোকাতে চেষ্টা করছে—এই বক্তব্যের পরে, স্বামীজী ভারতীয় ও সাহেবী শিল্পদৃষ্টির পার্থক্য দৃষ্টান্তযোগে তুলে ধরেছিলেন :

"আমার ইচ্ছে করে—আমার চোখ দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাড়িগুলো দ্যাখ—সব সাদামাটা। তার কোনো মানে পাস? এই-যে এত বড়ো-বড়ো সব বাড়ি গভর্নমেন্টের রয়েছে—বাইরে থেকে দেখলে তার কোনো মানে বুঝিস—বলতে পারিস? [অর্থাৎ সরকারী বাড়িগুলি স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে ভাব-তাৎপর্যহীন]। তারপর তাদের খাড়া প্যান্ট, চোস্ত কোট...তার কী-যে বাহার!! আমাদের জন্মভূমিটা ঘুরে দ্যাখ—কোন্ বিল্ডিংটার মানে না বুঝতে পারিস? আর তাতে কত-না শিল্প? ওদের জলখাবার গেলাস, আর আমাদের ঘটি—কোন্‌টায় আর্ট আছে?...পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ি দেখেছিস,...তাদের ধানের মরাই দেখেছিস? তাতে কত আর্ট! মেটে ঘরগুলোয় কত চিত্তির-বিচিত্তির! কি জানিস, সাহেবদের ইউটিলিটি আর আমাদের আর্ট। ...ওই সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি ঘটি ফেলে এনামেলের গেলাস এসেছেন ঘরে। ওইরকমে ইউটিলিটি এমনভাবে আমাদের ভেতর ঢুকেছে যে, বদহজম হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৬]

ইউটিলিটি ও আর্টের সমন্বয়ের ফলেই জাপানের উন্নতি—স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন।

ভারতীয় গৃহস্থাপত্যের বাঙ্ময় সৌন্দর্য সম্বন্ধে স্বামীজী অন্য একবার প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন :

"ভারতে স্থপতি, মুসলমান স্থপতিও, ভাবপ্রকাশে বিরত নয় কখনো। আলোয়ারে ভ্রমণকালে একটি মিনারে দেখেছি—কী অনবদ্য ভাবপ্রকাশক সৌন্দর্য! তাজমহলের মর্মরের যে-কোনো অংশ পেষণ করলেই যেন রাজহৃদয়ের প্রেম ও যাতনা বিন্দু-বিন্দু ঝরে পড়বে। লোকে বলে, কলকাতা প্রাসাদনগরী। রাম কহো! বাড়িগুলো বাক্সের মতো—একের পর এক সাজানো—ভাব বলে একটুও কিছু নেই। রাজপুতানায় এখনো খাঁটি হিন্দুস্থাপত্যের স্বাক্ষর মেলে। কোনো ধর্মশালার দিকে তাকালে মনে হবে—তা যেন হাত বাড়িয়ে ডাক দিচ্ছে উদার আতিথ্য গ্রহণের জন্য। মন্দিরের দিকে তাকালে মনে হবে, তার ভিতর-বাহির দেবভাবে পূর্ণ। গ্রামের কুটীর তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন গৃহস্বামীর মনটিকে খুলে ধরছে। এই ধরনের ভাবব্যঞ্জক স্থাপত্য আর মাত্র দেখেছি ইতালিতে।"[৭]

ইতালীয় শিল্পের প্রতি স্বামীজীর গভীর অনুরাগের কথা প্রিয়নাথ জানিয়েছেন।

স্বামীজীর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত অথবা নিজস্ব শিল্পদৃষ্টিতে চালিত নিবেদিতা ১৯০২-এর শেষের দিকে যখন বরোদায় যান তখন সেখানকার সরকারী ভবনগুলি তাঁর কাছে 'কুৎসিত'—সেকথা শুনে সুশিক্ষিত ভারতীয় আমলারা মনে করেছিলেন—"মেমসাহেবের মাথা খারাপ।"

সে যাই হোক, স্বামীজী উৎসুক ছিলেন—ওকাকুরা যাতে ভারতবর্ষের গণজীবনে

ওতঃপ্রোত শিল্পকে বুঝে নেন। বারাণসীতে স্বামীজীর সঙ্গে কিছুকাল কাটাবার পরে ওকাকুরা যখন ভারতের অন্যান্য স্থানের শিল্পনিদর্শন দেখার জন্য বেরিয়ে পড়েন তখন স্বামীজী তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে-কৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মিসেস ওলি বুলকে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯০২ বারাণসী থেকে এক চিঠি লেখেন—সেই চিঠিতে ভারতের গণশিল্পের প্রতি স্বামীজীর মমত্ব এবং রাজপুত ও মুঘল শিল্পের প্রতি সমাদরসূচক মনোভাবের বিশেষ পরিচয় আছে। স্বামীজী অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন—ওকাকুরার সঙ্গে ভারতের এই জীবনব্যাপ্ত শিল্প-সংস্কৃতির পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য। স্বামীজী লিখেছিলেন :

"আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমদিকের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র এবং খড়ের তৈরী বাংলার পুরাতন চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি শিল্পসৌন্দর্যে অনবদ্য। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরগুলোকেও 'বাংলো' নাম দেয়।

"পুরনো দিনে কোনো ব্যক্তি নিজের প্রাসাদ নির্মাণের সময়ে অতিথি আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সে শিল্প লুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার গোটা বিদ্যালয়টি যদি সেইভাবে নির্মাণ করা যেত। তাই এখনো যে-কটি অবশিষ্ট আছে, দেখে রাখা ভালো, অন্তত একটি [অর্থাৎ আটপুরের আটচালা]। ব্রহ্মানন্দ ব্যবস্থাদি করে দেবেন—আপনাদের কেবল কয়েক ঘণ্টা ভ্রমণের কাজ।"

এর পরেই এসে গেল ওকাকুরা-প্রসঙ্গ :

"বারাণসীর এক সুশিক্ষিত ধনী যুবক, [পূর্বোক্ত কালিদাস মিত্র] যার পিতার সঙ্গে আমার বহুকালের বন্ধুত্ব, গতকাল এই শহরে [বারাণসীতে] ফিরে এসেছে। শিল্পবিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ ; লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সে প্রচুর অর্থব্যয় করছে। মিঃ ওকাকুরা চলে যাবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে সে আমার কাছে এসে হাজির। মিঃ ওকাকুরাকে শিল্পময় ভারত (তার যেটুকু অবশিষ্ট আছে) দেখাবার উপযুক্ত লোক সে। ওকাকুরার উপদেশ-নির্দেশাদিতে সে বিশেষ লাভবান হবে, তাতেও আমার সন্দেহ নেই। এখানে ভৃত্যদের ব্যবহারের সাধারণ ধরনের একটা টেরাকোটা জলপাত্রের গড়ন ও তার উপরে খোদাই কাজ দেখে তো ওকাকুরা একেবারে মোহিত। কিন্তু সেটি সাধারণ মৃৎপাত্র, ভ্রমণের ধাক্কা সামলাবার উপযোগী নয়, তাই আমাকে তার হুবহু পিতল-রূপ করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে গেছেন। কী করব যখন ভেবে পাচ্ছিনা তখন কয়েক ঘণ্টা পরেই তরুণ বন্ধুটি উপস্থিত। সেটা তৈরী করে দিতে সে কেবল রাজি হয়েছে তাই নয়, ওকাকুরার পছন্দসই ওই জিনিসটির চেয়ে বহুগুণ উৎকৃষ্ট কারুকার্যযুক্ত শত-শত টেরাকোটা পাত্র দেখাতে পারে বলেছে।

"প্রাচীন শৈলীতে আঁকা অপূর্ব চিত্রাবলীও সে আমাদের দেখাতে পারে বলেছে। পুরনো রীতিতে আঁকতে পারে এমন একটিমাত্র পরিবার এখনো বারাণসীতে টিকে আছে। তাদের একজন একটি মটরদানার উপরে খুঁটিনাটিসহ গোটা শিকারদৃশ্য এঁকেছে—একেবারে নিখুঁত কাজ।

"আশা করি, মিঃ ওকাকুরা ভ্রমণশেষে এই শহরে ফিরে এসে ওই ভদ্রলোকের আতিথ্য গ্রহণ করবেন এবং যা এখনো অবশিষ্ট আছে তেমন শিল্পবস্তুগুলি দেখে নেবেন।"[৮]

॥৩॥

এখানেই বিবেকানন্দ, ওকাকুরা ও নিবেদিতাকে শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে একত্রিত দেখতে পাচ্ছি। জাপানের শিল্প-বিশেষজ্ঞ ওকাকুরা এসেছেন উৎস-ভূমি ভারতবর্ষে ; তাঁকে ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির প্রাণধর্ম জানাচ্ছেন প্রতিভূ বিবেকানন্দ, বলছেন, ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন, শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি ভারতের প্রভাব ছড়িয়েছে এশিয়ার অন্য দেশগুলিতে ; ওকাকুরা আগে যা অনুভব করেছিলেন এখানে বিবেকানন্দের মুখে শুনে, এবং সাক্ষাতে শিল্প-নিদর্শন দেখে, তার অবশ্যগ্রাহ্য সত্যতা উপলব্ধি করছেন ; তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও সৌহার্দ্য হয়েছে বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতার, নিবেদিতা তাঁকে তাঁর 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' বই লেখায় সাহায্য করছেন (সে সাহায্যের ব্যাপকতার কথা ওকাকুরা-নিবেদিতার রাজনীতি প্রসঙ্গে ২য় খণ্ডে বলে এসেছি), সেই বই অবিলম্বে সংস্কৃতি-সচেতন শিক্ষিত ভারতবাসীর, বিশেষত শিল্পপ্রেমিকদের মনোহরণ ক'রে তাঁদের পরবর্তী চিন্তাভাবনার উপরে প্রভাববিস্তার করছে ; নিবেদিতা ওকাকুরার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয়সাধনের নিমিত্ত হচ্ছেন (?), যে-অবনীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে ভারতীয় শিল্পজাগরণের সৃষ্টিশীল অংশের অবিসংবাদিত নেতা।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে নিবেদিতা যখন ইংলণ্ডে আছেন তখনই মিস ম্যাকলাউডের মারফত ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়, এবং তিনি ওকাকুরার পাঠানো রচনাদি পরিমার্জনার কাজে লেগে যান—সেইসকল রচনা জাতীয়তা ও শিল্পসংক্রান্ত। এ-বিষয়ে কিছু পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায়। নরওয়ে থেকে নিবেদিতা ১৯.৭.১৯০১ তারিখে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে 'জাপানী কাগজপত্র' সম্বন্ধে বলেছেন :

"The Japanese papers that you sent gave infinite pleasure...I admired so much a paper that could use English and Oriental type at will. As for me it gives me endless courage to have heard in America and in Norway, and in some sense now from Japan, that I had exactly expressed the national ideal."

এই অংশে নিবেদিতা "জাপানী পেপারস্" বলতে ঠিক কী বলতে চেয়েছেন, তার মাঝখানে আবার তাঁর নিজের রচনার কথা কিভাবে এল, যাতে তিনি জাপানের জাতীয় আদর্শকে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন—এ-ব্যাপারে সঠিক মীমাংসা করা শক্ত। যতদূর মনে হয়, জাপান থেকে কিছু লেখা তাঁর কাছে এসেছিল, সেগুলি তিনি দেখে-শুনে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, এবং তাঁর সেই কাজ জাপানী বন্ধুদের, ঠিকভাবে বলতে গেলে ওকাকুরার, পছন্দ হয়েছিল।

এই ধরনের একটা-কিছু হয়েছিল তার বিষয়ে আরও কিছু প্রমাণ দেওয়া যায়। নিবেদিতা কলকাতার ইউ এস এ কনস্যুলেটে সাময়িক অবস্থানকালে মিস ম্যাকলাউডকে ১৯ এপ্রিল ১৯০২ তারিখে যে-চিঠি লিখেছেন, তার শেষাংশে আছে :

"There is an article in the **Studio** of March 15 last about the Bijitsuin by Miss Hyde–with a reproduction of my lotuses. And another signed by Mr Okakura. Both extremely opportune credentials, I think!"

লণ্ডনের স্টুডিও পত্রিকায় ১৫ মার্চ যে-লেখা বেরিয়েছে, তা নিশ্চয়ই বেশ কয়েক মাস আগে জমা দিতে হয়েছে। এবং সেই লেখা জমা দেওয়ার কাজটা নিবেদিতার ভারতে ফেরার আগেই হয়ে গেছে, এমনকি ভারতবর্ষে ওকাকুরার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়ের

আগেই। ওকাকুরা ভারতে আসেন ১৯০২ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। নিবেদিতা কলকাতায় ফেরেন ১৯০২ ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে—যখন ওকাকুরা—স্বামীজী ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে ভারতভ্রমণ করছেন। ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০২ মার্চের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে। এক্ষেত্রে নিবেদিতা যদি লন্ডনে থাকাকালে ওকাকুরা ও মিস হাইডের প্রবন্ধের প্রকাশের সঙ্গে জড়িত না হয়ে থাকেন (কিংবা সে বিষয়ে অবহিত না হয়ে থাকেন) তাহলে উপরে উদ্ধৃত পত্রের ভাষায় তাঁর পক্ষে কথা বলা সম্ভব হতো না। স্টুডিও পত্রিকা সন্ধান ক'রে ১৫ মার্চ ১৯০২ তারিখের সংখ্যায় আমরা ওকাকুরার প্রবন্ধটি পেয়েছি, ('Notes on Contemporary Japanese Art.' By Prof. K. Okakura), তার মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাষায় সমকালের জাপানী শিল্পধারার বিবরণ আছে। ওই সময়ের জাপানী শিল্পধারাকে তিনি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, (১) ক্লাসিক বা অতি-রক্ষণশীল ধারা, (২) পাশ্চাত্ত্য ধারা, (৩) নব ধারা। এই তিন ধারার বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা প্রবন্ধটিতে পাই। 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' বইয়ের ভূমিকায় নিবেদিতা নিপ্পন বিজিৎসুর জন্মকথা যেভাবে লিখেছেন, এখানেও মোটামুটি সেই কথাগুলি রয়েছে, অধিকন্তু আছে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের আর একটু বিস্তৃত বিবরণ, এবং এই ব্যাপারে জড়িত অনেক শিল্পীর নাম।[৯]

নিবেদিতা উপরের চিঠিতে স্টুডিও-র একই সংখ্যায় মিস হাইডের লেখা প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। ('The Autumn Exhibition of the Nippon Bijitsu-In–The Japan Fine Arts Academi'. By Joshephine M. Hyde)। এই লেখায় মিস হাইড ওকাকুরার সাহচর্যে বিজিৎসু-র শিল্প-প্রদর্শনী দেখার বর্ণনা করেছেন। অনেকগুলি ছবির উল্লেখ রচনামধ্যে আছে, এবং চারটি ছবির প্রতিলিপিও আছে। হাসিমতো গাহো-র আঁকা তুষারদৃশ্য তাঁকে অভিভূত করেছিল। সিল্কের উপর কয়েকটি মাত্র রেখায় আঁকা ছবিটিতে সাতষট্টি বৎসর বয়স্ক শিল্পী এমন নতুনভাবে নিজেকে খুলে ধরেছেন যে, দেখলেই মনে হয়, তিনি প্রকৃতির নবরহস্য যেন নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন। অথচ গাহো বাল্যকাল থেকে অবিরাম ছবি এঁকে যাচ্ছেন এবং সে সকলেই আছে প্রতিভার স্বাক্ষর। আত্মানুকরণকে পরিহার করতে সচেষ্ট এই শিল্পী সম্বন্ধে ওকাকুরা যেকথা মিস হাইডকে বলেছিলেন, তার মধ্যে জাপানী শিল্পের প্রাণধর্মের মূল কথা মেলে। ওকাকুরার কথাগুলি মিস হাইড-এর লেখা থেকে সরাসরি তুলে ধরছি :

...'Yes', said Mr Okakura, the President of the Bijitsu-In, who was also enjoying this wonderful picture–'Yes, each picture of Gaho is a new creation, evolving according to laws of its own. A picture must be criticised within itself; it is not fair to judge it by others, not even by others of the same master. Japanese art had fallen into mannerisms, but with Gaho the true fire is burning as brightly as ever. And you see we Japanese have more to go to nature for our pleasure and refreshment; to nature in landscape and birds and flowers rather than to nature in man; for though birds and flowers have their sufferings, we do not know them, we only know thier joy, and it refreshes and soothes us. So instead of always painting man, we go to the birds and flowers.''

জাপানী শিল্পে নিসর্গ-প্রকৃতির প্রাধান্যের কারণ ওকাকুরার কথায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, কিন্তু কেবল পুষ্পসমারোহের মধ্যেই জাপানী শিল্পের প্রাণধর্ম নিহিত নেই, একথাও স্বয়ং

ওকাকুরারই, তা কিছু পরে নিবেদিতার লেখা থেকে দেখতে পাব।

মিস হাইড যে-চারটি চিত্রের প্রতিলিপি তাঁর রচনামধ্যে দিয়েছেন তার দুটি ঈশপ-কাহিনী অবলম্বনে একই শিল্পীর আঁকা—'ময়ূরপুচ্ছধারী কাক' এবং 'শৃগাল ও টক আঙুর' (শিল্পী শিমামুরা কানজান)। শেষোক্ত ছবিতে শুধু শৃগালের ঊর্ধ্বমুখটি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তারই মধ্যে শিল্পী এমন প্রবল ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন যে, গোটা শৃগালটির দেহচ্ছন্দ যেন দর্শক চাক্ষুষ করে। এই প্রসঙ্গে ওকাকুরা বলেছিলেন, '''Suggestion is the nearest shadow of infinity.'' তারপর যে-সোনালি সিল্কের জমিতে ছবিটি আঁকা হয়েছে তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে তিনি বলেছিলেন—যেকথা বলেছিলেন তার মধ্যে তিনি এবং তাঁর গোষ্ঠীকে নিছক পুনরুত্থানবাদী বলে যে-সমালোচনা করা হয় তার উপযুক্ত উত্তর আছে :

''The tendency of the revival of old art is the tendency to meaningless purism or insipid classicism; but we find in a young man like Kanzan an artist who can revel in colour and create on a broad basis, taking a new subject like Aesop's Fables, which lend so much to a decorative gold screen, yet remain true to the ideals of Sotatsu and Korin, those master decorators of the seventeenth century.''

মিস হাইড জলের ভিতর থেকে উপরে ওঠা কয়েকটি পদ্ম ও পদ্মপত্রের একটি ছবি ছেপেছেন, তার শিল্পী নাকাজিমা রেইসন। অথচ নিবেদিতার পূর্বে উল্লিখিত চিঠিতে দেখেছি, তিনি বলেছেন মিস হাইড স্টুডিও-র লেখায় তাঁর পদ্মের প্রতিলিপি ('reproduction of my lotuses') ছেপেছেন। তাহলে এসব কথায় সঙ্গতি কোথায়? একমাত্র সঙ্গত উত্তর—শিল্পীর এই ছবিটি ওকাকুরা লন্ডনে অবস্থিত নিবেদিতাকে পাঠিয়েছিলেন, এবং স্টুডিও-র জন্য ওকাকুরার ও মিস হাইডের রচনা প্রকাশের ব্যাপারে সহযোগিতা করবার সময়ে নিবেদিতা ওই পদ্ম-চিত্রটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এই রচনাদুটিকে নিবেদিতা কিছু পরেই ওকাকুরার যে-বইটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে স্বয়ং মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছেন ('আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট') তার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রপ্রস্তুতকারক বিবেচনা করেছেন।

এইখানেই উত্তর পাওয়া যাবে, 'আইডিয়ালস্' বইয়ের ভূমিকা নিবেদিতাকে কেন লিখতে বলা হয়েছিল, যিনি তখনো পর্যন্ত কোনো নামী লেখিকা নন, তখন কেবল তাঁর 'কালী দি মাদার' বইটি বেরিয়েছে। তাহলেও ওকাকুরা তাঁর শিল্পমুখ্য বইটির ভূমিকা নিবেদিতাকে লিখতে বলেছিলেন এইজন্য যে, তিনি নিবেদিতার যথার্থ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। প্রাচ্যশিল্পের ওই বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ যদি নিবেদিতার শিল্পবোধ এবং শিল্প-ইতিহাসে গভীর অনুপ্রবেশের কথা না জানতেন, তাহলে কদাপি ওহেন অনুরোধ তাঁকে করতেন না।

এইভাবে দেখা গেল, নিবেদিতার সঙ্গে ওকাকুরার শিল্প-সহযোগ, ঠাকুরবাড়ির শিল্প-অঙ্গনে তাঁর প্রবেশ, রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যমণ্ডলীর, বিশেষত নন্দলালের উপরে তাঁর প্রভাব—সব জড়িয়ে আধুনিক ভারতীয় শিল্পে জাপানী ধারার বিস্তার। এর সূচনা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দ, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতার সূত্রেই।

॥ ৪ ॥

'আইডিয়ালস্' গ্রন্থমধ্যে নিবেদিতা ওকাকুরার সম্মতিতে যেসব স্বামীজীর ভাব এবং

নিজের ভাব ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন—ভূমিকায় বিশেষ চাতুর্যের সঙ্গে তাদেরই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এশিয়ার শিল্পে ভারতের প্রভাব বিষয়ে ওকাকুরার বক্তব্যের উল্লেখের পরে নিবেদিতা লেখেন :

"মিঃ ওকাকুরার মতো একজন সুযোগ্য বিশেষজ্ঞের মুখে একথা শুনে আমরা আশ্বস্ত হই যে, ভারতবর্ষ একদা অশোকের আমলে ধর্মক্ষেত্রে যেমন তেমনি শিল্পক্ষেত্রেও সমগ্র প্রাচ্যের নেতৃত্ব করেছে। ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও গুহামন্দিরসমূহ পরিদর্শনকারী অগণিত চীনা পরিব্রাজকদের মনের উপরে ভারত তার রুচি ও ভাবনা মুদ্রিত ক'রে দিয়েছিল। সেই পরিব্রাজকগণ প্রথমত চীনদেশের, তারপর চীনের মধ্য দিয়ে জাপানের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিকাশে প্রভাব বিস্তার করেছেন।"

জাপানী শিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরার বিশেষ একটি বক্তব্যের উল্লেখ নিবেদিতা করেছেন। "চীনের কাছে জাপান চিরদিন আঙ্গিকের শিক্ষা নিয়েছে, কিন্তু মৌল আদর্শের ব্যাপারে নির্ভর করেছে ভারতের উপর।"

জাপানী শিল্পের আসল বৈশিষ্ট্য কী, সে-বিষয়ে ওকাকুরার দৃষ্টিভঙ্গির এই সুন্দর উপস্থাপনা : (ওকাকুরার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিস হাইড-কথিত ওকাকুরার পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কিন্তু বিশেষ পার্থক্য) :

"মিঃ ওকাকুরার দৃষ্টিতে, অলঙ্করণ বা কারুকৌশলের মধ্যে তাঁর স্বদেশীয় শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য নিহিত নেই, তা রয়েছে তার বিরাট জীবনদর্শনের মধ্যে, যার বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশ এখনো অবহিত কিনা সন্দেহ। প্রস্ফুট পুষ্পরাশি কিংবা দ্রাক্ষাগুচ্ছের রেখাঙ্কনে নয়—তার দেখা মিলবে মহাশক্তিশালী ড্রাগন-চিত্রে। না—পাখি বা ফুলের ছবিতে তা নেই—আছে মৃত্যুপূজায়। তুচ্ছ বহিরঙ্গ বাস্তবতার রূপ যত সুন্দরই হোক—তার রূপায়ণ অপেক্ষা সুমহিম ভাবনার সুগভীর তাৎপর্যকে মানবমনের গোচরে আনা—নিজেকে নয়, অপরকে রক্ষা করার জন্য বুদ্ধতুল্য ঐকান্তিক বাসনার প্রকাশই—জাপানী শিল্পের গুরু দায়।"

এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান মধ্যযুগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—একালের তার সূচনা ঘটিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, "যাঁর প্রতিভায় ঐতিহ্যবাদী হিন্দুধর্ম অশোকের কালের মতোই গতিশীল ও বিস্তারকামী হয়েছে।" অপরদিকে ভারতে এসেছেন ওকাকুরা। নিবেদিতা সেই সূত্রে লিখেছেন :

"ভারতবর্ষে আধুনিককালে এমন এক পরিব্রাজকের আগমন ঘটল যিনি প্রাচ্যসংস্কৃতির ব্যাপক জ্ঞানে ভূষিত, যাঁর অজন্তা গুহাদর্শন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নবযুগের সূচক।"

এশিয়ার শিল্পের আর এক বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে ওকাকুরার ধারণার কথা নিবেদিতা সাগ্রহে তুলে ধরেছেন :

"এশিয়ার শিল্প, ওকাকুরা বলেছেন, কদাপি বুর্জোয়া নয়—এক্ষেত্রে জার্মানী ইংলণ্ড ও নরওয়ের শিল্পের সঙ্গে তার তীক্ষ্ণ পার্থক্য।"

এই ধারণা বিবেকানন্দের অনুরূপ।

কিন্তু নিবেদিতার আগ্রহ কি নিছক শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় (স্বামীজী যাকে বলেছেন কেবল 'বাক্যিচ্ছড়ি') আবদ্ধ ছিল? কদাপি না। কেবল সক্রিয় মনোবৃত্তি নয়, অনন্যসাধারণ সাংগঠনী প্রতিভাও তাঁরই, আঘাত ও আন্দোলনের ভাষায় তাঁর চিন্তা আত্মপ্রকাশ করত,

সুতরাং শিল্পতাত্ত্বিক ওকাকুরা অপেক্ষা স্বদেশে শিল্প-আন্দোলনের সংগঠক ওকাকুরা নিবেদিতার কম মনোযোগের বিষয় হননি। আইরিশ হিসাবে, বৃটিশ সংস্কৃতির দ্বারা নিষ্পিষ্ট আইরিশ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা আগে জেনেছি। আত্মবোধ ভিন্ন আত্মবিকাশ সম্ভব নয়, এই তাঁর ধ্রুবপ্রত্যয়। মিসেস বুলের সূত্রে তিনি জেনেছেন, নরওয়ের জাতীয় সাহিত্যসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে (যা ডেনমার্কের অধীনস্থ থাকার ফলে রুদ্ধশক্তি) মিঃ ওলি বুলের জীবনব্যাপী প্রয়াসের কথা। সে-বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেনও। ভারতে একই ধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিবেদিতার কাম্য। শিল্পক্ষেত্রে সেই আন্দোলন সৃষ্টিতে অংশ নেবার কথা যখন ভাবছেন ঠিক তখনই জাপানে অনুরূপ এক আন্দোলনের স্রষ্টা ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ।

'আইডিয়ালস্' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রদত্ত ওকাকুরার জীবনরেখার সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত হয়েছি। জেনেছি যে, ওকাকুরা বাল্যকাল থেকে পুরাতনী সংস্কৃতির অনুরাগী; ১৮৮০-তে কলেজ ছাড়ার পরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য সংস্থা গঠনে উদ্যোগী; ১৮৮৬ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে জাপানের ইম্পিরিয়াল আর্ট কমিশনের সদস্যরূপে ইউরোপ আমেরিকা সফর করেছেন।—

"পাশ্চাত্য ভ্রমণের ফল হলো—মিঃ ওকাকুরার দেখলেন, এশিয়ার শিল্প-বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ হয়ে উঠেছে বহুগুণে ঘনতর, তীব্রতর। তদবধি তিনি জাপানী শিল্পের পুনঃজাতীয়করণের ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব উত্তরোত্তর প্রয়োগ করতে লাগলেন। সমগ্র প্রাচ্যভূমে বর্তমানে তথাকথিত পাশ্চাত্য অনুকরণের যে-ফ্যাশান দেখা যায়, তার বিরুদ্ধেই তাঁকে সক্রিয় হতে হয়েছে।"

এর পরিণতিতে ওকাকুরার বিরাট ত্যাগ ও দুঃসাহসিক নতুন পথসন্ধান। ইউরোপীয় শিল্পরীতি সম্বন্ধে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষে চাপ দেওয়ায় ওকাকুরা-কর্তৃক সরকারী টোকিও নিউ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষতা ত্যাগ, নিপ্পন বিজিৎসু স্থাপন, সে প্রতিষ্ঠানে তরুণ শিল্পীদের যোগদান, ফলে তা জাপানী শিল্পের নবজন্মের গর্ভমন্দির হয়ে ওঠা, ইত্যাদি কথার পরে নিবেদিতা বলেছেন :

"মিঃ ওকাকুরাকে যদি এক অর্থে তাঁর নিজ দেশের উইলিয়ম মরিস" বলি তাহলে একথাও বলব—তাঁর নিপ্পন বিজিৎসু এক ধরনের মার্টন অ্যাবী। এখানে জাপানী চিত্রকলা ও ভাস্কর্য শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও নানা ধরনের অলঙ্করণ-শিল্প, যথা গালা ধাতুর কাজ, ব্রোঞ্জ ঢালাই, পোর্সিলেন দ্রব্য তৈরি শেখানো হয়। এর সদস্যরা একদিকে পাশ্চাত্যের সমকালীন কলাশিল্প আন্দোলনের বিষয়ে যেমন গভীর সহানুভূতি ও উপলব্ধির মনোভাব রক্ষা করতে সচেষ্ট, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা তাঁদের জাতীয় ভাবপ্রেরণার সংরক্ষণ ও বিস্তারেও উদ্দেশ্যবদ্ধ। সগর্বে তাঁরা বলেন, তাঁদের কাজ পৃথিবীর যে-কোনো শিল্পকর্মের সঙ্গে সমমর্যাদায় তুলনীয়।...নিপ্পন বিজিৎসুর কাজ ছাড়াও মিঃ ওকাকুরা জাপানের শিল্প-সম্পদের তালিকা ও শ্রেণীবিন্যাস ক'রে সরকারকে সাহায্য করেছেন, এবং তিনি চীন ও ভারত ভ্রমণ করেছেন ওই দুই দেশের প্রাচীন শিল্পনমুনা দর্শনের জন্য।"

এখানে কালপর্বের দিকে পুনশ্চ দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ১৮৯৬-১৯০২-এর মধ্যে স্বামীজী শিল্পবিষয়ে তাঁর কথাগুলি বলেছেন। ১৯০২-এর মার্চ মাসে ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে (আগেই জেনেছি, তাঁদের পত্রালাপ ১৯০১ সাল থেকে শুরু হয়েছিল মিস ম্যাকলাউডের মধ্যবর্তিতায়), ১৯০২-এর মাঝামাঝি ওকাকুরা ও নিবেদিতার

বৌদ্ধ গ্রন্থের 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' রচিত হয়ে গেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব, ১৯০২-এর মার্চ মাসে হ্যাভেলের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ঘটে যাবে, এবং অচিরে শিল্প-আন্দোলন সৃষ্টিতে উভয়ে হাত মেলাবেন।

ওকাকুরা একাধিকবার ভারতে এসেছেন। প্রথম আগমনকালেই তাঁর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয়। সে পরিচয় গাঢ়তর হয় বেশ কয়েক-বছর পরে, ওকাকুরার পরবর্তী আগমনের সময়ে। ওকাকুরা জাপান থেকে দুই শিল্পী টাইক্কান ও হিশিদাকে ভারতে পাঠান যাতে তাঁদের রচনারীতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীরা পরিচিত হতে পারেন—এবং তাঁরাও জেনে নিতে পারেন ভারতের শিল্পরূপ ও জীবনরূপ। অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইয়ে টাইক্কান ও হিশিদার চিত্রাঙ্কন-রীতির চমৎকার বর্ণনা আছে। টাইক্কানের কাছ থেকেই যে তিনি ওয়াশ পদ্ধতি শিখে নিয়েছিলেন (কিছুটা পরিবর্তিত আকারে) তাও বলেছেন। জাপানী শিল্পীরা তাঁর কাছ থেকে মুঘল ছবির রীতিশিক্ষা করেছিলেন। ওকাকুরার ওই একটুকরো বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথের রচনায়—তা যেন একেবারে মিনিয়েচর ছবি :

"মাঝে মাঝে যেতুম, দেখতুম বসে আছেন তিনি একটা কৌচে। সামনে ব্রোঞ্জের একটি পদ্মফুল, তার ভিতরে সিগারেট গোঁজা, একটি করে তুলছেন আর ধরাচ্ছেন। বেশি কথা তিনি কখনই বলতেন না। বেঁটেখাটো মানুষটি, সুন্দর চেহারা, টানা চোখ, ধ্যাননিবিষ্ট গম্ভীর মূর্তি। বসে থাকতেন ঠিক যেন এক মহাপুরুষ। রাজভাব প্রকাশ পেত তাঁর চেহারায়।"

নন্দলাল বসুও ওকাকুরার কথা অনেক বলেছেন, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের 'ভারতশিল্পী নন্দলাল' (১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-৮৩) বইয়ে তা মিলবে। ১৯০৩ সালে ওকাকুরার পাঠানো টাইক্কান ও হিশিদা কলকাতায় এসে কী-ধরনের ভারতীয় বিষয়ের ছবি এঁকেছিলেন (কিরিতান, খাটসুতা ও আরাই-সান প্রভৃতি জাপানী শিল্পীরাও এসেছিলেন), তার বিবরণ নন্দলাল দিয়েছেন। ওকাকুরার কাছে নন্দলাল ছবির ব্যাপারে কোন্ নির্দেশ পেয়েছিলেন, তাও জেনেছি। ওকাকুরার মুখে আর একটি বিবেচনাযোগ্য কথা নন্দলাল শুনেছিলেন : "ভারতবর্ষ পেন্টিং-এর দেশ নয়—এ হলো স্কালপ্‌চারের দেশ।...পেন্টিং-এ সরেস হলো চীন। ভারতবর্ষের ভাস্কর্য যে-স্তরে উঠেছিল, চিত্রশিল্প সে স্তরে ওঠেনি। ভারতীয় ছাত্রদের ভাস্কর্য শিখতে বলতেন তিনি।"

অবনীন্দ্রনাথ কোনো কিছু বর্ণনার সময়ে স্বপ্নের সুর লাগাতেন—আর, নন্দলাল নিজ স্বভাবমতো বিবরণ দিতেন সাদামাঠা ভাবে :

"তখন ওঁর [ওকাকুরার] লিভারের অসুখ। মাতাল ছিলেন খুবই। মদ খাওয়া ছিল ওঁর আব্‌নরম্যাল। সিপ্ ক'রে খেতেন। জলও খেতেন সিপ্ ক'রে। আর সিগারেট খেতেন কৌটার পর কৌটা। মুখের আগুন নিভছে না। ঘন-ঘন বাথরুম যাচ্ছেন।" [পৃ. ২৮১]

নেশায় ডুবে থাকার মতোই প্রেমে পড়ার অভ্যাসও তাঁর ছিল। সারারাত ধরে রাশি-রাশি কবিতা লিখতেন—মিস ম্যাকলাউড রোমা রোলাঁকে সেকথা বলেছেন। ওকাকুরাকে প্রথম দেখার পর বিবেকানন্দ তাঁকে হাত বাড়িয়ে বহুদিন পরে ফিরে-আসা ভাই বলে গ্রহণ করলেও, কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা নিজ-নিজ কাজে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। "বিবেকানন্দের কর্মের মহিমা পুরোপুরি বুঝলেও তার জন্য ওকাকুরা নিজেকে তৈরি বলে মনে করেন নি। তাঁর ছিল নিজের সাম্রাজ্য—আর্টের সাম্রাজ্য।"[11] ধনগোপালের মুখে রোলাঁ শুনেছেন, বিবেকানন্দ ওকাকুরাকে বলেছিলেন, "এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ। আপনি রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি এখনো জীবনের মধ্যে

আছেন।"[12] স্বামীজীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল ওকাকুরার, স্বামীজীকে অনেক উপহার দিয়েছেন,[13] শিল্পভারতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য স্বামীজীর তীব্র আগ্রহের রূপও তিনি দেখেছেন, তবু এইটি বুঝেছিলেন, স্বামীজীরও তাতে সায় ছিল, জাপানের রূপের ধর্ম বোঝাতে হবে ভারতীয় শিল্পীদের, না স্পর্শ করে তাদের মন ও চোখকে। সে-কাজ তিনি করেছিলেন। তার ফলে প্রাচ্য জাপান ও চীন এসে গিয়েছিল ভারতের অজন্তার কাছে, যেখানে মুঘল-পারসিক রূপ ও রঙ তো ছিলই—এবং পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকও। যুক্ত হয়েছিল লোকশিল্পের প্রাণরস। এর ফলে নব্যবঙ্গীয় শিল্প বলে যা পরিচিত, তা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের অনুকরণে আবদ্ধ থাকেনি—চিত্রক্ষেত্রে অন্তত সেকথা সত্য।

॥ ৫ ॥

শিল্প-আন্দোলনের কথায় ফিরে যাই। ওকাকুরার মৃত্যুর পরে অবনীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায় (সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী) কার্তিক ১৩২০ সংখ্যায় "স্বর্গগত শ্রীমদ্ ওকাকুরা" রচনায় ওকাকুরার উদ্দেশ্যে আবেগময় শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন। সেখানে কিন্তু ভারতীয় শিল্প-আন্দোলন ওকাকুরার কাছ থেকে সরাসরি কতখানি দান পেয়েছিল, তার কথা বেশি বলা হয়নি। বলা হয়েছে সেই ক্ষত্রিয়ের কথা যিনি স্বদেশীয় শিল্পের জন্য ক্ষাত্র-বীর্যে সংগ্রাম করেছিলেন, এবং সেই ভারতপ্রেমিকের কথা, "ভারত-কলালক্ষ্মীর উপর" যাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি, যিনি "ভারতমাতার শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়া Asia is One–এই মহাসত্যের—এই বিরাট প্রেমের—বেদধ্বনি জগতে প্রচার করিয়াছেন।"

অবনীন্দ্রনাথের রচনার প্রধানাংশে স্বাভাবিকভাবেই পেয়েছি জাপানের জাতীয় শিল্পের পক্ষে ওকাকুরার মহাবীরোচিত সংগ্রামের কথা। ভারতে সেই সংগ্রাম তিনি স্বয়ং, এবং হ্যাভেল, নিবেদিতা, কুমারস্বামী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অনেকে করেছেন। ওকাকুরার সংগ্রামচিত্র অঙ্কনের সময়ে অবনীন্দ্রনাথ অবশ্যই প্রচ্ছন্নভাবে জুড়ে দিয়েছিলেন আত্মচিত্র ও আত্মীয়-চিত্র :

"আমাদের দেশে যেমন, জাপানেও তেমনি একদিন পাশ্চাত্ত্যশিল্প জাপানবাসীর সনাতন সভ্যতার পূর্বভাবটুকু ঘুচাইয়া দিয়া জাপান-চিত্রকলার যে-অবশ্যম্ভাবী পতনের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া স্বদেশের শিল্পকে যথাস্থানে অচল অটল বজ্রাসনে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন মহামনা আচার্য ওকাকুরা।...

"জাপানের রাজাপ্রজা যখন শিল্পে পাশ্চাত্ত্যপ্রথার বহুল প্রচারে বদ্ধপরিকর,...সেই দুর্দিনে এই মহামনা দৃঢ়চেতা উদ্যমশীল পুরুষ নিজের পদ মান সকলই তুচ্ছ করিয়া, বন্যার মুখে অটুট অভেদ্য বাঁধের মতো...একা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।...জাপানের সেই কালরাত্রির অন্ধকারপটে ওকাকুরা সেদিন তমোহারী পূর্ণচন্দ্ররূপে প্রকাশ পাইলেন।...

"রাজ-অনুগ্রহ, সম্মান, সম্ভ্রম ইত্যাদির প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্ত্যপন্থী শিল্পীকুলের অধ্যক্ষতা ছাড়িয়া যেদিন জাপানের সরকারী শিল্পশালা হইতে স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেদিন জাপানের পক্ষে শুভদিন বলিতে হইবে। কেননা ইহারই ছয় মাসের মধ্যে শ্রীমদ্ ওকাকুরা প্রমুখ চত্বারিংশ শিল্প-মহারথী তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠারূপ মহাযজ্ঞে নিজেদের সর্বস্ব আহুতি প্রদান করিলেন এবং তাহাতেই স্রোত ফিরিয়া গেল ও জাপানের মৃয়মান শিল্প নবজীবনের মধ্যে আর একবার বিকশিত হইয়া উঠিবার অবসর পাইল।"

ভারতীয় রাজনীতিতে ওকাকুরার নাক গলানো ব্যাপারটি অবশ্যই বিতর্কিত, উদ্দেশ্য সন্দেহযোগ্য, সেকথা বলেছি। কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাগরণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকে তাঁর স্মরণীয় ভূমিকা। 'আইডিয়ালস্' গ্রন্থের ভূমিকা নিবেদিতা শেষ করছেন এই বলে :

"আমাদের গ্রন্থকারের রচনা বৃথা যাবে যদি তিনি চূড়ান্তভাবে এই কথাটি প্রমাণ করতে না পেরে থাকেন—যা দিয়ে এই ক্ষুদ্রাকার বইটি শুরু হয়েছে—এশিয়া মহামাতা—তিনি অখণ্ড প্রতিমা।"

না, ওকাকুরার রচনা বৃথা যায়নি, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ মিসেস ওলি বুলকে লেখা মিস ম্যাকলাউডের ৩০ অক্টোবর ১৯০১ তারিখের চিঠিতে ওকাকুরার ভারতে আগমন পরিকল্পনা বিষয়ে কিছু সংবাদ আছে, যেমন,

"...Since Swamiji did not come to Japan Mr Okakura is thinking of going to India for two months but as the Committee of the Restoration of the Old Temples–of which he is the head, may not take place till early December–if I go the 30th of November as I had planned, he may not be able to accompany me. So I would rather postpone sailing a week or ten days, and have the pleasure and protection of his and Mr. Hori's company during the three weeks' sea voyage... The Japanese Government gives annually 150,000 Yen or $75,000 in our money for restoring the old temples, and as this is one of the results of Mr Okakura's life's work, and the other the Bijitsuin or Fine Arts Hall, that stands for Japanese Evolutionary Art–it is important that he attends this meeting–before going to India... Mr Okakura is keen to know you and says he knows he will like you. He is so gentle–just the thing you like in Dr (J. C.) Bose." (**Letters of Sister Nivedita**. Vol. I, p. 454, Edited by Sankari Prasad Basu).

২ 'স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন' (১৩৭৪), স্বামী নির্লেপানন্দ সংকলিত, পৃ. ৪৯, ৫২-৫৩, ৫৮।

৩ স্বামী সদাশিবানন্দ, 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ', (১৩৬০), (মহেন্দ্রনাথ দত্ত অনুলিখিত), পৃ. ৭০-৭১, ৭৫-৭৬।

৪ ঐ

৫ **Letters of Sister Nivedita**, Vol. I, p. 457.

৬ বাণী ও রচনা, ৯—৪০৬-০৮।

৭ প্রিয়নাথ সিংহ, 'বিবেকানন্দ অন আর্ট', প্রবুদ্ধ ভারত, নভেম্বর, ১৯০৮।

৮ বাণী ও রচনা, ৮—১৯৭-৯৮।

একদিকে দেশীয় শিল্পের অনাদর, অন্যদিকে স্থূল বিদেশী নকলনবিশির বিরুদ্ধে স্বামীজীর তীব্র ধিক্কার অন্যত্রও আছে।

"ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ এখনো পায়ের উপর দাঁড়ায় নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্র-বিচিত্র করত, বাহার ক'রে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত—সেসব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র-শীঘ্র। নতুন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরনোগুলো জলে ভাসিয়ে দিতে হবে নাকি? নতুন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি!! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনো দূর পাড়াগাঁয়ে পুরনো কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসো গে। কলকেতার ছুতোর একজোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না—দোর কি আগড় বুঝবার জো নেই!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতি যন্ত্র কেনা। ...নিজেদের যা ছিল, তা তো সব যাচ্ছে, অথচ বিদেশী [বস্তু] শেখবার মধ্যে বাক্যিযন্ত্রণা মাত্র। খালি পুঁথি পড়ছ আর পুঁথি পড়ছ।" [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বাণী ও রচনা, ৬—২১৪]

শিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে লোকশিল্প অংশের বিষয়ে চিন্তামূলক এক পটচিত্র স্বামীজী যেন কয়েক আঁচড়ে এঁকে সামনে দাঁড়িয়ে দিলেন পরবর্তীকালের জন্য নির্দেশিকা হিসাবে।

৯ নিপ্পন বিজিৎসু-সম্বন্ধে ওকাকুরার প্রবন্ধটির কিছু কথা :

"The Nippon Bijitsu-In, situated in Yanaka Tokio, is a private institution supported by contributions from the members and by private donations. The course includes painting, sculpture, bronze, lacquer, metal work,

and design, and instruction is given in the Japanese style only. It holds its half-yearly exhibitions in the main cities of Japan. The faculty consists, in addition to those who left the Government school, of many prominent independent Tokio artists, especially artists of the Ukiyoye or Popular School. The artists of the New School of Kioto also exhibit their work in that city. Among the prominent artists we may mention: Hashimoto Gaho, the last Chief instructor of the Kano Academi, whose vigorous brushwork often approaches that of Motikage and Sesson; Shimomura Kansan, a fine student of the Tosa school, who has stuck a new vein of Korin-like impressionism; Matsumoto Fuko, the true follower of Yosai; Ogata Gekko, the chief Ukio painter since the lamented Kawanabe Kiyosai; Suzuki Kason, noted for his delicate ink-effect (Shijo Style); Tominaga Yeisen, the successor of the late Yeitaku; and Yokoyama Taikan, with his bold conception, and Kaiwai Giokudo, with his pure effects, both worthy pupils of Gaho."

(**Studio**, March 15, 1902. 'The Nippon Bijitsu-In', by K. Okakura, p. 128)

১০ উইলিয়ম মরিস (১৮৩৪-৯৬), বৃটিশ শিল্পী এবং কবি, চারু ও কারুকলা আন্দোলনের প্রবর্তক, যা যন্ত্রশিল্পের ক্রমবর্ধিত প্রাধান্যের যুগে হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন-প্রয়াসী। রসেটি তাঁকে প্রি-র‍্যাফায়েলাইট আন্দোলনে যুক্ত করেন, এ-ব্যাপারে সহায়ক ছিলেন মরিসের অক্সফোর্ডের সহপাঠী বন্ধু বার্ন জোনস্। মরিসের আদি শিক্ষা স্থাপত্যের, রসেটির সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে চিত্রকলায় মন দেন। বিয়ের পরে তিনি গৃহসজ্জা, মণ্ডনশিল্প ইত্যাদিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৮৬২ সালে স্থাপিত তাঁর প্রতিষ্ঠান গির্জা-সজ্জা, রঙিন কাচের জানালা নির্মাণ, আসবাবের ডিজাইন, ফ্যাব্রিক ইত্যাদি কাজ করত। মণ্ডনধর্মী কাজের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভাবসঞ্চার, সেইসঙ্গে পুস্তক-শিল্প ও মুদ্রণশিল্পের সংস্কারের ব্যাপারে তাঁর গুরুত্ব স্বীকৃত। তবে তাঁর চিত্রাবলী ভিক্টোরীয় ভাবালুতায় পূর্ণ বলে পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় যে প্রাণশক্তি এবং মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা আছে, তা তাঁর ছবিতে নেই। (**Encyclopedia of Painting**, Edited by Bernard S. Myers).

১১ রম্যাঁ রলাঁ, "ভারতবর্ষ : দিনপঞ্জী", অবন্তীকুমার সান্যাল অনূদিত। পৃ. ২০৩-০৪।

১২ ঐ। পৃ. ১৬৭।

১৩ নন্দলালের স্মৃতি :

"পুরাতন জাপানী শিল্পীর আঁকা দু'খানি ছবি ওকাকুরা উপহার দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দজীকে। তার একটি ছবিতে কুঁড়ি থেকে একটি পদ্ম ফুটছে; আর একটি পদ্ম ফুটেছিল, ঝরে পড়েছে। বেলুড়-মঠে ছিল দু'খানি। মিস ম্যাকলাউড ছবি দু'খানি এনে শান্তিনিকেতন কলাভবনে উপহার দিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলুম, ছবি দু'খানি জাপানে পাঠাবো মাউন্ট করাতে। মিস ম্যাকলাউড নিষেধ করলেন—'ওরা ফেরত দেবে না।' তাই কলাভবনে টাঙানো হলো যেমন ছিল তেমনই।' ['ভারতশিল্পী নন্দলাল', পৃ. ১৮৩]

সপ্তম অধ্যায়

নিবেদিতা ও হ্যাভেল

॥ ১ ॥

আধুনিক ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের ইতিহাসে আর্নেস্ট বীনফিল্ড হ্যাভেলই মূল নায়ক, তা স্বীকার্য। এখানে অবশ্য সৃষ্টিশীল শিল্পীদের কথা বাদ দিচ্ছি। শিল্পী ছাড়া নিশ্চয় শিল্প-আন্দোলন সম্ভব নয়; তাই শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরে আচার্য নন্দলালের নেতৃত্বের মূল্য বলার অপেক্ষা রাখেনা। আমি এখানে সমর্থক ও সহায়করূপে যাঁরা আন্দোলনের উত্থানে ও গতিবিধানে বৃহৎ অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের প্রসঙ্গেই কথাটা তুলছি। এই বিচারে হ্যাভেল প্রথম এবং নিবেদিতা দ্বিতীয় চরিত্র।

হ্যাভেলকে প্রথম চরিত্র বলার অনেক কারণ, তার মধ্যে প্রধান তিনটি:

এক, হ্যাভেল ১৮৯৬ সালে কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে এসে (তার আগে তিনি এক দশক মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন) এখানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করেন। যেখানে ড্রইং ও পেন্টিং ক্লাসে "ইয়োরোপের প্রাদেশিক শিল্পের জঘন্য প্রতিচ্ছবির" অনুকরণ করতে শেখানো হত, সেখানে তিনি স্থির করলেন, অতঃপর, "এদেশে শিক্ষার ভিত্তি হবে প্রাচ্য-শিল্প।"[১] হ্যাভেলের এই নীতি যথার্থ ফলপ্রসূ হয় স্বদেশী আন্দোলনকালে। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনকালে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এদেশীয় ভাবচেতনা উন্মোচনের প্রতিষ্ঠান করে তোলার মতো পরমাশ্চর্য কাণ্ড তিনি ঘটিয়েছিলেন।

দুই, এই আন্দোলনের প্রধান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ—হ্যাভেলকে তিনি "গুরু" বলে স্বীকার করেছেন। হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের ছাত্ররা এই শিল্পধারাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়েছেন।[২]

তিন, হ্যাভেলই প্রথম এক বৃহৎ সুলিখিত গ্রন্থে ভারতীয় শিল্প ও শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিষয়ে হ্যাভেল একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।[৩]

॥ ২ ॥

সরকারী আর্ট স্কুলে ভারতীয়তা আনার ব্যাপারে হ্যাভেলের প্রয়াস ও সাফল্য একটি দুঃসাহসিক কীর্তি, যার পরিমাপ এখন করা সম্ভব নয়। এর জন্য হ্যাভেল যেমন সম্মান পেয়েছেন তেমনি নিন্দা ও লাঞ্ছনা তাঁর ভাগ্যে কম জোটেনি। সাহেব-আমলাদের বদ্ধমূল ধারণার বিরোধিতা করার জন্য তাদের হাতে হ্যাভেলের দুর্গতির কথা নিবেদিতা বলেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ১৯১১ সালে নিউইয়র্কে অবস্থানকালে: "বেচারা সদাশয় হ্যাভেল! তাকে ভারতের বিরূপ, বক্রদৃষ্টি বৃটিশ আমলাতন্ত্রের হাতে কী-না উৎপীড়ন সহ্য করতে হচ্ছে।"[৪] হ্যাভেলের মৃত্যুর পরে অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এই বিষয়ে লেখেন: "ভারতের প্রাচীন শিল্পের বিশিষ্ট রূপ ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, জগতের শিল্পের দরবারে ভারতীয় শিল্পের জন্য শ্রেষ্ঠ আসন দাবি করিয়া, ভারত ও য়ুরোপের শিক্ষিত সমাজে নানা অপমান ও লাঞ্ছনা হ্যাভেল সাহেবকে বরণ করিতে হইয়াছিল।"

ইউরোপের শিক্ষিত সমাজের হাতে হ্যাভেলের লাঞ্ছনার কারণ বোঝা গেল, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষিত সমাজেও বিরূপতা!! অর্ধেন্দ্রকুমার অতঃপর লিখেছেন: "সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহার ভারতীয় শিল্পের ব্যাখ্যান বিষয়ে প্রথমে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে এবং তিরস্কারই দিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। আজও শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে খুব কম লোকেই আছেন যাঁহারা হ্যাভেল সাহেবের ভারতশিল্পের মূল্যের দাবি অকপটে ও সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন।"

হ্যাভেল 'উত্তম যোদ্ধার ভঙ্গিতে' সরকারি আর্ট স্কুল থেকে বিদেশীয় অনুকরণের উপাদান এবং শিক্ষাপদ্ধতি দূর করেছিলেন (যেজন্য এখনো অনেকে বেদনার্ত), তাঁর কাজের প্রতিবাদে একদিনের ছাত্র-ধর্মঘট হয়, কিছু ছাত্র আর্ট স্কুল ছেড়ে যান, অন্য প্রতিষ্ঠানও গঠন করেন। এঁদের নেতা ছিলেন রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত। ইনি উদ্যোগী ও ক্ষমতাশালী, কিন্তু ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব ভাব সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর একদিনের কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায়। স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী—"কলিকাতা জুবিলী আর্ট একাডেমীর অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাবু রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়কে" সঙ্গে করে বেলুড়মঠে এসেছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। "রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ সুপণ্ডিত ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী।" শিল্পের প্রাণধর্ম নিয়ে স্বামীজী তাঁকে অনেক কথা বলেন—সেই কথাগুলি রণদাপ্রসাদের ধ্যান-ধারণার ভিন্নপ্রান্তের। স্বামীজী বিশেষভাবে বলেছিলেন, শিল্প যদি আইডিয়া প্রকাশ করতে না পারে তাহলে শিল্পই নয়—নিছক রঙ-রেখার চাকচিক্য বা পারিপাট্য কোনো কিছুকে শিল্পবস্তু করে তুলতে পারেনা। প্যারিস প্রদর্শনীতে তিনি পাথর-খোদাই একটি মূর্তি দেখেছিলেন মুগ্ধ হয়ে—তার বিষয়বস্তু—'Art Unveiling Nature।' মূর্তিটি এমনভাবে তৈরী হয়েছে যাতে দেখা যায়, প্রকৃতির নিবিড় অবগুণ্ঠন মোচন করছে শিল্প, অল্পমাত্র মুখচ্ছবি বিকশিত, তারই সৌন্দর্যে শিল্প মোহিত। ভাবপ্রকাশক বলেই ভাস্কর্যটি স্বামীজীর মনোহরণ করেছিল। স্বামীজীর কথা শুনে উদ্দীপ্ত রণদাপ্রসাদ 'Original modelling' করার ইচ্ছা প্রকাশ করেও নৈরাশ্যও জানিয়েছিলেন, আর তখনই আসল কথাটা বেরিয়ে এসেছিল, "অর্থাভাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের অভাব।" স্বামীজী নিজস্ব আদর্শবাদের তাগিদে এর পরে যেসব কথা বলেছিলেন তা সমকালীন পাশ্চাত্য রীতির প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ: "[ওদেশে] অরিজিন্যালিটি প্রায় দেখতে পাওয়া যায়না। ওইসব দেশে ফটোযন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা

চিত্র তুলে ছবি আঁকছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য নিলে অরিজিন্যালিটি লোপ পেয়ে যায়।...আগেকার ভাস্করগণ নিজেদের মাথা থেকে নূতন নূতন ভাব বের করতে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন। এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে।" তিনি জাতীয় প্রবণতার কথা তুলেছিলেন। ইহবাদী পাশ্চাত্যদেশ বাস্তবকে এবং ভাববাদী ভারতবর্ষ 'আইডিয়ালিটিকে' শিল্পের মৌল ভিত্তি করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই গৌরবান্বিত শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। "ওদেশের এক-একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশ সম্বন্ধেও তেমনি পুরাকালে স্থাপত্যবিদ্যায় যখন খুব বিকাশ হয়েছিল তখনকার-এক-একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে।" স্বামীজী তারপর নিজের 'কালী দি মাদার' কবিতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তার ভাবধর্মের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন এবং রণদাপ্রসাদকে ওই ভাব অবলম্বন করে ছবি আঁকতে অনুরোধ করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের যে-শীলমোহর তিনি নিজে প্রস্তুত করেন তার প্রতীকরূপ ব্যাখ্যাও এখানে করেছিলেন। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ-মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য পরিকল্পনার কথাও খুলে বলেন। স্বামীজী সরাসরি সমকালের আর্ট স্কুলের ছবির সমালোচনা করে বলেন, "এই দেখুন না, আপনাদের আর্ট স্কুলের ছবিগুলিতে যেন কোনো এক্সপ্রেশন নেই।" স্বামীজীর নানা কথা শুনে রণদাপ্রসাদ বলেছিলেন, "শিল্প সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ-জীবনে আর কখনো শুনিনি। আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে-সকল ভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।" কিন্তু সে কাজ সঠিকভাবে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলনা। স্বামীজী যে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন—"আপনারা হিন্দুদের নিত্যধ্যেয় মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক এক্সপ্রেশন দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করলে ভালো হয়"—না, চেষ্টা করলেও রণদাপ্রসাদ তাতে সফল হতে পারতেন না, যেহেতু শিল্পের বিষয় ও ভাবের মতোই আঙ্গিক বলে একটা জিনিস আছে—তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না—ভারতীয় অঙ্কন পদ্ধতিকে পুরো বর্জন করে ভারতীয় ভাবধারার রূপায়ণ সম্ভব নয়, যদিও পুরাতনের সঙ্গে কালোচিত নবরীতির যোজনাও অবশ্যকৃত্য।

১৯০১ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই আলোচনা হয়েছিল।*

হ্যাভেলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ছাত্রদের বিদ্রোহের কারণ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দুইই। জাতীয় ভাবভিত্তির উপরে না দাঁড়ালে শিল্পীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এই সহজ ও স্বীকৃত কথাটা অস্বীকার্য ছিল সেকালের পরাধীন (বা চিরকালের পরাধীন) মানুষের কাছে। ছাত্ররা আরও মনে করেছিলেন, বিদেশী পদ্ধতিকে অনুসরণ না করলে এদেশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহেবী সমাদর লাভ করা যাবেনা—যার ফল শিল্পীর অন্নসমস্যা। তাই হ্যাভেলের প্রচেষ্টার এগার বছর আগে আর্ট স্কুলের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ও-গিলার্ডি, তারও আগে স্কামবার্গ, যখন কিছুটা এই ধরনের চেষ্টা করেছিলেন, তখনো ভারতীয় ছাত্ররা বিরূপতা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। গিলার্ডিকে স্কামবার্গ বলেন, শিক্ষাসূচীতে প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিক রীতির ভিত্তিচিত্রকে যোগ করে দেওয়া উচিত। সেই উচিত বন্দনাকে ভারতীয় ছাত্ররা কী বিতৃষ্ণাকর মনে করত এবং তাদের বিরোধিতার মুখে শিক্ষানীতিতে অল্পমাত্রায় ভারতীয় ভাব প্রবেশ করানোও যে সম্ভব নয়, তা শিক্ষাবিভাগের কাছে লেখা ও-গিলার্ডির রিপোর্টে দেখা যায় :

"The late Mr. Schaumburg pointed out to me the necessity of reinstating Indian decorative art in its original brilliancy, but both he and myself were fully aware that we should have been undertaking a task beyond our powers, for this reason that we should have found in the native students themselves the chief and strongest opposition to our efforts."*

স্কামবার্গ এবং ও-গিলার্ডি যে কাজকে 'সাধ্যাতীত' মনে করেছিলেন, তাকে ব্যাপকতর আকারে সম্ভব করেন হ্যাভেল। তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার বিষয়ে বলবার সুযোগ্য পুরুষ অবনীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য :

"সে তখনকার কথা যখন একদিকে বড় বড় নামজাদা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আমাদের প্রাচীন মন্দির-মঠাদির বর্ণন ও ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন, আর একদিকে আর্ট স্কুলে প্রাচীন গ্রীক রোমান মূর্তির মাটির ছাঁচ এবং প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রকলার মাঝারিগোছের সস্তা নমুনা থেকে নকল নিয়ে গিয়ে আমাদের দেশে শিল্পশিক্ষার্থীদের করে তোলা হচ্ছে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অয়েল-পেন্টার, ওয়াটারকলার-পেন্টার—নকল র‍্যাফেল, টিশিয়ান হয়ে ওঠার অভিনয় চলছে—যেন বাঙালী ছেলে ব্রুটস সেজে মুখস্থকরা স্পীচ্ আউড়ে যাচ্ছে আর ভাবছে নিজেকে সত্যই সে রোমান সেনেটের একজন। আমরা যে কেবলই আর্টিস্ট হবার অভিনয় করে চলেছি সেটা ভ্রমেও মনে হতনা কারু। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যে আর্টের সৌন্দর্য বোঝার পক্ষে একেবারেই কাজে আসেনা এটা বুঝলেম আমরা প্রথম হ্যাভেল সাহেবের লেখা থেকে। এ যেন এতকাল আমাদের ভাস্কর্যশিল্পের বহিরঙ্গীণ অংশের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বয়স ইত্যাদির হিসেব ধরা হচ্ছিল আমাদের আগের প্রত্নতত্ত্ববিদগণের দ্বারা, ঠিক যেভাবে ঘোড়ার দালাল ঘোড়ার দাঁত, লেজের দৈর্ঘ্য, কাঠামোর লম্বাই চওড়াই দিয়ে ঘোড়ার সৌন্দর্য বর্ণনা করে, সেইভাবে কাজ হচ্ছিল। কিন্তু হ্যাভেল সাহেব তাঁর লেখায় একাধারে প্রত্নতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, ভারতীয় শিল্পের নিগূঢ় রস পরিবেশন করলেন আমাদের।"[১]

অবনীন্দ্রনাথের বিচারে হ্যাভেল "এ দেশের শিল্পশিক্ষার মূল প্রতিষ্ঠাতা" এবং "আমাদের দেশের শিক্ষাদীক্ষা শিল্প ইতিহাস প্রভৃতির" দ্রষ্টা "ঋষি"।

॥৩॥

হ্যাভেলের কাছে অবনীন্দ্রনাথের অপরিশোধ্য ব্যক্তিগত ঋণ। হ্যাভেল ৬ জুলাই ১৮৯৬, কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে আসার কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। অবনীন্দ্রনাথ অল্প আগে দেশী রীতিতে শিল্পচর্চা আরম্ভ করলেও এদেশীয় শিল্পের প্রাণধর্ম তাঁর কাছে ধরা পড়েনি। তাঁর কাছে হ্যাভেল কিভাবে তা নিয়ে এসেছিলেন—অবনীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তিতে সেকথা আছে :

"গভর্নমেন্টের টাকায় আর্ট গ্যালারির জন্য জিনিস সংগ্রহ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্টের সঙ্গে পরিচয় ঘটেও যাচ্ছে। তার উপর ছিলেন আমার হ্যাভেল গুরু। এদেশের আর্ট বুঝতে এমন দুটি ছিলনা। রোজ দু ঘন্টা নিরিবিলি তাঁর পাশে বসিয়ে দেশের ছবি, মূর্তির সৌন্দর্য, তার ইতিহাস বুঝিয়ে দিতেন।...ভাবি, সেই বিদেশী গুরু আমার হ্যাভেল-সাহেব অমন করে আমায় যদি-না বোঝাতেন ভারতশিল্পের গুণাগুণ, তবে কয়লা ছিলেম, কয়লাই হয়ত থেকে যেতেম, মনের ময়লা ঘুচত না, চোখ ফুটত না দেশের শিল্পসৌন্দর্যের দিকে।"

কী করে মুঘল শিল্প দেখতে হয়, তার শিক্ষাও পেয়েছেন হ্যাভেলের কাছ থেকে।

হ্যাভেল তাঁকে একটি আতসী কাঁচ দিয়েছিলেন, তারই সাহায্যে তিনি ছোট ছোট মুঘল ছবির খুঁটিনাটি দেখেছেন, আর অবাক হয়েছেন : "ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি ; ঢেলে দিয়েছে সোনা রূপো সব ।"[৯]

আতসী কাঁচটিকে অবনীন্দ্রনাথ বলতেন "দিব্যচক্ষু ।"[১০]

মর্মান্তিক বেদনা থেকে অবনীন্দ্রনাথের সেরা একটি ছবির সৃষ্টি—'শাজাহানের মৃত্যু ।' সে শাজাহান আসলে অবনীন্দ্রনাথের একসময়ের আত্মমূর্তি । তাঁর বড়ো ভালবাসার একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছিল—পিতৃহৃদয়ের বেদনা উজাড় করে দিয়েছিলেন এই ছবিটিতে । হ্যাভেল মুগ্ধ হন । তাঁরই চেষ্টায় এটি যায় ১৯০২-এ দিল্লী দরবারে এবং সর্বোচ্চ প্রশংসা পায় ।[১১]

এখানেই শেষ নয় । অবনীন্দ্রনাথের বৈদেশিক প্রচারের প্রথম দায় হ্যাভেলই গ্রহণ করেন । ইংলন্ডের 'স্টুডিও' পত্রিকার ১৫ অক্টোবর ১৯০২ সংখ্যায় তিনি ভারতীয় শিল্পের ধারাপথে অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের জয়ঘোষণা করেছিলেন—তাঁর সে রচনা শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই 'ঐতিহাসিক'—অসাধারণ রচনা বলে নয়, অসাধারণ সাহসের এবং নতুনকে চিনে নেবার শক্তিতে পূর্ণ রচনা বলে ।[১২]

রচনার গোড়ায় হ্যাভেল দুঃখপ্রকাশ করেছেন এই বলে যে, ভারতীয় চিত্রশিল্পের সমাদর ভারতীয়দের মধ্যে নেই, এমন-কি ভারতীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষক বলে কথিত পাশ্চাত্যের গুণগ্রাহী পর্যালোচক এবং প্রশাসকরাও ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে উদাসীন । অথচ এদেশে অজন্তা আছে, যা দেখিয়ে দেয় "হিন্দু শিল্পনীতির কঠোর রীতিবন্ধন—এবং মুসলমানী গোঁড়ামির বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত থাকলে ভারতীয় শিল্পীরা এদেশের জীবন এবং নিসর্গপ্রকৃতির অসীম কাব্যিক সম্ভাবনাকে পুরোপুরি উপভোগ করে রূপায়িত করতে সমর্থ । এই পর্বের চিত্রাবলী গৌতম বুদ্ধের মানবাত্মিক ভাবধারার দ্বারা যেমন গভীরভাবে প্রভাবিত, তেমনি উত্তরভারতে বসবাসকারী, আলেক্সাণ্ডারের অনুগামীদের দ্বারা প্রবর্তিত গ্রীসের শিল্পনীতির প্রভাবও তার উপর আছে ।"

এর পরে হ্যাভেল বলতে চেয়েছেন, ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চিত্রশিল্পের অধোগতি ঘটে, কারণ হিন্দুদের জাতিপ্রথায় চিত্রশিল্পীর স্থান ছিল সর্বনিম্নে । তাছাড়া ব্রহ্মণ্যবাদ মন্দির অলঙ্করণের জন্য ভাস্কর্যকেই পছন্দ করত । বৌদ্ধ-পরবর্তী ৯০০ বছর ধরে চিত্রশিল্পের দুর্গতির পরে মুঘল যুগে তার পুনরুত্থান ঘটে । প্রথম দিকে ভারতাগত মুঘলরা পারস্য থেকে শিল্পী আনিয়ে পুথিপত্র, পাণ্ডুলিপি, 'শাস্ত্রগ্রন্থ অলঙ্করণের কাজ করাতেন । আকবরের পূর্ব পর্যন্ত মুঘল শিল্পে ভারতীয় পরিবেশের চিহ্ন নেই । এই সারাসেনিক আর্টে জীবজন্তু ও মনুষ্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ । আকবর নতুন জীবনদর্শন আনলেন—ওইসব বাধা তিনি সরিয়ে দিলেন, এবং শিল্পীরা পেলেন সৃষ্টির স্বাধীনতা । "ফলে উজ্জীবক পরিবেশে একটি নূতন এবং বিশিষ্টভাবে ভারতীয় চিত্রশিল্পধারার উদ্ভব হলো ।" আকবরের শাসনের গোড়ার দিকে না হলেও শেষের দিকের শিল্পে শিল্পী-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ রয়েছে । হ্যাভেল এই শিল্পধারাকে 'রিয়ালিস্টিক' বলে চিহ্নিত করেছেন । কারণ তা প্রকৃতি থেকে সরাসরি প্রেরণা লাভ করত—যদিও আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীরা যেভাবে রিয়ালিজমের নামে সমস্ত রীতিনীতিকে ঠেলে সরিয়ে দেন—সে-বস্তু তখন ছিলনা । হ্যাভেল নতুন পর্বের মুঘল শিল্পীদের সম্বন্ধে আরও বললেন, এঁরা পারসিক শিল্পের অপূর্ব আঙ্গিককৌশল ও মণ্ডনধর্ম স্বীকার করে মানবচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা

এনেছিলেন । আকবরের পরে জাহাঙ্গীর এবং শাজাহান পর্যন্ত সময়ে (অবশ্য শাজাহানের বেশি ঝোঁক ছিল স্থাপত্যে) এই নবভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি ঘটে । "তারপরে শাজাহানের উত্তরাধিকারী আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতা মুঘল শিল্পধারার চমৎকার বিকাশকে বিপর্যস্ত করে দেয় । আওরঙ্গজেব পুনশ্চ শরিয়তী আইন কঠোরভাবে বলবৎ করেন, যেসব শিল্পী তাঁর বিধান অগ্রাহ্য করলেন তাঁদের দূর করে দিলেন রাজসভা থেকে এবং যেসব স্থাপত্য বা চিত্রকলা তাঁর বিবেচনায় বিধর্মী ব্যাপার বলে মনে হলো সেসবকে তিনি হয় ধ্বংস না-হয় বিকৃত করলেন ।" কিছু শিল্পী জয়পুর, লাহোর, দিল্লী, মহীশূর ইত্যাদি জায়গায় সরে গিয়ে এই ধারাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তবে পূর্বেকার গৌরবযুগ আর ফিরে আসেনি । "তথাপি মুঘল শিল্প তার সমুন্নতির অল্পস্থায়ী পর্বে, এমন কি পরবর্তী মুসলমানী ধর্মান্ধতা, রাজনৈতিক নৈরাজ্য এবং বৃটিশের অসংস্কৃত মূঢ়তার ক্রমাগত অনিষ্টকর আঘাতের কালেও, ভারতীয় জীবন, রীতিনীতি ও ইতিহাসের যে চিত্র-রূপ রেখে গেছে—সেসব এমনকি যাঁরা বিরাট ভারত-সাম্রাজ্যের শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আগ্রহ দেখান তাঁদের কাছেও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ।"

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা প্রসঙ্গে ভারতের গোটা চিত্রধারার বিবরণ দেওয়ার কৈফিয়ত হ্যাভেল দিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, গোটা ধারাপথে স্থাপন না করলে "মিঃ অবনীন্দ্রনাথ টেগোরের শিল্পসৃষ্টিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয় ।" "সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্প-প্রতিভায় সম্পন্ন এক পুরাতন ভারতীয় পরিবারের ইনি সন্তান । এঁর অন্যতম ভ্রাতা [না, কাকা] রবীন্দ্রনাথ টেগোর বাঙালী কবি ও নাট্যকার রূপে বিরাট খ্যাতি অর্জন করেছেন । অন্য এক নিকট আত্মীয় সৌরীন্দ্রমোহন টেগোর সঙ্গীতশাস্ত্রী, ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান বিশেষজ্ঞ হিসাবে পাশ্চাত্যে স্বীকৃত ।" অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররীতি যে পুনরুজ্জীবনবাদী গোঁড়ামির উৎপাদন নয়, পরন্তু তা লুপ্ত ধারাকে সঞ্জীবিত ক'রে সাগরবাহিনী করারই প্রযত্ন, সেকথা হ্যাভেল দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন :

"মিঃ টেগোর প্রচলিত ইউরোপীয় শিল্পরীতির ছাঁচে নিজের শিল্পচরিত্রকে ঢালাই করার প্রলোভন এড়িয়েছেন । মুঘল রীতির মধ্যে তিনি নিজের শিল্পবিকাশের পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছেন । কিন্তু তিনি লুপ্ত রীতির নিছক অনুকারীও নন ।...যদি কোনো ইউরোপীয় শিল্পী বিশ শতকে মধ্যযুগীয় রীতি অনুযায়ী চিত্রাঙ্কন করেন, তাহলে অবশ্যই সে রচনার মধ্যে একধরনের অবাস্তবতা, এমনকি কৃত্রিমতার সুর থাকবে । কিন্তু আধা-ইউরোপীয় শহরগুলিকে বাদ দিলে ভারতবর্ষ এখনও মূল অংশে পাঁচশো বছর আগেকার ভারতবর্ষই । মুঘল রীতির শিল্প-ঐতিহ্য এখনও সঞ্জীব । তাই তার অনুসরণ ক'রে মিঃ টেগোর ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন না । যদিও তিনি এখনো পর্যন্ত সেরা মুঘল চিত্রের রেখাঙ্কনের অপূর্ব আকার এবং সবজড়ানো সুকোমল লাবণ্য আয়ত্ত করা থেকে অনেক দূরেই আছেন, তবু যেভাবে শিল্পীজনোচিত আনন্দানুভূতির সঙ্গে পুরাতন যুগের কাহিনীচিত্র আঁকছেন, তাদের মধ্যে মনোহারী কাব্যিক আবেগের প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এ জিনিস তাঁর একেবারে নিজস্ব ।"

পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির জড় প্রভাবে সমকালীন ভারতীয় চিত্রশিল্পের দুর্গতির কথা হ্যাভেল স্বতঃই বলেছিলেন । যে-শিক্ষা ভারতে চালু করা হয়েছে তা মৌলিকতার সকল সম্ভাবনাকে নিকেশ করে দিয়েছে । ভারতীয় ছাত্ররা এই কথাটা বিশেষভাবে শিখেছে, বা তাদের বিশেষভাবে শেখানো হয়েছে যে, ভারতের শিল্প-সাহিত্যের কোনো কিছুই চর্চার যোগ্য নয়, ভারতীয় জীবন ও শিল্পের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য নেই বা থাকতে পারেনা, টপ হ্যাট ও ফ্রক

কোটই সভ্যতা-সংস্কৃতির জয়ধ্বজা। ভারতের শাসকদের জীবনযাত্রাও শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুকূল নয়। "অধিকাংশ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান (মানে ভারতবাসী ইংরাজ) অর্ধ-যাযাবরের জীবনযাপন করে—সে জীবনে শিল্পের ঠাঁই নেই। তাদের প্রধান শিল্পসম্ভোগ সিমলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বাৎসরিক চারুশিল্প প্রদর্শনীতে গমনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা শিল্পের পিকনিক ছাড়া কিছু নয়।" এই পরিস্থিতিতে কলকাতার আর্ট স্কুলে নিম্নস্তরের ইউরোপীয় শিল্পের সমারোহ দেখে চমৎকৃত হ্যাভেল সবিস্ময়ে ভেবেছেন, সমকালীন ইংরেজি শিল্পজগতে সত্যকার প্রতিভাবান এবং সম্মানিত শিল্পী জি এফ ওয়টস্ যদি দেখতেন, তাঁর সেরা সৃষ্টির নমুনারূপে রাখা হয়েছে—একটি দাসী চায়ের কাপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে এমন একটি ছবি—তাহলে না-জানি তাঁর মনোভাব কি-রকম দাঁড়াত!! পরাধীন ভারতের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে আর একটি বিপদের কথাও হ্যাভেল বলেছেন। "গত ৫০ বছর ধরে ভারতীয় শিল্প একদিকে যেমন গৌরবহারা, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপীয় শিল্প-সংগ্রাহকরা এই দেশকে তছনছ করে যা-কিছু হস্তান্তরযোগ্য উচ্চাঙ্গের শিল্পনির্দশন পেয়েছেন তাদেরই নিয়ে চলে গেছেন স্বদেশে—ফলে ভারতীয় শিল্পচর্চা করতে হলে ভারতের মিউজিয়ামে গেলে চলবে না, অবশ্যই যেতে হবে ইউরোপের ব্যক্তিগত ও সাধারণ সংগ্রহশালায়।" স্বাধীন এবং বুদ্ধিমান জাপানীরা এ-জিনিস নিজেদের দেশের ক্ষেত্রে করতে দেয়নি, তাও হ্যাভেল বলেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের "খাঁটি শিল্পচেতনার" প্রশংসার পরে হ্যাভেল তাঁর চিত্ররচনার পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখ করেছেন তাঁর ঋতুসংহার চিত্রাবলীর, যথা 'নিশাভিসার', যার মধ্যে পম্পেই রীতির প্রকোপ আছে, (অজন্তা ধারার দৃষ্টান্ত থাকায় ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে গ্রীক-প্রভাব একেবারে ত্যাজ্য নয়), রিচার্ড বার্টনের 'টেলস অব হিন্দু ডেভিল্রি' থেকে 'পদ্মহস্ত রাজকুমারী', রামায়ণ সিরিজ ইত্যাদি। অবনীন্দ্রনাথ মহাভারত সিরিজ আঁকার পরিকল্পনা করছেন, চারুশিল্প ও মণ্ডনশিল্পের সমন্বয়ে আগ্রহী, এসব কথাও পাই।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের সেরা ছবি 'বুদ্ধ ও সুজাতা'-র বিশেষ উল্লেখ হ্যাভেল করেছিলেন। এডউইন আর্নল্ডের 'লাইট অফ এশিয়া' থেকে ওই চিত্রবিষয় গৃহীত। বুদ্ধকে বনদেবতা ভেবে গ্রাম-রমণী সুজাতা পায়সান্ন নিবেদন করেছিলেন। "মিঃ টেগোর বুদ্ধের প্রশান্ত আধ্যাত্মিক মহিমাকে সহজ ছন্দে, অনুভূতির গভীরতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন—একই সহজতার সঙ্গে সুজাতার নিবেদনের মধ্যে এনেছেন লাবণ্য ও মধুরিমা।"

হ্যাভেলের প্রবন্ধমধ্যে অবনীন্দ্রনাথের একাধিক একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র-প্রতিলিপি ছিল।

এর পরেও হ্যাভেল নানা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের ছবির এবং তাঁর প্রবর্তিত ধারার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একটি বড়ো মাপের বই তিনি অবনীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন—**The Ancient and Mediaeval Architecture of India (1915)**। উৎসর্গপত্রে আছে—"To Abanindro Nath Tagore—With his Guru's greetings." হ্যাভেলের অধিকাংশ বইয়ের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথের উল্লেখ পাই।

হ্যাভেলই অবনীন্দ্রনাথকে কার্যত হাতে ধরে আর্ট স্কুলের সহাধ্যক্ষের পদে বসিয়ে দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ১৯০৫-১৫ পর্যন্ত সেকাজ করেন ; মধ্যে একবার ২ বছরের জন্য অস্থায়ী অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। স্বভাব-কুঁড়ে ঢিলেঢালা মেজাজের এই শিল্পীকে হ্যাভেল কিরকম মাতৃযত্নে চাকরি করিয়েছেন, তার বিবরণ অবনীন্দ্রনাথ দিয়েছেন 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইয়ে। কার্যকারণ সম্পর্ককে মানতে হলে বলব, আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথ সহাধ্যক্ষ

থাকার জন্যই নন্দলাল প্রমুখকে পেয়েছিলেন, এবং নন্দলাল প্রমুখরা তাঁকে পেয়েছিলেন বলেই ভারতীয় শিল্প-আন্দোলন বিস্তারলাভ করেছিল।

সুতরাং এই আন্দোলনের 'গুরু' অবশ্যই ঈ বী হ্যাভেল। ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"তাঁকে চিরকাল গুরু বলে শ্রদ্ধা করেছি। জ্যেষ্ঠের মতো ভক্তি করেছি কি সাধে ? উনিও আমাকে collaborator সহকর্মী বলে ডাকতেন আদর করে। কখনো চেলাও বলেছেন। ছোট ভাইয়ের মতো ভালবাসতেন। আমি নন্দলালকে যতখানি ভালবাসি তার বেশি তিনি আমাকে ভালবাসতেন।"[১৩]

॥ ৪ ॥

এহেন হ্যাভেল ছিলেন নিবেদিতার "আমার বন্ধু মিঃ হ্যাভেল।" উভয়ের বন্ধুত্ব শিল্পচর্চা ও শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রেই। শুধু তাই নয়, নিবেদিতা হ্যাভেলকে প্রভাবিতও করেছেন, অন্তত প্রত্যক্ষদর্শী নন্দলাল বসুর রচনায় তা পাই। শিল্পবিষয়ে উভয়ের আলোচনার বিষয়ে তথ্য আছে। অথচ দেখা যায়, হ্যাভেলের গ্রন্থগুলির ভূমিকায় নিবেদিতার নাম নেই। এই অনুল্লেখের নানা কারণ সম্ভব। তার অন্যতম, হয়ত-বা প্রধানতম কারণ—নিবেদিতার নিষেধ। তিনি চাইতেন না, তাঁর সাহায্যের উল্লেখ থাক অপরের বইয়ে—সে এক ধরনের আত্মবিলোপের সাধনা। দীনেশচন্দ্র সেনকে তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ইংরেজি রূপান্তরের ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করার পরে নিবেদিতা ওই ধরনের নিষেধ করে রেখেছিলেন। তাছাড়া এমনও হতে পারে, ভারতের বৃটিশ আমলাতন্ত্রের দ্বারা উৎপীড়িত হ্যাভেল বোধহয় নিবেদিতার মতো সন্দেহভাজন রাজনৈতিক চরিত্রের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ককথা বলে বিপদ বাড়াতে চাননি।

তবু এই ব্যাপারটি কিছু বিস্ময়কর। নন্দলালের উক্তিতে তার ছোঁয়া আছে। বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে ২৫-৮-৫৪ তারিখে এক পত্রে নন্দলাল লেখেন :

"হ্যাঁ, সিস্টার হ্যাভেল-সাহেবকে শিল্পবিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। মনে হয়, Aesthetics ও Philosophy of Art বিষয়ে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি উনি তাঁহাকে বুঝিয়েছিলেন। কারণ, হ্যাভেল-সাহেব ভারতীয় শিল্পের গূঢ় রহস্য ও অন্তরের কথা জানবার জন্য এ-সময় খুব ব্যগ্র ছিলেন। হ্যাভেলের লেখা ভারতীয় শিল্পের উপর বইগুলি পড়লে তাহা বুঝা যাবে। হ্যাভেল-সাহেব সিস্টারের নাম কোথাও উল্লেখ করেছেন কিনা জানিনা, কিন্তু তিনি ইন্ডিয়ান আর্টের উপর বইগুলি লেখার সময় ভারতীয় মনীষীদের সঙ্গে সদাই আলোচনা করতেন।"

একই পত্রের শেষে নন্দলাল লিখেছেন :

"সিস্টারের সঙ্গে হ্যাভেল, অবনবাবু, ওকাকুরা ও জগদীশ বসু প্রভৃতির শিল্পবিষয়ে আলোচনা হতো এবং সকলেই সিস্টারের আইডিয়া দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহা তাঁহাদের বই পড়িলেই বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ঐসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। একবার পদ্মায় বোটে করে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু ও সিস্টার বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আলোচনার বিষয় আমি কিছু জানিনা। তবে শুনেছি, [রবীন্দ্রনাথ] 'গোরা' উপন্যাসের hero গোরা সিস্টারকে মনে করে করেছিলেন।"[১৪]

হ্যাভেলের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয় কোন্ পরিস্থিতিতে হয়, হ্যাভেলের অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষাকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দেবার জন্য নিবেদিতা কোন্ উদ্দীপ্ত আবেগ বোধ

করেছিলেন, তা দেখতে পাই নিবেদিতার একটি চিঠিতে। শিল্প-আন্দোলন ইতিহাসের প্রথমে পর্বের মূল্যবান সংবাদ এখানে আছে। নিবেদিতা ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০২, মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, মিস হে (Miss Hay) তাঁকে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের অর্থাৎ হ্যাভেলের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। মিস হে ছিলেন শিল্পরসিক ; গ্রীসের অভিজ্ঞতার বিষয়ে তাঁকে বলরাম বসুর বাড়িতে বক্তৃতা করতে দেখা গেছে। নিবেদিতা ওই পত্রে লিখেছেন :

"মিস হে আমাকে এখানকার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেলেন। সেটা সফল ব্যাপার দাঁড়াল। ...অধ্যক্ষ ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে অসাধারণ সঠিক ধারণাসম্পন্ন ; স্কুলগুলি মন্দ ছাড়া ভালো করছে না, সরকার পুরো অন্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। উনি বললেন, 'কাউকে রেখা টানতে বা রঙ চড়াতে শেখাতে পারি, কিন্তু তাকে শিল্পী তৈরী করতে পারিনা, কিংবা জিনিয়াস বানাতে।' শুনেই মনে-মনে হেসে উঠলাম—অবোধ ! ও-কাজ আমি পারি।'

এর পরেই প্রেরণার প্রবাহের মতো নেমে এসেছিল শব্দধারা :

"আচ্ছা, ওরা এই ব্যাপারটি দেখছে না কেন ? দেশের প্রতি ভালবাসা—দেশবাসীর প্রতি ভালবাসা—কুলগৌরব—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা বিশ্বাস—ভারতের জন্য অদম্য ভাবাবেগ—এই সকলের দ্বারা শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম এবং প্রাণশক্তির এমন বন্যাতরঙ্গ জেগে উঠবে যে, কোনো মানুষের পক্ষে তাকে পিছু ফেরানো সম্ভব হবেনা। বুজ্রু মানুষের বদলে বীর—নকলনবিশের বদলে মৌলিক প্রতিভা— ...এ সকলই সৃষ্টি করা যায়—করতেই হবে।"

একই চিঠিতে আরও লিখেছেন :

"ভূমি ! ভূমি !—এবং ভূমিজাত সকল কিছুই ! সুবিশাল আরাধনা ও মধুরিমা নিয়ে অবস্থিত তপোমগ্ন অরণ্যানীকে আমি দেখেছি—দেখেছি মহাবিশ্বস্পর্শী মনীষাকে। একটি পরিধেয় শালের নির্মাণে, একটি পটের অঙ্গবিন্যাসে রয়েছে যে-মধুতা ও আস্বাদনের সুসংহত মর্যাদা—সে সকলই কি সম্পদরূপে রক্ষণীয় নয়, যা মানুষকে মহাশক্তিধর করে তুলবে ?"

এখান থেকেই নিবেদিতার যাত্রা শুরু হয়েছিল ভারতের কলামন্দির অভিমুখে। এবার তাঁর সহযাত্রী তাঁর বিদ্যালয়ের কয়েকটি বালিকামাত্র নয়—দেশের সৃষ্টিসমর্থ প্রতিভাবান শিল্পীরা এবং রসানুভূতিসম্পন্ন মনীষী লেখকেরা।

॥ ৫ ॥

সে কাহিনী বলার আগে তাঁর পত্রাবলীতে হ্যাভেল-প্রসঙ্গ দেখে নেওয়া যায়। নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন বলেছেন, শিল্পবিষয়ে হ্যাভেলের সঙ্গে নিবেদিতার নিয়মিত পত্রালাপ হতো। হ্যাভেলকে লেখা নিবেদিতার মাত্র চারটি চিঠি পেয়েছি ; অবশ্য তাদেরই মধ্যে উভয়ের আলাপ-আলোচনার চরিত্র কিছুটা বোঝা সম্ভব। অপর পক্ষে নিবেদিতাকে লেখা হ্যাভেলের কোনো চিঠিই পাইনি।

Kali The Mother.

The stars are blotted out.
Clouds are covering clouds.
It is darkness vibrant, sonant.
In the roaring whirling wind
Are the souls of a million lunatics,
Just loosed from the prison-house,
Wrenching trees by the root,
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky.
Scattering plagues & sorrows,
Dancing mad with joy,
Come, Mother, come!
For Terror is Thy name.
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er.
Thou "Time" the All-Destroyer!
Then come, O Mother, come!

Who dare misery love,
Hug the form of Death,
Dance in destruction's dance,—
To him the Mother comes.

Sept. 30th 1898.
V.

স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত কবিতা "কালী দি মাদার"-এর বিপুল প্রভাব নিবেদিতার জীবনে। কবিতাটির নিবেদিতা-কৃত অনুলিপি। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার সৌজন্যে।

The Ancient Abbey of Ajanta
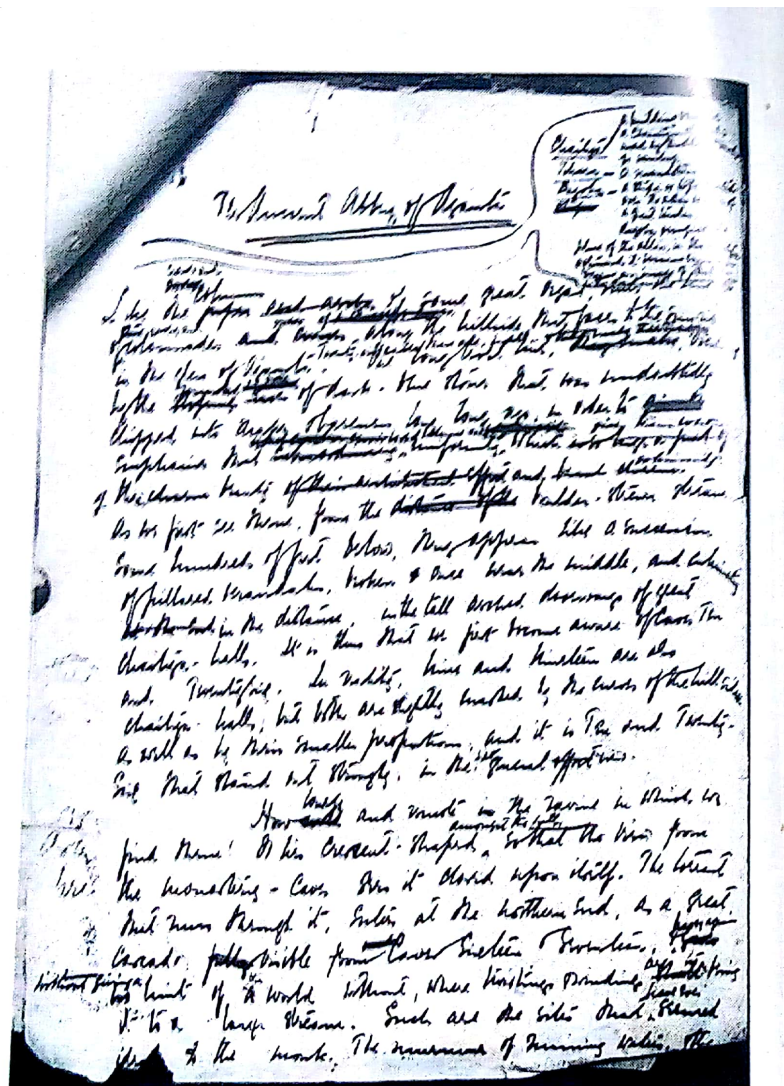
নিবেদিতার "দি এনসেন্ট অ্যাবী অব অজন্তা" প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি-চিত্র। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সংগ্রহ।
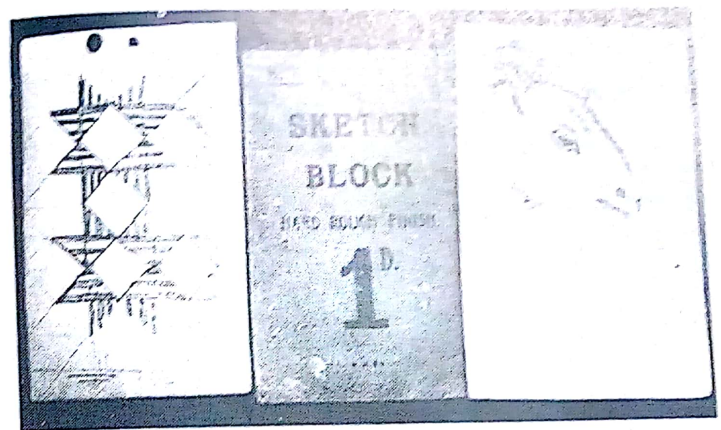
নিবেদিতার স্কেচ-বই। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সংগ্রহ।

নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আঁকা ছবি। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সংগ্রহ।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সদলে ভারতভ্রমণের উপরে নিবেদিতার লেখা "নোটস্ অব সাম ওয়ান্ডারিংস্ উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ" বইয়ে প্রচুর শিল্পপ্রসঙ্গ। পাণ্ডুলিপির অনেক পৃষ্ঠায় নিবেদিতা নকশা এঁকেছেন। তেমন দুই পৃষ্ঠা। ধীরাজ বসুর সৌজন্যে।

নন্দলাল-অঙ্কিত রেখাচিত্র—বাগবাজার বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার কক্ষে মেঝেয় নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সোফায় ও চেয়ারে যথাক্রমে নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন। রেখাচিত্রটি সম্বন্ধে নন্দলাল আলোচনা করেছেন।

নন্দলাল-অঙ্কিত। অবনীন্দ্রনাথের দক্ষিণের বারান্দায় সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ। কুমারস্বামীর সঙ্গে আলোচনারত নন্দলাল।
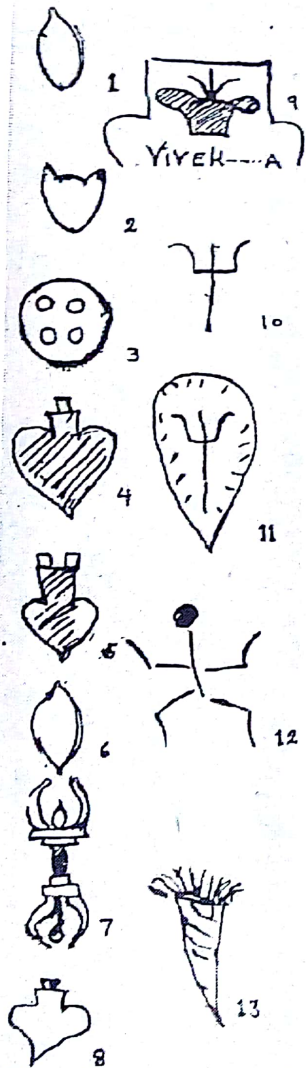
নিবেদিতা-পরিকল্পিত জাতীয় পুরস্কার—'বিবেকানন্দ মেড্যাল'। নিবেদিতার চিঠির মধ্যে তার বিভিন্ন রেখাচিত্র।
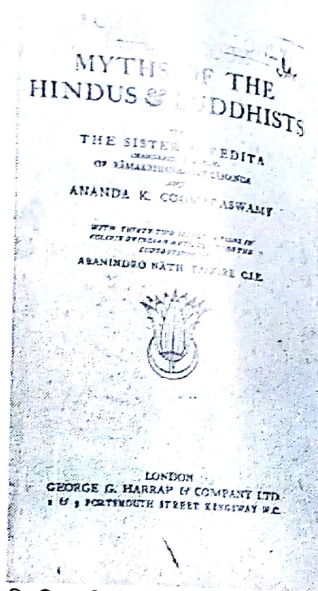
নিবেদিতা-পরিকল্পিত ও সূচিত অসমাপ্ত গ্রন্থ—যা শেষ করেন আনন্দ কুমারস্বামী। তার প্রচ্ছদ।
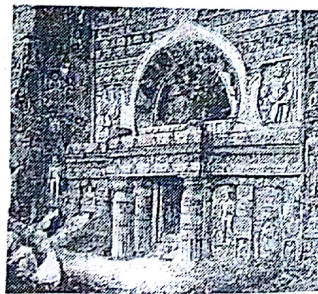
অজন্তা বিষয়ে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় নিবেদিতার প্রবন্ধে বিশেষ আলোচিত উনিশ নম্বর গুহার সম্মুখচিত্র।
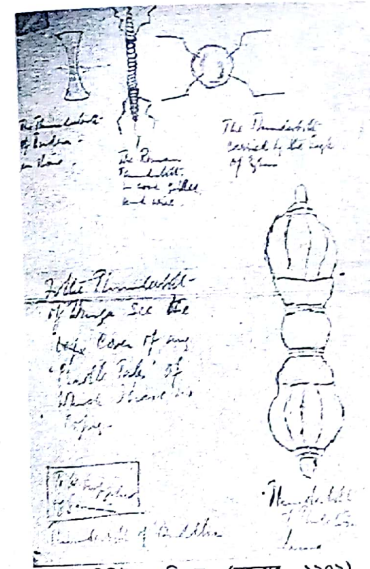
মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (নভেম্বর ১৯০৯) নিবেদিতার ছদ্মনামা প্রবন্ধে নানা দেশ ও কালের বজ্র-চিত্র। তার কিছু অংশের পাণ্ডুলিপি-চিত্র। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সংগ্রহ।

১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে প্রদর্শিত নিবেদিতা-পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা।
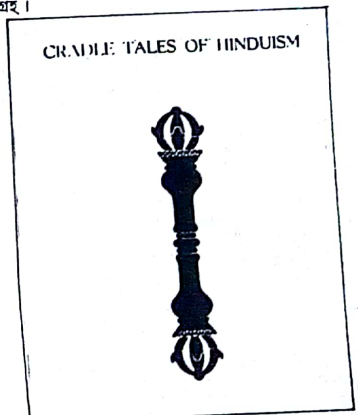
নিবেদিতার "ক্র্যাডল্ টেলস অব হিন্দুইজম্' বইয়ের অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদে বজ্র-চিত্র।
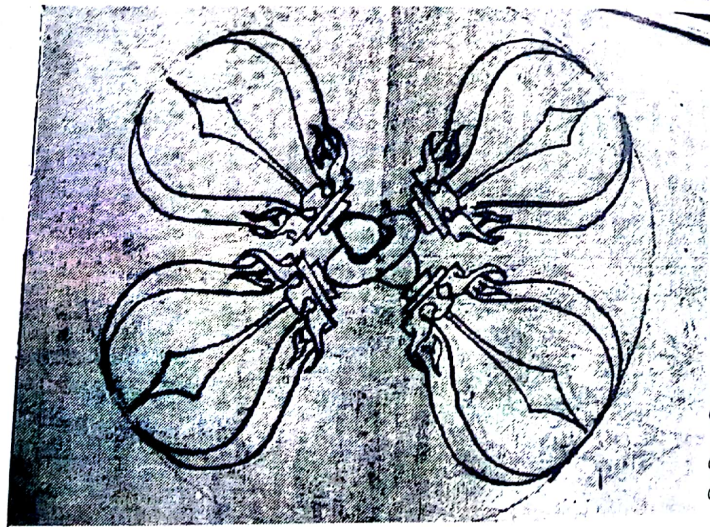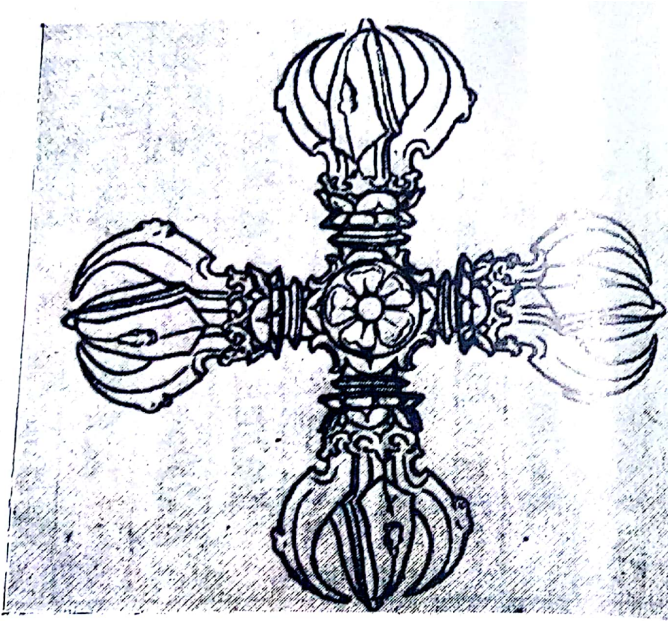
নিবেদিতা-অঙ্কিত বজ্র। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সংগ্রহ।

নিবেদিতা-অঙ্কিত বজ্র। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সংগ্রহ।

Lavender Gardens
Clapham Common.
March 13. 1908.

Dear Mr Havell

It is most cheering to find that you think anything of the Buddha-Siva image so sound. I quite agree that the subject is one on which I cannot possibly write, with my own hand. At the same time I cannot imagine that you wd. care to take it up, with the mass of material which will eventually have to be published, on the subject. I shall therefore be most grateful to you for anything you care to say, regarding it. And a statement of fuller and more detailed kind can be made later, by an Indian man. I am anxious that this particular sword should be drawn

হ্যাভেলকে লেখা নিবেদিতার চিঠি (১৩.৩.১৯০৮)। প্রসঙ্গ : লিঙ্গোপাসনার উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে নিবেদিতার নিজস্ব চিন্তার সূত্র আছে এই পত্রে।

in defence of the Faith, by the People themselves!

Let me try to put in form the points that I think you want –

There was an early phallic worship common to the whole primitive world – See the "Sacred Stone" in the Celtic museum at the Ashmolean in Oxford. A perfect black Siva. See Maypole. Egyptian Crux Ansata. + Indian ~~[illegible]~~ Siva. etc.

[illegible]

2. Some phallic significance [illegible] part of the [illegible] Hindu Aryans.

3. The Tope or Stupa of Buddhism was gradually anthropomorphised. From plain Stupa to Stupa with [illegible] N. S. E. and W.

4. This gradually, with many hesitations as to the direction to be chosen, gave place to the Four-Headed Stupa which we commonly call the Image of Brahma – & which Hindus frequently accept as such.

5. This form was adopted just in the

হ্যাভেলকে লেখা নিবেদিতার চিঠি (১৩.৩.১৯০৮)। প্রসঙ্গ : লিঙ্গোপাসনার উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে নিবেদিতার নিজস্ব চিন্তার সূত্র আছে এই পত্রে।

'Great God' of the Brahmins, & scholars, began to give place to the Hindu (i.e. more popular & democratic) conception of Siva, & Mahadev. This Siva was a clear & more [illegible] common mythologising of the [illegible] by Buddha [illegible] the memory of the People. Consequently the 4-headed image is sometimes called 'Brahma' & sometimes 'Mahadev'.

6. The Rajputs began to establish themselves in India at this time. & the 4 headed Mahadev is the commonest form of Siva in

Rajputana.

Gradually the heads became indistinguishable. The Great God was emblemed, not imaged. Of this period one finds rough & often shapeless stone work – the lower corners being almost always square –

At some subsequent period the form thus arrived at was identified with the primitive phallic symbol – the lower corner became round & the whole interpretation was taken over by students & theologians. But to the mass of the people the image is not consciously phallic even now. It is 'the Great God' still. They never notice the

হ্যাভেলকে লেখা নিবেদিতার চিঠি (১৩.৩.১৯০৮)। প্রসঙ্গ : লিঙ্গোপাসনার উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে নিবেদিতার নিজস্ব চিন্তার সূত্র আছে এই পত্রে।

fact that the particular image happens to be in this setting or that. Like the own experience "being washed in blood". The gross aspect of the thing conveys nothing to the ordinary mind at all. If you want any point elaborated, be [illegible] sweet. Mr. Shaw has not seen

Vincent Smith's article. But I know that his views regarding the individuality of Indian art grows and abound. There is a sentence in the Hibbert that shows it.

Yours ever
Nivedita. of R.K.V.

E. B. Havell Esq.
31 Acacia Road.
St. John's Wood.
N.W.

হ্যাভেলকে লেখা নিবেদিতার চিঠি (১৩.৩.১৯০৮)। প্রসঙ্গ : লিঙ্গোপাসনার উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে নিবেদিতার নিজস্ব চিন্তার সূত্র আছে এই পত্রে।

In the Library of Trinity College Dublin, I saw a beautiful little manuscript, on vellum, in [illegible] characters. Down each side ran a pattern in gold outlining & green & pink & blue. of leaves — Here & there was a little picture — It was about 3½ inches broad — closely written [illegible], 36 or 42 inches in length. The whole was mounted on rollers. Why should you not make such manuscripts? You might get others to do the writing. Perhaps

your wife & her sister could do it, with a little practice, & you could do the painting. [illegible] or Renunciation — or a chapter of the Gita — or some of Swamiji's wonderful Bengali about Woman. What? Do try. If you could make a few cards, with bits [illegible] illumination, I would try to see if I could get a market

শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে লেখা নিবেদিতার খণ্ডিত পত্র। সম্ভবত ৪ এপ্রিল ১৯০৯ তারিখে লেখা। প্রিয়নাথ-পুত্র তারানাথ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

for them in America before Christmas.

My love to all the ladies.

Ever your sister

Nivedita. of R.K.V.

I am so so pleased about Mr Blount. But do remember that everything takes time.

Babu Priyanath Sinha
13 Nikashipara Lane
Calcutta.
India. via Brindisi

শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে লেখা নিবেদিতার খণ্ডিত পত্র। সম্ভবত ৪ এপ্রিল ১৯০৯ তারিখে লেখা। প্রিয়নাথ-পুত্র তারানাথ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

7, St. Edmund's Terrace,
Regent's Park, N.W.

19.3.09.

My dear Sir,

I am very much obliged for your second very interesting letter and for your kind offer to send me Swami Vivekananda's book "My Master" which I shall be very pleased indeed to have.

I did not mean to suggest in my book that either the doctrine of Maya or Yoga philosophy were in themselves necessarily destructive to the creative faculties. What I meant was that such doctrines might be interpreted (either rightly or wrongly) in a sense inimical to artistic creation and they might have

প্রিয়নাথ সিংহকে লেখা হ্যাভেলের চিঠি (১৯.৩.১৯০৯)। এতে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ। সেইসঙ্গে, যোগদর্শন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার ক্ষতি করেছে কিনা, সেই প্রসঙ্গ। তারানাথ সিংহের সৌজন্যে।

প্রিয়নাথ সিংহকে লেখা হ্যাভেলের চিঠি (১৯.৩.১৯০৯)। এতে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ। সেইসঙ্গে, যোগদর্শন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে [illegible] করেছে কিনা, সেই প্রসঙ্গ। তারানাথ সিংহের সৌজন্যে।

বিভিন্ন পরিচিত মানুষকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে হ্যাভেলের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' বই সম্বন্ধে হ্যাভেলের মনোভাব নিবেদিতাকে খুশি করেছিল। বইটির রচনায় নিবেদিতার হাত থাকায় স্বভাবতই তিনি হ্যাভেলের অনুকূল মন্তব্যে আনন্দিত হন। ৯ এপ্রিল ১৯০৩, তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"টাইমস পত্রিকায় বইটির আলোচনা মোটামুটি ভালোই বলতে হবে ; তবে এখানে মিঃ হ্যাভেল যে-মন্তব্য করেছেন সেই আকারে অবশ্য ওটি ভালো নয়। তিনি বলেছেন, বইটি বহু রকমের সমস্যার উপর প্রচুর-প্রচুর আলোকপাত করেছে। মিঃ হ্যাভেলের ধারণা, স্যার জর্জ বার্ডউড বোধহয় [টাইমসে] আলোচনাটি লিখেছেন। সেক্ষেত্রে বুঝতেই পারা যায় তার মূল্য কত সামান্য।"

হ্যাভেলের আগমনের ও তাঁর সঙ্গে আলোচনার ফলে নিবেদিতা কত আনন্দিত, সে-বিষয়ে ২ জুলাই ১৯০৫, মিসেস বুলকে লিখেছেন :

"চিঠি লিখছি, ঠিক এখনি মিঃ হ্যাভেল দেখা করবার জন্য এসে হাজির। ফলে কতখানি বেশি ভালো লাগছে দেখে আমি অবাক। তাজা মন আর তাজা চিন্তার ধাক্কা আমরা চাই-ই।"

হ্যাভেলকে লেখা নিবেদিতার যে-কয়টি চিঠি পেয়েছি সেগুলিতে স্বতঃই শিল্পপ্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর ১৩-৩-১৯০৮ তারিখের চিঠির বক্তব্যের পটভূমিকায় আছে ১৯০০ প্যারিস কংগ্রেস স্বামীজীর কিছু বক্তব্য, যাতে তিনি শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে সাহেবগণের স্বচ্ছন্দগৃহীত প্রচলিত ধারণাকে কিছু মৌলিক যুক্তিতে নাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, "শিবলিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি অথর্ব বেদসংহিতার যূপস্তম্ভ থেকে।" অথর্বসংহিতায় এ-বিষয়ে কী আছে বলার পরে স্বামীজী বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধস্তূপের কথায় আসেন—এবং বলতে চান, ওই স্তূপ থেকে শিবলিঙ্গ আকারিত হয়েছে। পরে ব্যাপারটা বৌদ্ধ তান্ত্রিক কদাচারের সময়ে লিঙ্গোপাসনা দাঁড়ায়। "শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌনব্যাখ্যা ভারতবর্ষে অতি অবচীন এবং উক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘোর অবনতির সময়ে সংঘটিত হয়। ঐ সময়ের ঘোর বৌদ্ধতন্ত্রসকল এখনও নেপালে ও তিব্বতে খুব প্রচলিত।"[১৫]

স্বামীজীর বক্তব্য গ্রাহ্য কি গ্রাহ্য নয়, তা বিচারের ভার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতজনেরা গ্রহণ করতে পারেন। স্বামীজী অবশ্য পৃথিবীতে লিঙ্গোপাসনার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করেন নি, স্বীকার করেছেন, অবনতির যুগে শিবলিঙ্গ ভারতের কোনো-কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রচলিত অর্থে লিঙ্গোপাসনা দাঁড়িয়েছিল (যদিও অগণিত শিবপূজক ওই স্থূল ব্যাপারটির চিন্তায় কদাপি উদ্দীপ্ত ছিলনা !)। তাঁর বক্তব্য কেন্দ্রীভূত ছিল, ভারতবর্ষে শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি কিভাবে হয়, এবং কিভাবে তা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান আকারে পৌঁছেছে—সেই প্রসঙ্গেই।

স্বামীজী কেবল কতকগুলি চিন্তাসূত্র দিয়ে গিয়েছিলেন—তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রমাণ করার দায়বোধ করেছিলেন নিবেদিতা। কিন্তু বিষয়টি কোনো নারীর পক্ষে শোভন আলোচনার বস্তু নয়, (অন্তত সেকালের শিক্ষিত তবু অনগ্রসর নারীরা তাই মনে করতেন !!)—সে কথা নিবেদিতা হ্যাভেলকে লেখা উদ্দিষ্ট পত্রের (১৩-৩-১৯০৮) গোড়ায় লিখেছিলেন :

"এ কথা জেনে অতীব উল্লসিত—তুমি আমার বৌদ্ধ-শিব প্রতীক-তত্ত্বটিকে খুবই সুদৃঢ় মনে করো। আর আমি এও স্বীকার করি, বিষয়টি এমন যে, আমি নিজ নামে এ-সম্বন্ধে

লিখতে পারিনা।

"সেইসঙ্গে এ-কথাও ভাবতে পারছি না যে, বিষয়টির আলোচনার ভার তুমি তুলে নেবে, কেননা তার জন্য শেষ পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ তথ্য প্রকাশ করার দায় ঘাড়ে চাপবে। তবে এ-বিষয়ে তোমার মতামত পেলে খুবই কৃতজ্ঞ হব। খুঁটিনাটি তথ্যযুক্ত পূর্ণতর রচনা পরে কোনো ভারতীয় পুরুষ লিখতে পারবেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে স্বধর্মের মর্যাদারক্ষায় মানুষ তরবারি নিষ্কাশন করুক, আমি তারই জন্য উদ্‌গ্রীব।"

বিষয়টি নিয়ে নিবেদিতা আগেই সক্রিয় হয়েছিলেন। উল্লিখিত চিঠির প্রায় আট মাস আগে (২১-৭-১৯০৭) মিসেস বুলকে লেখেন :

"ভেবে দ্যাখো, ভাইপো [পরে স্বামী শঙ্করানন্দ] এবং একজন কুশলী ব্রহ্মচারীকে [গণেন্দ্রনাথ] আমি ফটোগ্রাফি-অভিযানে পাঠিয়েছি, উদ্দেশ্য—শিবলিঙ্গ যে, উদ্ভবকালে মোটেই লিঙ্গোপাসনার ব্যাপার ছিলনা—আমাদের এই থিয়োরীর পক্ষে তথ্যসংগ্রহের জন্য !!! দারুণ, নয় ? এর পরে বিষয়টি লিখে ফেলার আশা রাখি। তবে ভাইপোর নামেই মঠ থেকে লেখাটি যাবে—নারী হিসাবে এইসব ক্ষেত্রে প্রকাশ্য যুক্তিতর্কে নামা সঙ্গত হবেনা। তুমি খুশি হয়েছ তো ? এই সময়ে এই কাজে টাকাকড়ি খরচ করায় তুমি হয়ত অবাক হবে। কিন্তু এই মরসুমেই এটা সেরে ফেলতে হবে, নাহলে এর পরে ৬/৮ মাস আগে তা করা যাবেনা। যদি কাজটা করা যায় তাহলে আমরা হয়ে দাঁড়াব আমাদের ধর্মবিশ্বাসের দুর্গরক্ষী। স্বামীজী কি খুশি হবেন না ? শিব ! শিব !"

নিবেদিতা বিদ্যালয়ে উক্ত "ফোটোগ্রাফিক অভিযানের" কিছু সংগ্রহ রক্ষিত আছে।

হ্যাভেলকে পূর্বোক্ত ১৩-৩-১৯০৮-এর চিঠিতে নিবেদিতা তাঁর মূল সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তিগুলি তুলে ধরেন :

"তোমার কাজে লাগতে পারে এমন সূত্রগুলি আমি লিখে দেবার চেষ্টা করছি :

"১। আদিম পৃথিবীর সর্বত্রই এক ধরনের লিঙ্গোপাসনা ছিল। দ্রষ্টব্য, অক্সফোর্ডের অ্যাসমোলিয়াম-এ ক্রীট ধ্বংসাবশেষের অংশ 'পবিত্র প্রস্তর'—নিখুঁত এক কালো শিব। Maypole দ্যাখো—মিশরের Crux Ausata—আর তার সঙ্গে ভারতীয় শিব।

"আমি এই কথাও মনে করি, আমাদের ক্রুশও একই ধরনের স্মারকচিহ্ন, যার আদিম রূপ পরে উচ্চতর প্রতীকে পরিণত হয়েছে। [অক্সফোর্ডের খ্রীস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক অধ্যাপক টি কে চেনীর সঙ্গে এই বিষয়ে নিবেদিতা অনেকগুলি চিঠিতে আলোচনা করেছেন]। শিবমূর্তির সঙ্গে জড়িত 'লিঙ্গ' শব্দটি নিয়েই আমার অসুবিধা—যে-শব্দটির ব্যবহার অবশ্যই এড়িয়ে যাওয়া উচিত, সেকথা আমাকে বলা হয়েছে। আশা করি আমি দেখাতে পারব, দশম শতক পর্যন্ত শব্দটি ব্যবহৃত হতো না।

"২। এই লিঙ্গ-প্রতীক হিন্দু আর্যদের ধর্মোপাসনার অঙ্গ ছিলনা।

"৩। বৌদ্ধদের স্তূপ ক্রমে ঈশ্বরাবতারের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সাধারণ স্তূপের পরে এসেছে চার বুদ্ধযুক্ত স্তূপ—উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকে মূর্তিগুলি সংলগ্ন।

"৪। এই ক্রম-বিবর্তিত এবং কোন্ রূপ নেওয়া উচিত সে-বিষয়ে দ্বিধান্বিত ভাবনা গিয়ে পৌঁছয় চতুর্মুখযুক্ত স্তূপে—তাকে সাধারণত আমরা ব্রহ্মার মূর্তি বলি—এবং হিন্দুরা প্রায়শই সেইভাবে তাকে গ্রহণ করে।

"৫। এই আকারটি তখনই গৃহীত হলো যখন ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিতদের 'মহাদেব'—হিন্দু

লোকসাধারণের নিকট অধিকতর জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক শিব বা মহাদেবের ধারণার সঙ্গে মিশে গেল। জনগণের ভাবনায় বুদ্ধ যে-ছাপ রেখে গিয়েছিলেন, এই শিব তারই সুস্পষ্ট এবং মোটামুটি সচেতন পৌরাণিকীকরণ। ক্রমে এই চতুর্মুখ মূর্তি কখনো ব্রহ্মা, কখনো মহাদেব বলে কথিত হতে থাকেন।

"৬। এই সময়ে রাজপুতরা ভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে—আর চতুর্মুখ মহাদেব হলেন রাজপুতানায় শিবের সবচেয়ে প্রচলিত রূপ।

"৭। ক্রমে মুখগুলির প্রয়োজন রইল না। মূর্তির বদলে নিরাকার ঈশ্বর বিশুদ্ধ প্রতীক-রূপ পেলেন। এই যুগে অমসৃণ, প্রায়শই নির্দিষ্ট আকারহীন প্রস্তরাদি দেখা যায়, যার চারপাশে জলধারার গতিচিহ্ন প্রায় চৌকারূপের।

"৮। পরে কোনো এক সময়ে এই আকারটির সঙ্গে আদিম লিঙ্গ-প্রতীক মিশে যায়—জলধারাপথ গোলাকার ধারণ করে—এবং তান্ত্রিকরা এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করেন [জলধারা-রেখা যোনিচিহ্ন এবং বাকি বস্তু লিঙ্গ-প্রতীক]। কিন্তু বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে এখনো তা সচেতনভাবে লিঙ্গোপাসনা নয়। তা এখনো 'নিরাকার ঈশ্বর-প্রতীক'। এই বিশেষ প্রতীকটি কোথায় কিভাবে স্থাপিত, তা তারা কখনই ভাবনা-চিন্তার মধ্যে আনে না। যেমন আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত [খ্রীস্টীয়] ভাষা—'রক্তের দ্বারা স্নাত'—এই কথার স্থূল দিকটি সাধারণ খ্রীস্টানের মনের মধ্যে আসেই না।

"যদি এর কোনো অংশের অধিক ব্যাখ্যা চাও তাহলে দেখা সাক্ষাতের দরকার হবে। না, আমি ভিনসেন্ট স্মিথের প্রবন্ধটি পড়িনি। কিন্তু ভারতীয় শিল্পপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত উদ্ভট জানি। তাঁর 'ইতিহাস' বইয়ের কোনো একটি বাক্য থেকেই তা দেখা যায়।"

শেষপর্যন্ত নিবেদিতার চেষ্টার কী ফল দাঁড়িয়েছিল জানিনা। কিন্তু তাঁর পরবর্তী চিঠিপত্রের মধ্যে অনেকবারই প্রসঙ্গটি ঘুরে-ফিরে এসে গেছে। প্রশ্নটি 'ধর্ম-বিশ্বাসের দুর্গরক্ষার' সঙ্গে জড়িত বলে তাকে মন বা চেষ্টা থেকে সরাতে পারেন নি। হ্যাভেলকে ৬ জুলাই ১৯০৯ তারিখে লিখেছেন :

"আমেরিকা থাকাকালে পীবডি মিউজিয়ম কেমব্রিজ-এর অধ্যাপক পুটনাম আমাকে মেক্সিকোর চিত্রাবলীর এক স্পেনীয় বই দেখান—সেখানে দেখি যে, একটি মন্দিরের সামনে বাইরের দিকে শিবলিঙ্গের সামনে এক নারী পুত্রলাভের জন্য ধূপারতি করছে !! এখন এই বইটি মায়াসংস্কৃতির অন্তর্গত, যার মূল কোনো সন্দেহ না রেখে, মঙ্গোলীয়। আমি তাই প্রায় নিশ্চিত এই ধারণায় পৌঁছে গেছি, ভারতে বৌদ্ধস্তূপের পরিবর্তিত রূপের সঙ্গে লিঙ্গরূপ একীভূত হয়ে যায় রাজপুত অভিযানের পরে—আর এই বস্তু উৎসক্ষেত্রে মঙ্গোলীয় ছাড়া কিছু নয়। আমরা তো জানি, বৌদ্ধযুগ থেকে মুসলমান যুগ পর্যন্ত সময়ে ভারতবর্ষ চীনা ও মঙ্গোলীয় প্রভাবে ভর্তি ছিল। আমি আরও বলতে চাই, উক্ত দুই বস্তুর একীভূত হওয়ার ব্যাপারটা জনমনে এখনও পুরোপুরি স্বীকৃত নয়, কারণ তাদের কাছে শিব হলেন নিরাকার দেবতা।"

আরও বেশ কিছুদিন পরে ১ সেপ্টেম্বর ১৯১০ তারিখে র‍্যাটক্লিফকে লেখা এক চিঠিতে নিবেদিতা বলেছেন :

"শিবপূজা [ইতিহাস] নিয়ে খুব খাটছি। খুব চিত্তাকর্ষক বিষয়—ইতিহাসে ভরা। চিন্তার বিবর্তনকাহিনী—জনজীবন এবং আচার-ব্যবহারে সেই চিন্তার অভিব্যক্তি—এ কী যথার্থ ইতিহাস নয় ?"

একই তারিখে আর একটি চিঠিতে [প্রাপক অনির্ধারিত] তিনি বিষয়টিকে স্পষ্টতর আকারে তুলে ধরেছেন :

"এই সপ্তাহে সারদানন্দের সঙ্গে আমি কয়েক ঘন্টা শিব-ব্যাপার নিয়ে কাজ করেছি—তিনি সাহায্য করছেন। শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে, এই উপাসনাকে লিঙ্গোপাসনা বা কোনো অপবিত্র ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত করার প্রায় কোনো কারণই নেই। আমি ক্রমেই স্থিরবিশ্বাসে উপনীত যে, প্রতীকটি বৌদ্ধস্তূপের ধারাপথে উদ্ভিন্ন। জানো কি, মেয়েরা যখন পূজার জন্য মাটির ছোট-ছোট শিব গড়ে তখন তারা প্রথমে তাকে একটি ছোট গোল মাটির উপরে স্থাপন করে, যাকে তারা বজ্র বলে ? তারপরে পূজাকালে প্রথম কাজ হলো ওই বজ্রটিকে সরিয়ে ফেলা। এটি অদ্ভুত ব্যাপার। [জগদীশ] বসুর মনে আছে, তার ঠাকুরমা খুবই এ-জিনিস করতেন। এই অপূর্ব ব্যাপারটি উপলব্ধি করা উচিত, 'বজ্র' শব্দটি কত বেশি 'বুদ্ধ' শব্দের বদলে ব্যবহার করা হয়। তাহলে দেখছ, হিন্দুধর্মের ইতিহাসের বিষয়ে কিছু করার আশা রাখছিই ! তা সত্যই করতে পারলে স্বামীজী কত না খুশি হবেন।"

॥ ৬ ॥

শিল্প থেকে কিছুটা প্রত্নতত্ত্ব এসে গিয়েছিল। তবে শিল্পের ইতিহাসভিত্তি নির্মাণের কালে প্রত্নতত্ত্বের অনিবার্য আগমন ঘটেই—হ্যাভেলের গ্রন্থাদিতে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। হ্যাভেলকে লেখা নিবেদিতার ৩ মার্চ ১৯১০ তারিখের চিঠির মধ্যে ভারতীয় শিল্পগরিমা বিষয়ে কিছু গুরুতর বিতর্কের প্রসঙ্গ আছে। এই বিতর্কে অংশগ্রহণকারীরা অবশ্য ভারতীয় নন—পাশ্চাত্যের মানুষ।

বিতর্কের পটভূমিকা এই : স্যার জর্জ বার্ডউডের সভাপতিত্বে হ্যাভেল ভারতের শিল্প-প্রশাসন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। সেই সভায় বার্ডউড শিল্পজগতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে কিছু অরুচিকর মন্তব্য করেন। সে মন্তব্য খাঁটি জনবৃষধর্মী। ১৩ জানুয়ারি ১৯১০ তারিখে প্রদত্ত সেই বক্তৃতার বিবরণ পত্রযোগে হ্যাভেল পাঠিয়ে দেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতা পূর্বোক্ত ৩ মার্চ তারিখে ১৭ বোসপাড়া লেন বাগবাজার থেকে হ্যাভেলকে লেখেন :

"তোমার চিঠি এবং সেইসঙ্গে জার্নাল অফ দি সোসাইটি অফ আর্টসের যে-সংখ্যা পাঠিয়েছ, সেজন্য ধন্যবাদ। স্যার জি বি [জর্জ বার্ডউড] লোকটা ডাহা শঠ। তবে জানলাম যে, ওয়ালটার ক্রেন ও অন্য দু'একজন তাঁর ধারণাদি থেকে খোলাখুলি সরে দাঁড়িয়েছেন। উত্তম। গোটা ভবিষ্যৎ কিন্তু তোমারই হাতে। ...সাম্প্রতিক প্রদর্শনী সর্বাধিক সফল। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের কল্পনাধর্মিতা বিষয়ে তুমি যা-যা বলেছ তা ৪০ কি ৫০টি মোটামুটি ভালো শিল্প-নির্দশন প্রদর্শনীতে একত্র উপস্থিত করা মাত্র হয়ে যাবে একেবারে প্রমাণীকৃত। নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, ভারতের ইতিহাস বিষয়ে প্রতিদিনই আমার জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটছে এবং তাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাও। বুদ্ধ-বিষয়ে বলবে বার্ডউড !!!!—যে-বুদ্ধমূর্তি মানব-ইতিহাসে সম্ভবত মহত্তম প্রতীক ! ওই বুড়ো ইউরেশিয়ানের মন অপেক্ষা বহুগুণে উদারতর মনই কেবল জগৎ সম্বন্ধে সহানুভূতি ও বোধের নবভূমির দ্বার খুলে দিতে কিংবা সেখানে স্বয়ং প্রবেশ করতে সমর্থ। ওঁর অবশ্য কারুশিল্প উপভোগের যথেষ্ট রুচি আছে ; আর অম্লরসাক্ত ভঙ্গিতে যা লেখেন তাতে মনে হয়, তাঁর আলোচনায় রয়েছে যেন প্রতিভার ছাপ। কিন্তু সেখানেই শেষ। ওঁর সবটাই ওপর-ওপর। যথার্থ কাজ করতে পারে যে-বিরাট বুদ্ধি ও হৃদয়, মন ও প্রেম—সে-সকলের

উপলব্ধি উনি এবং উনি-মার্কাদের সাধ্যে নেই।"

তন্ত্রসাধনা ইত্যাদি নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে হাভেলের মাথায় গণ্ডগোল হয়, এবং তাঁকে ১৯০৬-এর জানুয়ারি মাসে ছুটি নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে হয়। নিবেদিতা একাধিকবার চিঠিতে এই নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। (র‍্যাটক্লিফকে লেখা ৬-৭-১৯১০, এবং ১৯/২০-৭-১৯১০-এর চিঠি)। কিন্তু হ্যাভেল সাময়িক মানসিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে, ইংলন্ডে অবস্থানকালে ভারতীয় শিল্পের মর্যাদারক্ষায় অসাধারণ কাজ ক'রে গেছেন। স্মরণ রাখতে হবে, তাঁর সেরা বইগুলি ইংলন্ডে অবস্থানকালেই লেখা। হ্যাভেল সভা-সমিতিতে প্রবন্ধপাঠ ক'রে, আলোচনায় অংশ নিয়ে, ভারতীয় শিল্পের অযথা নিন্দার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, যেভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন, তার বরেণ্য রূপকে নিবেদিতা অভিনন্দিত করেন ৭-৪-১৯১০ তারিখের চিঠিতে :

"আমরা সকলেই আপনার দারুণ লড়াইয়ে আনন্দিত। তা বিশেষভাবে বুঝলাম 'টাইমস্' পত্রিকায় পাঠানো ম্যানিফেস্টো অবশেষে আমার কাছে পৌঁছানোর পরে। ভারতীয় শিল্পের পক্ষে আপনি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাচ্ছেন। এখন তো দেখছি, এখানকার চাকরি থেকে আপনার অবসরগ্রহণ কিভাবে বিরাট একটা কাজ করার সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আপনার পরে যিনি [আর্ট স্কুলে] কার্যভার নিয়েছেন [পার্সি ব্রাউন] তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং গুণ সম্বন্ধে তারিফ করার কিছু আছে, এমন বলতে পারিনা। অবশ্য চূড়ান্ত মন্দ-কিছু যদি শেষপর্যন্ত ঘটেই তাহলে টেগোরদের পক্ষে [শিল্প] আন্দোলনকে সরকারী আওতা থেকে সরিয়ে আনা সবসময়েই সম্ভব। খুবই ভাগ্যের কথা, এই টেগোর-কুল যুগপৎ শক্তিশালী ও উৎসাহী।"

এইকালে নিবেদিতার শিল্পবিষয়ে কথাবার্তার মধ্যে ঘুরে-ফিরে ভাস্কর্যের প্রসঙ্গ এসেছেই, কারণ বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে বার্ডউডের স্থূল মন্তব্য তাঁর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। একই চিঠিতে হ্যাভেলকে লিখেছেন :

"'ভারতীয় শিল্পের আদর্শ এবং দর্শন'—শুনেই মন কেড়ে নিচ্ছে। [ধরে নিতে পারি, হ্যাভেল ওই বিষয়ে গ্রন্থরচনার কথা জানিয়েছিলেন[১৬]]। প্রতিবার এলিফ্যান্টা ও এলুরার দর্শনের সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে মুসলমান-পূর্ব হিন্দু ভাস্কর্য সম্বন্ধে বিস্ময় সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা গভীরতর হয়েছে। গ্রুন্ভেল যে বলেছেন, হিন্দুরা খাঁটি ভাস্কর্যের রূপায়ণে অসমর্থ ('বুদ্ধ আর্ট ইন ইন্ডিয়া', পৃ. ৩০)—এই কথার কী-যে মাথা-মুণ্ডু—ধরতেই পারছি না। যেহেতু এই মূর্তিগুলি পাথরের গায়ে লাগানো—সেইজন্যই তারা রিলিফ !!!! তাছাড়া, শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যা জানি শুধু তাই হলো বেদবাক্য—আর অন্য দেশের মানুষদের ভিন্ন শিল্পাদর্শ মানে আদর্শচ্যুতি ?? ইচ্ছা হয়, তোমার সঙ্গে একত্র বসে প্রতি লাইন ধরে, প্রতি পৃষ্ঠা ধরে, গ্রুন্ভেলের লেখা পড়ি।"

একই চিঠিতে পুনশ্চ বার্ডউড প্রসঙ্গ :

"আমি সর্বদা ভেবেছি এবং বলেছি যে, বার্ডউড শক্তিশালী আমলার বেশিকিছু নন। সেই ধারণার পটভূমিকাতেও—বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে তাঁর উক্তি বর্বরাধিক বর্বরের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য। আমি এইটেই বলতে চাই—এমনকি তাঁর কাছ থেকে ও-রকম নিরেট-গবেট কথা আশা করিনি।"

নিবেদিতার জীবন, কার্যাবলী এবং রচনাদির সঙ্গে স্বল্প পরিচয় আছে এমন মানুষও

জানেন, নিবেদিতার মনোজীবনে বুদ্ধের কোন্ স্থান। শিব-বুদ্ধ-বিবেকানন্দ নিয়েই তাঁর জগৎ। সেখানে বুদ্ধ-বিষয়ে বার্ডউডের অশালীন মন্তব্য তাঁর কাছে পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মাতামাতি। বুদ্ধ তাঁর কাছে কী ছিলেন, তার এক টুকরো রূপ দেখে নেওয়া যায় মিসেস বুলকে লেখা ২ জুলাই ১৯০৫ চিঠির অংশ থেকে :

"আমার ডেস্কের উপরে ছোট্ট বুদ্ধমূর্তিটি। দেখছি আর ভাবছি—কী প্রশান্তভাবে সমাসীন—শুধু তিনি—চিন্তার মহাদেশে অভিযাত্রী—চিরযাত্রী—উর্ধ্বে, আরও উর্ধ্বে—নিঃসঙ্গ। আবেগের স্নায়ুকেন্দ্রে স্থাপিত তাঁর হাত—কিন্তু কোনো কাঁপন নেই তাতে। যে-সমুদ্রে নাবিক তিনি সেখানে দুর্বলতার তরঙ্গদোলা তাঁকে বিচলিত করেনা—তিনি একাকী—অনন্তে।"

লন্ডনের পূর্বোক্ত সভার তথ্যাদি কলকাতায় পৌঁছানোর পরে মর্ডার্ন রিভিউ পত্রিকায় মে ১৯১০ সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ দীর্ঘ বিবরণ বেরিয়েছিল—তাতে বার্ডউডের মন্তব্যের প্রতিবাদে ইংলন্ডের শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিকদের পত্র, তৎসহ লন্ডন টাইমসের শিল্পসমালোচকের মন্তব্য সংকলিত ছিল। বিষয় ও রচনারীতির বিচারে মর্ডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য যে নিবেদিতারই লেখা তা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়। সেই রচনা এই :

"২৩ ফেব্রুয়ারি লন্ডন টাইমস-এ এই মন্তব্যসংলগ্ন পত্রটি বেরিয়েছে। সে পত্র আমাদের দেশের কিছু বয়স্ক মানুষকে ধাক্কা দেবে, যাঁদের মনে এই শুভ বিশ্বাস বদ্ধমূল—ভারতীয় শিল্পের কোনো নিন্দুক সমালোচক নেই, বিশেষত যখন স্যার জর্জ বার্ডউডের মতো কিছু একনিষ্ঠ ও প্রাণোত্তপ্ত ইউরোপীয় ভারতপ্রেমিক আছেন। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের বিচারক ও প্রচারক হিসাবে স্যার জর্জের বিরাট খ্যাতি কোন্ শিথিল ভিত্তির উপরে স্থাপিত, তা নিম্নের অংশে রীতিমতো প্রকট। এক্ষেত্রে অন্য কারো তুলনায় আমাদের লজ্জাই বেশি, কারণ আমরা অতীব স্বচ্ছন্দে তাঁর উক্ত খ্যাতিকে বরণ করেছিলাম, অথচ তাঁর ভারতীয় শিল্পপ্রেম আসলে কিঞ্চিৎ ভদ্রতার পিঠ-চাপড়ানি বই কিছু নয়—তার মূলে কোনো গভীর সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা নেই। স্যার জর্জ বার্ডউডকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই—তিনি পূর্বেও যা, পরেও তাই। দোষ আমাদেরই—আমরা তাঁর অতীত কার্যকলাপকে গভীরে বুঝবার চেষ্টা করিনি।

"আমাদের প্রাচীন শিল্পের প্রতি মিঃ ঈ বি হ্যাভেলের অনুরাগের মূলে এই দেশের ধর্মভাবনা সম্বন্ধে ঐকান্তিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা—তার চরিত্র আলাদা। ইনি বা এঁর মতো অনুভূতিশালী ইউরোপীয়রাই বৃহত্তম পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে আমাদের শিল্পকে ব্যাখ্যা করার যোগ্য—কেননা এঁরা ওই কাজ করার ছুতো ধরে নাম-যশ জোগাড় করার তালে নেই। আমাদের যথার্থ বন্ধুদের কণ্ঠস্বর আমাদের বিবেকবোধকে এই সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে—আর দেরী নয়, আমাদের সভ্যতা ও তার সৃষ্টিসমূহের সমর্থনে আমাদেরই দাঁড়াতে হবে—অন্য কারো ধার আমরা ধারি না।"[১৭]

মর্ডার্ন রিভিউ-এর এই মন্তব্যের পরে উদ্ধৃত ছিল ইংলন্ডের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী ও শিল্পবেত্তার একটি খোলা চিঠি, যেটি তাঁরা লন্ডন টাইমস-এ পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠিকে নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে বিশ্বশিল্পবেত্তাদের 'ম্যানিফেস্টো' নামে চিহ্নিত করেছিলেন। ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের মহিমার স্বীকৃতিযুক্ত এই লেখাটি দেখিয়ে

দেয়—চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে অন্তত হ্যাভেল এবং নিবেদিতা নিঃসঙ্গ ছিলেন না। মূল্যবান পত্রটি অনুবাদে এই :

"মহাশয়, ৪ ফেব্রুয়ারির রয়াল সোসাইটি অফ আর্টস-এর জার্নালে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, স্যার জর্জ বার্ডউডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এক সভায় মিঃ ঈ বি হ্যাভেল 'ভারতে শিল্প-প্রশাসন' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পড়েছিলেন। স্যার জর্জ বার্ডউড সেই সভায় নিম্নের মন্তব্য করেন :

'...ইদানীং এমন-সব কথা শোনা যাচ্ছে যে, ভারতে, হিন্দু-ভারতে, এক নির্দিষ্ট রূপবিশিষ্ট, বিশেষ চারিত্র ও অভিব্যক্তিযুক্ত চারুশিল্প আছে, যা বহির্বস্তুর সাহায্য নিয়ে আমাদের অন্তর্গহনস্থিত আদর্শের আকুল অব্যাহত উপলব্ধি ঘটিয়ে দেব। আমি কিন্তু আমার ৭৮ বৎসরের ভারতীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা বলতে পারি, এখনো পর্যন্ত তার দৃষ্টান্ত দেখিনি। এইসকল প্রতীকধর্মী মূর্তিগুলি (সভায় ব্রহ্মণ্য ব্রোঞ্জ শিল্পের ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হয়েছিল) শিল্পসম্মতভাবে সৃষ্ট হয়নি—এসব পুরোপুরি রীতিশাসিত সৃষ্টি। ...কোনো যথার্থ শিল্পীর চোখে এরা প্রধানত ব্রোঞ্জ অথবা পিত্তলনির্মিত যান্ত্রিক সৃষ্টি, এবং নিছক সস্তা নকলনবিশি। ...আমার বাম পাশের এই-যে বুদ্ধমূর্তির ছবিটি—ভারতীয় কলাশিল্পের দৃষ্টান্তরূপে এটিকে স্থাপন করা হয়েছে। অনাদিকাল থেকে সেই-যে একই আকার চলে আসছে, এখানে তার অর্থহীন সমরূপতা দেখছি। এগুলি প্রাণহীন পিত্তলমূর্তি ছাড়া কিছু নয়—শূন্য, ভাবহীন, মিটমিটে চোখে হাতের বুড়ো আঙুল, হাঁটু ও পায়ের ডগার দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই। সুইট পুডিং [জন্তুর সিদ্ধ চর্বি দিয়ে তৈরী পুডিং] তো একই প্রকার বাসনাশূন্য পবিত্রতা এবং আত্মার প্রশান্তি বোঝাতে পারে।'

"আমরা—নিম্নে স্বাক্ষরকারী শিল্পী, সমালোচক এবং শিল্পচর্চাকারীগণ—ভারতের চারু ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ ও পুনরুত্থানের জন্য স্যার জর্জ বার্ডউডের মূল্যবান কার্যাবলীর কৃতিত্ব যেমন স্বীকার করি, তেমনি অপরপক্ষে তাঁর সদ্য-উল্লিখিত সমালোচনা যে, ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের শিল্পপ্রেমিকদের মধ্যে বলবৎ ধারণারূপে ভারত ও বিশ্বের অন্যত্র প্রচারিত হবে—এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারকেও স্বীকার করতে পারিনা। ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠাংশে ভারতের জনগণের ধর্মীয় আবেগ এবং ঐশ্বরিক বিষয়ে গভীরতম চিন্তাসমূহের সমুচ্চ প্রকাশ দেখতে পাই। বুদ্ধ-ধরনের পবিত্র মূর্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রেরণার অন্যতম সৃষ্টি বলেই আমরা মনে করি। আমাদের মতে, ভারতে যে-ধরনের স্বতন্ত্র, জীবন্ত এবং শক্তিশালী শিল্পধারা বহমান আছে, তা ভারতীয় জনগণের অমূল্য সম্পদ—সে বস্তুকে তাঁদের পক্ষে—এবং এক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্বকে যাঁরা মর্যাদাদান ক'রে থাকেন তাঁদের পক্ষেও—পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে রক্ষা করা উচিত। বিশেষ এক ধারাবাহিক রীতির যান্ত্রিক অনুকৃতির যেমন আমরা বিরোধী, তেমনি আমাদের মতে, ধারাবাহী জাতীয় শিল্পের অবয়ব থেকে সৃষ্ট শিল্পের মধ্যে আছে যথার্থ প্রগতির পথ। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এক্ষেত্রে আমরা পাশ্চাত্ত্যের বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞের মত প্রকাশ করছি। তারই জোরে আমরা ভারতের শিল্পী-ভ্রাতৃগণ ও শিল্প-ছাত্রদের বলতে পারি—ভারতের জাতীয় শিল্পধারা, যার মধ্যে এখনো প্রাণশক্তি আছে, যা ভারতীয় জীবন ও চিন্তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে, তা যতক্ষণ স্ব-সত্তা বজায় রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত কদাপি আমাদের সমাদর ও সহানুভূতি

আকর্ষণে ব্যর্থ হবেনা। আমাদের বিশ্বাস, বিদেশীয় সূত্রে প্রাপ্ত যেসব বস্তুকে স্বাস্থ্যকরভাবে আত্মসাৎ করা যায় সেগুলিকে যেমন উপেক্ষা করা উচিত নয়, তেমনি যেন দেশের ভূগোল এবং ইতিহাস থেকে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত বিশেষ চরিত্রধর্মকে সযত্নে রক্ষা করা হয়—সেইসঙ্গে রক্ষা করা হয় সুপ্রাচীন সুগভীর ধর্মীয় ভাবনাসমূহকে, যা কেবল ভারতের নয় সমগ্র প্রাচ্য-পৃথিবীর গৌরবের আকর। ইতি—

ফ্রেডরিখ ব্রাউন, ওয়াল্টার ক্রেন, জর্জ ফ্রামটন, লরেন্স হাউসম্যান, ই ল্যানটেরি, ডব্লিউ আর লেথাবি, হ্যালসে রিকার্ডো, টি ডব্লিউ রোলেস্টন, ডব্লিউ রোদেনস্টাইন, জর্জ ডব্লিউ রাসেল (এ. ই.), ডব্লিউ রেহোল্ডস্ স্টিফেনস্, চার্লস ওয়াল্ডস্টিন, এমেরি ওয়াকার।

"বিশিষ্ট শিল্পী ও সমালোচকদের দ্বারা স্বাক্ষরিত" উপরের পত্রটি বেরুবার পরদিনই টাইমস পত্রিকায় তার শিল্পসমালোচকের এক বিস্তৃত রচনা প্রকাশিত হয়—তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথা যেমন ছিল, তেমনি কোন্ ভূমিতে উভয়পক্ষীয় শিল্পধারণা মিলিত হতে পারে তার বিবেচনাসম্মত নির্দেশও ছিল। সুলিখিত এই রচনায় উপরের পত্রটির বক্তব্যকেই মূলে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছিল। বার্ডউডের মন্তব্যকে লেখক সমর্থন করেন নি। তবে একথাও বলেছেন: "অধিকাংশ বুদ্ধমূর্তি বেশিরভাগ ইউরোপীয়ের কাছে এই ধরনের [অর্থাৎ বার্ডউড-ধরনের] মনোভাব সৃষ্টি করে, তাতে সন্দেহ নেই।" ফলে যে-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তাকে "চিত্তাকর্ষক" বলে চিহ্নিত ক'রে লেখক বলেন, "এই বিতর্ক থেকে শিল্প সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধারণার বিরাট পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। সেই পার্থক্য এখন যেভাবে দেখা যাচ্ছে, আগে বোধহয় তেমন দেখা যায়নি।" এর পরে লেখক যা বলেছেন, তাকে একেবারে বিবেকানন্দের মুখের কথা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়:

"এখনকার দিনে সকল ইউরোপীয়ই তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী শিল্পরচনা করতে গেলে উদ্দিষ্ট বস্তুরই হুবহু রূপায়ণ আকাঙ্ক্ষা করেন। কোনো মানুষের মূর্তির ক্ষেত্রে তাঁরা চান—সেটি যেন ওই মানুষটির হুবহু চেহারা হয়—আর তা পেলে তো সর্বসিদ্ধি। প্রাচ্যের মানুষ সচরাচর এমন দাবি করেন না। তাঁরা হয়ত বলবেন, চারপাশে তো এত জ্যান্ত মানুষ ঘোরাফেরা করছে—তাদের নকল করার কী দরকার? ভাবাদর্শকে প্রকাশ করছে, এমন মূর্তিই তিনি চাইবেন। তাঁদের প্রত্যাশা, শিল্প এমন কিছুর ব্যঞ্জনা আনুক যা মানুষের মধ্যে আপাতত নেই, বা রয়েছে অসম্পূর্ণ মাত্রায়। এইক্ষেত্রে তাঁরা নিশ্চয়ই ইউরোপীয়দের অপেক্ষা অধিক যুক্তিবাদী। শিল্পের মূল উদ্দেশ্য যদি হয় কল্পলোক নির্মাণ, তাহলে সেই সৃষ্টির ক্রীড়াক্ষেত্রে নিছক অনুকরণাত্মক শিল্প সদ্‌বস্তুর মাপে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর জিনিস।"

টাইমসের শিল্প-সমালোচক এর পরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পদৃষ্টির স্বাভাবিক পতনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রাচ্য শিল্পীরা প্রতীকধর্মকে এমন স্বচ্ছন্দে সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করেন যে, শিল্পীর পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিসত্তার প্রকাশের কঠিন সাধনার কথা ভুলে যান, অপরদিকে পাশ্চাত্য শিল্পীরাও তা ভুলে যান বাস্তবানুকরণের একগুঁয়ে চেষ্টায়। "একদিকে পাচ্ছি, স্যার জর্জ বার্ডউড-কথিত প্রাণহীন পিত্তল মূর্তিগুলি, অন্যদিকে নিছক ফটোগ্রাফ-মার্কা পোর্ট্রেট। উভয়ই সমপরিমাণে অশৈল্পিক, কারণ তারা ভাবপ্রকাশে

সমপরিমাণে অসমর্থ।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পীদের এই ধরনের ত্রুটির মূলে রয়েছে, জনসাধারণের অযৌক্তিক দাবির কাছে বশ্যতা স্বীকারের প্রবণতা ইত্যাদি। এই লেখক শেষপর্যন্ত শিল্পের মূল লক্ষ্য যে ভাবপ্রকাশ—এই কথাটাকেই দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। এই 'ভাবপ্রকাশ' ব্যাপারটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প সমভূমি লাভ করতে পারে। "ভাবপ্রকাশের মধ্যে এমন প্রবল শক্তি আছে যা প্রথারীতির বন্ধন এবং বাস্তবানুকরণের বন্ধনকে অতিক্রম করতে সমর্থ।".

টাইমস পত্রিকার এই শিল্পসমালোচকের কিছু কিছু উক্তিতে নিবেদিতার ভাবনার প্রতিধ্বনি পাই। উক্ত লেখক বলবার চেষ্টা করেছেন, ঐহিক জীবনের সাফল্য পাশ্চাত্য জীবন থেকে সরিয়ে দিচ্ছে চেতনার শক্তিকে। সেখানে জমা হচ্ছে কেবল সম্পদ, বিলাস, অপচয় এবং জড়বাদী স্থূলতা। তার পরিবর্তে ইনি চেয়েছেন আদর্শ ও ত্যাগ। "আসুক দারিদ্র্য, সংগ্রাম, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা। এসকলই আমাদের শেখাবে সৃষ্টির আসল অর্থ। টাকায় কোনো জাতির আসল জয় নেই, তা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায়, সাহসে, আয়ত্ত করার শক্তিতে, পৌরুষে, সহ্যগুণে—এবং সত্যের গভীর উৎস থেকে বারি আহরণ ক'রে তা মানবসমাজকে দান করার সামর্থ্যে।" এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে ভারত-শিল্পের ভূমিকা কী হবে? টাইমস-এর লেখক বলেছেন:

"আমাদের সামনে যে-মহাযুগ বর্তমান রয়েছে তারই প্রয়োজনে ভারতীয় শিল্পকে যাচাই ক'রে নিতে হবে। ভারত নামক গুরুতর বস্তুটিকে প্রকাশ করতে হবে ভারতীয় শিল্পকে—উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তিতে—আর তার দ্বারা ভারতীয় শিল্প মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করার যোগ্য হয়ে উঠবে।"

॥ ৭ ॥

উনিশ-শো আট সালের নভেম্বরে বেরুল হ্যাভেলের বিখ্যাত গ্রন্থ "ইন্ডিয়ান স্কালপ্‌চার অ্যান্ড পেন্টিং"। ভারতীয় শিল্পের বিজয়ঘোষণার মতো এই গ্রন্থটি নিবেদিতাকে আনন্দে আত্মহারা ক'রে দেয়। ১৯০৯, মে মাসে নিবেদিতা ইংলন্ডে আছেন। প্যারিসের প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী নাগরিক জেরাল্ড নোবেলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল (জেরাল্ড নোবেল—মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু, বিবেকানন্দের গুণগ্রাহী; পুলিশের নজর এড়াতে নিবেদিতা যখন ফরাসি চন্দননগরে থাকার পরিকল্পনা করেন তখন এঁর সাহায্য নেবার কথা ভেবেছিলেন)—এঁকে ৬ মে তারিখে লেখেন:

"আহা, আপনি যখন এসেছিলেন তখন আমি বাড়িতে থাকলে আমার বন্ধু মিঃ হ্যাভেলের লেখা নতুন বইটি দেখাতে পারতাম—জন মারে কর্তৃক প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান স্কালপ্‌চার অ্যান্ড পেন্টিং'—দাম তিন পাউন্ড তিন শিলিঙ; চমৎকার সব ছবিতে ভর্তি—দেখলে আপনার মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যেত, আপনি বিশ্বাস করতে প্রণোদিত হতেন যে, এখনো আধুনিক ভারতে নতুন পথে চালিত অসাধারণ শিল্পপ্রেরণা থাকা সম্ভব।"

হ্যাভেল তাঁর বই নিবেদিতাকে পাঠিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে একটি "মনোরম চিঠি"। যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিবেদিতা ৬ জুলাই ১৯০৯ তারিখের পত্রে উক্ত "অপূর্ব বইটি" সম্বন্ধে লেখেন:

"আপনাকে উপযুক্তভাবে অভিনন্দিত করবার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা। মাথায় নানা প্রশ্ন উপচে পড়ছে, সেসব সময়মতো আপনাকে করা যাবে—কিন্তু আগে তো সমাদর—প্রশস্তি। ঠিক এই বইটিই আমরা চাইছিলাম। এখানে পাচ্ছি, স্বচ্ছন্দে পাঠযোগ্য

প্রামাণ্য বিবরণ, যথেষ্ট চিত্র-সমন্বিত—যার সাহায্যে যোগ্য ব্যক্তিরা ভারতীয় শিল্পের মনোদার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তার সম্মুখীন হতে পারেন।"

নিবেদিতা নিবেদিতাই। সুতরাং 'মাথায় উপচে-পড়া' বহু প্রশ্নের কিছুটা পত্রমধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন না—হতে পারে কখনো ?

"আপনার বইটি হল এ-জাতীয় প্রথম প্রয়াস—সহজেই বোঝা যায়, ভবিষ্যতে শত-শত অনুসরণকারী দেখা যাবে—কারণ এই গ্রন্থ উন্মুক্ত ক'রে দেবে বিচার-বিতর্কের এক যুগকে।"

নিবেদিতা অনেকগুলি প্রশ্ন ও মন্তব্য করলেন। তারানাথ থেকে যেসব উদ্ধৃতি হ্যাভেল দিয়েছেন সেগুলি 'অপূর্ব'। তিব্বতী লেখকটির স্টাইল কী আধুনিক! মগধের সব চৈত্যের নাম হ্যাভেল দেননি, সেইগুলি প্রয়োজন। প্রয়োজন—ওয়াড্ডেলের আবিষ্কারের প্রামাণ্য বিবরণ ইত্যাদি। 'পুরাতন পশ্চিম ভারতীয় শিল্পকলা', 'পূর্ব ভারতীয় শিল্পকলা', 'মধ্যদেশীয় শিল্পকলা'—এই ধরনের শিল্প-যুগবিন্যাসের কথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল বলে হ্যাভেল লিখেছেন। সেইসূত্রে নিবেদিতা বললেন—এদের সঙ্গে তুলনায় লিমব্রিয়া, টাসকানি ও ভেনিসের ধারাগুলির স্বাতন্ত্র্যের সঠিক প্রকৃতি হ্যাভেল নির্ণয় করেন নি, সেই ধারাগুলি কী আকারে এখনো বহমান, তাও বলেন নি। এসব বিষয়ে কিছু সংশোধনী মন্তব্য নিবেদিতা করেছিলেনই।

যে-বই নিবেদিতাকে এত খুশি করেছিল, যে বইকে শিক্ষিত-সাধারণের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব তিনি বোধ করেন—বইটি সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় :

1. Indian Sculpture and Painting (Oct. 1909).
2. Havell on Hindu Sculpture (Nov. 1909).
3. Havell on Indian Painting (Dec. 1909).

প্রথম প্রবন্ধটির আরম্ভ এই বাক্য দিয়ে :

"ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য লেখকের কলম থেকে এই প্রথম একটি বই পেলাম যার পৃষ্ঠাগুলির সর্বত্র ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জনগণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও প্রীতির মনোভাব প্রকাশিত আছে।"

এর পরে প্রবন্ধ তিনটিতে নিবেদিতা হ্যাভেলের বক্তব্য উৎকলন করার সঙ্গে, নিজের বক্তব্য জুড়ে দিয়ে, যে-চমৎকার আলোচনা করেছিলেন, তার সব কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। তবে দেখা যায়, ভারতশিল্পে গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের অতিরঞ্জিত দাবির খণ্ডনে হ্যাভেল যা বলেছিলেন, তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নিবেদিতা ব্যাখ্যা করেছেন। (এ প্রসঙ্গ পরে আসবে)। অপরদিকে তিনি পাশ্চাত্ত্যশিল্পের উপরে ভারতের প্রভাব প্রসঙ্গে হ্যাভেলের বক্তব্য তুলে ধরতে ভোলেন নি :

"ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব কেবল বাইজান্টীয় শিল্পেই সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয় তাই নয়, তা সমভাবে লক্ষণীয় মধ্যযুগের গথিক গির্জাগুলিতেও। এশিয়ার সভ্যতার উপরে পাশ্চাত্ত্য শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব বিষয়ে সবিশেষ আলোচনায় ইউরোপ খুবই তৎপর, কিন্তু তার নিজের ধর্ম ও সভ্যতার উপরে যে এশিয়ার ধর্ম, সংস্কৃতি ও চিন্তার বহুগুণ অধিক প্রভাব রয়েছে সে বিষয়ে সঠিক মূল্যায়নে তার আগ্রহ কদাচিৎ দেখা গেছে।"

এই সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে নেওয়া যায়।

সর্বপ্রাচীন গ্রীক শিল্পের উপরে প্রাচ্যপ্রভাবের কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের পরশিষ্টে প্রদত্ত তাঁর ডায়েরি নোটের মধ্যে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে পুনশ্চ লুভার দেখার পরে তিনি লিখেছেন : "[লুভার] মিউজিয়ম দেখে গ্রীককলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম।" এই তিন অবস্থার প্রথম অবস্থার সময় হলো প্রাচীন অজ্ঞাতকাল থেকে ৭৭৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই প্রথম পর্বকে বলা হয় গ্রীসের 'মিসেনি' শিল্পের কাল। এই পর্বের উপর প্রাচ্যপ্রভাব সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন, "[গ্রীসের] আচেনি রাজ্য, সন্নিহিত রাজ্যে অধিকার বিস্তার করেছিল, আর সেইসঙ্গে ওইসকল দ্বীপে প্রচলিত, এশিয়া হতে গৃহীত সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এইরূপে গ্রীসে প্রথম কলাবিদ্যার আবির্ভাব।"

স্বামীজী কিন্তু "প্রধানত এশিয়া-শিল্পের অনুকরণে ব্যাপৃত" ওইকালীন মিসেনি-শিল্পকে খাঁটি গ্রীক শিল্প বলতে চাননি। যথার্থ গ্রীক শিল্পের সূচনা হয় যখন তা "এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ ক'রে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ-চেষ্টা" আরম্ভ করেছিল। সেই পরবর্তী হেলেনিক-পর্বের মধ্যেই স্বামীজী খাঁটি গ্রীক শিল্পবিকাশ দেখেছেন। হেলেনিক পর্বের দ্বিতীয় পর্যায় 'ক্লাসিক গ্রীক শিল্প' নামে চিহ্নিত। এই হল গৌরবযুগ, যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন ফিডিয়াস, স্কোপাস, প্র্যাক্সিটেলেস এবং পলিক্লেটস ও লিসিপাস। "মহাশিল্পী ফিডিয়াস" সম্বন্ধে স্বামীজী এক ফরাসি পণ্ডিতের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন : "[তাঁর সৃষ্ট] অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবেরগৌরব যাহা কোনোকালে মানবমনে আপন অধিকার হারাইবে না।" গ্রীক শিল্পের একেবারে শেষ পর্বের বিষয়ে স্বামীজীর অনুরাগহীন মন্তব্য : "রোমানদের গ্রীস অধিকার সময়ে গ্রীক শিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব-পূর্ব শিল্পীদের কার্যের নকলমাত্র করেই সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে হুবহু কোনো লোকের মুখ নকল করা।"

স্বামীজীর ডায়েরি-নোট থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, তিনি সবসময়ে স্বাধীন আত্মবিকাশের পক্ষে। তাই প্রাচ্যভাবের অধীন গ্রীক শিল্প তাঁর দৃষ্টিতে বড়-কিছু নয়—তা প্রাচ্যভাব ত্যাগ করার পরেই নিজ মহিমা অর্জন করেছে। বাইরের ভাব গ্রহণের বিরোধী তিনি নন, কিন্তু সে প্রভাব যাতে জাতীয় প্রবণতাকে উৎপাটিত না করে, সে বিষয়ে সজাগ। ফিডিয়াসের রচনার মধ্যে স্বাধীন বিকাশ দেখে যেমন প্রশস্তি করেছেন, তেমনি বিতৃষ্ণাযুক্ত মন্তব্য করেছেন রোমক যুগের অনুকরণাত্মক গ্রীক শিল্পের। ক্লাসিক গ্রীক শিল্পযুগ সম্বন্ধে জনৈক ফরাসি শিল্পবেত্তার যে-মন্তব্য উৎকলন করেছেন তার মধ্যেই তাঁর মনোভাব প্রকাশিত। উক্ত ফরাসি শিল্পবেত্তা বলেছেন : "ক্লাসিক গ্রীক শিল্প চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোনো দেশের কলাবন্ধনই স্বীকার করে নাই, বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে-কালে নির্মিত হইয়াছিল—কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই চিন্তা করি ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিষেধের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীকশিল্প সজীব হইয়া ওঠে।"

বৌদ্ধযুগের অত্যুন্নত ভারতীয় শিল্প, তার প্রভাবে বোরবুদুরের মহিমান্বিত ভাস্কর্য এবং অজন্তার চিত্রকলা, যা ভারতের ধারাবাহী চিত্রকলারই এক পরম বিকশিত রূপ—এসকল কথাই নিবেদিতা হ্যাভেলের গ্রন্থসূত্রে বলেছিলেন। ভারতশিল্প বিষয়ে প্রথম পর্বের পাশ্চাত্ত্য আলোচকদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "প্রত্নতত্ত্ব বা সাহিত্যের লেজুড় হিসাবে কলাশিল্পের অনুশীলন করা চলেনা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিল্প—শিল্পই। তার

বিচার সেইভাবেই করতে হবে।"

হ্যাভেল কেবল প্রাচীন ভারতশিল্পের তত্ত্ব-তাৎপর্য, শোভা-সৌন্দর্য বিশ্লেষণেই নিবৃত্ত থাকেন নি, আধুনিক ভারতের শিল্পসৃষ্টিতেও মনোযোগী। হ্যাভেল যে, রিভাইভ্যালিস্টদের অতীত-রোমন্থনের অলস সুখে বুঁদ হননি, সেইজন্যই তিনি নিবেদিতার শ্রদ্ধেয় :

"তিনি [হ্যাভেল] ভারতের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতকে অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখেছেন। যাঁরা একদা নির্মাণ করেছেন দুর্গ ও স্তূপ, প্রাসাদ ও মন্দির, সেই ভারতবাসীরা বেঁচে আছেন, একই প্রকার সৃষ্টিতে তাঁরা সমর্থ—হ্যাঁ, যদি তার প্রয়োজন আসে এবং উপযুক্ত সুযোগ ঘটে।"

কিন্তু এই নতুন শিল্পের প্রতিনিধি অনুকরণসর্বস্ব রবিবর্মা নন। ইউরোপের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেদিতা বলেছেন, একথা সত্য নয় যে, ইউরোপের সকল চারুশিল্পের যথার্থ ও একমাত্র লক্ষ্য—বাস্তবানুকৃতি। "অলিম্পাসে জিউস ও মিকেলাঞ্জেলোর মোজেস বাস্তবের নকল নয়।" কিন্তু তিনি একথা অস্বীকার করতে পারেন নি—"এখনকার ইউরোপে বাস্তবানুকৃতিই সর্বপ্রকার চারুশিল্পের ক্ষেত্রে একমাত্র যথার্থ লক্ষ্য বলে সাধারণ ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে।" নিবেদিতা এইসঙ্গে যোগ করেছেন, "ইউরোপীয় শিল্পের এই আধুনিক প্রত্যয় ভারতবর্ষে রবিবর্মা ও তাঁর অনুগামীরা আঁকড়ে ধরেছেন।"

ভারতীয় শিল্প থেমে যায়নি, রবিবর্মাই শেষ কথা নন, অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে তার নববিস্তার ঘটেছে—হ্যাভেলের গ্রন্থ আলোচনার শেষে এই ছিল নিবেদিতার বক্তব্য। মুঘল শিল্প উৎকৃষ্ট ; দরবারী মুঘল শিল্পের রসগ্রহণে ও তাকে নিজ শিল্পে প্রকাশে সমর্থ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ওমর খৈয়ামের ছবির সঙ্গে মুঘল প্রতিকৃতির পার্থক্য কম নয়। নানা ভাব ও রসপায়ী অবনীন্দ্রনাথ যে, সৃষ্টিক্ষেত্রে নিজ ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে পারতেন, সে সম্বন্ধে নিবেদিতার তুলনামূলক আলোচনা :

"মুঘল চিত্রকলা এবং আধুনিক রীতির চিত্রকলার সাদৃশ্য ও পার্থক্য সাদীর প্রতিকৃতির সঙ্গে মিঃ টেগোরের ওমর খৈয়াম চিত্রের তুলনা করলে যত সহজে বোঝা যাবে এমন আর কিছুতে নয়।

"মুঘল প্রতিকৃতিতে যথার্থতা ও কল্পনার অনবদ্য রূপ। আধুনিক শিল্পী কিন্তু তাঁর দ্বারা চিত্রিত ব্যক্তির মানসিক ভাবমণ্ডল উন্মোচন করতেই সচেষ্ট। ছাতের উপরে সূর্যোদয়ের সময়ে বসে-থাকা একটি মানুষের ছবি তিনি এমনভাবে এঁকেছেন যে, আমরা যেন ওই মানুষটিকে তাঁর স্বপ্নলোকের মধ্যে অনুসরণ করবার সুযোগ পর্যন্ত পেয়ে যাই।

"সাদীও কবি : বই হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ; মুখে সঘন ভাবনা—তাঁকে এইভাবেই আঁকা হয়েছে। কিন্তু [অবনীন্দ্রনাথের] ওমর যেন বিগলিত হয়ে গেছেন তাঁর জাগর স্বপ্নের মধ্যে।

"অতি কঠিন নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকে-থাকা হয়ত প্রাচীন শিল্পীদের দোষ। আর আধুনিকদের ত্রুটি হলো—কোমলতা এবং ভাবাবেগের আতিশয্য—যা কখনো-কখনো দুর্বলতার ধার ঘেঁষে যায়।"

হ্যাভেলের গ্রন্থ সম্বন্ধে রচনাগুলিতে নিবেদিতা শিল্পের, বিশেষত ভারতীয় শিল্পের মৌল আদর্শ নিয়ে অনেক গভীর কথা বলেছেন। এই সূত্রে হ্যাভেলের যে-কথাগুলি তিনি উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলি বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনিময়—তা উপস্থিত করেই প্রসঙ্গ শেষ করব। হ্যাভেল লিখেছেন :

"দেবতার রূপনির্মাণে প্রয়াসী হয়ে ভারতীয় শিল্পী যখন দেবমূর্তির কটি ও নিম্নোদরকে কৃশ ক'রে নির্মাণ করেন, এবং অবয়বঘটিত খুঁটিনাটি বাস্তবতাকে পরিহার করেন...তখন ইউরোপ বলতে চায়—ভারতীয়রা শরীরসংস্থান বিষয়ে দুঃখজনকভাবে অজ্ঞ। ...কিন্তু ভারতীয় শিল্পী তখন যথার্থত রচনা করছেন বিষয়বস্তুর উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর রূপ ; ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন—আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে কেবল পৌঁছানো যায়...পার্থিব আকর্ষণ পরিহার ও পার্থিব বাসনা দমনের দ্বারা।"

হ্যাভেলের আরও কিছু বিবেকানন্দীয় উক্তি :

"পাশ্চাত্ত্য শিল্প যেন তার নিজের পাখা ছেঁটে দিয়ে বসে আছে ; তা কেবল পার্থিব সৌন্দর্যকেই চিনেছে। ভারতীয় শিল্প মুক্তপথে দ্যুলোকে উড্ডীন হয়ে সর্বদাই চেষ্টা করেছে সেখানকার কিছু বস্তুকে মর্ত্যসীমায় নামিয়ে আনতে।"

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ "Centenary: Government College Art and Craft, Calcutta", (1964), Ch. "History of the Govt, College of Art and Craft," (p. 22), by Jogesh Chandra Bagal.

২ এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র বাগল আর্ট স্কুলের পূর্বোক্ত ইতিহাসে যা লিখেছেন সংকলন করা যায় (পৃ. ৩৮-৩৯) :

"এই পর্বে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের বিশিষ্ট ছাত্রদের বিষয়ে অল্পকিছু বলে নিতে পারি। পাঠশেষে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে কয়েক বৎসর শিল্পকাজ করতে থাকেন। তাঁদের কেউ কেউ গোটা ভারত, এমনকি বহির্ভারতের, প্রাচ্যশিল্পের সন্ধান ও সংগ্রহের কাজে গমন করেন। ...নব শিল্পের ঐকান্তিক ও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১১ সালে তিনি প্রথমত অসিতকুমার হালদার, তারপরে নন্দলাল বসু (উভয়ই কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র) ও 'বিচিত্রা'-র সুরেন্দ্রনাথ করের সাহায্যে বিশ্বভারতী কলাভবন সংগঠন করেন। কলাভবন থেকে এই নব শিল্পের শিক্ষকগণ গেছেন সারা দেশের নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, এমন কি সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়েও। অসিতকুমার হালদার 'লখনৌ স্কুল অব আর্ট'-এর অধ্যক্ষরূপে এবং সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত লাহোরের 'মেয়ো স্কুল অব আর্ট'-এর অধ্যক্ষরূপে ওই সকল প্রদেশে এই নব শিল্পকে সর্ববিষয়ে প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জয়পুর আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষরূপে শৈলেন্দ্রনাথ দে একই কাজ করেছেন। বিখ্যাত 'অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা' অধ্যক্ষরূপে পেয়েছিল প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে—যিনি প্রথমে ছিলেন কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে, পরে অবনীন্দ্রনাথের সোসাইটির ছাত্র। যামিনীরঞ্জন রায় (যামিনী রায় নামেই অধিক পরিচিত) এবং যতীন্দ্রকুমার সেন সম্বন্ধে বলা যায়, তাঁরা নিজেরাই এক-একটি 'প্রতিষ্ঠান'। যামিনী রায় এদেশের লোকশিল্পের ধারাগুলির প্রধান একটি ধারা—এতাবৎ অবহেলিত পটশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এদেশে কমার্শিয়াল আর্ট-এর ক্ষেত্রে যতীন্দ্রকুমার সেনের অবিস্মরণীয় দান। অবনীন্দ্রনাথের এক প্রিয় শিষ্য মহীশূরের কে. বেঙ্কটাপ্পা তাঁর গোটা প্রদেশে প্রাচ্যশিল্পকে জনপ্রিয় করতে প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। বাঙ্গালোর ছিল তাঁর কেন্দ্র। কলকাতায় অবস্থিত মাতৃ-প্রতিষ্ঠান আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই সকল ছাত্ররা নব্য ভারতীয় শিল্পের দীপালোককে নিয়ে গেছেন সর্বত্র—এখনো যাচ্ছেন।"

৩ হ্যাভেলের প্রথম 'বৃহৎ' বই **Indian Sculpture and Painting** (১৯০৮)। তবে এটি একেবারে প্রথম বই নয়। এর আগে লিখেছেন, **Beneras, the Sacred City: Sketches of Hindu Life and Religion (1905) ; Monograph on Stone Carving in Bengal (1906) ; Hand Book to Agra and the Taj (1907)**। পরে বেরিয়েছে—**Ideals of Indian Art (1911); Indian Architecture, Its Psychology, Structure and History (1913); The Ancient and Mediaeval Architecture of India (1915)**।

এ ছাড়া পুস্তিকা জাতীয় আরও কিছু বই তাঁর আছে এবং ভারত-ইতিহাসের উপরে বইও।

৪ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্বামী বিবেকানন্দ : পেট্রিয়ট প্রফেট' (১৯৫৪), পৃ. ৩১১।

৫ বৈদ্য বিষয়ে কথাগল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণের। তিনি বলেছিলেন, তিন ধরনের বৈদ্য আছে—উত্তম, মধ্যম ও অধম। অধম বৈদ্য রোগীকে ওষুধ দিয়েই চলে যান। মধ্যম বৈদ্য ওষুধ খাবার জন্য অনুরোধ করেন। আর উত্তম বৈদ্য যখন দেখেন যে, অনুরোধে ফল হচ্ছেনা তখন রোগীর বুকে হাঁটু নিয়ে ওষুধ খাইয়ে দেন।

৬ বাণী ও রচনা, ৯—১৮৬-৯২।

৭ যোগেশচন্দ্র বাগল, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ১৪-১৫। স্মর্তব্য, গিলার্ডি ছিলেন ইতালীয় শিল্পী, ইংরেজ নন। যতদূর জানি, হ্যাভেলও মূলে ইংরেজ নন।

৮ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ই. বী. হ্যাভেল", প্রবাসী, মাঘ ১৩৪১।

৯ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জোড়াসাঁকোর ধারে', অবনীন্দ্র রচনাবলী, ১ম, পৃ. ২৫৮।

১০ ঐ, পৃ. ৩০৮-০৯।

১১ ১৯০২-০৩ দিল্লী প্রদর্শনীর সরকারী ক্যাটালগ 'ইণ্ডিয়ান আর্ট অ্যাট দিল্লী'-র মধ্যে (এই প্রদর্শনীর ডিরেক্টর ছিলেন স্যার জর্জ ওয়াট; বর্ণনার অংশ লেখেন সহ-ডিরেক্টর পার্সি ব্রাউন) অবনীন্দ্রনাথের 'শাজাহানের মৃত্যু' ছবির বিষয়ে লেখা হয়:

'The best of the three was no doubt the one entitled 'The Last Days (hours) of Shah Jahan', and represented two figures in a marble columned 'Imumbara', the one with a very natural turn of the head gazing across the water the 'Taj Mahal'. The foreshortening of the head of the figure was one of the most striking parts of the picture— The delicate colouring and soft effect of the whole composition was most pleasing." (Jogesh Ch. Bagal, p. 27).

উপরের ছবির সমালোচনা নিবেদিতাও করেছেন। গতানুগতিক সমালোচনার সঙ্গে প্রতিভাস্পৃষ্ট রচনার কোন্ পার্থক্য, তা পরে আমরা নিবেদিতার রচনার উল্লেখকালে দেখব।

১২ E. B. Havell, 'Some Notes On Indian Pictorial Art', The Studio (London), Oct. 15, 1902.

১৩ 'জোড়াসাঁকোর ধারে', অবনীন্দ্র রচনাবলী, ১ম, পৃ. ৩০৭।

১৪ বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, 'শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্প-দীপঙ্কর নন্দলাল' (১৯৬১), পৃ. ২৪, ২৮।

বিজ্ঞান বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের কাজে নিবেদিতার যেমন সহায়তা ছিল তেমনি তাঁরা ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের কল্পনায় মিলিত ছিলেন। নিবেদিতা শিল্প-আন্দোলনে যেভাবে সাহায্য করেছেন, জগদীশচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হওয়ায়, তাঁর পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তিনি গোটা ব্যাপারটির সঙ্গে মানসিকভাবে জড়িত ছিলেন; এবং নিবেদিতার সাহচর্যের কারণে এ-বিষয়ে সদাসচেতন না থেকে উপায় ছিলনা। বসু বিজ্ঞানমন্দির থেকে প্রকাশিত বসুর শতবার্ষিকী স্মারক বইয়ে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রমুখের বিশেষ পরিচয়ের কথা আছে। ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় নিবেদিতা, কুমারস্বামী, র‍্যাটক্লিফ প্রভৃতির সঙ্গে বসুও শিল্পালোচনায় যোগ দিয়েছেন, এমন তথ্য পেয়েছি। বসুবিজ্ঞান মন্দির উদ্‌ঘাটনের পরে 'বেঙ্গলী'তে প্রকাশিত বিবরণে আছে—"মহিমাব্যঞ্জক ভবন,...যা সম্পূর্ণত প্রস্তরনির্মিত; অতি সুন্দর শিল্পকল্পনায় সমৃদ্ধ।...অলঙ্করণগুলি প্রতীকধর্মী, পুরাকালোচিত মহৈশ্বর্যে সুগভীর।" বসুবিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন-ভাষণে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন—"এ কেবল বিজ্ঞানাগার নয়, এ হলো মন্দির।" সেই কথার সূত্র টেনে বসুর শতবার্ষিকী সুভেনিরে (সম্পাদক অমল হোম) বলা হয়েছে: "সত্যই মন্দির—এমনকি যদি আপাদমস্তক স্থাপত্যের দিক দিয়েও বিচার করা যায়—অজন্তার কথাই মনে পড়বে—কেন্দ্রে আছে সূর্যদেবতার রিলিফ, তিনি রথোপরি আবির্ভূত—তমসা ছিন্ন ক'রে নবজীবন সঞ্চারের জন্য। এক কার্নিসের নীচে নন্দলালের এক শ্রেষ্ঠ রচনা—'মনীষা' ও 'কল্পনা'র মিলনের প্রতীকমূর্তি। অনাবিষ্কৃত সত্যের সন্ধানী বৈজ্ঞানিক-মনে এই উভয় বস্তুর সহযোগ থাকে।" এই বইয়ে আমরা পেয়েছি, বিজ্ঞানমন্দিরের সংলগ্ন বসুভবনে বৌদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধস্তূপ এবং হরপ্পার কিছু প্রত্নবস্তু আছে। এদের অনেকগুলিই নিবেদিতার সঙ্গে ভ্রমণকালে সংগৃহীত হয়েছিল। বসুর ড্রইংরুমে নন্দলাল বসু-কৃত মহাভারতের চিত্রাবলী রয়েছে। এখানে স্মর্তব্য, আর্টস্কুলে বসুর সঙ্গে একদিন নিবেদিতা গিয়েছিলেন—সেখানেই নন্দলালের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা। বসু যে নব্যভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের অনুরাগী সমর্থক ছিলেন তাও জেনেছি শতবার্ষিকী সুভেনির থেকে। তার চেয়ে বড়ো কথা, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের বিজ্ঞানমন্দির অলঙ্কৃত করার জন্য তিনি আহ্বান করেছিলেন।

'ভারতশিল্পী নন্দলাল' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (পৃ. ৪৩৩-৩৭) বসুভবন ও বিজ্ঞানমন্দিরে নন্দলালের শিল্পকার্য করার অনেক সংবাদ আছে। নন্দলাল জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বিবরণ দিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র তাঁকে মহাভারত থেকে ছবি আঁকার আইডিয়া দিতেন, মহাভারতের কর্ণ ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। বসুভবনে ফ্রেস্কো করার ব্যাপারে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের উদ্যোগ ছিল। দীর্ঘ প্যানেলে নন্দলাল মহাভারতের নানা দৃশ্যের ছবি আঁকেন। সেই সঙ্গে "মোট চারটে অজন্তার প্যানেল করলেন সুরেন।" তা ছাড়া বিজ্ঞানমন্দিরের সভাগৃহে নন্দলালের করা 'উদিত সবিতা' আছে, যার কথা আগেই বলেছি। প্যাট্রিক গেডেসের জন্য করা নন্দলালের "কল্পনা ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রার" কথাও উল্লিখিত আছে। বিজ্ঞানমন্দিরের জন্য নিবেদিতার রিলিফ নন্দলালই করেছেন, এ-কথাও এখানে পাই।

কুমুদবন্ধু সেন জগদীশচন্দ্রের মুখে নিবেদিতা সম্বন্ধে যেসব কথা শুনেছিলেন, তার মধ্যে শিল্পপ্রসঙ্গ আছে। জগদীশচন্দ্র তাঁকে বলেছেন: "...নিবেদিতা প্রতিভাশালিনী নারীদের মধ্যেও অনেক উচুতে।...নানা বিষয়িনী বিদ্যায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়া।...তাঁর সঙ্গে গঙ্গার তীরে যেতে যেতে দেখতুম, তিনি একটুকরো পাথর, একটা পুতুল, একটা জীর্ণ ভাঙা মন্দির দেখে আনন্দ-বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। এমনই ভালবাসতেন, তিনি এই দেশকে। তাঁর মতো দৃষ্টি, তাঁর মতো সৌন্দর্যবোধ, তাঁর মতো গভীর স্বদেশপ্রেম, তাঁর মতো শিল্পীমন, আমাদের দেশে কারো নেই।...দধীচির মতো আত্মবলিদান, উমার মতো তপস্যা, যা পুরাণে বা কাব্যে বর্ণনা করেছে—তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি।" (উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯)।

১৫ বাণী ও রচনা, ৬—৪৮-৪৯।

১৬ বইটি সম্ভবত হ্যাভেলের ১৯১১ সালে প্রকাশিত 'Ideals of Indian Art.'

১৭ Modern Review, May 1910, "Eastern Art Makes Events in the West" (Notes).

সংযোজন

ঈ বি হ্যাভেলকে লেখা অবনীন্দ্রনাথের চিঠি

পত্রগুলির সম্বোধনে ছিল, 'Dear Mr Havell', এবং স্বাক্ষরের জায়গায়, 'Yours sincerely' বা 'Yours faithfully'। আমি ওই অংশগুলি বাদ দিয়েছি।

পত্রের ভাষা কোনো কোনো জায়গায় অস্পষ্ট। পাঠোদ্ধারেও ত্রুটি থাকতে পারে।

পত্রগুলির প্রতিলিপি প্রয়াত সোমেন্দ্রনাথ বসু 'টেগোর রিসার্চ সোসাইটি'-র সংগ্রহ থেকে আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

শিল্প-আন্দোলনের ইতিহাসে পত্রগুলির মূল্য আছে।

২০-১-১৯০৯, চিঠিতে পাই: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হ্যাভেলকে তাঁর শেষ বইয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে সভা করেছে। তিন ঘণ্টার সেই বৃহৎ সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি; উপস্থিত ছিলেন পার্সি ব্রাউন। এই ধরনের মানপত্র সাহিত্য পরিষদ আগে কাউকে অর্পণ করেনি। অবনীন্দ্রনাথ সানন্দে লিখেছেন—তাহলে শেষপর্যন্ত উজান স্রোত শুরু হলো!

২৪-২-১৯১০, চিঠিতে: রয়্যাল সোসাইটিতে হ্যাভেলের সাফল্যময় বক্তৃতার প্রসঙ্গ। (এই বিষয়টি অন্য অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত)। হ্যাভেলের জন্য অবনীন্দ্রনাথ শুক্রাচার্য-নীতি অনুবাদ করে পাঠাচ্ছেন।

২৬-৪-১৯১১, চিঠিতে: মূল ইলাস্ট্রেশন-সহ ওমর খৈয়াম হ্যাভেলকে গুরুদক্ষিণা হিসাবে পাঠানোর ইচ্ছা অবনীন্দ্রনাথের। নন্দলালকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ইলাস্ট্রেশন করানোর কথা।

৮-৬-১৯১১, চিঠিতে: ওমর খৈয়াম প্রেরণ ও গুরুদক্ষিণা প্রসঙ্গ। অবনীন্দ্রনাথের প্রবল গুরুভক্তি।

২-১১-১৯১, চিঠিতে: হ্যাভেলের মূল্যবান বই পেয়েছেন। 'গুরু' তাঁর 'অযোগ্য চেলাকে' বই উপহার পাঠিয়েছেন, সেজন্য আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। অতি প্রশংসার চোটে শিল্প মরে যায় না, উল্টোদিকে তা অসমাদর ও ঘৃণার পরিবেশে শুকিয়ে যায়—হ্যাভেলের এই কথাগুলি গভীরভাবে সত্য। ভারতবাসী যেন তাদের ঐশ্বর্যময় বিপুল শিল্প-ঐতিহ্যের রূপ উপলব্ধি করতে পারে। হ্যাভেলের বই সেই ব্যাপারে অতীব সহায়ক। "হয়ত আপনি শুনেছেন, আমাদের প্রিয় ভগিনী [নিবেদিতা] গত মাসে দার্জিলিঙে মারা গেছেন। তাঁর মতো আর কাউকে পাওয়া শক্ত হবে। তাঁর বিচ্ছেদ কী তীব্রভাবে অনুভব করছি কি বলব!" বাড়িতে ছোটখাট একটা স্টুডিও খুলেছেন, সেখানে নন্দলাল ও আরও কয়েকটি ছাত্র প্রতিদিন কাজ করতে আসেন। স্টুডিওটিকে গুছিয়ে তুলতে পারলে আর্ট স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেবেন। 'আমাদের কবি' [রবীন্দ্রনাথ] অবনীন্দ্রনাথকে সতর্ক করে বলেছেন, এখন তুমি সাগরে ভাসছ, যে-কাষ্ঠখণ্ডকে ধরে আছো তাকে ছেড়োনা যতক্ষণ-না হাতের কাছে ধরবার মতো আর একটা কিছু পাচ্ছ।

(তারিখহীন চিঠি): চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন—শিল্পসৃষ্টিতে তা সহায়ক হয়েছে। গোছায় গোছায় ছবি আঁকছেন। 'বিচিত্রা'-য় যোগদান করেছেন, সেখানে ও অন্যত্র প্রদর্শনী হয়েছে। ভি সি স্কট-এর কাশ্মীর বইয়ের ইলাস্ট্রেশন করছেন। গ্রাম-শিল্প, বিশেষত গ্রামের মেঝে ও দেওয়ালে মেয়েদের আঁকা চিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা।

২৯-১-১৯১৪, চিঠিতে: ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ বিষয়ে লেখা শেষ করেছেন—অঙ্গ-লক্ষণগুলি হ্যাভেলকে অনুবাদ করে পাঠাচ্ছেন। চীনা-নীতির সঙ্গে একাংশে ভারতীয় শিল্পনীতির ঐক্য আছে। কামসূত্রে ষড়ঙ্গ-প্রসঙ্গ আছে। তবে, তাঁর বই বেরুবার আগে কুমারস্বামী যেন বিষয়টি জানতে না পারেন, এই বিষয়ে সাবধানও করে দিয়েছেন।

১৭-৩-১৯১৫, চিঠিতে: গোড়ায় হ্যাভেলের নতুন বই উপহার পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা। তারপর কুমারস্বামীর করা বিদ্যাপতির পদাবলীর ইংরাজি অনুবাদের কঠোর সমালোচনা:

—কুমারস্বামী কেবল বিদ্যাপতিকে ও তাঁর সুন্দর পদগুলিকে খুন করেন নি, তিনি পৃথিবীর সামনে এমন একটা নোংরা বই হাজির করেছেন যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করবে। ভেবেছিলুম কুমারস্বামীকে কড়া ভাষায় ধাতানি দিয়ে বলব, গড় গড় করে লিখে যাওয়া সোজা, কিন্তু বিষয়ের মর্মসন্ধান অত সোজা নয়। কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকার সময়ে আমি বৈষ্ণব পদাবলী পড়েছি, তাদের মধ্যে স্থূল নোংরা জিনিস পাইনি—সেখানে কুমারস্বামীর অনুবাদ, কি বলব, রাধাকৃষ্ণের দিব্য প্রেমলীলা সম্বন্ধে বলিহারি কী ছবিই না তুলে ধরেছে !! কুমারস্বামীকে বলে দেবেন, এখানকার চার্চ মিশন সোসাইটিগুলির হাতে তার বই আর একটি অস্ত্র তুলে দিল। পাদরী-মহাত্মাগণ ও-বই প্রচুর কিনবেন ; তারপর ভারতীয়দের, বিশেষত সাহিত্যসেবী বাঙালীদের উপরে, বৈষ্ণব প্রভাবের অধোগতির প্রভাব সম্বন্ধে তাঁরা কলম ছোটাবেন। বই লেখা এখন খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তা মরণখেলা দাঁড়াচ্ছে অনেক জিনিসের পক্ষেই। এই নীতিবাক্যটি কুমারস্বামীর অমার্জনীয় পাপ সম্বন্ধে শুনিয়ে দিলুম।

৩-৯-১৯১৯, চিঠিতে : শিল্পানুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক উডরফ্ অবসর নিয়ে ইংলন্ডে ফিরে গেছেন—তাঁর ফেরার সম্ভাবনা কম। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট এখনো টিকে আছে। ৫ লক্ষ টাকা পেলে নিজের সমস্ত শিল্পসংগ্রহ বিক্রয় করতে তিনি [অবনীন্দ্রনাথ] রাজি। মন্দির-পরিক্রমার রীতি সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করছেন, হ্যাভেলের জন্য।

১৪-২-১৯২৫, চিঠিতে : তিন মাস ধরে 'স্রষ্টার মহামন্দির' হিমালয়ে বাস করছেন এবং হাতে পেয়ে গেছেন পাঠের জন্য হ্যাভেলের নতুন বই, 'দি হিমালয়াজ্ ইন ইন্ডিয়ান আর্ট।' হিমালয় তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে হৃত স্বাস্থ্য, আর মনের সজীবতা ফিরিয়ে দিয়েছে হ্যাভেলের নতুন বইটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁর শিল্প-বক্তৃতা কেবল শুনে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে হাতে-কলমে শিল্পরচনার ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিল্পশিক্ষার পদ্ধতি রচনার অনুরোধ জানিয়েছেন। খুব ক্ষতি হয়েছে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে, যিনি শিল্প-ব্যাপারে গভীর আগ্রহী ছিলেন এবং অবনীন্দ্রনাথের কার্যাবলীর বিশেষ সমর্থক। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পশিক্ষা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা, তবে তাঁর অন্যতম পুত্র শিল্পে আগ্রহী, এই একটু আশার আলো।

৫-৯-[?], চিঠিতে : অসিত হালদার ইংলন্ডে গিয়ে হ্যাভেলের সঙ্গে দেখা করেছেন, তাতে সন্তোষ। ছোকরা ইংলন্ড যেতে ছটফট করছিল, কিন্তু তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে,'বিদেশী ভাব'একেবারে ঘুচে গেছে, বলছে যে, আর কখনো কালাপানি পারে যাবেনা। গুজরাটে শিল্পবিদ্যালয় খোলা হচ্ছে, তাতে অসিতকুমার ও শৈলেন্দ্রকে শিক্ষক হিসাবে পাঠাবার ইচ্ছা। শিল্পের বিস্তার হচ্ছে, বীজ ছড়ানো হয়েছে, ফল কুড়োবে নাতি-পুতিরা। শান্তিনিকেতনে নন্দলাল শিল্পবিদ্যালয় শুরু করেছে, অন্ধ্রপ্রদেশে এবং বিহার ন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটিতে সূচনা হয়েছে শিল্পশিক্ষার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত শিল্প-বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন, তবে বাঙালীরা সদা-ঘুমন্ত, যেন বক্তৃতা করে যাচ্ছেন থাম আর বুক-কেসের সামনে। বয়স বাড়ছে, বেশিদিন বাঁচবেন না, কে তাঁর জায়গা নেবেন জানেন না, নন্দলাল তো লড়িয়ে স্বভাবের নয়, তাই ভূমিত্যাগের আগে লড়াইটা শেষ করে যেতে চান, যাতে ফসল তুলবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। লড়াই এখনো শেষ হয়নি, তাই গুরুর আশীর্বাদ চাই। উডরফ্, ব্লন্ট প্রভৃতি বন্ধুরা দূরে চলে গেছেন, তাঁদের অভাব বোধ করছেন প্রতি মুহূর্তে।

হ্যাভেলকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৬-৯-১৯১৯ তারিখের চিঠির কপিও সোমেন্দ্রনাথ পাঠিয়েছিলেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হ্যাভেলের 'হিস্টরি অব ইন্ডিয়া' পড়ে তিনি আনন্দিত, এবং বইটি তাঁর বিদ্যালয়ে পাঠ্য করেছেন। কবি কিছুদিন আগে ইউরোপ যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, কারণ পথখরচ এবং পাসপোর্ট জোগাড় করতে পারেন নি। এখন অবস্থা অনুকূল হলেও সে ইচ্ছা চলে গেছে। আসল কাজ ভারতেই, শান্তিনিকেতনে নিয়ত উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। নন্দলাল শান্তিনিকেতনে কাজ করছেন, তাঁর কাছে ভারতীয় শিল্পশিক্ষার জন্য ভারতের নানা প্রদেশ

থেকে শিক্ষার্থীরা আসছেন। এতে সরকারী কর্তাদের টনক নড়েছে, নন্দলালকে লোভ দেখিয়ে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় নিজেদের কুক্ষিগত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জুড়ে দেবার চেষ্টা চলছে। এ-ব্যাপারে তাঁরা অবনীন্দ্র ও গগনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। কবি আশা করেন তারা ওই ফাঁদে পা দেবে না। মিসেস হ্যাভেল 'বিসর্জন' ড্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করলে কোনো আপত্তি নেই, তবে যেহেতু ওই বিষয়ে নির্ধারণের স্বত্ব ম্যাকমিলানকে দেওয়া আছে, তাই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

Abanindra Nath Tagore to Mr. E. B. Havell

Calcutta, 20.1.09

At last we have suceeded in rousing the Calcutta public—I mean the Bengalis. 'Sahitya Parishad'the foremost literary Society has presented you with an address in a public meeting specially held for the purpose; of course your latest **Book** gave the finishing stroke. The tide has turned back—let us hope it will continue flowing in the right directions.

There was a large gathering, my uncle Rabindranath Tagore the Poet took the chair, all our best men also, the art students and teachers being present. The meeting lasted full three hours. Mr. Persy Brown was there and even I—poor picture-maker—had to a make a little speech in Bengali which I find was very much liked although I served it to them very bitter?—it is a good sign when a sick man likes bitter mixtures—don't you think so?

I am enclosing two cuttings from the Bengali [*Bengalee*] and Amrita Bazar—did not I tell you that the tide has turned?—This I call **artistic revenge.** I send you fuller reports by the next but let me assure you that the Society never gave such an address to any other Englishman before and I as an Indian will feel really proud if I get such an address in my old age from the institution.

I very much hope that my best friend shall have some thing better than the *School boy address* which Ghilardi got and at last I am satisfied.

We are entrusted with the work of illuminating the address also doing for you, your portrait in the Indian style which I hope to get done nicely in the school.

My only regret that you are not here to receive the address personally. Mrs. Havell would have been so glad to see the meeting. In honouring you I think that my countrymen had learnt to honour their own art.

P.S. Brojendra Babu sent you the keys by post which I hope you have recieved by this time.

Calcutta, 24.2.10

All of us read with great interest the full account of your lecture in the Royal Society.

What a strom of discussion it has raised? Who is this Sir T. H. Holdich and alphabets who after 36 years in the East and India has such super-fine ideas of our art?

Sir G. B.—in spite of his resolves—re-resolves—is grand even when he is tottering, he will always command respect, the dear old man.

I am very glad to hear that you are going to give another lecture soon, and I am sending you another passage from Sukracharya which may clear the point regarding our fine art.

After having laid down precise rules about making of Statues, Sukracharya goes

on:—

104. "An image which is perfect in every limb and which could please every body is produced one in a lakh (hundred thousand).
(So I have said) only those are lovely which are proved to be beautiful according to the principles and canons, of (Silpa) Sastras."

105. "But people those are in whose opinion, a thing that pleases the heart is a Thing of Beauty."
"But to the learned it is not lovely which does not follow the measurements and canons laid down by the (Silpa) Sastra." (Chapter 4th. Verses 104: 105)

The first two lines in the verse 105 clearly points out to another art (what we now call fine art) which was growing side by side with the great religious art of India. Sukracharya could not ignor it so he left it to the matter of taste. I place the weapon in your hand, knowing that you will make good use of it. Every one is now quoting Sukracharya but that one line of him always remained unnoticed. I call it his line of beauty.

Use it as Indra used his thunderbolt.

Sea Beach, Puri, 26.4.11

I ment [meant] to send you a copy of Omar together with some of the original illustrations but unfortunately the pictures were returned from Allahabad only after I have left for Puri. I hope to get back to Calcutta by the 2nd week of May and I will send my Guru-dakshina without fail as soon as I am there.

Only man who could take up your Benaras Book is Chintamoni Ghosh of Indian press, Allahabad and I have written to him about it. I will let you know as soon as I got a reply from him.

Glad to know that your book is going to be published soon.

Kindly remember me to Mrs. Havell.

P.S. I will get Nandalal do Bankim's Illustrations and send them to you soon as possible.

P.S. My cousin is anxious that Hiranmoy Raychaudhuri should take his diploma but I will talk to him when I go back and let you know.

Calcutta, 8th June 1911.

Thanks for your kind letter. It will never do to leave the school at once and blow out the lamp altogether. I must feel my way very very carefully.

We expect Coomaraswamy in Calcutta by August or September next and with his help I hope to get some good workmen who will be willing to come and settle around me.

I quite understand the difficulties that are on the way of pushing forward our claim, but I hope everything will be all right when we can show that we are doing really good work.

I hope by this time I hope you have got the copy The Omar with the original illustrations, My 'Dakshina', which you so very kindly consented to accept. I really believe in the old saying:—a man is without 'Siddhi' so long as he remains without a 'Guru'! My mind is now at peace with everything and everbody. In gaining my Guru I have gained all.

And like 'Kavir' I have tied the diamond of Siddhi in the corner of my cloth, and like him I say to my pupils and to my country-men :

The jewel lay unseen in the mud; and they have been looking for it in the East and the West, below the waters and underneath the stones.

Poor 'Kavir' (I) perceived the diamond; see here it is tied in the vail [veil?] of my life.

Calcutta, 2nd November, 1911

Many thanks for your valuable book. I shall keep it always as a valued present from my 'Guru' whose unworthy chela I am. Had time only to glance over the pages and I hope to write more fully about the book in my next to you.

How truly you have said, 'art does not die of over praise, it can not live or thrive in an atmosphere of contempt and depreciation!'

It is time that Indians should feel the magnitude and grandeur of their art heritage and I hope that your book will open their eyes.

Perhaps you have heard that our Sister [Nivedita] died in Darjeeling last month. It will be hard to find another like her again. How keenly we feel her loss.

I have now opened a little studio in our house where Nandalal and few of the boys come and work everyday. When I get this studio in proper working order I will leave the [Art] School. Our poet say, 'You are floating on the sea, do not let go the piece of wood on which you are leaning till you find another piece near at hand.'

Kindly remember me to Mrs. Havell, my 'Guru Mata'.

5, Dwarkanath Tagore's Lane

I am really sorry that I could not reply to your last letter earlier.

I have told my brother Gogonendra (He is now the Secy. of the I.S.O.A.) to send money fot the 'L,art' Decorative to finance as soon as possible. O.C. Ganguly never mentioned this matter to the Committee. He is a peculiar man.

I am now doing some illustrations for a book on Kashmare which V. C. Scott O'comcor has written. He is a nice man— author of the **Silken East**—do you know him? Longmans will publish his book.

We had this year two exhibitions of our Society, one in Calcutta and one in Madras. Both of the exhibitions proved to be great success.

We are now having another small exhibition of Village Arts in our **'Bichitra'**.

We have collected many beautiful things. Lord Carmichel visited it the other day. I hope to write soon some monographs on our village arts especially on wall and floor painting done by our girls,. They are beautifully decorative. I will send you some photographs of these drawings.

This retiring from the school has done me good. I am producing pictures now by dozens. Oh I am so happy now with my 'Bichitra'.

Remember me to Mrs. Havell.

Calcuuta. 29.1.14.

I have finished writing my introduction to the six canons of Indian Painting. In our Sanskrit, it is called the 'Six Limbs of Painting'. I give you a translation of the six canons.

1. Knowledge of appearances
2. Correct perception. Measure & Structure
3. Action of feeling on Forms
4. Infusion of grace, artistic representation
5. Similitude

6. Artistic manner of using the brush & colours.

"**Rupabheda,** [1] **Pramanani,** [2] **Bhava,** [3] **Labanya** [4] Jojanan, **Sadrisya,** [5]

Barnikabhanga, [6] iti chitra Shadangakam."

It is practically the same as the six canons of the Chinese (1) Rupabheda (2) Pramanani.

(1) Knowing the difference between the living forms and the dead forms (2) and correct perception, correct structure, correct measure—These are the two most important things in our canons and you will see that they are in one sense convey the same meaning as the 'Rhythmic Vitality' and the 'Laws of Bones' of the Chinese.

You will find the reference of our six canons or Sadanga in the chapter III of the Kamasutram by Vatsayana, but you must not tell anything about this to Coomaraswamy or other untill [until] my book is out.

I have got the copy of the London News which you kindly sent.

Govt. School of Art.
28, Chowringhee Road, Calcutta.
17th March, 1915.

Thank you very much for the new book of yours. I feel proud to receive this gift of my Guru.

Have you seen Coomarswamy's translation of **Vidyapati**? I have seen the copy which he sent to Rabindranath. Coomarswamy has not only murdered Vidyapati and his beautiful poems but has given to the world a vulgar book which will leave a wrong impression in the minds of our next generations as to the merits of the Vaishnava Poems. I have a mind to give a good scolding to Ananda K. C. to tell him that it is much easier to write and write than catch the true nature of a thing. When I was doing the Krishna Set I read these Vaishnava Poems and I found them to be absolutely devoid of any vulgarity, whereas A. K. C's translation—well I will not say **what pictures it brought to me of the Divine Love and Sports of Krishna Radha.**

Tell Coomaraswamy that his book will be another weapon in the hands of the Church Mission Societies here. It will have large sale with all **Rev. Gentlemen** writing about the debasing influence of Vaishnavism on Indians with special reference to Bengalies as a literary class of people.

Writing books are becoming as common as sports but it is dealing death to many things. This **maxim** I aim at AKC for his unpardonable sin.

5 Dwarkanath Tagore's Lane, Calcutta.
3rd September 1919.

Thank for your letter of the June 15th last.

Sri J. Woodroffe has retired from service and gone to England. I don't think he will return to India.

If you write to him please address your letters, C/o, Henry S. King.

About the Pradakshina question I enquired from different Pandits. Every one say that the rule is the same both in Shiva & Vishnu Temples.

It is very curious that the path in the Kailash Temple should be different, are you quite sure of it? There can be no other explanations than except that the rocks must have fallen and closed the path towards the left.

Pradakshina is when one goes round an image.

Parikrama=going round Holy place such as Benares and others. These are only two words for circumbulation. Of course the pandits say the rules in both cases are the same. The Indian Society of Oriental Art is still in existence and the Governor is trying to get a Government grant for it. There is no other important news which I can give you. We are all doing well.

With best wishes,

P.S. If you happen to know any one who is willing to make a collection of Indian pictures, kindly put us into communication with him. We want to sell our whole collection if we get a good price say Five Lacks.

5 Dwarkanath Tagore's Lane, Calcutta.
14th February, 1925.

For the last three months I was sitting in the Himalayas and your book—The Himalayas in Indian Art—just in time—when I have completed my pilgrimage to the "Creator's Shirne?" I can not express how very very grateful I am to you for this new book of yours.

Of late I was not keeping well and could not do much work but my trip to the mountains has brought me back to life and your great book has given me freshness of thought.

I have asked the Calcutta University to supply me with the details of the art teaching of its Post-graduate department.

There are so far as I know several art lectures, but very little practical work done by the students of M.A. class. They don't paint or model but listen to the lectures on painting and sculpture etc. at present, but I hope that eventually they have to come to the practical side of the thing and understand art better—some of the University professors and students told me so.

The sad and untimely death of Sir Ashootosh Mukherjee has to a great extent retarded the art work in the University. He was the prime mover and my great supporter and was building the foundation of a great University when he was suddenly taken away. However I find that one of his sons is taking interest in art and number of M.A. students are beginning to see the usefulness of art line. So I have every hope for the future.

I will send you the details of the work as soon as [I] receive it from the University.

Thanking you again for the New Book.

With all best wishes,

5, Dwarakanath Tagore's Lane, Calcutta.
5th Sept.

You must have met Sir John Woodroffe and Blount and heard from them all the news.

Asit Halder returned from England the other day and he told me of the kind treatment which he received from you. I was so glad that he went and saw you, the young man was rather anxious to visit England (!) but he has come back perfectly cured of his 'foreign ideas' and says he will never cross the 'Kala-pani' again. They are opening a school of art in **Geejgarh** Jaypore and I hope to send Asit and Sailendra there as teachers. The seed is being scattered. The fruit will be gathered not by us but our children—this much is my gain(!). There is another centre being created in Santiniketan at Bolpur, under Nandalal. Also we have begun work in the Andhra district and in the Behar National University.

I wanted to send another boy for the Lucknow University but thay have take one England returened poster painter, a foreigner student of P.B. & Co.?

I am giving regular art Lectures in the Calcutta University, but you know Bengali is so sleepy, I feel as if I am addressing the pillars and the Book-cases of the University. Still I am hopeful Bengal is the place where the tree can grow.

One thing I feel very much joy—I am growing old and can not last and I do not see who will take my placo—Nandalal is not a fighter, so I want to finish all the fighting work before I leave so that I may leave the field fit for the corn. Send me your blessings, the battle is not yet over. I have to do so much writing that I hardly find time to paint but this can not be avoided. Take my Namaskar and kindly remember me to Mrs. Havell and others. All my old friends, Woodroffe Blount, yourself are away. I feel so out of touch with every body now.

With kindest wishes,

Rabindra Nath Tagore To E. B. Havell

Santiniketan, Bolpur, Bengal.
Sept, 26. 1919

Dear Mr. Havell,

Thank you for kind letter.

I have greatly enjoyed your History of India which I have introduced as the text book in our school.

Some time ago I tried to go to Europe but could neither secure my passage nor passport. Now they are both available but I have changed my mind. For I feel that my work lies here in India and our Shantiniketan needs my constant presence and watchfulness. You will be glad to learn that Nandalal is working with me in our ashrama and students are coming here from different provinces of India to take lessons in Indian Art. This has suddenly made our authorities wake up to the immediate necessity of tempting away Nandalal from this place and setting up a rival movement in Calcutta under their own aegis. And they are negotiating with Abanindra and Gagan and I fervently hope that they will not succumb to their allurements.

I have no objection to Mrs. Havell's translating my Sacrifice into Danish and publish it. But as Macmillans have the sole right to make arrangements with the continental translator about translations of my books, can you communicate to them and ask them to settle terms with you. It is needless to say that I will be glad if they see their way to give permission to Mrs. Havell. With kind regards to you.

Yours very sincerely,
Rabindranath Tagore.

অষ্টম অধ্যায়

সামাজিক শিল্প বিষয়ে নিবেদিতার ভাবনা

(প্যুভি দ্য শ্যাভান, রনে লালীক)

॥ ১ ॥

হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয় নিবেদিতার সামনে নতুন পথ খুলে দিল। ভারত-শিল্প সম্বন্ধে যেসব চিন্তা ও অনুভূতি নিবেদিতাকে আলোড়িত করছিল, তারই অনুরূপ ভাব-ভাবনায় উদ্দীপ্ত এমন একজন ইউরোপীয়কে পেলেন যাঁর হাতে আবার, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, সত্যকার কার্যকর ক্ষমতা আছে, এবং সে শক্তিকে তিনি প্রয়োগ করছেন কলকাতার প্রধান শিল্পশিক্ষার সরকারী প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়তার প্রবর্তনে। এর ফলে সেখানে অনুপ্রবেশের সুযোগ নিবেদিতার এসে গেল, সরাসরি ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে এবং নিজের বাসভবনে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে পারলেন—যাতে তাঁদের মধ্যে "ভারতের জন্য অদম্য বাসনাক্রান্ত ভালবাসা" সঞ্চার ক'রে তাঁদের "শিল্পী" ক'রে তুলতে পারেন। এখন নিবেদিতার কাছে শিল্পশিক্ষার্থী কেবল বাগবাজারের কয়েকটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকা নয়—উন্মুখ-প্রতিভা তরুণ শিল্পীরা। না, এখানেও শেষ নয়—তাঁর রচনা থেকে শিল্পতত্ত্ব শিক্ষা করতে লাগলেন সারা দেশের শিল্পব্রতীরা।

১৯০৩ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত সময়ে নিবেদিতার চিঠিতে তিনি কিভাবে ভারতীয় শিল্পচর্চায় নিমগ্ন আছেন তার কিছু-কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। অজন্তা ও ইলোরা সম্বন্ধে তিনি তীক্ষ্ণভাবে সচেতন (যেখানে অবশ্য ১৯০৯ ডিসেম্বরের আগে গিয়ে উঠতে পারেন নি)। মিস ম্যাকলাউড ও ওকাকুরার অজন্তা ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহিত উক্তির কথা আগেই জেনেছি। মিস ম্যাকলাউড ফ্লোরেন্সে উপনীত হয়েছেন, এই সংবাদ পেয়ে কল্পনায় তাঁর সঙ্গী হতে চাইলেন, সেইসঙ্গে অজন্তা প্রসঙ্গও এসে গেল :

"ফ্লোরেন্স সর্বদাই আমার স্বপ্ননগরী। ফ্লোরেন্স কেবল সাভোনারোলা (Savonarola) এবং জিয়ত্তোর (Giotto) স্থান নয়—তা দান্তে ও বিয়েত্রিসেরও স্থান। আর

জিয়ত্তো—তিনি একান্তই নিজ-কালের মানুষ—তাঁর শিল্পকাজে সেন্ট ফ্রান্সিসের প্রাণস্বর সুস্পষ্ট ও সুমধুরভাবে ধ্বনিত—এবং [দান্তের] ডিভাইন কমেডিও। সেই শতাব্দীর সর্বপ্রকার বিশ্ব-ভাবনা যেন ফ্লোরেন্স-কমলের পাপড়ির নীচে সুখাশ্রয় পেয়েছে। ...ইলোরা ও অজন্তা অন্য এক ইতালির অন্য এক ফ্লোরেন্স—এই অন্য ইতালি সুবৃহৎ এবং ভিন্ন চিন্তার আধার। আমরা যে তাঁকে [স্বামীজীকে] দেখেছি—যাঁর সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখেছিল একদা ইতালি ও ফ্লোরেন্স।" [মিস ম্যাকলাউডকে, ৯-১২-১৯০৩]।

অজন্তা ও চিতোর ভ্রমণের জন্য নিবেদিতা খুবই উৎসুক ছিলেন। [চিঠি, ২৬-৭-১৯০৪]। ১৯০৪ সেপ্টেম্বর দলবল নিয়ে বুদ্ধগয়ায় গেছেন [একাধিকবার সেখানে গেছেন], সেখান থেকে পাওয়া বজ্রচিহ্নকে জাতীয় প্রতীক করতে চেয়েছেন [চিঠি ১-১২-১৯০৪]। বুদ্ধগয়ার মোহন্ত তাঁদের একটি স্তূপ উপহার দেন [যেটি জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে রক্ষিত ছিল]—নিবেদিতা আর একটি চিঠিতে [১-১২-১৯০৪] তার স্কেচ দিয়ে বলেছেন : "বুদ্ধগয়ার মোহন্ত আমাদের প্রায় নিখুঁত একটি স্তূপ উপহার দিয়েছেন—তার মধ্যে চারটি সুন্দর উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি—আর তাঁদের চতুর্দিকে শত-শত ছোট-ছোট বুদ্ধ।" ১১ জানুয়ারি ১৯০৫ চিঠিতে লিখেছেন, "আমি সাঁচী স্তূপ নিয়ে পড়াশোনা করছি। আহা, ওটি দেখতে কী-যে ইচ্ছা হয়!" এই পড়াশোনার প্রস্তুতি নিয়ে পর বৎসরের গোড়ার দিকে তিনি সাঁচী যান, সেইসঙ্গে ভূপাল, উজ্জয়িনী, চিতোর, আজমীর, লেগপুর, আগ্রা, এলাহাবাদ, বারাণসী। এই ভ্রমণের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়বার আগ্রার তাজমহল দেখলেন—স্বীকার করলেন, পূর্বের তুলনায় তাঁর রসদৃষ্টি ও রূপদৃষ্টি গভীরতর হয়েছে : "প্রথমবার যে-রাত্রে তাজমহল দেখেছিলাম, তোমার মনে পড়ে সেকথা ? তাজমহল যেন এখন আরো—আরো অনেক সুন্দর! এর মানে কি এই যে, মনের এমন পরিণতি ঘটেছে যাতে শাজাহানের প্রাণরূপকে উপলব্ধি করতে পারি—সদানন্দের ভাষায় 'প্রেমের ভিখারী' সেই শাজাহানকে ?" চিন্তা ও অনুভূতির কারুকার্যকরা মনটিকে এর পরে আরও খুলে ধরলেন :

"কিন্তু তুমি [মিস ম্যাকলাউড] এও জানো—[আগের বার] যখন তাজের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মেনে দেখছিলাম—দিনের রাজসিংহাসনে স্থাপিত তাজের উপরে ক্রমেই ধূসর হয়ে গেল আলো, ক্রমে রাত্রির সিংহাসনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাজ নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল বিভায়—ভারতের ললাটে পরম সৌন্দর্যে স্থাপিত সেই নিখুঁত মুক্তা-মুকুট—সে জিনিস তো এই উপলব্ধি সম্ভব ক'রে দিচ্ছিলই—পার্থিব সৃষ্টির গৌরব অপেক্ষা অনেক বড় হল প্রেমের আধ্যাত্মিক মহিমা। ভারতের সম্রাট হয়ে, পৃথিবীর সকল সম্পদ আহরণ ক'রে, তার দ্বারা প্রিয়তমাকে ভূষিত করার মহিমা—স্বপ্নের মতোই অপূর্ব—অপূর্ব। কিন্তু সৌন্দর্যের বিষয়ে চিন্তার আর একটি দিক আছে। কী বলব সেই মহামনীষার [স্বামীজীর] বিষয়ে যাঁর চিন্তা ও জ্ঞান প্রেম-বিষয়ের সঙ্গে অদ্বৈতবোধে উপনীত।" [২৪-১-১৯০৬]।[১]

নিবেদিতা এইকালে সাঁচী, আগ্রা, চিতোর বিষয়ে বক্তৃতাও করেছেন [চিঠি, ৮-৩-১৯০৬ ; ২২-৩-১৯০৬]। দেখা গেছে, তিনি ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ে ফার্গুসনের এবং উড়িষ্যা বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বই পড়তে উৎসুক। [চিঠি, ৪-৫-১৯০৫]। ইচ্ছা করেছেন, মৃত্যুর পূর্বে আরও দু'একটি বই লিখবেন, যাতে শিল্পপ্রসঙ্গ প্রাধান্য পাবে।

নিবেদিতার চিঠিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্প সম্বন্ধে নানা দীপ্ত মন্তব্য ছড়িয়ে আছে। তাঁর

মতে, "তীব্র পুরাণ-প্রীতি সৃষ্টি করেছে মধ্যযুগের শিল্প, আর তীব্র সত্য-প্রীতি মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানের দিকে।" ভারতবর্ষের ধর্মে রয়েছে সত্যপ্রীতি, যা উনিশ শতকে সৃষ্টি করেছে দ্বিতীয় রেনেসাঁস—এখানে প্রাচীনের ভিত্তিতে ঘটবে নব শিল্পের জাগরণ। এই শিল্প-জাগরণে, নিবেদিতা আরও বলেছেন, ভারতকে নিতে হবে ইউরোপকেও, বিশেষত নাগরিক ও সামাজিক আদর্শের সঙ্গে শিল্পকে যুক্ত করার ব্যাপারে। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে নিবেদিতা সবচেয়ে আকৃষ্ট হন প্যুভি দ্য শ্যাভান-এর পৌর-চিত্রাবলীর সম্বন্ধে।

॥ ২ ॥

ফরাসি শিল্পী প্যুভি দ্য শ্যাভান-এর (Puvis de Chauvannes, ১৮২৪-৯৮) জন্ম অভিজাত বংশে, প্রথম যৌবনে ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছুক, ইতালি ভ্রমণের ফলে শিল্পী। গোড়ার দিকে তাঁর ছবি সাধারণ প্রদর্শনীতে প্রত্যাখ্যাত হলেও উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে বরেণ্য শিল্পী বলে স্বীকৃত। তাঁর খ্যাতি প্রধানত বৃহদায়তন ম্যুরাল চিত্রের জন্য, যেগুলি সচরাচর রূপকার্থ-যুক্ত পৌরাণিক ও ধর্মীয় বিষয়ের। প্যারিসসহ ফ্রান্সের বড়ো-বড়ো জন-ভবনগুলির দেওয়াল তাঁর ম্যুরালে অলঙ্কৃত। সমকালের রিয়ালিজমের বিরোধী হলেও তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। আশ্চর্য সরল শৈলীতে আঁকা চিত্রাবলীর জন্য তিনি ১৮৮০-৯০ দশকের সিম্বলিস্ট চিত্রশিল্পী ও কবিদের কাছে নায়ক-গৌরব পেয়েছেন। "প্রতীকী ভাষায় নিজ চিন্তাপ্রকাশে সমর্থ" এই শিল্পী—গগ্যাঁ (Gauguin),সোরা (Seurat), লত্রেক (Lautrec) প্রমুখকে প্রভাবিত করেছেন।[২]

মিস ম্যাকলাউডের পাঠানো শ্যাভান-এর একটি ছবির ফটোকপি থেকেই সম্ভবত ওই শিল্পীর শিল্পকর্মের সঙ্গে নিবেদিতার প্রথম পরিচয় ঘটে। ছবিটি হলো—প্যারিস নগরীর উপরে দৃষ্টি মেলে রয়েছেন স্যাঁত্ জেনভিভ্ (St. Genevieve Watching Over Paris)। ছবিটি নিবেদিতার এত ভালো লেগে যায় যে, ডেস্কের উপরে বাঁধিয়ে রেখে দেন। [চিঠি, ৩১-১২-১৯০৩]। তাঁর মনে হয়, ওটি "এক চিরন্তন প্রতীক"। কিন্তু কিসের প্রতীক ?—নিবেদিতা যার সঞ্চারে ব্রতবদ্ধ সেই সামাজিক চেতনার। মিস ম্যাকলাউডকে ২৬-১-১৯০৫ তারিখে লিখলেন :

"আমার কখনো কখনো মনে হয়, ভারতের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো কাজ শিল্পের মাধ্যমেই করা যেতে পারে—পত্র-পত্রিকা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে নয়। ...তবে সে শিল্প হবে নাগরিক-চেতনা—জাতীয়-চেতনা—ইতিহাস-চেতনার বাহক। দুর্নৈতিক বা বিশৃঙ্খল শিল্পে আমাদের প্রয়োজন নেই। পূর্বোক্ত ধরনের চিত্রের জন্য ফ্রান্সের দ্বারস্থ হতেই হবে।"

Bobtet de Monval-এর [?] আঁকা জোয়ান অব আর্ক-এর কিছু ছবি এক্ষেত্রে তাঁর আকাঙ্ক্ষা অল্পাধিক পূরণ করেছিল। তিনি দেখেছেন, অন্য যাঁরা "জোয়ান অব আর্ক-এর ছবি এঁকেছেন তাঁরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ, কারণ সেসব ক্ষেত্রে ওঁকে ফ্রান্সের জাতীয় চেতনার মূর্ত বিগ্রহ এবং ঈশ্বরের করধৃত বজ্র না ক'রে, করা হয়েছে—উনিশ শতক বা বিশ শতকের গোড়ার দিকের বৈকালী চায়ের আসর বা বলনাচের আসরের সুন্দরী নারী।"

"স্যাঁত্ জেনভিভ্" বিষয়ে শ্যাভান-এর ওই বিশেষ ছবিটিই হলো নিবেদিতার ধারণায় ঠিক ছবি। "ছবিটি যদি চিত্রমালার অংশ হয় এবং সেই চিত্রমালা যদি কোনো স্থাপত্য

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়—তাহলে ওটি আরো সঠিক বস্তু।”

ওই ধরনের সব ছবি নিবেদিতা চেয়ে পাঠালেন। সেই সঙ্গে বললেন—“পৌরভাবের ও তার রূপায়ণের উপরে লেখা প্রবন্ধ বা বইও” তাঁর প্রয়োজন।

পাশ্চাত্ত্য বন্ধুদের কাছে নিবেদিতা অতঃপর বারবার শ্যাভান-এর ছবির প্রতিলিপি চেয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর বিষয়ে গ্রন্থাদিও (অবশ্যই ফরাসিতে লেখা), যার সাহায্যে তিনি ইংরাজিতে প্রবন্ধাদি লিখতে পারবেন। ভালো ফটোকপি পেয়ে উল্লসিত হয়েছেন, কেননা সেগুলি পুনর্মুদ্রিত করাতে পারবেন বাংলা পত্রিকায়। [চিঠি, ৮-২-১৯০৫ ; ১৮-৭-১৯০৬ ; ৯-৮-১৯০৮]।

শ্যাভান সম্বন্ধে নিবেদিতার সমাদর কিন্তু পৌরচিত্রগুলিতেই আবদ্ধ ছিল—পৌরাণিক বা রূপক চিত্রে পৌঁছয় নি। ক্ষেত্রবিশেষে শেষোক্ত ছবিগুলির তীক্ষ্ণ সমালোচনাও করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে প্যারিসের সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘গ্র্যান্ড অ্যাম্ফি থিয়েটারে’ ৭৫ ফুট দীর্ঘ ম্যুরাল ছবিটির উল্লেখ করা যায়। শ্যাভান-এর এই ছবির নাম, ‘পবিত্র অরণ্য।’ বিষয় : সরবনের অধিষ্ঠাত্রী বসে আছেন বনমধ্যে সিংহাসনের উপরে, পরিবৃত তিনি সাহিত্য, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যামিতি, বাগ্মিতা প্রভৃতির প্রতীক মূর্তির দ্বারা। নিবেদিতা এই ম্যুরালের চিত্রণকৌশলের প্রশংসা করলেও রুচির প্রশংসা করতে পারেন নি। ছবিটি এতই বিখ্যাত, এবং তা সরবন অ্যাম্ফি থিয়েটারের গৌরব বলে ওইকালে এমনই স্বীকৃত যে, স্বামী বিবেকানন্দ ওই ভবনে গিয়ে ছবিটি দেখেছেন—সেই সংবাদ পেয়ে মিসেস লেগেট মিস ম্যাকলাউডকে উৎসাহে লিখেছিলেন (সেপ্টেম্বর ১৯০০) :[৩]

‘Swamj at the Sorbonne! enfin. What would I give for a photograph of him with the Puvis de Chauvannes Background!''

দেহধারী বিশ্ববিদ্যা বিবেকানন্দ—প্যুভি দ্য শ্যাভান-এর বিদ্যারণ্যের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উন্নত মর্যাদায়—এই ভাবনাই উল্লসিত করেছিল মিসেস লেগেটকে।

স্বামীজী নিজে ছবিটি সম্বন্ধে কী মনে করেছিলেন জানা নেই। নিবেদিতার শ্যাভান-সমাদর কিন্তু আংশিক। ২১-২-১৯০৬ চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন : “ছবি পিছু তিন ফ্রাঁ দামের বেশি নয় এমন যত বেশি সম্ভব স্যাঁত্ জেনভিভ-এর ছবির অর্ডারি” দিয়ে দিও মসিয়ে ওত্ক্যুর-এর দোকানে। “স্যাঁত্ জেনভিভ্-চিত্রাবলীর মধ্যে সেরা হলো নগরের কল্যাণের জন্য প্রার্থনারত ছবিটি—তুমি প্রথম যেটি পাঠিয়েছিলে। তবে সবগুলিই সুন্দর। প্যুভি-র নগ্নপ্রায় সরবন্ চিত্রাবলী সহ্য করতে পারিনা।” স্যাঁত্ জেনভিভ্ ছবি সম্বন্ধে নিবেদিতার ভাববিহ্বলতা আরও পুরনো। “প্যুভি দ্য শ্যাভান-এর মতো হয়ে ওঠা, তাঁর মতো চিন্তার শক্তিলাভ করা—কী অপূর্ব! প্যারিস যখন নিদ্রিত তখন তার জন্য প্রার্থনা করছেন স্যাঁত্ জেনভিভ্! কী শান্তি! আত্মার কী বিপুল বিস্তার!” [মিস ম্যাকলাউডকে ২৫-১১-১৯০৩]। কয়েক বছর পরেও লিখছেন মিস ম্যাকলাউডকে (২৪-৪-১৯০৭) : “তুমি প্যারিস ঘুরে ঘুরে দেখছ—কী চমৎকার! কখনো আবার প্যারিস দেখব কিনা জানি না! আমার সবসময় মনে হয়, গতবারে [প্যারিসে থাকার সময়ে] প্রাপ্ত সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করিনি। যদি আবার ওখানে যাই তাহলে মঁসিয়ে নোবেল কি আমাকে দু-একবার ঐতিহাসিক জায়গাগুলি ঘুরে দেখাবেন? আমি লুভার একেবারে ঘেঁটে দেখব ; প্যুভি দ্য শ্যাভান-এর চর্চা করব—সে আমার জীবনস্বপ্ন।”

এহেন প্যুভির সরবন্ ম্যুরালের নগ্নতা-বিলাস সম্বন্ধে তাঁর তীব্র মত এইরূপ (মিস ম্যাকলাউডকে ২-৫-১৯০৬) :

“প্যুভি দ্য শ্যাভান সম্বন্ধে নিউনেস-প্রকাশিত একটা শস্তা বই পেয়েছি। ফলে তাঁর ছবির যে তালিকা চাইছিলাম তা মিলেছে। জানো কি, ভারতে বাস করার পরে, সাউথ কেনসিংটনে গিয়ে আমি গ্রীক মূর্তিগুলি দেখেছি—বিচারকের মনোভাব নিয়ে অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে। বুঝলাম, আমি এমন একটা দেশে থেকেছি যেখানে মানুষ প্রায়-নগ্ন অবস্থায় থাকে—আর তাতে আমার চোখ তৈরী হয়ে গেছে। ফলে মূর্তিগুলোকে গ্রীকরা যেভাবে দেখতে পারত, আমি সেইভাবে দেখেছি। সেই দৃষ্টি নিয়ে বলতে পারি, প্যুভি দ্য শ্যাভান-এর সেকুলার ছবি অসহ্য। চূড়ান্ত জগাখিচুড়ি। সেখানে কোনো একটা ছবিতে আগাগোড়ায় এক রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। এটা বিশেষভাবে ঘটেছে সরবন ছবিগুলির ক্ষেত্রে। লাইট, কালার, স্পেস, এবং কম্পোজিশন—একেবারে দিব্যকাণ্ড। কিন্তু মানবিক বিচারে বিশৃঙ্খলার দুঃস্বপ্ন। ছবির চরিত্রগুলির কি এমনই গরম লাগছে যে, গায়ে কাপড় রাখা যায়না? তাহলে ‘বিদ্যা’ বা ‘ভক্তি’ বা ‘গির্জা-ইতিহাস’ বা ওইধরনের কিছুকে সন্ন্যাসিনীদের মতো বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয়েছে কেন?''

নিবেদিতার মতে, এই গায়ে কাপড় রাখা বা না-রাখা এমন ইচ্ছামতো করা হয়েছে যে, তার পিছনে যুক্তির বালাই নেই। গ্রীক নগ্নমূর্তির তিনি অর্থ করতে পেরেছেন কিন্তু প্যুভির রূপক ছবির মূর্তিগুলি(যারা আপাতত খুবই রিয়ালিজমে ভরা) কেন-যে গায়ে কাপড় রাখছে, আবার কখনো কেন যে রাখছে না, তার হদিশ করতে না-পেরে কঠিনভাবে লিখেছেন : “আমাকে ফিলিস্টাইন বা জিনিয়াস—কী ভাবা হবে তার পরোয়া করিনা। কোন্ বিষয়ে কী বলছি, তা আমার খেয়াল আছে। প্যুভি দ্য শ্যাভান-এর গোটা চিত্রতালিকা ধরলে তাঁকে পৌরচেতনার অপূর্ব প্রতিভূ শিল্পী বলে অনুভব করা যায়। অপরপক্ষে তাঁর সুন্দরতম চিত্রের অনেকগুলি, প্রতীক চিত্রগুলি, মনের পূর্বলব্ধ অনড় ধারণার ফলে এবং শরীরসংস্থান বিষয়ে চিন্তার ঐক্য ও ঔচিত্যবোধের অভাবের ফলে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁর নগ্ন চিত্রের স্থানে আসুক শাড়ি ও শুভ্র অবগুণ্ঠনে ঢাকা ভারতীয় নারী। লোকে যেমন বলে, আমি সেইভাবে আমার অমর আত্মাকে বাজি রেখে বলব—দ্বিতীয় ব্যাপারটি ঘটলে পরিবর্তে যা পাব তা হবে মহিমান্বিত—গৌরবান্বিত। আহা, কোথায় সেই শিল্পী যিনি এই বস্তু সম্ভব করবেন!”

যেখানে পাশ্চাত্ত্য ছবিতে অহেতুক নগ্নতা-বিলাস সম্বন্ধে নিবেদিতার অত আপত্তি, সেখানে তিনি অনুকারী ভারতীয় শিল্পীদের ওই জাতীয় প্রবণতাকে পছন্দ করবেন না, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ‘হাই আর্ট’-এর নামে ভারতীয় শিল্পীরা নগ্ন বা অর্ধনগ্ন ছবি এঁকে খুশি হতে চান, যুক্তি ‘হাই আর্ট আমাদের তৃপ্তি দেয়।’ নিবেদিতার বক্তব্য, ওই প্রবণতা এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ ওই ধরনের ব্যাপারকে ঠিকভাবে গ্রহণ করার মতো মন বা চোখ এদেশে শিল্পীদের মধ্যে তৈরি হয়নি। কোন্ উচ্চ রসদৃষ্টি থেকে পাশ্চাত্ত্য শিল্পে নগ্নচিত্র এসেছে তা তিনি জানতেন। “নৈর্ব্যক্তিক ভাবের মহিমা আছে এমন পুরাতন শিল্পে—যেমন ভিনাস ডি মিলো বা ডোনাটেলো-র (Donatello) ‘পা থেকে কাঁটা তুলে ফেলছে তরুণী’ (‘Girl taking a thorn out of her feet'), কিংবা একালের ওয়টস্-এর ছবিতে, যেখানে মানবদেহের শারীরিকতা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত—নগ্ন রূপ দেখা যায়।” কিন্তু যারা এইসব বিষয়কে সঠিক অর্থে গ্রহণ করতে অসমর্থ তাদের পক্ষে এক্ষেত্রে অন্ধভাবে বিদেশী শিল্পের অনুকরণ করতে না যাওয়াই ভালো—নিবেদিতা বলতে চেয়েছেন।[৪]

গ্রীস ও রোমের সুদেহী মানবমানবী ও সুদেহী দেবদেবীর অন্ধ অনুকরণকে ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের বিশেষ এক পর্যায়ে বরণীয় মনে না-করলেও গ্রীক ও রোমক শিল্প সম্বন্ধে নিবেদিতার মনে আকর্ষণ ছিলই। মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন—কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, কনস্টানটিনোপল এবং এথেন্স দেখার ইচ্ছা তাঁর ছিল। মিস ম্যাকলাউডকে ১৫ জানুয়ারি ১৯০৭, লিখেছেন :

"এখন অবশ্য জেরুজালেম বা রোমের জন্য কোনো আঁকুপাঁকু নেই [মনে হয়, তিনি কথাটা বলেছেন ধর্মীয় দৃষ্টি থেকে]—কিন্তু হাঁ-হাঁ, প্যাগান রোম। তুমি তার সঙ্গে দিল্লীর তুলনা করেছিলে। সেই কারণেই তা দেখার বাসনা।"

পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক। একথা না বললেও চলে, সামাজিক চেতনা-সমৃদ্ধ শিল্প সম্বন্ধে নিবেদিতার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষার জন্যই প্যুভি দ্য শ্যভান-এর আঁকা এক বিশেষ ধরনের ছবির প্রতি তাঁর অমন তীব্র আকর্ষণ। এইখানেই নিবেদিতার শক্তি, অনেকে বলবেন দুর্বলতা, যাঁদের মতে, শিল্প কোনো কিছুর কাছে দায়বদ্ধ নয়, তা আপনাতে আপনি বিকশিত কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি উর্বশী। অথচ নিবেদিতা দায়হীন জীবন আছে এমন ভাবতেই পারতেন না—এবং জীবনের এক দায়ের সঙ্গে অন্য দায়ের সম্পর্ক নেই—এহেন বিচ্ছিন্নতাবাদীও ছিলেন না।

সামাজিক চেতনা বলতে নিবেদিতা কিন্তু নিছক কতকগুলি জনহিতকর কাজের উৎসাহ বুঝতেন না। যদি গভীর কোনো ভাবাশ্রয়ে ওই কাজগুলি করা না-হয় তাহলে সেসব অচিরে গতানুগতিক স্থূল কাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। এস কে র‍্যাটক্লিফকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯০২ এক চিঠিতে লিখেছেন :

"এই ভ্রমণের দিনগুলিতে [নিবেদিতা ওইসময়ে ভারত সফর করেছিলেন জাতীয়তা সৃষ্টির জন্য] ফ্রেডরিক হ্যারিসনের বই আমার সারা সময়ের আনন্দের বস্তু। মহান নগরীগুলি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা অদ্ভুত তাৎপর্যপূর্ণ—এবং চমৎকার। তাঁর ব্যর্থতার ক্ষেত্র কেবল আদর্শ নগরী সম্বন্ধে। সোস্যালিস্ট, পজিটিভিস্ট, রিফর্মার গোষ্ঠীভুক্ত আমাদের প্রগতিশীল বন্ধুগণের স্বপ্ন কেন দুঃখজনকভাবে স্থূল হয়? আদর্শ কি সব সময়ে বাঁধা থাকবে জলসরবরাহ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং ধনবণ্টনের উন্নততর নীতিতে? যদি তাই হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি ডিসরেলীকে—তাঁর ভূম্যধিকারী ও কৃষকসুদ্ধ তাঁকে—বেছে নেব। হায়, কেউই ভবিষ্যতের নগরী কোন্ আইডিয়ার দ্বারা জড়িত থাকবে সেকথা বলেনা; কিংবা কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের পারস্পরিক স্বাচ্ছন্দ্যের বেশিকিছুর ইঙ্গিত পর্যন্ত করেনা। কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত তোলেনা যে, আদর্শ যুগের শিল্পের কী-রকম বৈশিষ্ট্য হবে। আর ধর্ম বা শিক্ষার কথাটা তো লেখকদের মাথাতেই ওঠে না।"

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে চালিত নিবেদিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে প্রণোদিত করে প্যুভির উল্লিখিত চিত্রটি প্রবাসীর কার্তিক ১৩১৩ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। চিত্রপরিচয় তিনি ইংরাজিতে লেখেন, তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়। বাংলা অংশে স্যাঁত্ জেনভিভ্‌কে কেন "প্যারিসের রক্ষয়িত্রী দেবীরূপিণী' বলা হয় তার বর্ণনা ছিল। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ওঁর জন্ম। ফ্রাঙ্কদের দ্বারা প্যারিস আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হলে অধিবাসীরা যখন অনশনে মরণাপন্ন তখন এই "পূতশীলা নারী" একটি নৌকোয় পালিয়ে গিয়ে ফ্রান্সের বিভিন্ন নগরে ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ ১২-টি জাহাজ বোঝাই খাদ্য এনে অবরুদ্ধ অধিবাসীদের প্রাণ বাঁচান। অন্য একবার তিনি প্যারিস-বিজেতা হিলারিকের শিবিরে গিয়ে, নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁকে তিরস্কার

করে, বন্দী প্যারিসবাসীদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এইরূপ নানা কারণে তিনি প্যারিসবাসীদের কাছে রক্ষয়িত্রী দেবী। "এই চিত্রে তিনি নিদ্রিত নগরীর জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্যারিসের প্যান্থিয়নের দেওয়ালে প্যুভি দ্য শ্যভান কর্তৃক অঙ্কিত সেন্ট জেনভীভের জীবনচরিতবিষয়ক উৎকৃষ্ট চিত্রাবলীর ইহা অন্যতম। ফরাসীরা তাঁহাদের পূজ্যতম ব্যক্তিগণের চিরবিশ্রামস্থল এই মহান উপাসনা-মন্দির নানা পৌর ও ঐতিহাসিক প্রাকারচিত্রে বিভূষিতা করিয়াছেন। আমরাও যেন ভবিষ্যতে কোনও দিন আমাদের মিলনমন্দিরকে (Federation Hall) অলঙ্কৃত করিতে পারি।"

প্যারিস প্যান্থিয়নে স্যাঁত্ জেনভিভ্ বিষয়ে চারটি ম্যুরাল ছবি আছে। এদের মধ্যে খুবই বিখ্যাত ম্যুরাল, "দুঃখী প্যারিসবাসীর কাছে স্যাঁত জেনভিভ খাদ্য এনে দিচ্ছেন।" প্যান্থিয়নের বিরাট আয়তনের সুযোগ নিয়ে দূর থেকে দেখলেই তবে ছবিগুলোর পুরো সৌন্দর্য বোঝা যাবে। "টেম্পেরায় নয়, তেলের কাজ, তবু শিল্পী ফ্রেস্কোর মেজাজে নিজেকে খুলে ধরেছেন। তাঁর মানসভূমি ফ্রা আঞ্জেলিকোর সঙ্গে তুলনীয়। উভয়ই সাধারণ মানবজীবনের বাসনার উর্ধ্বে অবস্থিত;" তাই তাঁদের চিত্ররীতিতে অতিরিক্ত বর্ণক্ষেপের বৈচিত্র্য নেই, ইন্দ্রিয়ের পরিতোষ বিধান অপেক্ষা ভিন্নতর আদর্শে এঁরা অন্বিষ্ট। শ্যভানের ছবিতে আদর্শবাদ রয়েছে কিন্তু বস্তুবিরহিত তা নয়। অনাবশ্যককে পরিহার করেছেন তিনি, আলঙ্কারিকতাকেও সহজের ছন্দে এনেছেন শিল্পে।[৫]

নিবেদিতা, উদ্দিষ্ট ছবিতে স্যাঁত্ জেনভিভ্-এর সাত্ত্বিক মূর্তির সঙ্গে শুদ্ধচারিণী হিন্দু বিধবামূর্তির সমরূপতা না দেখে পারেন নি। উভয় ক্ষেত্রেই অবগুণ্ঠন—যদিও প্রথমটি সন্ন্যাসিনীর, দ্বিতীয়টি ভারতীয় গৃহাশ্রমের। যেমন, কলকাতার ছাতের উপর দাঁড়ালে ছাতের পর ছাত দেখা যায়, শ্যভানের ছবিতেও তাই। অঙ্গনে বাংলার তুলসী গাছের মতো প্যারিসের ছবিতে গোলাপ গাছ, গৃহমধ্যে ক্ষুদ্রদীপ। "সেন্ট জেনভিভ্-এর মুখ ও মূর্তি অনায়াসে কোনো হিন্দু বিধবার মুখ ও মূর্তি হতে পারত। ঠিক এই ছাঁচের চেহারার শত শত হিন্দু বিধবাকে আমরা কি জানিনা?"

"আধুনিক শিল্পে পৌরচেতনার এই সুন্দরতম অভিব্যক্তি"—যেখানে নিদ্রিত জগতের জন্য নিঃস্বার্থ কল্যাণ-কামনার রূপ দেখা যাচ্ছে—সেখান থেকে নিবেদিতার মন নবতর কল্পনায় অগ্রসর হয়েছে। অতীতে ধর্মমন্দিরে বা গৃহাশ্রমে কল্যাণময়ী নারীরা ছিলেন—এখন তাঁরা বিশালতর চিন্তা ও অনুভূতি আশ্রয় করে তাঁদের কল্যাণেচ্ছা ও চেষ্টাকে প্রসারিত করুন কেবল নগরীর উপরে নয়—সমগ্র জাতির জন্য। অনুরূপ সব ছবি আঁকা হোক স্বদেশী যুগের পরিকল্পিত ফেডারেশন হলে—নিবেদিতা চেয়েছেন। ওই ভবনের স্থাপত্য সম্বন্ধেও তাঁর উৎকণ্ঠিত চিন্তা ছিল। সে বিষয়ে নক্‌শা আমন্ত্রণ করে বিজ্ঞাপন বেরোয় ১৯১১-এর গোড়ার দিকে। মডার্ন রিভিউ-এর অগস্ট ১৯১১ সংখ্যায় নোটস-এর মধ্যে "এ সিভিল হল অ্যান্ড ইটস্ আর্কিটেকচার" নামে যে-লেখাটি বেরোয় তা নিঃসন্দেহে নিবেদিতারই। এর মধ্যে তিনি এই হল্ কোন্ রীতিতে নির্মিত হওয়া উচিত, সে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিবেচ্য হলো—আয়তন এবং বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভাবসংহতি। গ্রহণযোগ্য দুই স্থাপত্যরীতির কথাও তিনি তোলেন—নিখুঁত আঙ্গিকযুক্ত বৌদ্ধস্থাপত্য এবং ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্য। নিবেদিতা বৌদ্ধস্থাপত্যের পক্ষেই বলেন আদর্শ হিসাবে—যথাযথ যুক্তিসহকারে অজন্তার ১৯ নম্বর গুহার দৃষ্টান্তকে হাজির করেন। সামনের বারান্দা থেকে শুরু করে বিশাল গুহার অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশের মধ্যে কী-ধরনের

স্থাপত্যসৌন্দর্য আছে তার বর্ণনা করার পরে বলেন—ওহেন অসাধারণ গরিমাময় সৃষ্টি যেখানে আছে সেখানে অন্য আদর্শের সন্ধানে যাবার প্রয়োজন কি ? স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে পথ দেখাতে পারে ; তাই তার সকল মহান আদর্শকে গ্রহণ না করে বিদেশী আদর্শের চাকচিক্যভরা রীতিকে নেওয়ার মতো মানসিক দাসত্ব আর কিছুতে হয়না। "অতীতের মহান কণ্ঠস্বরকে অগ্রাহ্য করে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য নির্মিত পৌর-সভাগৃহকে নির্মাণ করব দোআঁসলা রীতির সাহায্যে ?"—তিনি বিতৃষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন।

মডার্ন রিভিউ-এ ১৯১১-এর অগস্ট মাসে এই রচনা বেরুল—তার আগে একই কাগজে ১৯১০-এর জানুয়ারি, জুলাই ও অগস্ট মাসে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়ে গেছে নিবেদিতার রচনা—'দি এনসেন্ট অ্যাবী অফ অজন্তা' নামক বহুচিত্রশোভিত বিখ্যাত রচনাটি। সে-রচনায় একাধিক স্থানে অজন্তার ১৯ নম্বর গুহার কালনির্ণয়সহ সেখানে বিভিন্ন ভাবধারা মিশ্রণের এবং তার স্থাপত্যমহিমার আলোচনা করেছেন। এই গুহার স্থাপত্যে বিদেশী প্রভাবযুক্ত অতি-অলঙ্কৃতি আছে, সেই ব্যাপারটি তিনি পছন্দ করেন নি, তাহলেও গঠনরীতির দিক থেকে সারা পৃথিবীতে এই ১৯ নং গুহা যে "স্থাপত্যের বিজয়বাদ্যের তুল্য", তাও বলেছেন।[৬]

॥৩॥

শিল্পের সামাজিক প্রয়োগের নানা দিকের মধ্যে ছিল শিল্পসুন্দর জাতীয় শোভাযাত্রার পরিকল্পনা, যেখানে পৌরাণিক ট্যাব্লোর পরিবর্তে নিবেদিতা জাতীয় ঐক্যমূলক ঐতিহাসিক ট্যাবলোর প্রদর্শনীতে ইচ্ছুক ছিলেন। সে-বস্তু হয়ে দাঁড়াবে পথ দিয়ে প্রবাহিত ইতিহাসের মতো। এই ক্ষেত্রে ওয়ারউইক প্যাজ্‌নট্-এর তুল্য কিছু গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা তাঁর চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে। বিষয়টি নিয়ে 'নিবেদিতা ও স্বদেশী আন্দোলন' প্রসঙ্গে আগে (গ্রন্থের ২য় খণ্ডে) আলোচনা করেছি। সেখানে জাতীয় প্রতীক এবং জাতীয় পতাকা পরিকল্পনার প্রসঙ্গও আছে। বুদ্ধগয়া ভ্রমণকালে নিবেদিতা বুদ্ধের বজ্রপ্রতীক দেখে তাকেই জাতীয় প্রতীক করার সিদ্ধান্ত করেন ; তাঁর প্রস্তাবিত পতাকায় সেই প্রতীক স্থাপিত হয় ; জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞানমন্দিরে এই প্রতীক গ্রহণ করেছেন ; রামকৃষ্ণ মিশন ও সারদা মিশনেও নানা প্রয়োজনে এই প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায় ; যদিও শেষপর্যন্ত এই প্রতীক নয়, অন্য বৌদ্ধ স্মারক অশোকচক্রকে স্বাধীন ভারত প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে। বজ্র সম্বন্ধে নিবেদিতার তীব্র আকর্ষণ—কেননা তার পিছনে আছে—পৌরাণিক দধীচির আত্মত্যাগের কাহিনী, বুদ্ধ ও বজ্রের অভিন্নতা, স্বামীজীর নিজেকে বজ্র বলা, এবং দুর্গার করধৃত বজ্র। বজ্র যেহেতু মূর্তি নয়—প্রতীক, তাই মূর্তিপূজাবিরোধীদের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য, ইত্যাদি। বুদ্ধগয়ার মোহন্ত একটি ধাতুনির্মিত বজ্র নিবেদিতাকে উপহার দিয়েছিলেন (ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের বাড়িতে যেটি রক্ষিত ছিল), তার আদলে অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতার 'ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম্' বইয়ের জন্য বজ্র এঁকে দিয়েছিলেন।

পূর্বোক্ত আলোচনায় আমি জাতীয় পুরস্কার হিসাবে বিবেকানন্দ মেড্যালের কথা বলেছি। এই মেড্যালটির সূত্রে নিবেদিতা কী ধরনের অভিনিবিষ্ট শিল্পচর্চা করেছেন, তার কাহিনী সেখানে বলা নেই। কোনো একটি জিনিসকে বুঝে নেবার জন্য বিস্ময়কর পরিশ্রম তিনি করতেন। বিবেকানন্দ মেড্যাল যাতে ঠিক মেড্যাল হয়, সেজন্য সেকালের ফ্রান্সের

সেরা এক বিশেষজ্ঞ, রনে লালীক-এর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন একাধিকবার। এঁর সঙ্গে মিস ম্যাকলাউডের সূত্রে নিবেদিতার যোগাযোগ ঘটে।

লালীক (১৮৬০-১৯৪৫) প্রখ্যাত ফরাসি মণিকার ও অলঙ্কারশিল্পী। উচ্চশ্রেণীর অলঙ্কৃত কাঁচের জিনিস এবং পেস্ট জুয়েলারির ক্ষেত্রে পথিকৃৎরূপে স্বীকৃত। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস এগজিবিশনের সময়ে (যাতে স্বামীজী ও জগদীশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন) ইনি প্রথম নজর কাড়েন। দেখা যায় যে, এঁর কাজে জাপানী রীতি এবং সিম্বলিস্ট আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে। গোটা কর্মজীবনে ইনি অলঙ্কারশিল্প সৃষ্টিতে নিয়োজিত ছিলেন, অসামান্য কাঁচশিল্প রচনাতেও ; শুধু তাই নয়, বড় মাপের গৃহসজ্জার কাজেও খ্যাতি পেয়েছেন। একাধিক বিখ্যাত গির্জার বেদী-পরিকল্পনা ও বেদী-রচনা করেছেন, সেইসঙ্গে গির্জার চিত্রিত রঙিন কাঁচের কাজও। ফরাসি কারুশিল্পের ইতিহাসে এনগ্রেভার হিসাবে তাঁর সমুচ্চ স্থান।[৭]

মিস ম্যাকলাউডের জন্য স্বামীজীর কেশ-সমন্বিত একটি লকেট লালীক তৈরি করে দিয়েছিলেন। (লালীক স্বামীজীর স্ফটিক মূর্তিও তৈরি করেন)। এই লকেটের ছবি আঁকেন ফরাসি শিল্পী মড় স্টাম। নিবেদিতা সেই ছবি পেয়ে মিস ম্যাকলালাউডকে ৪-৭-১৯০৪ তারিখে লিখেছেন :

"আজ মিস মড় স্টামের আঁকা তোমার রেলিক্যোয়ারির [Reliquary: সাধুদের দেহাবশেষ বা ব্যবহৃত জিনিস রাখার পাত্র] চিত্র এসে পৌঁছেছে। কী অপরূপ। কী রহস্যময়। কী শান্ত সুগভীর। মঁসিয়ে লালীক যেভাবে প্রতীকের ভাষায় চিন্তা করতে পারেন—সে ক্ষমতা দেখে কী-যে ঈর্ষা হয়। তবে—আমি যদি তুমি হতাম তাহলে ও-বস্তুকে [কণ্ঠে] ধারণ করতাম না—দেওয়ালে ওর জন্য একটি স্থান ঠিক ক'রে রাখতাম,...এবং নতজানু হয়ে তার দর্শন করতাম। কিন্তু তুমি যে যাযাবর পাখি, তোমার পক্ষে তো তা করা সম্ভব নয়। তাই তোমার জন্য নির্ধারিত আছে একটি স্থান—তোমার হৃদয়।"

মিস ম্যাকলাউডকে ২৮-২-১৯০৬ তারিখে এক দীর্ঘ চিঠিতে নিবেদিতা পরিকল্পিত বিবেকানন্দ মেড্যালের অনেকগুলি স্কেচ-সহ নানা প্রশ্ন ক'রে পাঠান। নিবেদিতার সতর্ক জিজ্ঞাসু মনের চিহ্নবাহী পত্রটি প্রধানাংশে এই প্রকার :

"আবার কবে মঁসিয়ে লালীকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ ? যখন যাবে তখন কি মনে ক'রে আমার হয়ে এই প্রশ্নগুলি তুমি করবে ?

"১. মেড্যালকে কি সর্বদাই গোল হতে হবে ?

"২. মেড্যালের অলঙ্করণের জন্য নক্‌শা-খোদাই করা কি ঠিক পদ্ধতি, নাকি কোনো এক ধরনের রিলিফ ?

"৩. আমি এইভাবে মেড্যাল করতে চেয়েছিলাম—(স্কেচ-১)

"৪. তারপর তোমার কবচের কথা ভাবলাম, যার রেখাচিত্র এই রকম—(স্কেচ-২)।

"৫. তাকে হৃৎপিণ্ড-আকারের কিংবা ঢাল-আকারের করা যায় ; তবে ভারতীয় ঢাল হলো গোলাকার এবং তাতে থাকে বুটি-খোদাই। (স্কেচ-৩)।

"তারপর হঠাৎ দুটি পেতলের পেনডান্ট নজরে এল, ডঃ বসু সেগুলি আমার জন্য একটা গ্রাম থেকে কিনেছিলেন, যাদের আমি কাগজ-চাপা হিসাবে ব্যবহার করছি। আমার পছন্দের জিনিস হলো এইরকম—(স্কেচ-৪), কিংবা এইরকম—(স্কেচ-৫)। তুমি কি মঁসিয়ে লালীককে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে—সম্মান-স্মারক মেড্যালের এগুলি কি স্বীকৃত আকার বলে গৃহীত হতে পারে? তুমি কি তাঁকে একথাও জিজ্ঞাসা করবে যে, এই বিষয়ে ইতিহাসগত জ্ঞান কোথা থেকে পেতে পারি? ভারতে মেড্যাল দেওয়ার খুবই চলন, আমাকে সদ্য একটি দিতে হয়েছে, যার ওজন হালকা বলে ভালো লাগেনি, সেটি ছিল গোলাকার মুদ্রা-আকারের, তাতে পরিচায়ক বক্তব্য খোদাই। আমি আর একটি মেড্যালের জন্য দায়বদ্ধ—বিবেকানন্দ মেড্যাল—যা ৬টি কি ৭টি বিষয়ের কোনো একটির উপরে রচিত প্রবন্ধের জন্য দেওয়া হবে বলে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু সেটি তৈরি করার আগে আমাকে মেড্যালের বিষয়ে আরও কিছু জেনে নিতে হবে। মেড্যালটি যদি এই আকারের হয় (স্কেচ-৬), তাতে বজ্রকে লম্বালম্বি স্থাপন করব (স্কেচ-৭)। বজ্রকে আমরা ভারতের জাতীয় প্রতীক করছি। আর যদি তা এই আকারে হয় (স্কেচ-৮), তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় তার উপরদিকে ভারতীয় মুকুট-চিহ্ন এবং তলায় 'বিবেকানন্দ' শব্দ দিলে (স্কেচ-৯)।

"জাতীয়তার চেতনাকে আমি সর্বপ্রকারে লোকগ্রাহ্য করতে চাইছি। তাই আমার নিশ্চিত ধারণা, মঁসিয়ে লালীক আমাকে কিছু পরামর্শ দিতে চাইবেনই। আমি চেয়েছি, সর্বদাই চেয়েছি, কিন্তু কদাপি বিবেকানন্দের এমন একটি প্রতীক তৈরি করতে সফল হইনি যা হবে মশালের মতো—তার শিখাগুলি পাশে এবং উপরে ছড়ানো। জানিনা, এর সঙ্গে ভারতীয় ত্রিশূলকে (স্কেচ-১০) কোনোভাবে যুক্ত করা যাবে কিনা—মনে হয় যাবেনা। যদি কোনো বাঙালী নারীকে মেড্যাল দিতাম তাহলে ত্রিশূলকে একটি তারকার মধ্যে স্থাপন করতাম, তাতে সংস্কৃত বা বাংলায় এই বাণী উৎকীর্ণ থাকত—'ওই দ্যাখো ধ্রুবনক্ষত্র'—কারণ ওই কথাগুলি শিব বিবাহকালে উমাকে বলেছিলেন (স্কেচ-১১)। কিন্তু গোটা ব্যাপারটি সম্বন্ধে নিজেকে কী-যে অজ্ঞ মনে হচ্ছে কী বলব! আর নিশ্চিত ধারণা, মঁসিয়ে লালীক ভারতীয় কৃষকদের গহনাদির অলঙ্করণ-বৈশিষ্ট্য খুবই উপভোগ করবেন। এই তো গত রবিবার, এক অর্ধনগ্ন বালকের গলায় পাঁচ ফ্রাঁ কি তারো চেয়ে ছোট আকারের ধুকধুকি ঝুলছে দেখতে পেলাম। সেটি দু'পাক সরু রূপোর তার-জড়ানো, মধ্যে যেন মেড্যালের জমি মনে হলো ব্রোঞ্জের তৈরী, অন্তত তার রঙ কালচে—আর তার উপরে কোনো রহস্যময় মন্ত্রপূত উজ্জ্বল নকশা (স্কেচ-১২)। এই নকশায় যেন কালচে জমিতে সোনার তার পিটিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেড্যাল কি এর মতো হতে পারে? এর থেকে কি ভাব নিতে পারি? ইউরোপীয়রা যখন অগোছালো শিঙের আকারে মশাল আঁকে (স্কেচ-১৩), তখন বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায়। অপরপক্ষে প্রাচ্যজগতে যে-কোনো সময়ে নানারকমের মশাল দেখা যাবে, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হলো—অসমান [পাট বা কঞ্চির] আঁটির আকারের বা পাকানো দড়ির আকারের মশাল। মঁসিয়ে লালীককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাকে কিছু পরামর্শ লিখে পাঠিও। তাঁকে বলো, আমি একেবারে অজ্ঞ, আঁকতে জানিনা, তবে মাঝে-মাঝে সুন্দর ভাব মাথায় আসে, কিন্তু কোনো জিনিস সম্বন্ধে অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে আমি ঘৃণা করি।"

লালীক নিবেদিতার প্রশ্নের কিছু উত্তর দিয়েছিলেন। তার থেকে নিবেদিতা "দুটি ব্যাপার" বুঝতে পারেন, "মেড্যাল গোল হবে এবং তাতে যথাসম্ভব নীচু ধরনের রিলিফ

কাশ্মীরে বিবেকানন্দ (১৮৯৮)।
প্রথম দর্শনে (১৮৯৫) নিবেদিতা স্বামীজীর মুখে গভীর ধ্যানলীন আচ্ছন্নতা এবং দিব্যশিশুর কোমলতা দেখেছিলেন, যা তাঁকে রাফায়েলের আঁকা 'সিস্টিন চাইল্ড'-এর কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল।

গ্রীস থেকে সিস্টার ক্রিস্টিনকে লেখা স্বামীজীর পিকচার-কার্ড। স্বামীজী ঘনিষ্ঠভাবে গ্রীসের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য দেখেছেন।
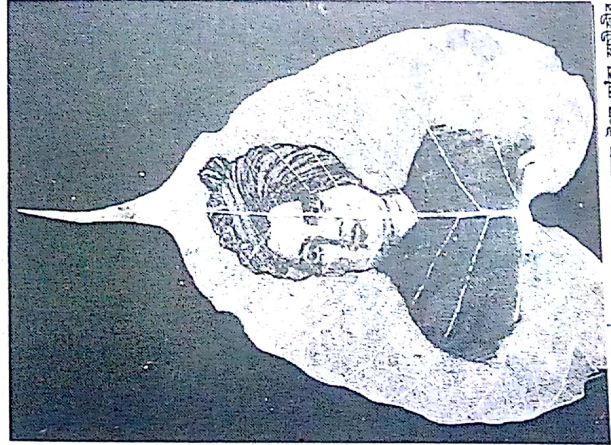
নিবেদিতার ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত অশ্বত্থ পাতার উপর আঁকা স্বামীজীর ছবি। নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সংগ্রহ।

রদ্যাঁর ছাত্রী, বিখ্যাত ভাস্কর মালভিনা [illegible] ব্রোঞ্জমূর্তি।

July 24th 1900
102 E. 58th New York

Dear Joe. The Sun = Knowledge, the Stormy water = work. the Lotus = Love
the Serpent = yoga. the Swan = the Self.
The motto = may the Swan (the Supreme Self) send us that. It is the mind-lake. How do you like it? May the Swan fill you with all these anyway.

I am starting on Thursday next, by the French steamer La Champagne.
The books are in the hands of [illegible]
They are nearly ready.
— I am well, getting better — [illegible]
till I see you next week.

Ever Yours in the Lord
Vivekananda

মিস ম্যাকলাউডকে লেখা স্বামীজীর চিঠি (২৪.৭.১৯০০), যাতে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সীল তৈরি ক'রে, তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন :

"Dear Joe, The Sun = Knowledge, the Stormy Water = Work, the Lotus = Love, the Serpent = Yoga, the Swan = the Self, the motto = may the Swan (the Supreme Self) send us that. It is the mind-lake. How do you like it? May the Swan fill you with all these anyway..."

প্রথম ধর্মোপদেশ দানরত বুদ্ধদেব। সারনাথ।

দণ্ডায়মান বুদ্ধদেব। মথুরা।

উপবিষ্ট বুদ্ধদেব। তক্ত্-ই-বাহি।

তিনটি ছবিই হ্যাভেলের 'ইন্ডিয়ান স্কালপচার অ্যান্ড পেন্টিং' বই থেকে গৃহীত।

ধর্মপালের ব্রোঞ্জমূর্তি। জাভা। হ্যাভেলের পূর্বোক্ত গ্রন্থভুক্ত।
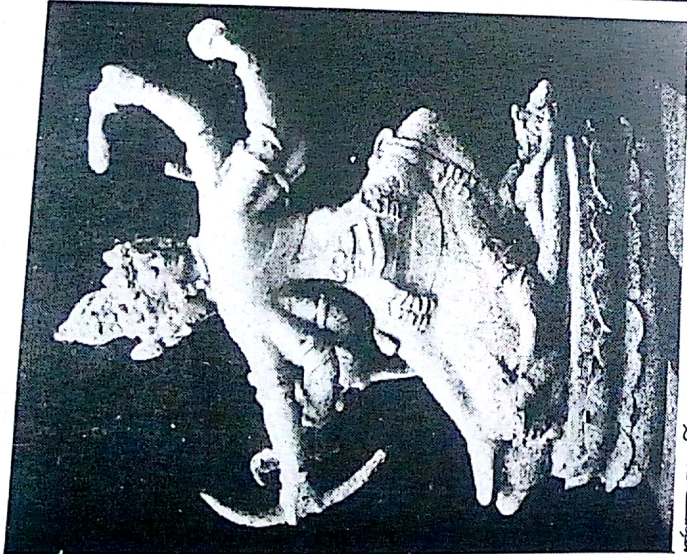
ধর্মপালের ব্রোঞ্জমূর্তি। জাভা। হ্যাভেলের পূর্বোক্ত গ্রন্থভুক্ত।

বাংলায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি। হ্যাভেলের পূর্বোক্ত গ্রন্থভুক্ত।
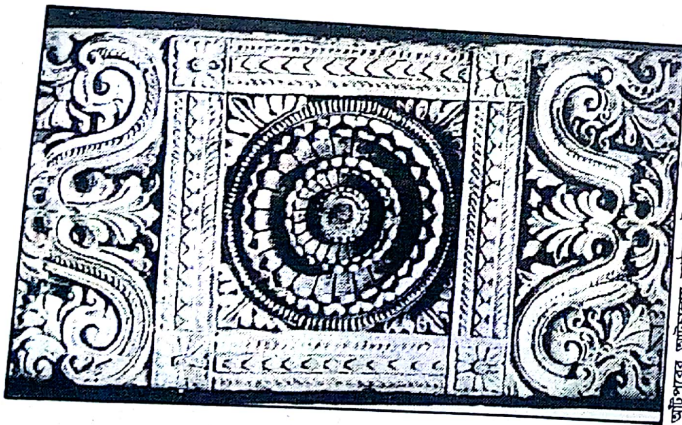
আঁটপুরের মন্দিরগাত্রে টেরাকোটায় কালী রিলিফ। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (নভেম্বর ১৯০৯) হ্যাভেলের গ্রন্থের উপরে নিবেদিতার রচনা।

আঁটপুরের আটচালায় কাঠখোদাই। স্বামী বিবেকানন্দ এই আটচালার বিশেষ প্রশংসা করেছেন বাংলার দেশী শিল্পনিদর্শন হিসাবে।

মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (নভেম্বর ১৯০৯) হ্যাভেলের গ্রন্থের উপরে নিবেদিতার রচনা।
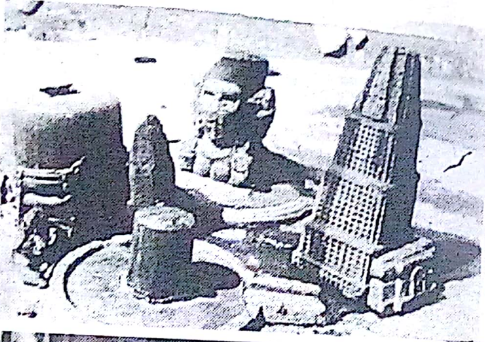
ভারতে লিঙ্গোপাসনার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার খণ্ডনের জন্য নিবেদিতা ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথকে দিয়ে অনেক ছবি তুলিয়েছিলেন। হ্যাভেলের সঙ্গে এ-বিষয়ে তিনি পত্রালাপ করেন (তাঁর একটি পত্রের চিত্র অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।)
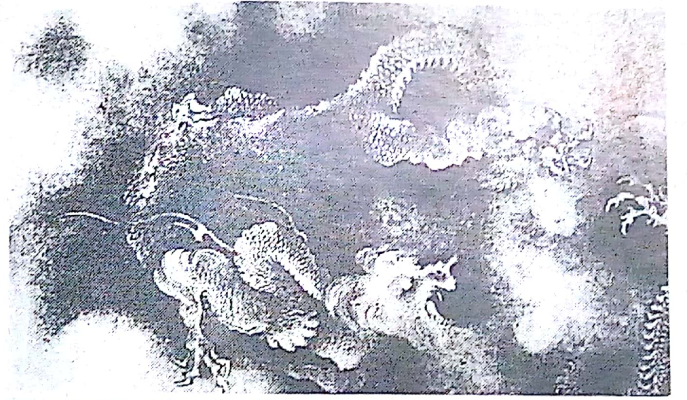
জাপানের ড্রাগন-চিত্র, যার বিশেষ উল্লেখ নিবেদিতা করেছেন।
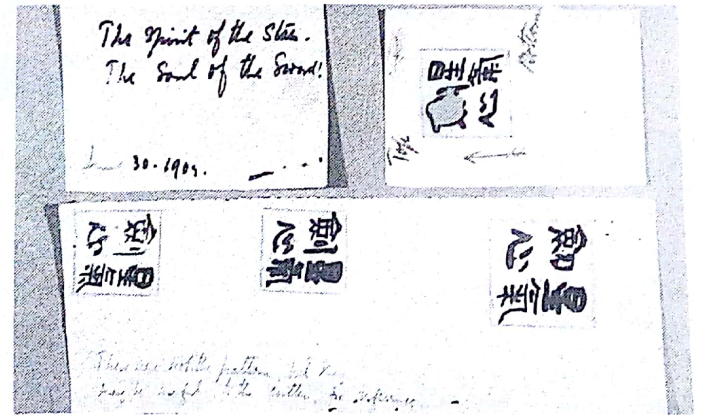
ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থের সম্পাদনা করেন নিবেদিতা। গ্রন্থ-প্রস্তুতির সূত্রে নিবেদিতার নির্দেশাদি।

The Nippon Bijitsu-In, situated in Yanaka Tokio, is a private institution supported by contributions from the members and by private donations. The course includes painting, sculpture, bronze, lacquer, metal work, and design, and instruction is given in the Japanese style only. It holds its half-yearly exhibitions in Tokio, besides periodical exhibitions in the main cities of Japan. The faculty consists, in addition to those who left the Government school, of many prominent independent Tokio artists, especially artists of the Ukiyoye or Popular School. The artists of the New School of Kioto also exhibit their work in that city. Among the prominent artists we may mention: Hashimoto Gaho, the last chief instructor of the Kano Academy, whose vigorous brushwork often approaches that of Morikage and Sesson; Shimomura Kansan, a fine student of the Tosa School, who has struck a new vein of Korin-like impressionism; Matsumoto Fuko, the true follower of Yosai; Ogata Gekko, the chief Ukiyo painter since the lamented Kawanabe Kiyósai; Suzuki Kason, noted for his delicate ink effect (Shijo style); Tominaga Yeisen, the successor of the late Veitaku; and Yokoyama Taikan, with his bold conception, and Kaiwai Giokudo, with his pure effects, both worthy pupils of Gaho.

Okazaki Sessei is celebrated for the inimitable shapes and colour which he imparts to bronzes; and Okabe Kakoya has successfully experimented with the problems of matching the colours of different alloys.

Outside of the two Schools, we must mention the representatives of the Shijo and Bunjin Schools.

Shijo School.—The artistic descendants of Okio and Goshinu are still best represented in the place of the School's birth—Kioto. Imao Keinen is still noted for his delicate birds and flowers. Mochidzuki Giokusen follow closely behind him; but his range of subjects is quite limited. The younger artists who have striven to strike out beyond the limited range, naturally work in the New School of Tokio. Among them we must mention Takenchi Seiho and Tsuji Rako, worthy successors of their teachers, Bairei and Chikudo.

The Bunjin School have been losing ground with the thinning of its ranks. At present Taki Katei holds the foremost rank.

K. OKAKURA.
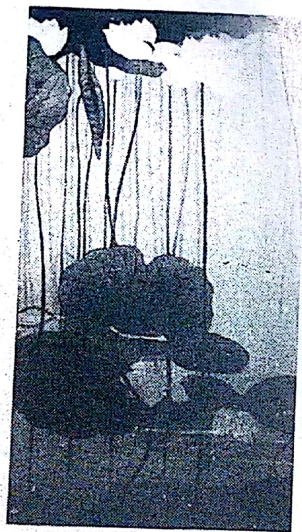
WHITE LOTUS BY NAKAJIMA REISE[N]

THE AUTUMN EXHIBITION OF THE NIPPON BIJITSU-IN—THE JAPAN FINE ARTS ACADEMY

The Imperial Flag of Japan was flying over the entrance.

The pictures are not in large galleries, as with us but a huge hall is adapted to the needs of each exhibition by stretching wide white canvas so tha it forms a maze with narrow passages and number less small rooms. No frames, no heavy gilt; th pictures painted on silk or paper are simpl stretched on light wood, and hung against thes canvas walls.

Outside, the morning was fresh and crisp. Th Japanese artist has caught the very spirit of nature for in this maze of pictures one felt the very sam purity and sparkle of the air, and it is the spiri

ইংলন্ডের স্টুডিও পত্রিকায় (১৫.৩.১৯০২) জাপানী শিল্প-আন্দোলন সম্পর্কে ওকাকুরার প্রবন্ধ। এর মধ্যে মুদ্রিত নাকাজিমা রেইসেন-অঙ্কিত পদ্ম-চিত্রটি নিবেদিতার ব্যক্তিগত সংগ্রহের বস্তু, সে-বিষয়ে আলোচনা গ্রন্থমধ্যে।

ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' বইয়ের রচনাকাজে কেবল নয়, প্রকাশ ব্যাপারেও নিবেদিতার কর্তৃত্ব ছিল। নিবেদিতার কাগজপত্রে তার কিছু নিদর্শন আছে।
উপরে জাপানী অক্ষর। নীচে রেখাচিত্র। নিবেদিতা সংগ্রহে প্রাপ্ত।
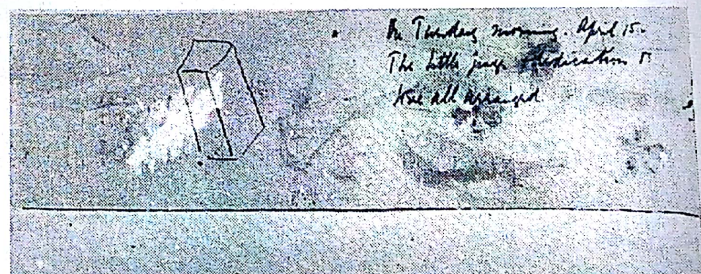
নিবেদিতা লিখেছেন: "On Tuesday morning—April 15—The little pages and dedication etc. were all arranged."
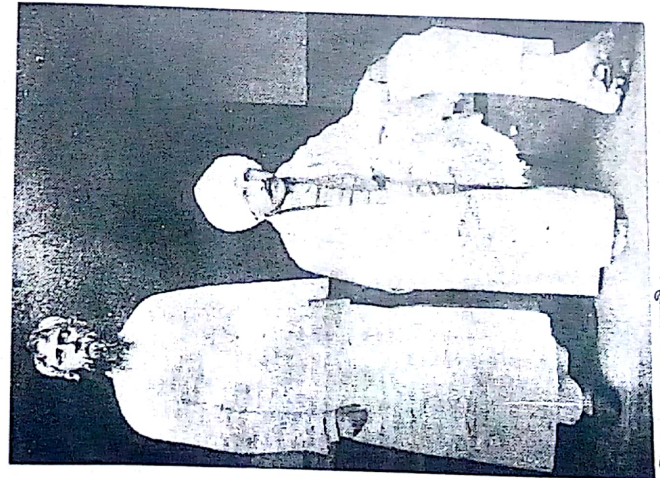
থাকবে।" তিনি "খাঁটি মেড্যালের সঙ্গে ভেজাল মেড্যালের পার্থক্যও" বুঝে নিয়েছিলেন। খাঁটি মেড্যালের রিলিফ তৈরি করার জন্য হাড্রলিক শক্তির দরকার হবে—কিভাবে তা পাওয়া যাবে, তা নিয়ে নিবেদিতা দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন (মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠি, ২.৫.১৯০৬)। তাঁর মাথায় বিবেকানন্দ মেড্যালের আদর্শ চেহারার চিন্তা পাক দিচ্ছিলই। পুনশ্চ লালীককে প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন। মিস ম্যাকলাউডকে তিনি ২৫.৭.১৯০৬ তারিখের চিঠিতে লিখলেন, রিলিফের জন্য বাষ্পশক্তির সহায়তা তিনি টাকশাল বা কোনো বড় কারখানা থেকে জোগাড় করতে পারবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি মেড্যালের আদর্শ চেহারা যে গোল হবেই—সে-বিষয়ে আর নিশ্চিত থাকছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল যে, "মেড্যালের আসল চরিত্র হলো প্রতিযোগিতা-বিজয়ীর নাম তাতে ছাঁচে ঢালাই থাকবে।" "আমি আমার এই মেড্যালকে ছোট ফলকের চেহারা দিতে চাই।...তার এক পিঠে সংস্কৃত অক্ষরে দুটি বাণী উৎকীর্ণ থাকবে, একটি হলো 'বন্দেমাতরম্', যা এদেশে এখন রণধ্বনি হয়ে উঠেছে—অন্যটি হলো, 'ওয়া গুরু কী ফতে', যা ছিল স্বামীজীর প্রিয়। উল্টোপিঠে থাকবে—'জাতীয়তার বিবেকানন্দ মেড্যাল'—সেইসঙ্গে তারিখ ও বিজেতার নাম।" এইসঙ্গে মিস ম্যাকলাউডকে আশ্বস্ত ও প্ররোচিত করে তিনি লেখেন : "এর খরচ বেশি হবে না—তিন কি চার পাউন্ডের মতো। যদি ইচ্ছা হয়, সে অর্থ তুমি দান করতেও পারো। তুমি দিলে খুবই খুশি হবো। তবে জিনিসটি ভারতেই তৈরি করতে হবে। জনগণের শিক্ষা তো চাই।"

মেড্যাল সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা নিবেদিতার এখানেই শেষ হয়নি। কয়েক বছর পরেও তিনি মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে (৩.৪.১৯০৯) প্যারিস থেকে Sadi Carnot Medal কিনে পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে ফ্রান্সের মেটারনিটি মেড্যালের সন্ধান করতেও বলেছেন। সন্তান প্রসবের পরে এই মেড্যাল প্রসূতিকে দেওয়ার রীতি। একই চিঠিতে মেড্যাল সম্বন্ধে নবভাবনার কথাও বলেছেন : গোলাকার বা ডিম্বাকার মেড্যাল অপেক্ষা চতুষ্কোণ ছোট ফলকের আকারে মেড্যাল হলে তাতে স্বাধীনভাবনা প্রকাশের সুযোগ থাকবে, ছবির ছাঁদও আনা যাবে ; গোলাকার মেড্যাল গতানুগতিক, ইত্যাদি। জেরাল্ড নোবেল নিবেদিতাকে কিছু মেটারনিটি মেড্যাল ও অন্য শিল্পবস্তু পাঠিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁকে নিবেদিতা লেখেন (৬.৫.১৯০৯) :

"মেড্যালগুলি সম্বন্ধে মনোভাব কিভাবে প্রকাশ করব জানিনা। Roty Of Carnot's Funeral সম্বন্ধে কী অনুভব করেছি বলে বোঝাতে পারব না। আমরা মনে হচ্ছে—প্যান্থিয়নে [বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাধিগৃহ বা স্মরণগৃহ] একটি দেহকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন ৬ জন অবগুণ্ঠিত নারী—এই জিনিস বাংলাদেশের শিল্পে পূর্ণ নবপ্রেরণার সূচনাভূমি হতে পারে।...আর ক্ষুদ্র মেটারনিটি মেড্যালগুলি—কী সুন্দর। কী অপরূপ সুচারু ও সুকোমল।"[৮]

॥ ৪ ॥

কারুশিল্পের বিষয়ে নিবেদিতার বিশেষ আগ্রহের পরিচয় তাঁর চিঠি ও লেখায় মেলে। সূচীশিল্প সম্বন্ধে তাঁর চেষ্টার কিছু কথা আগে বলেছি। অলঙ্কারশিল্প বিষয়ে তাঁর মনোভাব বোন মিসেস উইলসনকে লেখা একটি চিঠি (১৩.১২.১৯০৫) থেকে দেখে নিতে পারি। একটি অলঙ্কারের স্কেচ দেওয়ার পরে লিখেছেন :

"এই বালাটিতে রয়েছে—একটি পুকুরের মাঝখানে পদ্ম এবং তার চারধারে চারটি

পাপড়ির রূপচিত্র। বালার পুকুর-অংশের কিছুটা ভেঙে গেছে, কিন্তু সহজেই মেরামত করে নেওয়া যাবে। জিনিসটা খুব পুরনো নয়, তবে পদ্মকুঁড়ি, পদ্মপত্র এবং তার উপরে শিশিরবিন্দুর কল্পনা নিয়ে সজীব শিল্প। এটি ঢাকা বা কটকের কাজ—এমন এক কারিগরের তৈরি যার শিক্ষাদীক্ষা কৃষকসুলভ। তার মানে, সে না-জানে পড়তে, না-জানে লিখতে।

"আমি জানি, তুমি এটি পরতে পারবে না। আমার এইটুকু আশা আছে, শিল্পকর্ম হিসাবে এর থেকে আমি যে-আনন্দ পেয়েছি, তা তুমি বা তোমার বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতরা লাভ করবেন।

"সরু রূপোর তারের কাজ ইংলন্ডে অনেক সময় অত্যন্ত স্থূল বলে মনে করা হয়। ভারতে কিন্তু মূল শিল্পরূপটি পাই—যা আমরা [ইংলন্ডে] তড়িঘড়ি নকলের চেষ্টায় নীচুমানের বস্তু করে তুলি। তেঁতুল জল দিয়ে ওটি পরিষ্কার করা যায়।"

এখানে স্মর্তব্য, শিল্প-আন্দোলনের ভিত্তি-চিন্তা নিবেদিতা যতখানি তাঁর বিশেষভাবে শিল্প-নামাঙ্কিত রচনায় করেছেন—তার থেকে কম করেন নি 'ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থে বা স্টেটসম্যানে ও অন্যত্র ১৯০৪ সাল থেকে প্রকাশিত 'স্টাডিজ্ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম' সিরিজের রচনাগুলিতে। শেষোক্ত লেখাগুলিতে নিবেদিতা অসামান্য ভাব ও রূপের চোখে ভারত-দর্শন করেছিলেন। যদি কেউ ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনের সৌন্দর্যছবি দেখে নিতে চান, তিনি যেন 'স্টাডিজ' সিরিজের লেখাগুলি পড়ে নেন। ধরা যাক, তার অন্তর্গত 'দি হিন্দু উইডো অ্যান্ড দি জেনানা' নামক লেখায় হিন্দুনারীর শাড়ির ইতিকথা ও রূপচ্ছন্দ—যা সাদা-মাঠা অনুবাদে এইরকম :

"কেউ জানেনা শাড়ি কত পুরাতন। রামের সীতা বনগমন করছেন—পরনে শাড়ি। মিশরীয় ছবিতে দেবীদের অঙ্গে একফালি সেলাই-না-করা কাপড় ; গ্রীক ভাস্কর্যেও তেমন দেখা যায়।

"রক্ষণশীলদের দৃষ্টিতে সেলাই-করা কাপড় অপবিত্রতাসূচক। সেজন্য আদিম সরলতা রয়ে গেছে এই শাড়িতে, অসামান্য এর সৌন্দর্য—নিরুৎসুকের প্রথম দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে। আর দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণের ফলেই উপলব্ধি করা যায় অবগুণ্ঠনের আঁকাবাঁকা রেখা, মাথাটির বিশেষ ভঙ্গি, চলাফেরার সময়ে আঁচল বিন্যাসের মনোরম ছন্দ। অপূর্ব। বাতাস কখনো-কখনো নাড়িয়ে সরিয়ে দেয় গুণ্ঠনকে, আর আমরা আমাদের এই সাধারণ মানবজীবনের মধ্যেই সহসা মুহূর্তের ঝলকে দেখে ফেলি সিস্টিন-ম্যাডোনার মুখচ্ছবিকে।"

নিবেদিতা বলতে চেয়েছেন—অব্রে বিয়ার্ডস্‌লে, ফিল মে কিংবা ফরাসি পোস্টারের শিল্পীরা টেনিস ব্লাউজ, পিকচার হ্যাট বা ফ্যাশন-মাফিক পোশাকের ছবির ব্যাখ্যায় ভাববিহ্বল হতে পারেন, হোন, তাতে দোষের কিছু নেই, তবে—

"যদি কেউ সাধারণ বাঁচার জীবনের মধ্যে সুগভীর আধ্যাত্মিকতার দর্শন পেতে চান, যদি কেউ জানতে চান একদিকে কোনো এক জীবনের তীব্র যন্ত্রণার রূপ, অন্যদিকে আর একটি জীবনের ভাসমান বাসন্তী সুখের আকার, যদি কেউ বুঝতে চান বিষাদ-জননী ও রাজ্ঞী-জননীর মধ্যে আপাতভাবে যে চুলচেরা পার্থক্যের রেখা দেখা যাচ্ছে তা বস্তুতপক্ষে সীমাহীন পার্থক্য—তাহলে সেই উদ্‌ঘাটন তিনি পাবেন হিন্দু অন্তঃপুরেই। কারণ সেখানে

দেখতে পাওয়া যাবে এমন মর্যাদা ও লাবণ্যকে, যা অপূর্ব ঔদাসীন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল কিছুকেই গ্রহণ করে, যা দৈনন্দিনের কর্মক্লান্তিকে উন্নীত করে দেয় সুচারু-সুন্দর কর্মস্তরে, যেখানে সমদৃষ্টিতে গৃহীত হয় সাধারণ বীজবপনের কাজ কিংবা মর্মান্তিক মৃত্যুর দর্শন। আধুনিক ইউরোপে মিলে-ই (Millet) কেবল শিল্পের ক্ষেত্রে সহজ সাধারণ জীবনের অন্তর্লীন বিপুল সম্ভাবনার রূপকে জেনেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর দোসর নেই। তাঁর 'আঞ্জেলাস' অনন্তের যে-ঘনীভূত রূপের দ্যোতনায় পূর্ণ, তার সঙ্গে উনিশ শতকীয় বাস্তবতার কী গভীর পার্থক্য।"

শাড়ির ছাঁদের বিষয়ে আরও কিছু কথা :

"তারপর ধরা যাক—শাড়ির রঙ। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হলো, কোনো জিনিস যখন তার সঠিক আকারে থাকে তাকে প্রায়ই চিনতে পারিনা। সে বস্তুকে অনেকদিন দেখে তবে চোখ তৈরি করতে হয়। পাড়হীন শাড়িই ছিল আমার পছন্দের বিষয়। পাড়ের সরু রেখাটি—যা শরীরের উপর থেকে নীচে আঁকাবাঁকা হয়ে নেমে আসে, তাকে আগে সামগ্রিক রূপবিন্যাসের ক্ষেত্রে অর্থহীন বাধার মতো মনে হতো, তা যেন চিত্রসুষমায় ছন্দপতন। কিন্তু আজ দেখি, ও-জিনিস মহাশিল্পীর তুলির টানের মতো—গোটা ছবিটির রূপনির্ধারণ করে তাকে সুস্পষ্ট আকার দিচ্ছে।"

শাড়ির রঙ নিয়েও আলোচনা আছে। কিন্তু যেখানে রঙ হারিয়ে গেছে সেখানে শুদ্ধসত্ত্বকে দর্শন করেছিলেন তিনি :

"তথাপি বিধবা নারীর সাধারণ শুভ্র বসনের মতো সমুজ্জ্বল পবিত্রতায় পূর্ণ আর কোনো জিনিস আছে কি? পূজার জন্য তাঁরা রেশমীবস্ত্র পরেন ; আর দৈনন্দিন কাজকর্মে সূতীবস্ত্র—সেগুলি সর্বদাই শুভ্র—কোনো রঙের ছোঁয়া তাতে নেই। হয়ত অনুষঙ্গই এদের মহিমার মূলে। কঠোর সংযমে ভরা সরলতা—সর্বোচ্চ আদর্শেরই স্মারক। তাতে আছে সমগ্র বিশ্বকে বরণ করার মতো হৃদয় এবং উৎসর্গীকৃত জীবন। পশ্চাৎপটে রয়েছে অতীতের শোক, যা বর্তমানকে প্রস্তুত করেছে কেবলই দানের জন্য। বৈধব্যের শুভ্রবসনে উচ্চারিত রয়েছে এই তাৎপর্যকথা।"

নিবেদিতার কাছে শিল্প নিছক ব্যক্তিবিলাসের বস্তু ছিলনা—সমষ্টিমনের অভিব্যক্তির দিকটিকে তিনি সব সময়েই বড় করে তুলে ধরেছেন। একটা শহরের কথা ভাববার সময়ে তাঁর মনে পৌর-স্বাস্থ্যব্যবস্থা বা পৌর-শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অবিলম্বে কলাশিল্প-সংগঠনের কথা উঠেছে। শহর কতকগুলি বাড়ির সমাবেশ নয়, তার মধ্যে একটা প্রাণ বা আত্মা আছে—"তা মানুষের প্রেমাগ্নি রক্ষার আধার।" প্যারিসের মতো অত্যন্ত আধুনিক, নিতান্ত পার্থিব এক শহরে প্যুভি দ্য শ্যাভান স্যাঁত্ জেনভিভ্-এর ছবি এঁকে প্রমাণ করে দিয়েছেন—এহেন শহরও বিশ্বাস করতে চায়—তার জন্য স্বর্গে কোনো পরম আত্মা প্রার্থনারত। নিবেদিতার বিশ্বাস এমনই ছিল।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ এই কথাগুলি লেখার সময়ে নিবেদিতার মনে স্বামীজী বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অনেক স্মৃতির সঙ্গে নিশ্চয় বিশেষভাবে একটি দিনের কথাবার্তার স্মৃতি জাগরূক ছিল। স্বামীজী ১৮৯৯ অক্টোবর মাসে নিউইয়র্ক অঞ্চলে লেগেটদের গ্রাম-ভবন

রিজলি ম্যানরে ছিলেন। সেখানে নরওয়ের বিশ্ববিখ্যাত বেহালাবাদক মিঃ ওলি বুলের পত্নী মিসেস বুলের সঙ্গে স্বামীজীর বাক্য বিনিময়ের কথা লিখেছেন ওই সময়ে উপস্থিত নিবেদিতা তাঁর ১৮ অক্টোবর ১৮৯৯-এর চিঠিতে :

"...Mrs Bull turned and pointed out how his [Swamiji's] poetry had been the weak point on which he had been beguiled to the loss of honour. And she said her husband [Mr Bull] was never sensitive about criticism of his music, that he expected, he knew it was not perfect. But on road-engineering he felt deeply, and could be flattered!...And he [Swamiji] suddenly woke up and said–'You see there is one thing called Love–and there is another thing called Union. And Union is greater than Love. I do not *Love Religion.* I have become identified with it. It is my life. So no man loves that thing in which his life has been spent, in which he readily has accomplished something. That which we love is not yet ourself. Your husband did not *love* music for which he had always stood. He loved engineering in which as yet he knew comparatively little. This is the difference between Bhakti anf Gnan. And this is why Gnan is greater than Bhakti." [Letters of Sister Nivedita, Vol. I. p. 216]

২ Encyclopedia of Painting, (Editor, Bernard S. Myers). Encyclopedia of World Art, Vol XI (McGraw-Hill Book Company, New York)

৩ Prabuddha Bharata, March 1969, p. 114

৪ Complete Works of Sister Nivedita, Vol. III, pp. 15-16, ('The Function of Art in Shaping Nationality').

আর্ট স্কুলের ছাত্রদের ন্যুড মডেল থেকে ছবি আঁকা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের মনোভাবের কথা নন্দলাল জানিয়েছেন। অম্ল-কষায় মেশানো বর্ণনাটি। এক ছোকরা শিল্পী চিৎপুরের এক মেয়েকে মডেল করে অয়েল পেন্টিং-এ ন্যুড ছবি করেছে। তা দেখে অবনীন্দ্রনাথ 'গম্ভীর' হয়ে গেলেন। তারপর :

"তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে খানিক প্রশংসা করলেন : হিসেব করে দেখালেন, এটা তেলরঙে আঁকতে খরচ হয়েছে পঞ্চাশ টাকা, আর এটা বিক্রি হলে লাভ হবে পঞ্চাশ টাকা। এই একশো টাকা সাকুল্যে আসবে এটা থেকে। তারপর তাকে বলতে লাগলেন, 'ন্যুড মূর্তি করেছ, এটা করে তুমি কী সুখ পেলে? এই টাকা খরচ করলে এই মেয়েটির ওখানে তুমি এতো বার যেতে পারতে। বাপের কি টাকা-পয়সা রাখবার জায়গা নেই বাবা? এই টাকা এভাবে নষ্ট করতে গেলে কেন? যদি ইচ্ছেই আছে, ওর কাছে গিয়ে একা-একা উপভোগ করলে না কেন? নিজের বদ মতলব এভাবে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজকে দূষিত করার কি অধিকার আছে তোমার'?" (পঞ্চানন মণ্ডল, ভারতশিল্পী নন্দলাল, ১ম, পৃ. ৬৭-৬৮)।

জঘন্য শুচিবাতিক!—জীবনবাদী দেহঘাটা শিল্পতত্ত্বের দৃষ্টিতে—বলাবাহুল্য।

৫ Arthur Fish, 'Great Pictures by Great Painters'.

৬ নানা দিক দিয়ে অজন্তার ১৯ নং গুহার বিচার নিবেদিতা করেছেন। আমি তাঁর সিদ্ধান্তবাক্য তুলছি :

"Inspite of its eclecticism of detailed, and daring romanticism in the treatment of sacred subjects, Nineteen at Ajanta remains one of the architectural triumphs of the world. It is the very flowering-point of a great civic life. The strong porch, brought forward on two solid pillars, suggests the presence and words of the leaders of men; the side-galleries, their supporters and attendants; while on the sill of the great window behind we have room and background for the anointing of a king, or the lying-in-state of the dead."

"Chinese, Gandharan, Persian and Ceylonese elements mingle with touches from every part of India itself in the complexity of this superb edifice." [NCW, Vol. IV, pp. 50, 62]

৭ The New Caxton Encyclopedia, Vol II (1967)

৮ পাশ্চাত্ত্যে মেড্যাল দীর্ঘদিনের চর্চার বিষয়। তার নানা বিবর্তন ঘটেছে। ফলক বা মুদ্রার সঙ্গে তার পার্থক্য তাতে ঘোষিত। মেড্যাল সাধারণত গোলাকার, তার একদিকে প্রায়শই থাকবে একটি মুখাকৃতি, অন্যদিকে উদ্দেশ্যযুক্ত ডিজাইন। এই ডিজাইন অনেক সময়ে অতি সুন্দর, সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে ফলকেও মুদ্রিত হয়। মেড্যাল সাধারণত ব্রোঞ্জ বা সীসায় তৈরী হয়, কারণ সোনা বা রূপায় তৈরী হলে গলে যাওয়ার সম্ভাবনা। আধুনিক মেড্যালগুলিতে শাসক, শিল্পী, লেখক, পণ্ডিত প্রমুখের চমৎকার মুখাকৃতি মেলে। সেরা মেড্যালিস্টরা বড় চিত্র-শিল্পী—ভাস্কররা এইক্ষেত্রে সফল হননি। ক্লাসিকাল যুগে বা মধ্যযুগে মেড্যালের অস্তিত্ব থাকলেও আধুনিক মেড্যাল ইতালীয় রেনেসাঁসের উদ্ভাবন।

কিভাবে মেড্যাল তৈরী হয়, সেরা মেড্যালিস্ট কারা, এসব বিষয়ে প্রচুর আলোচনা আছে শিল্পগ্রন্থের বিশ্বকোষ। [The Oxford Companion to Art, Ed, Harold Osborne].

নবম অধ্যায়

'শিল্প-জাগরণ আমার জীবনস্বপ্ন'

১৯০৫, ১২ মার্চ রবিবার—নিবেদিতা মস্তিষ্কপ্রদাহে আক্রান্ত—বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। তার দু'দিন আগে শুক্রবার তিনি তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা সমাপ্ত করেছেন। বেশ কিছুদিন পরে ১৩ ডিসেম্বর ১৯০৬, তিনি ম্যাকলাউডকে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"একথা জেনে আমি যেমন আনন্দিত তেমনি বিস্মিত যে, তুমি 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্' লেখাটি পছন্দ করেছে। আমার মনে হয়েছিল, লেখাটি সাধারণভাবে পড়ে উপভোগ করার পক্ষে বড়ো বেশি টেকনিক্যাল। কিন্তু কীভাবে ওটি তৈরি হয়েছিল সেকথা ভাবলে আনন্দ পাই। এক সন্ধ্যায় বসে ভাবছিলাম—'ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে এই যদি আমার শেষ উক্তি হয় তাহলে ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রদত্ত স্বামীজীর গোটা আদর্শকে এক অখণ্ড বার্তার মধ্যে ধরিয়ে দেওয়া যাক।' তিনটি সন্ধ্যায় লিখে ওটি শেষ করলাম। তারপর কপি ক'রে বোধহয় সেই সপ্তাহের শুক্রবার দিন পাঠিয়ে দিই। দু'দিন পরে আমি ব্রেন-ফিভারে শয্যাগত—কেউ জানত না, বাঁচব কি মরব? সুতরাং এই লেখাটি সত্যই হয়ে উঠতে পারত—আমার শেষ ইচ্ছাপত্র ও ঘোষণাপত্র।" ('Last Will and Testament')।[১]

শক্তিশালী চিন্তায় এবং অনুরূপ ভাষায় উদ্দীপ্ত লেখাটিতে নিবেদিতা 'জাতীয়তা' বলতে কী বোঝেন তা তুলে ধরেছেন। এর মধ্য হতে কেটে বেরিয়ে এসেছে প্রাচীন ও নবীন এবং বিদেশী ও স্বদেশীর মধ্যে উচিত সম্পর্কের চরিত্র-রূপ। তাঁর বক্তব্য : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মানুষকে নিকটবর্তী করেছে, দ্বার ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে গৃহবদ্ধরা। প্রাচ্যপৃথিবীর মানুষ পাশ্চাত্ত্যে গিয়ে সেখানকার গণতান্ত্রিক আচার-আচরণ দেখে প্রভাবিত হয়, এবং ঘৃণা করতে শুরু করে স্বদেশীয় সবকিছুকে। সত্যকার সভ্যসমাজে এই মনুষ্যগুলি 'স্নব' শব্দে চিহ্নিত এবং হাসির পাত্র। নিবেদিতা বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, পুরনো জীবনের শক্তির অংশটিকে যেমন নিতে হবে তেমনি বিশ্বভাবনায় চালিত হয়ে গ্রাম্য কুসংস্কারকে এড়াতেও হবে। জাতীয় ভাবাদর্শ বলতে তিনি "সমগ্র অতীত জীবনকে বিশ্বজীবনের অঙ্গীভূত করার" আদর্শকে বুঝেছেন। "জাতীয় ভাবকে আত্মগত করতে হবে

বিশ্বভাবের অংশ হিসাবেই। সেজন্য প্রয়োজনে ভাঙতে হবে আচারের বন্ধন—তবে তা যেন নীচ ব্যক্তিস্বার্থে করা না-হয়।" বিশ্ব-জাতীয়তার প্রসঙ্গও তিনি তুলেছেন, যেখানে উপনীত হওয়া যে-কোনো দেশের যে-কোনো সময়ের মানুষের পক্ষে কঠিন। "বিশ্ব-জাতীয়তার অর্থ—বিশ্ব-ভাবের মধ্যে স্থানীয় ভাবের স্থাপন ও লালন। সকলেই জানেন এই কথাটি, সংস্কৃতি মানে নয় তথ্য-জ্ঞান, তার উৎস সমানুভূতিতে।" পুরাকালের অন্ধ অনুকরণে বর্বর পিছুটানের শক্তির অর্চনা সম্বন্ধে কঠিন সতর্কবাণী যেমন তিনি করেছেন, তেমনি একথাও সুনিশ্চিত ভাষায় বলেছেন—ভারতবর্ষে আমরা অপরের তৈরি কর্মসূচী হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করব না, তাকে রচনা করব আমরাই ; আমাদের অভিযান-পথ নির্ধারণের দায়িত্ব আমাদেরই, অন্য কেউ তা আমাদের হয়ে করে দেবেনা ; এজন্য নতুন করে লিখতে হবে ভারতের ইতিহাস, যা হবে ভারতের সকল স্থানের সকল মানুষের ইতিহাস ; সেই ইতিহাস হোক ভবিষ্যতের জন্য সুসমাচারের শঙ্খধ্বনি।

এই পটভূমিকাতে উক্ত 'অ্যাগ্রেসিভ' লেখাটির শিল্প-প্রসঙ্গকে স্থাপন করতে হবে। নিবেদিতা লিখছেন :

"শিল্পের নবজন্ম চাইই। এখন আমরা যার সঙ্গে পরিচিত সেই হবু-সাহেবিয়ানার দুঃখজনক অনুকরণ-প্রয়াসের দ্বারা তা ঘটবে না। জনগণের কাছে পৌঁছবার জন্য শিল্পের তুল্য ভাষা আর কোথাও নেই। একটি সঙ্গীত—একটি চিত্র—এরা হয়ে উঠতে পারে অগ্নি-ক্রুশ। [আধপোড়া কাঠের অমসৃণ ক্রুশ, যা স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে চালান দেওয়া হতো যুদ্ধবার্তা ঘোষণার জন্য]—যা সকল উপজাতির মধ্যে পৌঁছে গিয়ে তাদের সংগঠিত করবে অখণ্ড জাতিরূপে। শিল্পের নবজন্ম হবেই হবে—কারণ তা পেয়ে গেছে নতুন বিষয়বস্তু—যার নাম স্বয়ং ভারতবর্ষ। আ-হা! অর্ধনগ্ন পারিয়া [অচ্ছুত] সাবলীল ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে মাদ্রাজের বীচ-রোড ধরে—পৃথিবীর সামনে তার সৌন্দর্য তুলে ধরার জন্য যদি কেউ হয়ে ওঠেন ব্রোঞ্জ-আঙ্গিকে চিন্তা করার মতো সমর্থ শিল্পী! আ-হা! যদি কেউ উষাকালে সমুদ্রতটে পূজারত নারীকে চিত্রিত করার জন্য হয়ে ওঠেন মিলে-র মতো শিল্পী! কী অপূর্ব সেই আঁকার পেনসিলটি—যা ভাষ্য রচনা করবে ভারতীয় শাড়ির, যা রেখায়িত করবে মধুর গ্রামজীবন ও মন্দির, গঙ্গাতটে স্নানার্থীর গমনাগমন, শিশুর খেলা, মানুষের মুখ, শ্রমের আকার এবং ভারবাহী গাভীগুলিকে।

"আমরা চাই আরো। স্বয়ং ভারতবর্ষের পক্ষে আমরা এমন শিল্পীকে চাই যিনি অর্ধাংশে কবি, বাকি অর্ধাংশে নকশাকার—যিনি আমাদের মধ্যে বিশাল আকারে নবভাবনাসমূহের জাগরণ ঘটাবেন। শিরা-ধমনীতে ভারতীয় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এমন মানুষকেই আমাদের প্রয়োজন। তিনি আমাদের কাছে চিত্রিত ক'রে দেবেন অতীতের বৃহৎ মানুষগুলিকে—যথা, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির, আকবর ও শেরশাহ, প্রতাপ সিংহ ও চাঁদবিবি। তা এমনভাবে করবেন যাতে দোলা লাগে রক্তস্রোতে। এই সকলের দ্বারা ভারতের মানুষ হিসাবে আমরা অনুভব করব—ভাবীকালে কী আমাদের কর্তব্য? শুধু বিশ্বের সামনে ভারতকে প্রকাশ করা নয়, ভারতের কাছেও ভারতের উন্মোচন হলো শিল্পের উদ্দেশ্য—সে ভারত আদর্শের দিব্যজননী—অবতরণকালে যিনি নিজেকে ঢেকে নেন বাস্তবের পরিচ্ছদে।"

শিল্প-আন্দোলনের ইতিহাসে লেখাটির মূল্য এইখানে—অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিপ্রতিভায় নব্যভারতীয় শিল্পধারার সূচনা হলেও তা এখনো তাঁতেই আবদ্ধ, এখনো তিনি আর্ট স্কুলে সহাধ্যক্ষের পদে যোগ দেননি (তিনি সেখানে যোগদান করেন অগস্ট ১৯০৫), এবং তাঁর যে-ছাত্রধারা এই শিল্প-আন্দোলনকে প্রসারিত করবেন তাঁদের অগ্রণী নন্দলাল ছাত্ররূপে এখনো আসেন নি, নন্দলালের সতীর্থ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রমুখও নন।[২] অবনীন্দ্রনাথ আর্টস্কুলে যোগদানের আগেই অবশ্য নিবেদিতা সেখানে বক্তৃতা করেছেন 'ললিতকলা' বিষয়ে—২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫।[৩] চিঠিপত্রে, 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থে, এবং প্রবন্ধাদিতে শিল্পপ্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু ১৯০৫ মার্চ মাসেই তাঁর পূর্বোক্ত ঘোষণাপত্র দেখা গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই আর একবার 'লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট' লেখার প্রয়োজন হলো। পূর্ববঙ্গের বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে সেবাসংগঠন করে ফিরে আসার পরে ১৯০৬ সেপ্টেম্বর মাসে নিবেদিতা ঘোর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। এই অসুখও মারাত্মক হয়ে ওঠে। (স্মর্তব্য, তখন ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি)। তার কিছুদিন আগে, জুলাই মাসের মাঝামাঝি (১৬-৭-১৯০৬) কী কারণে বলা শক্ত, নিবেদিতা মিসেস বুলকে তাঁর পরবর্তী জীবনের রেখাচিত্র দিয়েছিলেন—সেইসঙ্গে দেহান্তের পরে তাঁর যদি কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকে তা কিভাবে ব্যয়িত হবে, তাও বলেছিলেন। সে অর্থের কিছু যাবে বিজ্ঞানচর্চা ও নারীশিক্ষার জন্য। তারপর শিল্প সম্বন্ধে যা বলেছেন সেই কথাগুলি তাঁর হৃদয়ের রক্তচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নয় :

"জাতির উদ্দেশ্যে। এক হাজার পাউন্ড, যার সুদ থেকে একটি বাৎসরিক পুরস্কার স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতীয় শিল্পীকে দেওয়া হবে—ভারতীয় রীতিতে ভারতীয় ইতিহাসের বিষয়ে আঁকা সেরা রেখাচিত্রের জন্য। বিচারক হবেন, ফরাসি বা আমেরিকান শিল্পী নিয়ে গড়া তিনজনের একটি কমিটি। উপযুক্ত মানের সৃষ্টি না পেলে বছরের পর বছর পুরস্কার আটকে রাখা যাবে। উপযুক্ত মানের শিল্পসৃষ্টি করতে পারলে একই শিল্পী একাধিক বৎসর পুরস্কার পেতে পারেন। সস্তায় কপি করা যাবে, রেখাচিত্রটি যেন এমন হয়। ম্যুরাল ছবির বর্তমান বিকল্প হলো—কাগজে ছাপা সস্তা কপি। কেউ তিনবার পুরস্কার পেলে তাঁকে কমিটিতে অন্যতম বিচারক হিসাবে নেওয়া যেতে পারে।

"ভারতীয় রীতি বলতে আমি বুঝি—ঐতিহ্যবাদী প্রাচ্যরীতি, পুরাতন পাণ্ডুলিপি, এবং ভাস্কর্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত রীতি। এইসব রীতিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। ইউরোপীয় রীতি নিলে পুভি দ্য শ্যভান, ববতে দ্য মঁভাল, রসেটি, প্রি-র্যাফায়েলাইট এবং মিডিয়াভ্যাল। আমি চাই মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের যোগ—নিছক চোখ ও হাত দিয়ে আঁকা ছবি নয়। চাই ভাবাত্মক ছবি।

"...জনসাধারণ যদি আমার স্মৃতিরক্ষার জন্য কোনো অর্থদান করে, তা যেন মিউজিয়াম এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহে রক্ষিত বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রতিরূপ করার কাজের পুরস্কাররূপে ব্যয়িত হয়। যে-কোনো উপাদানেই প্রতিরূপ করা যাবে—তবে সে সকলকে সুবৃহৎ আকারের হতে হবে।

"জাতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ আমার সর্বপ্রিয় স্বপ্ন। ভারত যখন তার পুরাতন শিল্পকে ফিরে পাবে তখন সে শক্তিশালী জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।"

লক্ষ্য করার বিষয় : নিবেদিতা তাঁর ইচ্ছাপত্রে কেবল ভারতীয় নয়, প্রয়োজনে বিশেষ চরিত্রের ইউরোপীয় শৈলী গ্রহণের কথাও বলেছেন। শুরুতে বিচারক করতে চেয়েছেন পাশ্চাত্ত্য শিল্পীদের। তাঁর ঝোঁক ম্যুরালের দিকে। রঙের থেকে রেখার উপরে জোর দিয়েছেন ; ভাস্কর্য-রীতির প্রতিও ঝোঁক। মিনিয়েচার অপেক্ষা বৃহদাকার ছবির প্রতিই তাঁর পক্ষপাত।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্' ঠিক কখন লেখা হয়েছিল ? প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার 'ভগিনী নিবেদিতা' (১৯৫৯) গ্রন্থে পাই, তা লেখা হয় ১৯০৫ জানুয়ারি মাসে। এই কথা সত্য বলে মনে হতে পারে কারণ মাদ্রাজের ইন্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার সন্ধানকালে দেখেছি, ১৯০৫ ফেব্রুয়ারি থেকে সেখানে লেখাটি বেরুতে শুরু করে। সেক্ষেত্রে আবার নিবেদিতা যে বলেছেন—লেখাটি শুরু করার দু'দিন পরে তিনি অসুখে পড়েন—সে অসুখ যে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে হয়েছিল বলে মনে হয়। মিসেস বুলকে লেখা নিবেদিতার ৫ মার্চ ১৯০৫, রবিবারের চিঠিতে কোনো অসুস্থতার কথা নেই। এর পরের চিঠি যা পেয়েছি তা হলো মিস ম্যাকলাউডকে ৫ এপ্রিল তারিখে লেখা—জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি থেকে। এর প্রথম লাইনে পাই : "দুই কি তিন সপ্তাহ ধরে আমি গুরুতর অসুস্থ ছিলাম—শুরু হয় ব্রেন-ফিভার দিয়ে।" অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে বসুদের বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। হতে পারে ভিতরে-ভিতরে অসুখের আক্রমণ হয়েছে, তখনই তিনি এই লেখাটি শুরু ও শেষ করেন। সেইজন্যই তাঁর মনে অসচেতনভাবে 'লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট' কথাটি উঠেছিল। সেক্ষেত্রে এটি লিখেছেন ৭-৯ মার্চ। অনুমান করি, ইন্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যা দেরিতে বেরিয়েছিল।

২ সংবাদগুলির সূত্র, **An Album of Nandalal Bose.** (Santiniketan Ashramik Sangha, Calcutta, 1956), pp. 8-9। অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, "ভারতের শিল্প ও আমার কথা," পৃ. ১৬৭। **Nandalal Bose (1882–1966) Centenary Exhibition** (National Gallery of Modern Art, New Delhi) p. 19.

৩ মুক্তিপ্রাণা, পৃ. ৩২৫। নিবেদিতার ডায়েরি থেকে ইনি এই সংবাদ পেয়েছেন।

দশম অধ্যায়

নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথ

॥ ১ ॥

সামাজিক আদর্শবাহী যে-ধরনের ভারতীয় শিল্পের আকাঙ্ক্ষায় নিবেদিতার সমগ্র চেতনা সূচীমুখ—তা এক নবসৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে হর্ষোচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—ছবির নাম 'ভারতমাতা'—শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯০৬ সালের জুলাই মাসে নিবেদিতা চিঠিতে যখন তাঁর 'লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট'-এ ভারতের সামাজিক শিল্প সম্বন্ধে স্বপ্নকথা লিখছিলেন, ঠিক তখনি তাঁকে সানন্দে লিখতে হয়েছে ভারতের সামাজিক শিল্পের জন্মকথা। 'ভাণ্ডার' পত্রিকার জুন ১৯০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ভারতমাতার প্রতিলিপি। ভাদ্র ১৩১৩, প্রবাসীতে সেই চিত্রের বিষয়ে নিবেদিতার ইংরাজি রচনা বঙ্গানুবাদসহ বেরোয়। ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড পত্রিকার অগস্ট ১৯০৬ সংখ্যায় একই বিষয়ে আর একটি লেখা বেরোয়।[১] প্রবাসীর লেখাটি সংক্ষিপ্ত, ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড-এর লেখা দীর্ঘতর। উভয় লেখাতেই ছবিটির বিষয়, আঙ্গিক ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যা ছিল। প্রবাসীর লেখা শুরু হয়েছিল এই বলে : "এখানে এমন একটি ছবি পাচ্ছি যা ভারতীয় শিল্পে নবযুগ সূচনার আশা জাগাচ্ছে।" প্রবাসীর মতো করেই ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড-এও বলা হয়, "নতুন স্টাইলের এই হলো প্রথম মাস্টারপিস, যার মধ্যে একজন ভারতীয় শিল্পী মাতৃভূমির ভাবনাচেতনাকে যেন সত্যই মোচন করতে সমর্থ হয়েছেন।" "শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে ভারতীয় ভাষায় ভারতের হৃদয়ের কাছে অনুপম আবেদন।" অবনীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী শিল্পপ্রয়াস সম্বন্ধে নিবেদিতা সচেতন ছিলেন। সেইসকল কাজের মধ্যে, তাঁর মতে, অবনীন্দ্রনাথ যথার্থ "অভিব্যক্তির ভাষা আয়ত্ত করছিলেন, তৈরি করে নিচ্ছিলেন নিজের স্টাইল। এইবার তার সাহায্যে শুরু করেছেন কবিতা।" ছবিতে দেখা গেল :

"অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা দাঁড়িয়ে আছেন সবুজ জমিতে। পিছনে নীল আকাশ। ক্ষুদ্র সুন্দর চরণদুটির নীচে চারটি অস্পষ্ট শ্বেতপদ্ম। তাঁর চারি হস্ত—ভারতীয় ভাবনায় যা

দৈবশক্তির দ্যোতক। পরিধানের শাড়িতে কঠোর শুচিতা। নয়ন ও ললাটে পরম স্বচ্ছতা—পিছনে বিস্তৃত শুভ্র জ্যোতিচক্র—স্তব্ধ করে দেয় সম্ভ্রমে। শিক্ষা-দীক্ষা-অন্ন-বস্ত্র—সন্তানের জন্য এই চারটি দান মাতার চতুর্ভুজে।"

নিবেদিতার প্রেমদৃষ্টি তাঁর বসবাসের সংকীর্ণ গলিটিকে (এবং নিশ্চয় আরও অনেক গলিকে) শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয়রূপে কল্পনা করতে প্রণোদিত হয়েছে। গলির মধ্যে বাড়ির বারান্দার দেওয়ালে লাগানো হোক মস্ত আকারের ম্যুরাল ছবি—"যার কোনোটি আঁকা হবে প্রচলিত রঙে, কোনোটি তৈরি হবে মোজেয়িকে, কোনওটি-বা অতীত ভারতের রীতিতে পাথরের নীচু রিলিফে—তাতে রূপায়িত হবে পৌরজীবনের শক্তিশালী রূপ বা জাতির অতীত কাহিনী।" তিনি দেখেছেন, ভারতের নানা মন্দিরে কার্নিসের নীচে রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণের কাহিনী নিয়ে রচিত দীর্ঘ প্রসারিত রিলিফ। দৃঢ় ভাষায় বললেন, "কিন্তু আমি যে-ভবনগুলির কথা এখন বলছি, সেগুলি হবে [ধর্মমন্দির নয়] পৌরমন্দির, কিংবা জাতীয় ভাববাহী মন্দির। ওসব মন্দিরে কদাপি পৌরাণিক চিত্রকে স্থান নেওয়া হবেনা।" তিনি ভাবতে চাইলেন, সেখানে অঙ্কিত হবে—"অশোক তাঁর বার্তাদূতদের পাঠাচ্ছেন," "কনিষ্ক সপারিষদ সভাগৃহে উপবিষ্ট আছেন," "বিক্রমাদিত্য অশ্বমেধ উৎসর্গ করছেন," "আকবরের অভিষেক হচ্ছে," "আওরঙ্গজেবের সমাধি," কিংবা "পার্বত্য ত্রিপুরার রাণী জাহ্নবীর সতীব্রত।" যে নারীরা নদীতে স্নানের জন্য, কিংবা যে শ্রমিকেরা দৈনন্দিন কাজে যোগদানের জন্য এই গলিপথ দিয়ে যাতায়াত করবেন, তাঁরা যাত্রাপথেই লাভ করবেন ভারতবোধ এবং ভারতের ইতিহাস-জ্ঞান। "এর ফলে গলি হয়ে উঠবে বিশ্ববিদ্যালয়; চিত্রাবলী ঠাকুরঘরের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াবে—তা হবে শিক্ষালয়, গ্রন্থাগার, মহাকাব্য একসঙ্গে।" নিবেদিতার সানন্দ উপলব্ধি—একালে ম্যুরালের সস্তা বিকল্প হচ্ছে রঙিন প্রতিলিপি। নিবেদিতা আরও লিখেছেন: "পারলে, ভারতমাতা চিত্রটির লক্ষ-লক্ষ পুনর্মুদ্রণ করে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতাম, যে-পর্যন্ত না কেদারনাথ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত স্থানে প্রতিটি চাষার কুটিরে, কারুশিল্পীর ঘরে, তা লম্বিত হয়।"

॥২॥

মহৎ উচ্চারণের জন্য অবনীন্দ্রনাথ প্রস্তুত হচ্ছিলেন—নিবেদিতা বলেছেন। কীভাবে? অবনীন্দ্রনাথের আত্মকথা ('জোড়াসাঁকোর ধারে') থেকে তার খণ্ড বিবরণ তুলে আনা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের পরিবারে ছবি আঁকার চল ছিল; তাঁর দাদা তেলরঙের ছবি আঁকতে পারতেন, সম্পর্কের ভাইরাও পারতেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজে ছেলেবেলা থেকে ছবি আঁকতেন। সংসারে জড়িয়ে পড়ার পর, এটা-ওটা আঁকার ফাঁকে 'স্বপ্নপ্রয়াণটা চিত্রিত' করার ইচ্ছা হয় এবং সে ইচ্ছার পূরণও করেন। "স্বপন-রমণী আইল অমনি নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ"—সেই ভাবনার ছবি আঁকলেন এবং তা "খুলে দিল মনোমন্দিরের ছবি।" সে ছবি বেরুল 'সাধনা'য়। তাঁর মেজমা "রীতিমতো ছবি আঁকা" শেখার তাগিদ দিলেন। "তখন ইউরোপীয় আর্ট ছাড়া গতি ছিলনা। ভারতীয় শিল্পের নামও জানত না কেউ।" আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও'গিলার্ডির কাছে তেলরঙ ও প্যাস্টেলের কাজ শিখলেন। আর্টিস্ট হবার ঘোর ইচ্ছা জাগল। রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ দিলেন। 'রবিকা'-র চিত্রাঙ্গদা কাব্যের ছবি এঁকে ফেললেন ("এখন অবশ্য সেসব ছবি দেখলে আমার হাসি পায়"), প্যাস্টেলে আঁকলেন প্রচুর মুখচিত্র, রবিবর্মার কাছে তারিফ শুনলেন, ভালো করে অয়েল পেন্টিং

শিখলেন সি এল পামারের কাছে, তাঁরই কাছে জলরঙের কাজ শিখে ল্যান্ডস্কেপ আর্টিস্ট হয়ে পড়লেন। তার পরেই পেলেন নতুন পথের ইশারা। তাঁর ছোট দাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক আইরিশ বান্ধবী বিলেত থেকে পাঠিয়েছিলেন পুরানো আইরিশ পদ্ধতিতে চিত্রবিচিত্র করা "আইরিশ মেলডিজের কবিতার বই"—তার সৌন্দর্যে তিনি থ। আর ঠিক সেই সময়েই ভগিনীপতি, শেষেন্দ্র উপহার দিলেন দিল্লির পার্শিয়ান ছবির একটি বই। রবীন্দ্রনাথ রবিবর্মার ছবির কতকগুলি ফটোও উপহার দিলেন। "সেই আইরিশ মেলডির ছবি ও দিল্লীর ইন্দ্রসভার নকশা যেন আমার চোখ খুলে দিল। একদিকে পুরাতন ইউরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন, ও আর একদিকে এ দেশের পুরাতন চিত্রের নিদর্শন। দুই দিকের দুই পুরাতন চিত্রকলার গোড়াকার কথা একই। সে যে আমার কী আনন্দ! সেই সময়ে সাধনাতে আমার ওই ইন্দ্রসভার বইখানির বর্ণনা দিয়ে 'দিল্লির চিত্রশালিকা' বলে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন; চারিদিকে তখন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল।" "ভারতশিল্পের এই উদ্দিশ" পেয়ে অবনীন্দ্রনাথ যখন আঁকার বিষয় খুঁজছেন তখন রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় বৈষ্ণব পদাবলীর ছবি আঁকতে শুরু করলেন। দিশি ধরনের তাঁর প্রথম ছবি 'শুক্লাভিসার'। সে ছবি তাঁকে তৃপ্তি দিলনা, কেননা "দেশী রাধিকা হলনা, সে হলো যেন মেমসাহেবকে শাড়ি পরিয়ে শীতের রাত্তিরে ছেড়ে দিয়েছি।" তারপরে নানা পরীক্ষার পরে দ্বার খুলে গেল, শেষ করে ফেললেন বৈষ্ণব পদাবলীর এবং বেতাল পঞ্চবিংশতির সিরিজ। "হু হু করে ছবি হতে লাগল, কৃষ্ণচরিত্র, বুদ্ধচরিত্র" ইত্যাদি। তারপর একদিন বুকের বেদনা মিশিয়ে আঁকলেন 'শাজাহানের মৃত্যু', তার বিষয়ে হ্যাভেলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—সেকথা আগে বলেছি।

শিল্পী-জীবনের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার কথা অবনীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলেছেন। হ্যাভেলকে অবনীন্দ্রনাথ গুরু বলতেন, কিন্তু ফণীন্দ্রনাথ বসুর এক প্রবন্ধের প্রতিবাদে তিনি বলেন, শিল্প-আন্দোলনের সূচনা রবীন্দ্রনাথ হতেই। "তোমরা শুনে অবাক হবে, কৃষ্ণলীলার কুড়িখানি ছবি শেষ করতে তখন আমার পুরো এক বৎসর খাটতে হয়েছিল এবং তখন সারাদিন ছবি, সন্ধ্যার সময় রবিকাকার খামখেয়ালী মজলিশে সঙ্গীত সাহিত্য কাব্য ও নাটক—এরই চর্চা। এই যখন চলেছে নিয়মিতভাবে বলতে পারো, অনিয়মিতভাবে তখন এলেন হ্যাভেল সাহেব কলিকাতায়। হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আর্টস্কুলের ছাত্র হিসাবে আমার পরিচয় নয়, আমি কোনওকালেই আর্টস্কুলে ভর্তি হইনি, আমার সঙ্গে হ্যাভেল সাহেবের পরিচয় আমার কৃষ্ণলীলার ছবি নিয়ে এবং সেই সূত্রে মোগল শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে পরিচয় বিশেষ করে তাঁরই সাহায্যে আমার ঘটল। সেইজন্যই আমি তাঁকে বলি আমার গুরু, কিন্তু হ্যাভেল সাহেব আমাকে ডাকতেন collaborator হলেই, স্নেহ করে কখনও-বা বলতেন chela। বাংলার কবি আর্টের সূত্রপাত করলেন, বাংলার আর্টিস্ট সেই সূত্র ধরে একলা-একলা কাজ করে চলল কতদিন।"[২]

অবনীন্দ্রনাথের কথাগুলি নির্দিষ্ট অর্থে নিশ্চয়ই সত্য, নিজ কথামতো তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই দেশী রীতিতে কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু আমরা ভারতশিল্পের আন্দোলন বলতে যা বুঝি, সে-জিনিস হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের যোগাযোগের আগে ঘটেনি—এবং তা অবনীন্দ্রনাথের রচিত পূর্বে উদ্ধৃত 'ঈ বি হ্যাভেল' (প্রবাসী, মাঘ ১৩৪১) রচনাতেও দেখা যায়। কৃষ্ণলীলা ছবির অবনীন্দ্রনাথ, একালের ভারত শিল্পের প্রধান আচার্য নন—স্বদেশী

যুগের অবনীন্দ্রনাথ হলেন তাই। স্বদেশী যুগেই শিল্প-আন্দোলনের একটা দার্শনিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, এবং অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই আদর্শের চিত্র-রূপকার হয়ে উঠেছিলেন। ভারত শিল্প-আন্দোলন কেবল দেশীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্পরীতির অনুকৃতি নয়, সেক্ষেত্রে ঈশ্বরীপ্রসাদরা তো ছিলেনই, কিংবা কতকগুলি রীতির মিশ্রণও নয়—তা হলো নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি জাতির শিল্পের পথে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা—নানা শৈলীকে অঙ্গীকার করেও। হ্যাভেল, আরও বেশি করে নিবেদিতা, এই দৃষ্টিতেই ভারতশিল্পের নবজাগরণকে দেখেছিলেন। সেইজন্যই নিবেদিতা 'ভারতমাতা' চিত্র অঙ্কনের পূর্বকালে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরচনাকে নিজস্ব রীতি আবিষ্কারের প্রস্তুতিপর্ব বলেছেন।

॥৩॥

এখন প্রশ্ন—নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় কখন কিভাবে? ঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত। এই পরিচয় হতে পারে ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি। উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দ, স্বদেশী যুগের মানুষ; অবনীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে লিখেছিলেন: "তিনি প্রসঙ্গত আমাদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই [শিল্পবিষয়ক] প্রচেষ্টার পশ্চাতে বিদুষী ভগিনী নিবেদিতার অনুপ্রেরণা আছে।...তিনি আমাদিগকে আরও বলিয়াছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে কলিকাতা নগরীতে প্লেগ-রিলিফ আরম্ভ হইলে উহার জন্য দ্বারে দ্বারে যাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন।"[৩] অবনীন্দ্রনাথ 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইয়েও প্রায় একই কথা বলেছেন।[৪] যদি এ-তথ্য ঠিক হয় তাহলে ওঁদের পরিচয় ১৮৯৯ সালের মধ্যেই হয়েছিল। অপরপক্ষে দেখি, একই বইয়ের অন্যত্র তিনি বলেছেন, ওকাকুরাকে আমেরিকান কনসালের বাড়িতে যে রিসেপ্‌শন দেওয়া হয় সেখানেই "তাঁর [নিবেদিতার] সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।"[৫] সেকথা সত্য হলে সময়টা দাঁড়ায় ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যেভাবে নিবেদিতার সঙ্গে একত্রে প্লেগ সেবায় অংশগ্রহণের কথা বলেছেন, সেই অবিস্মরণীয় ঘটনা তাঁর স্মৃতি থেকে লুপ্ত হবার নয়। তাই ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি সময়কেই তাঁদের প্রথম পরিচয়ের কাল বলে ধরছি। এমন-কি তা ১৮৯৮ সালও হতে পারে।

নিবেদিতার প্রকাশিত রচনায় যে পরিমাণে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রালোচনা পাই, তাঁর চিঠিতে সেইভাবে তা পাইনা, কারণ অবনীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠি পাইনি, কিংবা যাঁদের কাছে লেখা চিঠিতে শিল্পপ্রসঙ্গ থাকত, তেমন মানুষদের কাছে লেখা তাঁর চিঠিও অল্পই পেয়েছি—হ্যাভেলকে লেখা মাত্র ৪টি চিঠি, মিসেস হেরিংহামকে লেখা কোনো চিঠিই নয়। দীনেশচন্দ্র সেনকে ৭ অক্টোবর ১৯০৪ তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মিত একটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তির (সরস্বতীর) প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, প্রথম চেষ্টা হিসাবে চমৎকার সেটি, এর অর্ধেক ভালোও তিনি আশা করেন নি, তবে মাটিতে মডেলিং করার ব্যাপারে স্থায়ী দীর্ঘ পরিশ্রম করে যেতে হবে, এবং যদি তা করতে পারেন তাহলে "ভারতবর্ষের বিশেষ প্রয়োজন যে ভাস্কর্যশিল্পের উত্থান, সেই ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠবেন।" "এই ব্যাপারে প্রয়োজন এতই আছে যে, দারিদ্র্যের ভয় করতে হবেনা; এই ধরনের কাজকে বরণ করে নেবার জন্য বিপুল অর্থভাগ্য অপেক্ষা করে আছে।" নিবেদিতা এও বলেছিলেন, তবে শীতলচন্দ্রকে প্রস্তুতিপর্বে উপযুক্ত ব্যক্তির

তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। "মিঃ অবনীন্দ্রনাথ টেগোর গতকাল আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি আপনার [দীনেশচন্দ্রের] বন্ধুকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উপদেশ নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করতে রাজি আছেন, এবং আমি জানি যে, মিঃ হ্যাভেলও সানন্দে সে-কাজ করবেন। আমার কথা তো বলাই বাহুল্য।"

মিস ম্যাকলাউড পাশ্চাত্য থেকে পেরী চিত্রাবলী [Perry pictures][৬] পাঠিয়েছিলেন নিবেদিতার ঘোর অসুস্থতার সময়ে। একটু ভালো হয়ে উঠে নিবেদিতা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন, (২৬-১২-১৯০৬), কার্নিসের নীচে লাগাবার ছবিগুলি অপূর্ব—গোড়াতে তিনি তো সেগুলিকে ব্রাশ্‌-এর কাজ মনে করেছিলেন। "যখন আমি এখান থেকে [তিনি আনন্দমোহন বসুর দমদমের বাগানবাড়ি ফেয়ারি হলে নিরাময়ের জন্য কাটাচ্ছিলেন] বোসপাড়া লেনে যাব তখন অবনীন্দ্রনাথ টেগোরকে এসব পাঠিয়ে দেব আর্টস্কুলে ব্যবহারের জন্য। ওখানে ছবিগুলির প্রভাব হবে অসাধারণ।"

প্যারিস থেকে জেরাল্ড নোবেল কতকগুলি মেড্যাল পাঠিয়েছিলেন। সেই সূত্রে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে চিঠিতে লিখেছেন (৫-৮-১৯০৯), "মেড্যালগুলি দেখে শিল্প-আন্দোলনের নেতা একেবারে অভিভূত। ...কাজটার জন্য মডেলিং তিনি এখানেই শুরু করতে পারেন, তবে হয়তো তার পরে ওইরকম সুন্দর ঢালাইয়ের জন্য ফ্রান্সে পাঠাতে হতে পারে।"

লক্ষণীয় নিবেদিতা এই চিঠিতে অবনীন্দ্রনাথকে সরাসরি **"Leader of the Art Movement"** বলে চিহ্নিত করেছেন।

অজন্তায় প্রেরিত ভারতীয় শিল্পীদের দুর্গতি ঘটেছিল সরকারি কর্মচারীদের হাতে—সে বিষয়ে মিসেস হেরিংহাম "আশ্চর্যরকম খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে শিল্পী মিঃ এ এন টেগোরকে লিখেছেন। তার থেকে মিসেস হেরিংহামের উত্তেজনা ও ক্রোধের পরিমাণ বোঝা যায়।" (নিবেদিতার চিঠি, ২৩-২-১৯০৯)। হ্যাভেলের প্রস্থানের পরেও শিল্প আন্দোলন "প্রভাবশালী টেগোরদের দ্বারা" চালিত হতে পারবে, এই আশ্বাস নিবেদিতা বোধ করেছিলেন, এবং হ্যাভেলকে তা জানিয়েছিলেন, (৭-৪-১৯১০), সেকথা আগেই বলেছি।[৭]

॥৪॥

নিবেদিতা তাঁর নানা প্রকাশিত লেখায় আবেগের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার জয়গান করেছেন। বহুপোষিত স্বপ্নের পূর্তি-সম্ভাবনায় স্বাভাবিক উল্লাসই এখানে লক্ষ্য করার বিষয়। স্বচ্ছন্দে বলা যায়, অবনীন্দ্রনাথের ছবির ভাবরূপের বিষয়ে নিবেদিতার রচনা সাহিত্যগুণে অনতিক্রান্ত।

অবনীন্দ্রনাথের চারটি ছবির উপরে নিবেদিতার লেখা পাই। 'ভারতমাতা' বাদ দিলে সেগুলি হলো—'সীতা', 'শাহজাহানের তাজ-স্বপ্ন', 'শাজাহানের অন্তিম শয্যা।' ভারতমাতা ছবির আলোচনায় নিবেদিতা জাতীয়তার ঋষি—আর শাজাহান বিষয়ে চিত্রের আলোচনায়—সাহিত্যিক।

শিল্পে জাতীয়তার কথা বললেও, নিবেদিতা সে জাতীয়তাকে দেশ-মানুষ-ইতিহাসের প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসার উদ্বোধনী শক্তিরূপেই দেখেছেন—কদাপি অন্ধ মধ্যযুগীয় অনুকৃতিকে

প্রশ্রয় দেননি। পৌরাণিক চিত্র অপেক্ষা ঐতিহাসিক চিত্র, তৎসহ সমকালীন জনজীবনচিত্র সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের রূপ আগে দেখেছি। জাতীয় ভাবের মধ্য দিয়ে তিনি চেয়েছেন শিল্পীর সমাজবোধ—উদ্দেশ্য ছিল শিল্পী যেন সংকীর্ণ রসলুব্ধতা ও আত্মভ্রষ্ট অনুকরণস্পৃহা থেকে দূরে থাকে। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি "ব্যক্তিগত মহান স্টাইলের" অনুরাগী। "বিশেষ"-কে জীবন দেবার জন্য "জ্ঞান" নামক নির্বিশেষকে আহরণ করবেন শিল্পী—এই তাঁর বক্তব্য। ইউরোপীয়, জাপানী, মুঘল, রাজপুত—সর্ববিধ রীতিকে গ্রহণ করে অবনীন্দ্রনাথ নিজের স্টাইল গড়ে তুলেছিলেন, অথচ সন্দেহমাত্র থাকেনি তিনি ভারত-শিল্পেরই মহান আচার্য। "মহান স্টাইলের বৈশিষ্ট্য হলো...তা আত্ম-অবমাননা না করে নতুন জ্ঞানকে আত্মসাৎ করতে পারে।"[৮] পুরাতন ভারতীয় শিল্পের একটি ত্রুটি, "শিল্প এই দেশে কারুশিল্পীদের বংশগত বৃত্তি হওয়ায়" প্রাচীন ধারার শিল্পীরা "নবত্বের ভাব-বঞ্চিত।" এবং "এইসব শিল্পীর মনে কোনো নতুন মহান শিল্পীরীতির প্রয়োজনবোধ নাড়া দেয়না।"[৯] বংশগত 'জাতি'-নিবদ্ধ শিল্পধারা যেখানে চিন্তাহীন অভ্যাসে, অত্যধিক আলঙ্কারিকতায় বা কঠিন শাস্ত্রীয় মননশীলতায় আবদ্ধ ছিল, অবনীন্দ্রনাথ সেই ভূমি থেকে প্রয়োজনমতো গ্রহণ করে, তাতে যোগ করে দিলেন কল্পনার নবত্ব এবং ব্যক্তিপ্রতিভার মুদ্রণ। তদুপরি আচার্য ভূমিকা গ্রহণ করে শিষ্যদলের মধ্যে জ্ঞান ও প্রেরণার সঞ্চারের দ্বারা নূতন ধারার সূত্রপাত করলেন, যাঁরা জাতীয় প্রতিভার সঙ্গে ব্যক্তিপ্রতিভার সমন্বয়ে সচেষ্ট হবেন। নিবেদিতার কাছে আর্টস্কুল তাই ইউনিভার্সিটি ছাড়া কিছু নয়। "বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয় চিন্তাসম্পদ ও আশা-বিশ্বাসের দ্বারা—নিছক সংগঠনশক্তির দ্বারা নয়। যদি শুধু দুটি মানুষ সঠিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পের অনুশীলন শুরু করে, তাহলে তারা ভারতের গোটা শিল্পজগৎকে পরিবর্তিত করে দিতে পারবে।" তিনি আরও বলেছেন, আর্টস্কুল নামক ইউনিভার্সিটিতে "ছাত্রদের সাধারণ আলোচনার মধ্যে এসে যাবে সকলপ্রকার এতাবৎ-স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলি এবং সমকালের সবরকমের জ্বলন্ত প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি।" "তাদের অনুধাবন যেন পৃথিবীর সর্বপ্রকার গভীর ও মহান রহস্যের বিষয়ে অশান্ত কৌতূহলের দ্বারা চিহ্নিত হয়।" এমনই আর্টস্কুল-ইউনিভার্সিটির শিক্ষাস্তরে নিবেদিতা দেখতে চেয়েছেন "একটি পরিণত মন ও তাঁর বহুসংখ্যক শিষ্যকে—কিংবা সমপরিমাণ শ্রমে ও যন্ত্রণায় পূর্ণ বহুসংখ্যক তরুণকে। সেই গোষ্ঠীর দ্বারাই ঘটবে শক্তির বিকাশ।"[১০] নিবেদিতা অন্যত্র বলেছেন, অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর বলা যাবে না—তিনি নিজেই নিজ শিল্পরীতির প্রতিনিধি। তাঁর শিষ্যদল এসে গেছেন, যাঁরা মৌলিক শিল্পরচনা করতে শুরু করেছেন। "অবশেষে জন্ম হয়েছে আধুনিক ভারতীয় শিল্পের—যা যথার্থই ভারতীয় এবং যথার্থই আধুনিক।"[১১]

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ যেখানে ছবির মধ্যে কবি (সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পী অংশত তাই) সেখানে তাঁর বিষয়ে রচনাকালে নিবেদিতা চিত্রালোচনার মধ্যে কবি। অবনীন্দ্রনাথের 'সীতা' ছবির আলোচনায় নিবেদিতাকে কিন্তু অধিক বিচারশীল দেখা গেছে। অবনীন্দ্রনাথ, সীতাকে নতুন পরিবেশে স্থাপন করেছেন। এখানে সীতা নদীতীরে অশোকবনে মধুর আবেষ্টনীতে স্থাপিত নন—এই ছবিতে তিনি রয়েছেন কারাগারের মধ্যে, দৃষ্টি দূরবিসর্পী, সমুদ্রের দিকে প্রসারিত, সূর্যোদয়ের জন্য সতৃষ্ণ প্রতীক্ষায় আতুর। এহেন সীতার মুখ-রূপ অঙ্কনকালে "ভারতীয় ধরনের সবচেয়ে সুন্দর মুখকে শিল্পী বেছে নেননি।" ছবিতে দেখা যায়, ঢালু কপাল, স্থূল গ্রীবা। সীতার এ এক নতুন রূপ। সীতা এখানে যতখানি "মহীয়সী পত্নী", তারো বেশি "মহীয়সী নারী"। "রাজ্ঞী-গর্বে সমুন্নত শক্তিময়ী মহিমান্বিত নারীত্বের" যে-প্রকাশ এখানে ঘটেছে তার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে নিবেদিতা বলেছেন, "ভারতীয় ম্যাডোনা অবশেষে লাভ করল নতুন এক আকার।" বাঞ্ছিত এই নব রূপ—কারণ, ইউরোপে "পূত পরিবারকে" যেমন নানা মন নানা ভাবে দেখে চিত্রায়িত করেছে—তা করেছেন রাফায়েল, লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি, করেজ্জো বা বতিচেল্লী—সেইভাবে ভবিষ্যতের ভারতীয় শিল্পীরা সীতাকে নানাভাবে রূপায়িত করবেন, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে যার এক নমুনা দেখা গেছে—নিবেদিতা তাঁর আলোচনায় এইসব কথা বলেছিলেন।

নিবেদিতা কিন্তু তাঁর সমস্ত মনস্বিতাকে নত ক'রে অভিভূত ভাষায় বন্দনা করেছেন শাজাহান বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের দুই শিল্পসৃষ্টিকে। আলোচনাকালে যথাসম্ভব আঙ্গিকের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ পরিহার করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনাকে তিনি অনুসরণ করতেই চেয়েছিলেন। একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়—যে-নিঃশ্বাসে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসৃষ্টি, সেই নিঃশ্বাসেই নিবেদিতার রচনা—একই শ্বাসে হয়ত উদ্ভূত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের শাজাহান কবিতা। নিবেদিতার বাক্যের আলোকপাতে আমাদের গোচর হয়েছে সম্রাটের অন্তর্জগৎ।

'তাজস্বপ্ন' চিত্রটির শৈলী ও রূপায়ণ প্রসঙ্গে নিবেদিতা গোড়ায় বলেছেন, "বিষয়বস্তুর গভীর স্তব্ধতার জন্য নৈশ-পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। তাজবিবির ক্ষুদ্র সমাধির উপরে আচ্ছন্ন চন্দ্রের আলোকপাত হয়েছে, যা অপূর্বভাবে উদ্‌ঘাটন করেছে সম্রাটের জীবনে কী তার অধ্যাত্ম ভূমিকা। রেখাঙ্কনে আছে শক্তির প্রকাশ।" অবশ্য একথা না-বলে পারেন নি, মিঃ টেগোরের হাতে যে-রঙের খেলা ইতিমধ্যে তাঁরা দেখেছেন, তার কিছু বর্ষণ ছবিতে থাকলে ভালো হতো—এই উজ্জ্বল আলোকের দেশে যে-রঙের ভাষায় সুকোমল ভাষ্য রচনা করতে তিনি সিদ্ধশিল্পী।

ছবিটিতে দেখা যায়, আসন্ন সন্ধ্যায় শাজাহান অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন—দূরে নদীর ওপারে একটি অতি ক্ষুদ্র শ্বেত সমাধিপ্রস্তরের সম্মুখে প্রার্থনা করতে—আর তখন তাঁর মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে নতুন পৃথিবী, যার কেন্দ্রে একটি মর্মরস্বপ্ন—নাম তাজমহল।

নিবেদিতার এই রচনা :

"পূর্বাকাশ থেকে অস্তসূর্যের শেষ প্রতিফলনটুকু মুছে যায়নি এখনো,
মেঘের পিছনে উঁচু আকাশে নতুন চন্দ্রলেখা।
অশ্বপৃষ্ঠে একাকী সম্রাট—চলেছেন নদীতট দিয়ে প্রার্থনা করতে।
অনেক সপ্তাহ, হয়ত অনেক মাস কেটে গেছে সেই ভয়ানক বিচ্ছেদক্ষণের পরে,
যাঁরা এক তাঁরা এখন বিচ্ছিন্ন, হয়ত সাময়িকভাবে,
তবু হৃদয় কাঁপছে যেন সদ্য-ক্ষত বেদনায়।
প্রশান্তির প্রভাতকোমল আলো—সেও বিস্তীর্ণ,
আত্মার মন্দিরে যাতনা ও শান্তির সম্মিলন।
ওই ওখানে—নদীর ওপারে—একটি সমাধি—তাঁর সমাধি।
হে প্রবাহিত তটিনী। ওগো ক্ষুদ্র সমাধি!
আমার হৃদয়ের এই শিবিরে রাত্রি আজ কী হিমশীতল!

কিছু পরে চাঁদ যখন ডুবে যাবে,
গোপন রহস্যের আবরণ অঙ্গে টেনে নেবে পৃথিবী—
তখন শাজাহান ঢালু তট দিয়ে দিয়ে নদী পেরিয়ে চলে যাবেন ওখানে,
নতজানু হবেন মর্মর চন্দ্রাতপের নীচে,
নিবিড় চুম্বনে ভরিয়ে দেবেন শীতল পাষাণখণ্ড আর নীরব পৃথিবীকে
যা পড়ে রয়েছে প্রিয়তমার বসনপ্রান্তের মতো।
একটু আগেও নৈরাশ্যে ও বাসনায় অভিভূত ছিলেন,
এখন শুধু প্রার্থনা।...

প্রিয়তমা মৃত্যুমন্দিরে আসীনা।
রাজসিংহাসনের সাধ্য নেই সেখান থেকে তুলে এনে স্থাপন করে নিজ অঙ্কে,
নশ্বর পৃথিবীর ক্লান্তি ও যাতনা, কোলাহল ও ক্রন্দনের কত উপরে তিনি!
অনন্ত হতে বিশাল শুভ্র পাখির মতো যে-আত্মা এসেছিল শাজাহানের কাছে
দুই ডানায় বহন ক'রে প্রেম ও করুণা—
সে আবার ফিরে গেছে পাখা গুটিয়ে ঈশ্বরের বুকের নীড়ে।
এই-যে ধূলার আসন—এ তো উৎসর্গবেদী!
নিবেছে ঘরের আলো—কিন্তু বেদীমূলে কি আরও উজ্জ্বল নয় দীপশিখা!
পত্নী—মাতা—রাণী—আর তিনি নন,
এখন ঈশ্বরের পাদমূলে নতজানু দেবদূতী,
প্রার্থনারত প্রেমাস্পদের জন্য।

এমনই এক ক্ষণে কি তাজের স্বপ্ন জাগেনি
শাজাহানের মনে?"

'শাজাহানের অন্তিমশয্যা' ছবির আলোচনার গোড়ার দিকে নিবেদিতা কুমারস্বামীর উক্তি উদ্ধৃত করেন—'ইউরোপের একালের শিল্পীদলের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাবেন।' তারপর নিবেদিতা বিশ্লেষণ করেছেন শাজাহানের জীবনের নাটকীয়তাকে—যিনি "এক জীবনে বহু জীবনের ফসল তুলেছিলেন।" দুর্দম তরুণ সৈনিক হলেন দিল্লীর সম্রাট। গৌরব ভিড় করে এলো তাঁর জীবনে। সফল সেনাপতি, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রশাসক, ধনগরিষ্ঠ বাদশাহ। সেই তিনি কিন্তু বঞ্চিত ছিলেন না সাধারণ মানুষের জীবনের সূক্ষ্ম সুকুমার আনন্দে। ভারত-ঈশ্বর শাজাহান একই সঙ্গে পৃথিবীর চরম এক দাম্পত্য প্রেমকাব্যের নায়ক। "প্রিয়তমার স্মরণে অমর সঙ্গীত রচনার ভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন,...সম্রাটের কণ্ঠোচ্চারিত এক মর্মর কবিতা।" ["হে সম্রাট কবি, এই তব হৃদয়ের ছবি, এই তব নব মেঘদূত, অপূর্ব অদ্ভুত।"]

সম্রাটের এতখানি প্রতিভা, প্রাপ্তি ও সৃষ্টির ঐশ্বর্য বোধহয় রসিকের কাছে তাঁর কাহিনীকে অব্যাহত সাফল্য-কাহিনী হিসাবে ক্লান্তিকর করে তুলত। তাই এল তাঁর "জীবনসঙ্গীতে বিষাদের করুণ তান। আনন্দোচ্ছল দাম্পত্যের পরে সুদীর্ঘ প্রিয়াহারা কাল; তাঁর সম্রাট-জীবনকে ঢেকে দিয়েছিল সাত বৎসরের বন্দীজীবন। পৃথিবী যাঁর কাছে নতজানু হতো, সেই তিনি কৃতজ্ঞ ও গর্বিত হলেন একটি মাত্র নারীর, যিনি নিজ কন্যা ছাড়া কেউ

নন, মধুর বিশ্বাসভরা সেবালাভ ক'রে। বিশ্ব-সিংহাসন থেকে কারাকক্ষ!"

শাজাহানের সেই বন্দীজীবনের শেষ এবার—অবনীন্দ্রনাথের ছবির আরম্ভ সেখান থেকেই। সম্রাটের অন্তিম ইচ্ছায় তাঁকে প্রাসাদ-অলিন্দে আনা হয়েছে যেখান থেকে দেখা যায় নদীপারে তাজমহল। কেউ নেই, কেবল পাদমূলে রুদ্যমানা জাহানারা। সম্রাট নগ্নপদ, নগ্নমস্তক, খুলে রেখেছেন পাদুকা ও মুকুট। "নীরবতা, রাত্রি, এবং সঞ্চরমাণ মেঘের অবগুণ্ঠনে অর্ধাবৃতমুখ শোকার্ত চন্দ্র।"

আর শাজাহান?

"শাজাহানের কাছে মুহূর্তটি প্রত্যাশায় রোমাঞ্চিত। প্রসারিত দুর্গপ্রাচীরের নিচে নদীর মৃদুধ্বনি তাঁর হৃদয়কে পূর্ণ করেছে আর একটি নদীর চেতনায়—যার তটবর্তী এখন তাঁর আত্মা। ওই তো বাঁকের পরে শুভ্র সূক্ষ্ম রহস্যগুণ্ঠনে আবৃত অস্তিত্বের মতো তাজ—তাজবানুর তাজ—সেই মুকুট যা সম্রাট তাঁর জন্য নির্মাণ করেছিলেন। আজ রাত্রে কিন্তু তাজমহল নয়—স্বয়ং মমতাজ। আজ রাত্রে মমতাজ আছেন ওখানে—তাঁর অতীতের সকল গরিমা ও মধুরিমা নিয়ে—যুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে পবিত্রতা। আজ রাত্রে জলের মৃদু কলতানের ওপারে রয়েছে যে-সুমহান আকারটি...সে অপেক্ষা করছে সেই যাত্রীর জন্য যিনি আসছেন—ক্লান্তপদে, ন্যুব্জপৃষ্ঠে, নতমস্তকে। আসছেন—পিছনে ফেলে রেখে প্রাসাদ ও কারাগার, যুদ্ধক্ষেত্র ও প্রার্থনাকক্ষ—উত্তীর্ণ হতে মৃত্যুর ওই নীরব তটে।"

॥ ৫ ॥

অবনীন্দ্রনাথ অপরপক্ষে নিবেদিতার জন্য কী করেছিলেন?

তথ্যরূপে বলতে পারি, তিনি নিবেদিতার বিভিন্ন বইয়ের জন্য স্বয়ং ছবি এঁকেছেন বা শিষ্যগোষ্ঠীর দ্বারা আঁকার ব্যবস্থা করেছেন। নিবেদিতার "ক্র্যাডল্ টেলস্ অব হিন্দুইজম্" বইয়ের জন্য দুটি ছবি এঁকেছেন—গ্রন্থমুখের ছবি—"সন্ধ্যায় ভারতীয় কথক-ঠাকুর", এবং প্রচ্ছদচিত্র—"দুর্গারি বজ্র"। নিবেদিতার অসম্পূর্ণ বই 'মিথ্স অব হিন্দুজ্ অ্যান্ড বুদ্ধিস্টস্'-এর (যা কুমারস্বামী সম্পূর্ণ করেন) জন্য এঁকেছিলেন—'বুদ্ধের বোধিলাভ', 'বোধিসত্ত্বের হস্তীদন্ত', 'রাজকুমার সিদ্ধার্থের বিদায়', 'মহাভিক্ষুক বুদ্ধ', 'মহাপরিনির্বাণ'। তাঁর তত্ত্বাবধানে নন্দলাল প্রমুখরা অনেকগুলি ছবি আঁকেন এই বইয়ের জন্য। নিবেদিতার মরণোত্তর গ্রন্থ "ফুটফলস্ অব ইন্ডিয়ান হিস্টরি" গ্রন্থের জন্য অবনীন্দ্রনাথ আঁকেন—'বুদ্ধের জন্ম'। (গ্রন্থমুখের ছবি এঁকেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ—'তীর্থযাত্রী'।)

একটি অপরিচিত সংবাদ এখানে দিতে পারি—অবনীন্দ্রনাথ নিবেদিতার উপরে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু নৈরাশ্যজনক সংবাদ হলো—তার হদিশ নেই। প্রবন্ধটি অবনীন্দ্রনাথ লেখেন নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে—এবং এর মধ্যে শিল্প-আন্দোলনে নিবেদিতার প্রেরণা ও সাহায্যের কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর আত্মকথা 'জোড়াসাঁকোর ধারে'-র মধ্যে সামান্যই বলেছেন; কারণ, জীবনসায়াহ্নে স্মৃতিচারণা করতে বসে অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্প-আন্দোলনে নিবেদিতার সহায়তার ইতিহাস অপেক্ষা অনেক বড় আকারে ধরা দেয় নিবেদিতার চরিত্রমহিমা। এই সিদ্ধশিল্পীর কাছে নিবেদিতা হয়ে উঠেছিলেন শিল্পের উপাদান। অবনীন্দ্রনাথ তখন তুলি ফেলে দিয়েছেন—তাই কথার তুলিতে এঁকেছিলেন নিবেদিতার প্রতিমা।

যাই হোক পূর্ব প্রসঙ্গে বলি, নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে ২৩ মার্চ ১৯১২, শনিবার কলকাতা টাউনহলে বিরাট স্মৃতিসভা হয়—অবনীন্দ্রনাথ তাতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন—একথা পেয়েছি বেঙ্গলী ও অমৃতবাজারের রিপোর্টে। অবনীন্দ্রনাথের প্রস্তাব সমর্থন করেন 'মাননীয়' ভূপেন্দ্রনাথ বসু। —

"Babu Abanindra Nath Tagore next moved the second resolution : 'That a suitable memorial be raised to commemorate the memory of the illustrious lady and that funds be collected for the maintenance of the Girls' School started by her and left in the hands of the Ramakrishna Mission, and that a strong committee be formed for that purpose.''[১২]

প্রসঙ্গের শেষ এখানেই নয়—ওই সভায় অবনীন্দ্রনাথ যে বাংলায় লেখা একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন তা জানতেই পারতাম না মর্ডার্ন রিভিউ পত্রিকার এপ্রিল ১৯১২ সংখ্যায় সে-বিষয়ে উল্লেখ না থাকলে। অবীন্দ্রনাথ সেই প্রবন্ধে শিল্পবিষয়ে নিবেদিতার প্রেরণার কথা বিশেষভাবে বলেন—কিভাবে তিনি এদেশীয় সুন্দর বস্তুর বিষয়ে চোখ খুলে দেন, কিভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন এদেশীয় শিল্প ও সংগঠনসমূহের মনোহারিতা :

"Babu Abanindra Nath Tagore read a paper in Bengali, pointing out how she had opened the eyes of the Indians to the beautiful in their country, their own art and their own institutions."

নিবেদিতাকে হারানো যে কতখানি হারানো তা অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলকে লেখা ২ নভেম্বর ১৯৯১ তারিখের চিঠিতে বলেছিলেন : "গত মাসে সিস্টার দার্জিলিঙ-এ দেহত্যাগ করেছেন, আপনি হয়ত শুনেছেন। তাঁর মতো কাউকে সহজে পাওয়া যাবেনা। কী যে তীব্র তাঁর বিয়োগের ব্যথা, কি বলব !"

অবনীন্দ্রনাথ কি নিবেদিতার কোনো ছবি এঁকেছিলেন ? জানিনা। তবে এইটুকু জানতে পেরেছি—অবনীন্দ্রনাথের ধ্যান-রূপ-লোকে অপরূপ ছবি হয়ে বিরাজিতা ছিলেন নিবেদিতা। নন্দলাল লিখেছেন, "অবনবাবু উঁহাকে দেখে আমাদের বলেছিলেন, যেন তপস্বিনী উমাকে দেখলাম।"[১৩]

কী বিস্ময়কর ! প্রেমতপস্যার শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কল্পনা, উমার রূপচ্ছবি হয়ে নিবেদিতা বিরাজিত ছিলেন 'শিল্পীগুরু' অবনীন্দ্রনাথের এবং 'কবিগুরু' রবীন্দ্রনাথের মনে। তিনি একই রূপ ধরেছিলেন নন্দলালের মনে—জগদীশচন্দ্র বসুর মনেও।

কেবল উমা নন—অবনীন্দ্রনাথের কল্পনায় নিবেদিতা কাদম্বরীর মহাশ্বেতাও। কথার তুলিতে আঁকা জলরঙের ছবির মালার মতো অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বই—তার মধ্যে ব্যক্তিমানুষের সেরা ছবি নিবেদিতারই।

আমেরিকান কনসালের বাড়িতে ওকাকুরার রিসেপশনের দিন নিবেদিতাকে দেখার কথা অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"...নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে শাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট-ছোট্ট রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা ; ঠিক যেন শাদা পাথরে গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি !"

জাস্টস হোমউডের বাড়িতে আর্ট সোসাইটির এক পার্টিতে নিবেদিতাকে দেখার স্মৃতি :

"পাটি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরী ক'রেই এসেছিলেন তিনি। বড়ো-বড়ো রাজারাজড়া সাহেব-মেম গিস্‌গিস্ করছে। অভিজাতবংশের বড়োঘরের মেম সব ; কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা ; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাশানে চার দিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত। সন্ধ্যে হয়ে এলো, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই শাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো, উঁচু ক'রে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কী বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হলো। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উড্‌রফ, ব্লান্ট এসে বললেন, 'কে এ ?' তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।

"সুন্দরী সুন্দরী কাকে বলো তোমরা জানি নে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।"

অবনীন্দ্রনাথের কথা আরও একটু তুলে নিবেদিতা-অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ শেষ করব। নিবেদিতার মারা যাবার পরে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ নিবেদিতার একটি ছবি অবনীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন, সেটি ওঁর টেবিলের উপরে থাকত। লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের খুবই ঘনিষ্ঠতা। "তাঁর মতো আর্টিস্টিক নজর বড়ো কারো ছিলনা। আমাদের নজরে নজরে মিল ছিল।"—

"সেই লর্ড কারমাইকেল একদিন আমার টেবিলের উপর নিবেদিতার ফটোখানি দেখে ঝুঁকে পড়লেন ; বললেন, 'এ কার ছবি ?' বললুম, 'সিস্টার নিবেদিতার'। তিনি বললেন, 'এ-ই সিস্টার নিবেদিতা ? আমার একখানি এইরকম ছবি চাই।' বলেই আর বলা-কওয়া নেই, সেই ছবিখানি বগলদাবা ক'রে চলে গেলেন। ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে। সাজসোজ ছিলনা, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমন ধীর-স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।"[১৪]

নিবেদিতা ধীর স্থির। তাহলে ঝড় ঝঞ্ঝা, আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তাঁর তুলনাগুলি—আক্রমণের মুখে জ্বলন্ত ইস্পাততুল্য তাঁর চোখের নীল আগুনের কঠিন দীপ্তি—এসব কোথায় যাবে, যা লিখেছেন দেশ-বিদেশের বিখ্যাত মানুষেরা ?

এইখানেই নিবেদিতার মহিমা—বহুব্যক্ত রূপে তিনি প্রতিভাত। আর, মানুষের সব দেখাই শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত দেখা। তার মধ্যে অসামান্য এক দর্শন অবনীন্দ্রনাথের।

'দিব্যচক্ষু' ছিল এই শিল্পীর।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক সূত্র

১ অবনীন্দ্রনাথ ভারতমাতা ছবি কোন সময়ে আঁকেন ? বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এই চিত্রাঙ্কনের সময় নির্ধারণ

করেছেন ১৯০২ ('অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আদিপর্বের শিল্পকর্ম', ভারতীয় সংগ্রহশালা প্রকাশিত, ১৯৬৬, পৃ. ১৭। এবং বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক, পৃ. ১৭৯)। কিন্তু এই কালনির্ণয় তিনি কি করে করলেন, তার হদিশ দেননি। নিবেদিতার লেখা থেকে মনে হয়, ছবিটি অল্প আগে আঁকা হয়েছে। শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ও সি গাঙ্গুলী বলেছেন, "অবনীবাবু ভারতমাতা চিত্র রচনা করেন খুব সম্ভব ১৩১৩ সালে।" ('ভারতের শিল্প ও আমার কথা', পৃ. ১৬৭)। পঞ্চানন মণ্ডলের 'ভারতশিল্পী নন্দলাল' (১ম খণ্ড) থেকেও যেসব তথ্য পাচ্ছি, তাতে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। তিনি এক জায়গায় নন্দলালের এই উক্তি দিয়েছেন। "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে অবনীবাবু এঁকেছিলেন 'বঙ্গমাতা'-র ছবি। পরে তারই নাম হল 'ভারতমাতা'—নাম দিয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতা।" [পৃ. ৪৩৫]। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯০৪ সালের শেষভাগ থেকে, জোরদার হয় ১৯০৫ সালে। এই গ্রন্থে অন্যত্রও নন্দলাল বলেছেন, স্বদেশী যুগেই অবনীন্দ্রনাথ বঙ্গমাতা আঁকেন। প্রথম আঁকার কালে নন্দলাল আর্টস্কুলে ভর্তি হননি। (ভর্তি হন ১৯০৫ সালে)। "আমি যখন আর্টস্কুলে ভর্তি হই, অবনীবাবু তখন বঙ্গমাতার ছবি ফিনিশ করছেন। কিন্তু সে ছবিখানা দু'টুকরো হয়ে গেছে। মধ্যিখানের ভাঁজে ক্র্যাক করেছে। জাপানী পদ্ধতি (ওয়াশ্‌-এর) আর তাঁর অনুসৃত আগের পদ্ধতি মিলিয়ে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি করেছিলেন।" [পৃ. ২১১]। পুনশ্চ আর এক জায়গায় : "ওখানে (আর্ট স্কুলে) অবনীবাবুর ফিনিশ-করা প্রথম বিখ্যাত ছবি 'বঙ্গমাতা' (১৯০২)। এই 'বঙ্গমাতাই' 'ভারতমাতা' হলেন ১৯০৫ সালে। নাম দিলেন সিস্টার নিবেদিতা। সে স্বদেশী যুগের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে। ভারতমাতা নাম দিয়ে সেই ছবি তখন স্বদেশী পতাকাতে ব্যবহার করা হত। অবনীবাবু বললেন, আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি,... একজন জাপানী [সম্ভবত ইয়াকোহামা টাইকোয়ান] সেটিকে বড় করে একটা পতাকা বানিয়ে দিলেন।" [পৃ. ৬৫]। এই সব উল্টোপাল্টা তথ্য থেকে মনে হয়, ১৯০২ সালে বঙ্গমাতা-রূপে যে ছবির সূচনা ১৯০৫ সালে ভারতমাতা-রূপে তার পরিণতি। পরিণতির পক্ষে সময়টা একটু দীর্ঘ, যদি-না ধরে নিই, পুরনো ছবির আদলে নতুন করে আঁকা হয়েছিল। তাছাড়া নন্দলাল বলেছেন, "অবনীবাবু বঙ্গমাতা শেষ করে ওমর খৈয়ামের ছবি আরম্ভ করলেন।" (৬৫)। বিনোদবিহারীর পূর্বোক্ত লেখায় দেখি, অবনীন্দ্রনাথ ওমর খৈয়ামের ছবি আঁকেন ১৯০৬-০৮-এর মধ্যে। এক্ষেত্রে ভারতমাতাকে কত বছর পেছিয়ে নিয়ে যাব। অবনীন্দ্র-গবেষকরা এর উত্তর দিতে পারেন।

২ অবনীন্দ্রনাথের এই লেখা প্রথম বেরোয় 'শান্তিনিকেতন পত্র'-এ, চৈত্র ১৩৩২। উদ্ধৃত হয় বিশ্বভারতী পত্রিকায়, কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক। আমি সেখান থেকেই নিয়েছি।

৩ "পরলোকে ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর", উদ্বোধন, পৌষ ১৩৫৮।

৪ অবনীন্দ্রনাথ রচনাবলী, ১ম খণ্ড (১৯৭৩), পৃ. ৩০৬। "সেই সময়ে কলকাতায় লাগল প্লেগ। চারদিকে মহামারী চলছে, ঘরে-ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবিকাকা এবং আমরা এ বাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। রবিকাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায়-পাড়ায় ইন্সপেকশনে যেতেন।"

প্লেগ-সেবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার সহযোগের বিষয়টি এখনও তথ্যসমর্থিত নয়। এই যোগ যদি হয়ে থাকে তা কি ১৮৯৮ সালে, নাকি ১৮৯৯ সালে? ১৮৯৮ সালে হতে পারে যেবার প্লেগের সংক্রমণ কলকাতায় বেশি হয়নি, যদিও আতঙ্ক ছড়িয়েছিল প্রচণ্ড। নিবেদিতার লেখা একটি বিবরণীতে (Calcutta Notes, by An English Lady, ৪ মে, ১৮৯৮, 'লেটারস্‌ অব সিস্টার নিবেদিতা' ১ম খণ্ডে সংকলিত, পৃ. ২৮-৩০) পাই, "কয়েকটি বড় পরিবার, বিশেষত ঠাকুর পরিবার দৃঢ়ভাবে (সরকারের প্লেগ-নীতির বিরুদ্ধে) বিক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ফল কিছুই হয়নি যতক্ষণ না শনিবারের দুপুরে সরকার ঘোষণা করলেন—প্লেগের টীকা নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়" ইত্যাদি।

৫ অবনীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।

৬ বস্টনের 'ইউনাইটেড সোসাইটি অব ক্রীশ্চান ইনডেভার' কর্তৃক প্রকাশিত বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রতিলিপি—বিক্রয়ের জন্য। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে এই রকম অনেক 'পেরী চিত্র সিরিজ' রক্ষিত আছে।

৭ অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ শেষপর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অবনীন্দ্রনাথদের পারিবারিক ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়ির "দক্ষিণের বারান্দা" ছিল "তখনকার কলকাতা শহরের সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র।" সেই তীর্থ সম্বন্ধে অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আরও লিখেছেন :

"শহরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিমান সব বিদগ্ধ পুরুষদের সমাগম হত সেখানে। মাঝে মাঝে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এসে বসতেন এই আসরে। আরও যাঁদের দেখেছি সেখানে তাঁরা হলেন, সখারাম গণেশ দেউস্কর, মনোমোহন চক্রবর্তী, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি। নানা বিদেশী জ্ঞানীগুণী এবং কলাপ্রেমী ব্যক্তিরাও এসে সমবেত হতেন সেখানে। দক্ষিণের বারান্দাতেই নিম্নলিখিত মনীষী ব্যক্তি ও গুণিজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল : যেমন, ভগিনী নিবেদিতা, স্যার জন উড্রফ তৎকালীন স্টেটসম্যান সম্পাদক এস কে র‍্যাটক্লিফ, কাউন্ট কেসারলিঙ, ভারতীয় সংগীতে বিশেষজ্ঞ ফক্স স্ট্র্যাঙ্গুয়েজ, বিশ্ববিশ্রুত জাপানী কলা-সমালোচক কাকাও ওকাকুরা, জাপানের ওস্তাদ চিত্রশিল্পীদ্বয় হিশিদা ও তাইকান এবং আরও অনেক বিদগ্ধ দিশী ও বিদেশী মানুষ।" ['ভারতের শিল্প ও আমার কথা', (১৯৬৯), পৃ. ১০১]

৮ N. C. W., Vol. III, p. 10.

৯ Ibid. Vol. III, p. 10.

১০ Ibid. Vol. III, pp. 12-14.

১১ Ibid. Vol. III, p. 71.

১২ **Prabuddha Bharata, May 1912.**

১৩ বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, 'শিল্প দীপঙ্কর নন্দলাল', পৃ. ২৭, নন্দলালের ২৫-৮-৫৪ তারিখের পত্রে লিখিত।

একই ধরনের কথা নন্দলালের সাক্ষ্য মারফতও জানতে পারি : "অবনীবাবু বলেছিলেন—'সিস্টার দেখতে ঠিক পার্বতীর মতো'।" ('ভারতশিল্পী নন্দলাল,' ১ম, পৃ. ১০৫)।

১৪ অবনীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম, পৃ. ২৮৭-৮৯।

একাদশ অধ্যায়

নিবেদিতা ও কুমারস্বামী

॥ ১ ॥

প্রাচ্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক পণ্ডিতরূপে কথিত আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে নিবেদিতার যথেষ্ট পরিচয় ছিল, পরস্পরের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা সম্ভ্রমপূর্ণ ; তবে একথাও বলতে হবে, কুমারস্বামীর অতিরিক্ত রক্ষণশীলতায় নিবেদিতা ঘোর আপত্তি বোধ করেছেন।

'এশিয়ার সর্বপ্রথম স্যার উপাধিধারী', 'লন্ডনের প্রথম [সিংহলী] হিন্দু ব্যারিস্টার' মুথু কুমারস্বামী এবং তাঁর ইংরাজ পত্নী এলিজাবেথ ক্লে বীরাই-এর পুত্র আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর জন্ম কলম্বোয়, ২২ অগস্ট ১৮৭৭ ; শিক্ষা—লন্ডনে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এস-সি উপাধিলাভের পরে ১৯০৩ সালে ২৫ বৎসর বয়সে তিনি সিংহলের (এখন শ্রীলঙ্কা) মিনারোলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর পদে যোগ দেন। পদসূত্রে ভূতাত্ত্বিক সন্ধানের কার্যকালে সিংহলের সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং প্রাচীন শিল্প নিদর্শনাদির সঙ্গে পরিচয় ঘটে—তার অন্যতম ফল **Mediaeval Sinhalese Art** গ্রন্থ। ১৯০৬ ডিসেম্বরে সিংহলের সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে ভারত ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তারপর জীবনের শেষ ৩০ বছর বস্টন শহরের মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টস্-এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১২টি ভাষায় ব্যুৎপন্ন এই পণ্ডিত-দার্শনিক ব্যক্তি ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রায় ৬০টি পুস্তক ও পুস্তিকা লেখেন। নিজ ক্ষেত্রে ইনি সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত।[১]

আনন্দ কুমারস্বামী অনেকবার ভারতে এসেছেন, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। নন্দলালের আঁকা অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিওর একটি রেখাচিত্র সুপরিচিত, যাতে দেখা যায়, কুমারস্বামী নন্দলালের দিকে ঝুঁকে পড়ে কোনো একটি ছবির বিষয়ে মন্তব্য করছেন।

নিবেদিতার সঙ্গে কুমারস্বামীর ভালোই পরিচয় ছিল। নিবেদিতার চিঠিতে কুমারস্বামীর উল্লেখ ছড়িয়ে আছে, যথা, কুমারস্বামী তাঁর বাড়িতে চা-পানে আসছেন (১২-৮-১৯০৯) ; কুমারস্বামীকে তিনি ব্রেকফাস্টে ডাকবেন (২৮-৮-১৯১০) ; হোমউডদের আবাসে তিনি শিল্প-বিষয়ে কুমারস্বামীর বক্তৃতা শুনতে গেছেন (১৪-৯-১৯১০) ; কুমারস্বামীর বই পড়ার

দৌলতে তিনি নিজ বিদ্যালয়-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে করা ডিজাইনের সৌন্দর্য আরও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন (৩০-৯-১৯০৯) ; খুশি হয়েছেন কুমারস্বামীর দ্বারা উপহৃত 'ইন্ডিয়ান ড্রইং' এবং 'সিলেকটেড সায়েন্স' ইত্যাদি বই পেয়ে (১৩-৪-১৯১১)। নিবেদিতার বিষয়ে স্মৃতিচারণায় অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় অন্যান্যদের সঙ্গে নিবেদিতা-কুমারস্বামীর শিল্পালোচনার কথা বলেছেন।

॥ ২ ॥

আনন্দ কুমারস্বামীর প্রতিভা প্রথমাবধি বুঝতে নিবেদিতার অসুবিধা হয়নি। ৩০ বছরের কুমারস্বামী সম্বন্ধে তিনি মডার্ন রিভিউয়ের মে ১৯০৭ সংখ্যায় এই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন :

"ইনি সেই মানুষ যাঁর নাম ভবিষ্যতে এক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্প সমালোচকরূপে নানাভাবে শোনা যাবে।"

ভারতীয় শিল্প বিষয়ে হ্যাভেলের প্রথম প্রধান গ্রন্থের মতো কুমারস্বামীর প্রথম গ্রন্থের সমালোচনাও নিবেদিতা করেছেন মডার্ন রিভিউয়ের পৃষ্ঠায়। ওই পত্রিকার মে ১৯০৯ সংখ্যায় তিনি কুমারস্বামীর **Mediaeval Sinhalese Art** বইয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনায় ঢালাও প্রশংসা করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত কুমারস্বামী—তাঁর বইটির বিষয়ে নিবেদিতা না-বলে পারেন নি :

"প্রাচ্য দৃষ্টিতে রচিত এক ক্লাসিক সৃষ্টি ! এই গ্রন্থের লেখক অনুরূপ পাশ্চাত্ত্য বিষয় সম্বন্ধে একই প্রকার বিশেষজ্ঞের অধিকারে প্রামাণ্য রচনায় সমর্থ।"

নিবেদিতা সাধারণত যা করেন না, কুমারস্বামীর বইটির ক্ষেত্রে তাই করেছেন—রচনারীতির প্রশস্তি। ইংরাজি রচনা সম্বন্ধে নিবেদিতার খুঁতখুঁতুনির শেষ ছিলনা ; ভারতীয়-ইংরাজির সম্বন্ধে অম্ল মন্তব্য তাঁর চিঠিপত্রে মেলে। তিনিই কুমারস্বামীর ভাষা সম্বন্ধে বলেছেন :

"এই বইয়ের ইংরাজি ভাষা সুসমাচার বা মধ্যযুগীয় বীরকাহিনীর তুল্য সহজ ও শক্তিপূর্ণ শব্দাবলীতে আকীর্ণ। যেমন মুদ্রণে তেমনি ভাষা ব্যবহারে এর মধ্যে আধুনিক পৃথিবীর আচার্য-কারুশিল্পী উইলিয়ম মরিসের ছাঁদ লক্ষ্য করা যায়।"

স্মর্তব্য, হাভেলের বইয়ের বিশেষ সমাদর করলেও নিবেদিতা তাঁর ভাষারীতির প্রশংসা করেন নি।

কিন্তু কেবল ভাষা ও শৈলীর জন্যই নয়—ওদের সাহায্যে কুমারস্বামী এমন বিষয়বস্তু ও চিন্তাকে প্রকাশ করেছিলেন, যাদের অনস্বীকার্য গুরুত্বের জন্য নিবেদিতা তাঁর লেখার মধ্যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি না দিয়ে পারেন নি। উদ্ধৃত অংশ থেকে আমরা জেনেছি : "সিংহলী শিল্প, মূলে ভারতীয় শিল্প,...কিন্তু নানা দিক দিয়ে প্রাচীনতর চরিত্র-প্রকাশক ; এবং তা বৌদ্ধ প্রেরণার সৃষ্টি হলেও, [ভারতীয় শিল্পের তুলনায়] অধিকতর হিন্দুত্বযুক্ত।" "ক্যান্ডীয় শিল্পকে আমরা যে-আকারে পাই তাতে দেখা যায় যে, তা ভারতীয় শিল্পের আদি ভিত্তি থেকে নির্গত ধারার প্রতিনিধি, তবে পরবর্তী নানা প্রভাবের দ্বারা অংশত পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ, আবার অনেক দিক দিয়ে আদিম-লক্ষণাক্রান্ত।" ক্যান্ডীয় শিল্প প্রধানাংশে মণ্ডনধর্মী ; কুমারস্বামী সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

নিবেদিতা কুমারস্বামীর ইতিহাসবোধের প্রশংসা একাধিকবার করেছেন : "ভারতীয়

জ্ঞানচর্চা, যা কখনো অর্থের কাছে মানবতাকে বলি দেয়নি—তারই খাঁটি সন্তান কুমারস্বামী কারুশিল্পের সামাজিক ভিত্তিভূমির কথা বিস্মৃত হননি।" নিবেদিতা মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রাচ্যশিল্পের প্রাণধর্ম প্রকাশে কুমারস্বামীর সামর্থ্য দেখে। প্রাচ্যশিল্পে কেন আদর্শধর্মিতা ও বিমূর্তভাব প্রাধান্য পেয়েছে, তার বিশেষ আলোচনা কুমারস্বামী করেছিলেন। তিনি এক্ষেত্রে পদ্মের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেন : "একটি সাধারণ পদ্মের রূপ সকল পদ্মের প্রতিভূ, যেমন টিউডর গোলাপ সকল গোলাপের প্রতিভূ। সে গোলাপ সকল গোলাপের ভাবাবেগকে বহন করে এনে একটি বিমূর্ত সংহত ভাবচেতনার সৃষ্টি করে। এই হলো শিল্প-রূপের ধারাবাহিকতার ভিতরকার রহস্য।...আদর্শ রূপের উপস্থাপনার মধ্যে—বহুবিধ জটিল আকারকে এক সহজতম আকারে আবদ্ধ করার মধ্যে—প্রকাশিত হয় বহুর মধ্যে এককে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা।" নিবেদিতা সগৌরবে কুমারস্বামীর এই কথাগুলিও তুলেছেন : "সুমহান শিল্প-যুগগুলি সুমহান ধর্ম-যুগগুলিরই সৃষ্টি। সেই সকল ঐতিহাসিক প্রহরে মানবসত্তা আদর্শের গৌরবানুভূতিতে সুগভীরভাবে অভিভূত।" ভারতশিল্পে গ্রীক-প্রভাব বিষয়ে কুমারস্বামীর বক্তব্যের প্রসঙ্গও নিবেদিতা এনেছেন (এ-বিষয়টি অন্য অধ্যায়ে আলোচ্য)। তিনি আলোচনার শেষে বলেছেন : "ভারত রত্নমাণিক্যে পূর্ণ—কেবল কুড়িয়ে নেবার মানুষই নেই।" হাঁ, কুমারস্বামী আছেন—কিন্তু নিবেদিতার সবিষাদ আক্ষেপ—যোগ্য অন্য ভারতীয় আছেন কি? বাইরের মানুষের নিছক খাটাখাটুনি করে জোগাড়যন্ত্র করার কাজকে তিনি বিশেষ মূল্যদানে গররাজি। তাঁর মতে, যোগ্য মানুষ তিনিই "যাঁর আছে প্রেমিকের তীব্র আকুতি, কবির অন্তর্দৃষ্টি, শিশুর কোমলতা,...এবং সঠিক দেখার, সেই সঙ্গে মাথা ও হাত ব্যবহারের শিক্ষা।" কিন্তু এমন মানুষ যে চাই-ই—ভারতের ভাবের ও রূপের সৌন্দর্য খুলে ধরার জন্য! আনন্দে ও যন্ত্রণায় পূর্ণ হৃদয়ে নিবেদিতা বলেছেন :

"ভারতীয় পণ্ডিতগণের শিল্প বিষয়ে অনুশীলনের ব্যাপারটির কী হবে? গবেষণার ক্ষেত্র তো সীমাহীন। প্রত্যেক ভারতীয় প্রদেশ, প্রত্যেক মধ্যযুগীয় নগর তো পূর্ণ হয়ে আছে গৃহশিল্পে, ঐতিহ্যসম্পদে, আচার-আচরণের বিশেষ চরিত্রে, কারুশিল্পজ্ঞানে—সেসব জিনিস রচনার দ্বারা অমর ক'রে রাখার যোগ্য—অমর ক'রে রাখলেই মঙ্গল—সেই-মুদ্রিত শব্দগুলির পাখায় ভর ক'রে আসবে পরবর্তী প্রভাবগুলি। কোথায় আছেন সেই মানুষেরা—যাঁরা স্বদেশীয় সম্পদের শ্রেণী নির্ণয় ক'রে তাদের গৌরবখ্যাপন ওইভাবে করতে পারবেন?"

কুমারস্বামীর লেখা নিবেদিতার আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা দুই বাড়িয়েছিল।

কুমারস্বামীর গ্রন্থ-আলোচনা নিবেদিতা পরেও করেছেন মডার্ন রিভিউ-এ। সেগুলিতে কিন্তু অনুরাগের কিছু ঘাটতি। এমনকি সমালোচনাও আছে। সমালোচনার কারণ কী, নিবেদিতা তা এস কে র‍্যাটক্লিফকে ১৯/২০ জুলাই ১৯১০ তারিখের চিঠিতে বলেছেন :

"কুমারস্বামী সংশোধনের অতীত প্রতিক্রিয়াশীল—পারলে মেকলেকে ধুয়ে-মুছে ফেলবে।"[২]

মেকলের কঠোর সমালোচক নিবেদিতার মনে ('নিবেদিতা লোকমাতা' ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১০-১৩ মেকলে-প্রসঙ্গ আলোচিত) একই সঙ্গে মেকলের প্রতি এই ঈষৎ অনুরাগ-লক্ষণ কেন? এই পত্রে তিনি সংক্ষেপে ভারতে বৃটিশ শাসনকালের শিক্ষানীতির কথা

তুলেছিলেন। বৃটিশ সরকার প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতিনিধি!—সেই দুঃখ দৃশ্য তাঁকে আঁতকে দিয়েছিল। ও-রকম 'জারজ' কাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর মনে ঘৃণা ছাড়া কার কিছু ছিলনা। শিক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারে তাঁর ঘোর আপত্তি। অথচ ওই পাপ-উদ্দেশ্য ছাড়া সরকার তো শিক্ষার জন্য টাকা খরচ করবেও না! এর বিকল্প হলো, রীতিমাফিক বিদেশী শিক্ষা কিংবা গণশিক্ষা। বিদেশী শাসনে একমাত্র আশার স্থল—সকল মানুষের জন্য একই প্রকার শিক্ষা। এক্ষেত্রে বিদেশী শিক্ষার দ্বারা লব্ধ মানসিক উদ্‌ভ্রান্তির সঙ্গে ওই শিক্ষার ভিতরকার চাবিটিও হাতে এসে যায়। স্বাধীনতাকে ইংরেজ যেভাবে দেখে, যা বিশুদ্ধ আত্মিক ও বৌদ্ধিক ভাব ছাড়া কিছু নয়—সেই হলো ইংরেজ-সৃষ্ট বিষের প্রতিষেধক। আসল শত্রু হলো ক্লাইভ, তুলনায় মেকলেকে বন্ধু বলেই ধরতে হবে। মেকলেকে এমন ছাড় দেওয়ার কারণ, তিনি 'রীতিমাফিক' বিদেশী শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন।

মেকলে সম্বন্ধে কুমারস্বামীর এবং নিজের মনোভাব জানাবার পরে নিবেদিতা একই পত্রে লিখেছেন :

"মধ্যযুগীয় ভারতের সৌন্দর্য নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করার কী প্রয়োজন? সচেতনভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই সকল সৌন্দর্যের চরিত্র আমাদের বুঝে নিতে হবে—কীভাবে তারা সৃষ্ট হলো—কেন হলো?"

তিনি আরও বললেন :

"পুরাতন রীতিকে সজোরে পিছু হঠে পুনর্বহাল করার বৃথা চেষ্টার প্রয়োজন নেই। যা-কিছু উত্তম উপাদান আছে তাদের নিক্ষেপ করব বর্তমানের 'ডাইনির জ্বলন্ত কটাহে'—কী বেরিয়ে আসে দেখবার জন্য।...সুতরাং ডঃ কুমারস্বামী যখন কবির কলমে বিশুদ্ধ সংস্কৃতি বিষয়ে লেখেন তখন তিনি মূল্যবান। কিন্তু বর্তমান কাল সম্বন্ধে তাঁর অসহিষ্ণুতার জন্য আমি তাঁকে মোটেই যোগ্য পথপ্রদর্শক মনে করতে পারিনা।"

(এই কারণে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যখন কুমারস্বামীকে অধ্যক্ষ পদ দেবার কথা ওঠে, তিনি সে প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। বিশ্ববীক্ষাসম্পন্ন প্যাট্রিক গেডেসই হলেন উপযুক্ত মানুষ—নিবেদিতা একাধিক চিঠিতে তা লিখেছেন : ২-৯-১৯০৯, ৩০-৯-১৯০৯)।

র‍্যাটক্লিফকে নিবেদিতা উপরের কথাগুলি লিখেছিলেন কুমারস্বামীর **Essays in National Idealism** বই সম্বন্ধেই। সে বই "অনবদ্য", তবু পূর্বোক্ত কারণে "বইটির আলোচনাকালে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।" নিবেদিতার সেই "সতর্ক সমালোচনা" বেরোয় মডার্ন রিভিউয়ের সেপ্টেম্বর ১৯১০ সংখ্যায়। কুমারস্বামীর "চিন্তার ওজস্বিতা এবং পৌরুষশক্তিপূর্ণ ইংরাজির" উল্লেখের কালে পূর্ববৎ বলেছেন, উইলিয়ম মরিসের ধাঁচে নির্মিত হয়েছে রচনারীতি। কুমারস্বামীর বইয়ের রচনাসংখ্যা পনর, "বিষয় বহুবিধ—যোগতত্ত্ব থেকে গ্রামোফোন।" র‍্যাটক্লিফকে চিঠিতে যেকথা লিখেছেন, এখানেও তাই লিখলেন, তবে অপেক্ষাকৃত নরম কলমে : "লেখক যুক্তিনির্ভর এবং আপসহীন প্রতিক্রিয়াপন্থী।" নিবেদিতা সহানুভূতিতে ঘাটতি রাখতে চাননি—কুমারস্বামীর অতীতপ্রীতির মূলে আছে "খাঁটি আদর্শগত সত্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর ভালবাসা"—আর তার চেহারা দেখাবার জন্য তিনি কুমারস্বামীর রচনাংশ উদ্ধৃতও করেছেন, নিজেও আত্মবিদ্রূপের সঙ্গে বলেছেন, "বর্তমান প্রজন্মের ভারতীয় নাগরিক আমরা—মাতৃভূমির সংস্কৃতি-বিষয়ে যেন কিছুটা অনাথ সন্তানের চরিত্র নিয়ে, কিংবা বিদেশীসুলভ অপরিচয়ের মনোভাব নিয়ে, জন্মগ্রহণ করেছি।"

এবং শিল্প সম্বন্ধে কুমারস্বামীর এই "গভীর জ্ঞানগর্ভ" উক্তি তাঁর কাছে কী-না হৃদ্য মনে হয়েছিল (যা বিবেকানন্দের উক্তির ধার ঘেঁষে যায়) :

"মিশরের বিখ্যাত মার্জার-দেবতা, জাভার সুমহান বুদ্ধমূর্তি, ভারতের চতুর্ভুজ দেবতা, এমন-কি চীনের প্রখ্যাত ড্রাগন—এ সকলই হারমিস অফ প্রাকস্‌টিলেস কিংবা ভেনাস ডি মিলো-র তুলনায় কল্পনাশক্তিময় শিল্প হিসাবে মহত্তর। শেষোক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে আদর্শ সীমাবদ্ধ।"

আদর্শকে যেহেতু নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয় তাই আর্টের ক্ষেত্রে 'সীমাহীনতার' ভাবকে যদি সাংকেতিকতার দ্বারা প্রকাশ করা যায়, সেই হবে মহত্তম শিল্প—এই ছিল কুমারস্বামীর মত।

এসব সত্ত্বেও নিবেদিতাকে কিছু সংশোধনী মন্তব্য করতে হয়েছিল : "গ্রামোফোন, এমন-কি হারমোনিয়াম ব্যবহার নামক জারজ ব্যাপারটিকে তাঁর [কুমারস্বামীর] মতো করেই সোৎসাহে আমরা ঘৃণা করতে প্রস্তুত আছি। আমরা কেবল এই বিষয়টিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই : প্রতি দেশেই দেশসংস্কৃতির চরম উদ্দেশ্য বিশ্বসংস্কৃতির দিকে মনকে উন্মোচিত ক'রে দেওয়া—আর ভারতীয় সঙ্গীত সে-নীতির ব্যতিক্রম হতে পারে না। [ভারতীয়] সঙ্গীতশিক্ষার জন্য শ্রমস্বীকারের যৌক্তিকতা তখনই থাকবে যদি তা পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের যথার্থ সুন্দর অংশকে সমাদর করতে সামর্থ্য দেয়।"

ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি, 'প্রতিক্রিয়াশীল' কুমারস্বামীর রচনার মধ্যে নিবেদিতা এমন অংশ আবিষ্কার ক'রে তুলে ধরেছেন, যাতে আছে প্রগতিশীলতার সমর্থন। তেমন অংশ :

"শিল্প অথবা জীবন সম্বন্ধে যে-ধরনের বৃথা কল্পনাবিলাসে আমরা অভ্যস্ত, তার অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য নয় ; এমন-কি সংস্কৃতির প্রাচীন সংগঠকগণ কর্তৃক নির্ধারিত পথরেখা ধরে অন্ধভাবে চলাও উদ্দেশ্য নয়—যদিও সে ব্যাপারটি অতীব তৃপ্তিদায়ক। আমাদের উদ্দেশ্য, নিজেদের এমনভাবে পরিমার্জিত ক'রে নেওয়া যাতে আমরা পুনর্বার খাঁটি বাস্তবতার রূপ দর্শন করতে বা তার স্বর শুনতে পারি এবং আমাদের আধুনিক চেতনার ভাষায় সে-সকলের পুনঃপ্রকাশ করতে পারি।"[৩]

কুমারস্বামীর আলোচ্য পুস্তকের মধ্যে এমন একটি রচনাংশ বার করতে পেরে নিবেদিতা খুবই তৃপ্তি পেয়েছিলেন, বলাই বাহুল্য।

কুমারস্বামীর আরও চারটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আলোচনা নিবেদিতা এর পরেও করেছেন—মডার্ন রিভিউ-এ অগস্ট ১৯১১ সংখ্যায়। পুস্তিকাগুলি হলো :

The Aims of Indian Art. The Influence of Greek on Indian Art. Indian Drawings. Selected Examples of Indian Art.[৪]

আলোচনাকালে নিবেদিতা প্রধানত বিষয়পরিচয় দিয়েছেন সুষ্ঠুভাবে, উদ্ধৃতিসহ। আলোচনার সূচনায় বলেছেন, "ভারতীয় শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে এগুলি চারটি উল্লেখযোগ্য দান।" কুমারস্বামীর "অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষক রচনারীতির" কথা পুনশ্চ বলার পরে, কুমারস্বামী সম্বন্ধে যে-সমালোচনা উন্মুখ হয়েই ছিল (যাতে নিবেদিতারও অংশ ছিল) তাকে নমনীয় করার জন্য, কুমারস্বামীর রচনার গ্রাহ্য অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

"অতীত ও বর্তমানের সম্পর্ক-সেতুতে আমরা দণ্ডায়মান। অতীতের মধ্যেই আমরা

নির্মাণ করেছি বর্তমানকে ; আর ভবিষ্যৎকে গঠন করেছি এই বর্তমানের ভিতরে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য হলো—ভারতীয় উত্তরাধিকারকে ধ্বংস না ক'রে সমৃদ্ধ ক'রে তুলব, এবং একথা স্মরণ রাখব যে, সেই উত্তরাধিকার কেবল ভারতের নয়, সমগ্র মানবজাতির।"

॥৩॥

নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' ও 'ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ' কুমারস্বামীর মনোহরণ করেছিল। ওই বই দুটিকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয় মনে করতেন। কুমারস্বামী সম্পর্কে গবেষণা ও গ্রন্থরচনা যাঁর জীবনব্যাপী সাধনার লক্ষ্য, সেই ডঃ এস ডুরাই রাজা সিংগম-এর (Dr. S Durai Raja Singam) বিভিন্ন বইয়ে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা সম্বন্ধে কুমারস্বামীর সচেতন আগ্রহের পরিচয় আছে। ডঃ সিংগম-এর কাছ থেকে এ-বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীগৌতম হালদার।

কুমারস্বামী বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী। ওহিও-র কেনিয়ন কলেজে ১৯৪৬ সালে এক বক্তৃতাকালে তিনি তাঁর এক রোমান ক্যাথলিক বন্ধুর কথার উল্লেখ করেছিলেন যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দ্বিতীয় খ্রীস্ট মনে করেন। ("...and that India has had many teachers amongst whom in modern times I shall mention only **Sri Ramakrishna,** whom an English Roman Catholic friend of mine has referred to as an alter Christus (another Christ.")। একই বক্তৃতায় তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতিকে যদি অবতার বলা হয়, তাহলে বিভিন্ন ধর্মের অন্য প্রমাণপুরুষদের মতোই শ্রীরামকৃষ্ণও অবতার।[৪] শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের স্বামী নিখিলানন্দ-কৃত ইংরাজি অনুবাদ 'দি গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' কুমারস্বামীকে অভিভূত করেছিল। ম্যাসাচুসেট্‌সের 'ইন্সটিটিউট অব টেকনলজি'-তে ভারতীয় ছাত্র ও ছাত্র-বন্ধুদের এক সভায় (জানুয়ারি ১৯৪৫) কুমারস্বামী খ্রীস্টধর্ম-সহ অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে উক্ত 'গসপেল অব রামকৃষ্ণ' অভূতপূর্ব ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, একথা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। ("The recent publication in America of such an important work as Swami Nikhilananda's version of the **Gospel of Sri Ramakrishna** may be well regarded as the sign of the begining of a new and more fruitful era in 'cultural relations', a field that has hitherto been are of wistful thinking rather than of accomplishment.")।[৫] কুমারস্বামীর অনেক চিঠিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর গস্‌পেল-এর উল্লেখ আছে।[৬] আমরা জানি, কুমারস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সময়ে বক্তৃতা করেছেন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে তাঁর একটি দীর্ঘ রচনা প্রবুদ্ধ ভারতের জুন ১৯৩৬ সংখ্যায় বেরিয়েছিল (**Sri Ramakrishna and Religious Tolerance**)। জীবনের শেষ পর্বে তিনি 'অকৃত্রিম' রামকৃষ্ণের এমনই অনুরক্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁর বিবেচনায় ইউরোপে 'খাঁটি' বেদান্ত দিতে হলে প্রচারের ক্ষেত্রে ইংরাজি-জানা ভারতীয় বৈদান্তিক চলবে না, এমন-কি বিবেকানন্দও নন। "কোনো রমন মহর্ষি ইউরোপে বাস" করলে হয়ত খাঁটি বেদান্ত দিতে পারতেন। "তবে স্বয়ং রামকৃষ্ণ [ইউরোপে] উপস্থিত থাকতে পারলে, সে হতো অন্য ব্যাপার।"[৭] অতীতচারী কুমারস্বামীর কাছে বিবেকানন্দ তখনই গ্রাহ্য যখন তিনি ভারতের নিম্নবর্ণকে উচ্চতর বর্ণের সঙ্গে সংস্কৃতিক্ষেত্রে সমস্তরে তোলার জন্য সংস্কৃত শিক্ষার বিধান দেন,[৮] কিংবা তথাকথিত সংস্কারকদের ধ্বংসাত্মক পদ্ধতির সমালোচনা করেন।[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা এখানে বিশেষভাবে আনার কারণ, কুমারস্বামী চিরন্তন ভারতবর্ষের

একালীন পরম বিগ্রহরূপে রামকৃষ্ণকেই জেনেছিলেন। তাঁর কথা কুমারস্বামী হয়ত জানতে পারেন ম্যাক্সমুলারের 'রামকৃষ্ণ : হিজ লাইফ অ্যান্ড সেইংস' (১৮৯৮) পড়ে। যদি সে বই তিনি পড়েও থাকেন, ম্যাক্সমুলারের লেখার মধ্যে অবশ্যই রহস্যসিন্ধু মন্থনজাত রামকৃষ্ণকে পাননি—যার সত্যকার আভাস পান নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' (১৮৯১) গ্রন্থে রামকৃষ্ণের অনবদ্য রেখাচিত্র থেকে। শিল্প-ভারতের মর্মকথা বুঝতে এই পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল—কুমারস্বামী শিল্পকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করতেন না, ভারতীয় শিল্পের প্রধান উৎস ধর্মই, রামকৃষ্ণের মতো ধর্মধারক আবির্ভূত হয়ে প্রমাণ করেছেন ভারতবর্ষে এখনও সনাতন ধর্ম—নিত্যস্রোত, যে-চেতনা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে শুরু করতে হবে নবপর্যায়ে ভারতীয় শিল্প আন্দোলন।

ডুরাই রাজা সিংগমের গ্রন্থাদিতে সংকলিত তথ্যাদি থেকে দেখি, কুমারস্বামী মাঝে মাঝেই ভারতীয় সমাজজীবন সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান পাওয়ার জন্য নিবেদিতার 'ওয়েব' গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে বলেছেন। নিউইয়র্কে ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৩ তারিখে এক আলোচনাকালে তিনি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে অবশ্যপাঠ্য বইয়ের মধ্যে নিবেদিতার 'ওয়েব' বই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তালিকাভুক্ত অন্য বইগুলির মধ্যে আছে—ভগবদ্গীতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার প্রকাশিত 'দি কালচারাল হেরিটেজ অব ইন্ডিয়া, রবীন্দ্রনাথ-অনূদিত 'হানড্রেড পোয়েমস্ অব কবীর', স্বামী নিখিলানন্দ-অনূদিত 'সি গস্পেল অব রামকৃষ্ণ', এবং রাধাকৃষ্ণন-কৃত 'ইস্টার্ন রিলিজিয়নস্ অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন থট্'।[১০]

কুমারস্বামী একবার সপ্তদশ শতাব্দীর একটি ভারতীয় ছবি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে ধার নিয়ে, সেটির চিত্রলিপি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ছবিটি সম্ভবত 'রামসীতার রাজ্যাভিষেক', যার সম্বন্ধে নিবেদিতা একাধিকবার উল্লেখ ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। (পরে এক অধ্যায়ে তা আমরা দেখব)। নিবেদিতা ছবিটির সঙ্গে অনুরূপ প্রকৃতির ইতালীয় চিত্রের ঐক্য ও পার্থক্যের কথা বলেছিলেন। নিবেদিতার পরে কুমারস্বামীও ছবিটির মধ্যে আদি ইতালীয় চিত্রের অনুরূপ ভাবানুভূতি লক্ষ্য করেন। তিনি ১৬ মার্চ ১৯০৯ তারিখের এক চিঠিতে পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিত্র-বিষয় বুঝবার জন্য নিবেদিতার 'ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম্' পড়বার পরামর্শ দিয়েছেন।[১১]

১৯০৮ সালে নিবেদিতা যখন ইংলন্ডে ছিলেন, তখন কুমারস্বামী তাঁর 'ব্রড ক্যাম্পডেন' ভবনে নিবেদিতার এক বক্তৃতা-সভার আয়োজন করেন, বিষয়, 'ধর্ম, শিক্ষা ও জাতীয়তা সম্পর্কিত ভারতীয় নারীর জীবন'। এই বক্তৃতার বিষয়ে 'অ্যাশবী জার্নাল'-এ প্রতিবেদন বেরিয়েছিল, তাতে নিবেদিতা সম্বন্ধে প্রশংসা এবং কটাক্ষ দুইই ছিল। সেইসঙ্গে প্রাচ্যরীতিতে সজ্জিত কুমারস্বামী-ভবনের—যাতে উইলিয়ম মরিসের চিত্রাবলীও লম্বিত—কিছুটা মুগ্ধ, কিছুটা তির্যক বর্ণনাও।[১২] ডুরাই রাজা ওই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "বর্ণনাটি থেকে লব্ধ ধারণার দ্বারা বুঝতে পারি, কুমারস্বামী ও নিবেদিতার জীবন থেকে উৎসারিত কোন্ বিশেষ গুণ তাঁদের চতুষ্পার্শ্বের মানুষদের মধ্যে সংক্রামিত হতো। অধিকতর বুঝতে পারি, পৃথিবীর সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ভারতকে স্থাপনের ব্রতধারী এই দুইজনকে কোন্ ধরনের কালো অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছিল।"

কুমারস্বামী 'দি সিলোন ন্যাশন্যাল রিভিউ' পত্রিকার জানুয়ারি ১৯০৭ সংখ্যায় নিবেদিতার 'ওয়েব' গ্রন্থের উপর সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। কুমারস্বামীর পুত্র ডঃ রাম পানামবলাম

কুমারস্বামী-র কাছ থেকে সেটি সংগ্রহ করে শ্রীগৌতম হালদার আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বড়ো আকারের পত্রিকার ঠাসা পাঁচ পাতার সেই লেখার বড়ো অংশে ছিল নিবেদিতার লেখার ব্যাপক উদ্ধৃতি। কুমারস্বামী এমনভাবে উদ্ধৃতিগুলি উপস্থিত করেছেন, যাতে মনে হয়, তিনি নিবেদিতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ভারতবর্ষের জীবনসত্য উচ্চারণ করছেন। ভারতীয় নারীজীবন এবং ভারতের মহাকাব্য সম্বন্ধেই সমধিক তাঁর সংকলন। "যাঁরা ভারতীয় নারীদের বড়ই করুণা করেন, এবং 'তাদের নিজেদের হাত থেকে তাদের নিজেদের বাঁচাবার জন্য' জেনানা মিশন সংগঠিত করেন, কিংবা যাঁরা ভারতীয় নারীদের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণায় আছেন", সেই সমস্ত অতি হিতব্রতীদের বোধোদয়ের জন্য কুমারস্বামী নিবেদিতার প্রাণজ্যোতিতে পূর্ণ রচনাংশগুলি উৎকলন করেছেন। রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে নিবেদিতার গভীর ও উজ্জ্বল মন্তব্যগুলি কুমারস্বামীকে চমৎকৃত করেছিল। ভারতীয় সমাজীবনে ওই দুই কাব্যের ব্যাপক প্রভাব দেখাবার উদ্দেশ্যে নিবেদিতার মন্তব্য তিনি ব্যবহার করেছেন। জাতিপ্রথার দোষগুণ সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানী নিবেদিতার প্রজ্ঞাঘন মন্তব্যগুলিও তিনি কিয়দংশে সংকলন করেছেন।

পাশ্চাত্ত্যপ্রভাবে আত্মভ্রষ্ট সিংহলবাসীদের কাছে কুমারস্বামী নিবেদিতার বইটি পড়বার বিশেষ আবেদন জানান। ভারতীয় সভ্যতাই বিস্তৃত হয়েছে সিংহলে। মূল ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সংযোগ না রাখলে সিংহলীয় সংস্কৃতির মহতী বিনষ্টি।[১৩]

কুমারস্বামীর রচনা শুরু হয়েছিল এই কথাগুলি দিয়ে :

"This book is one that should be read by every man or woman who aspires to influence India or educate Indian boys or girls: too often is it the case that those who are teachers are not prepared for thier work by any serious knowledge or of sympathy with Indian ideals. The work of such is actually harmful; for only those Western teachers can truly serve India 'who in a spirit of entire respect for her existing conventions and her past, recognise that they are but offering new modes of expression to qualities already developed and expressed in other ways under the old training'."

শেষ হয়েছিল এই বলে :

"The book must be read by all who care for India's past or India's future."

ইংলন্ডের হ্যারাপ কোম্পানি নিবেদিতাকে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী লেখবার বরাত দেন। নিবেদিতা বইটি শুরু ক'রে অনেকখানি এগিয়ে যান। মিস ম্যাকলাউডকে ৪ জুলাই ১৯১১ তারিখের পত্রে তিনি লিখেছেন, "আমি হ্যারাপ-এর জন্য বইটি আজ সকালে লিখতে শুরু করেছি। খুবই আশা করি যে, কাজটি চালিয়ে গিয়ে অক্টোবর মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারব।"[১৪] আকস্মিক মৃত্যুর জন্য শেষ করতে পারেন নি—কিছু-বেশি এক-তৃতীয়াংশ লিখতে পেরেছিলেন। 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে 'পূর্ব জীবন' অধ্যায় নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসনকে লেখা এস কে র‍্যাটক্লিফের (স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক) যে-চিঠি উদ্ধৃত করেছি, তার থেকে দেখা যায়, ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু বইটি ওই অবস্থায় প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হলেও হ্যারাপ কোম্পানি তাতে রাজি নন—বিশেষত যখন খরচ করে ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা অনেক ছবি আঁকানো হয়েছে। বইটি অন্য কারো দ্বারা শেষ করিয়ে তবে প্রকাশ করা যাবে—এই ছিল হ্যারাপের

সিদ্ধান্ত। শেষ পর্যন্ত তাই করতে হয়। কুমারস্বামী বইটির অবশিষ্ট অংশ লেখেন—এবং নিবেদিতার *Indo-Aryan Myths* পূর্ণাঙ্গ বই হিসাবে নিবেদিতা ও কুমারস্বামীর যুগ্ম-নামে বেরোয়—*Myths of the Hindus and Buddhists* রূপে।

এই বইয়ের ভূমিকায় কুমারস্বামী নিবেদিতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বিচারশীল মন্তব্য করেন। ভারতের সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে নিবেদিতার কাজের গুরুত্ব বিষয়ে কুমারস্বামী ওজন করে যে-কথাগুলি বলেছিলেন, তাদের প্রতিটি শব্দের মূল্য স্বীকার্য :

"এই গ্রন্থ রচনার ভার যাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল সেই ভগিনী নিবেদিতাকে ভারতীয় বা পাশ্চাত্ত্য পাঠকদের কাছে পরিচায়িত করার প্রয়োজন নেই। সুমহান রামকৃষ্ণের অনুগামী স্বামী বিবেকানন্দের এই একনিষ্ঠ শিষ্যা ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাগত, সমাজবিজ্ঞানসম্মত প্রণালী সুদৃঢ়ভাবে ব্যবহার করেছেন। যে-দেশকে তিনি স্বদেশ বলে বরণ করেছেন, সেই দেশ সম্বন্ধে এবং সেই দেশের মানুষদের বিষয়ে অনুরাগের অনতিক্রমণীয় উদ্দীপনার প্রকাশ রয়েছে তাঁর রচনাগুলিতে। তাঁর প্রধান গ্রন্থের মধ্যে পড়ে 'দি ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ'—সে বইটি হিন্দুসমাজ সম্পর্কে ইংরাজি ভাষায় লিখিত একমাত্র সৎ ও সঠিক বই, একথা বলা যায় ; এবং তাঁর 'কালী দি মাদার' বই—যেটি ভারতীয় শক্তি-উপাসনার ভয়ঙ্কর ও সুকোমল দিকগুলিকে পাশ্চাত্ত্য পাঠকদের কাছে সর্বপ্রথম ধর্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্যসহ উৎকৃষ্টভাবে উন্মোচন করে দিয়েছে। এইসকল গ্রন্থদ্বারা নিবেদিতা কেবল পাশ্চাত্ত্যের কাছে ভারতসংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা হননি আরও বেশি হয়ে উঠেছেন—ভারতীয় ছাত্রদের এক নব প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস। ওইসকল ছাত্ররা আর পাশ্চাত্ত্য-অনুকরণের জন্য ব্যস্ত নয় ; তারা এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েছে যে, সকল যথার্থ প্রগতির (যা নিছক রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডা নয়) ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে জাতীয় ভাবাদর্শকে, যা ইতিমধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে ধর্মও শিল্পের আদর্শের মধ্যে।"

সুষ্ঠু রচনা। তবে লেখা কুমারস্বামীর, তাই একটু অতীতমুখী পিছুটানের মাত্রা থেকে গেছে।

নিবেদিতার মৃত্যু কুমারস্বামীকে আঘাত করে।

প্যাট্রিক গেডেসকে ১৫-১-১৯১২ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "নিবেদিতার মৃত্যুতে ক্ষতি অপরিসীম ; তাঁর শূন্যস্থান কিভাবে পূরণ হবে জানিনা।"

দীনেশচন্দ্র সেনকে ১০-১-১৯১২ তারিখে তিনি লেখেন, "নিবেদিতার বিয়োগে আপনার বেদনানুভূতির পরিমাণ আমি বুঝতে পারি। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ এখানে [ইংলন্ডে] আমাদের সকলকেই বিশেষভাবে বেজেছে।"[১৫]

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, 'ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী', উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৫৪। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালে কুমারস্বামীর দেহান্ত হয়।

২ সমালোচনার অন্য কারণও সম্ভব। নিবেদিতা র‍্যাটক্লিফকে ১৬-৯-১৯০৯, চিঠিতে লেখেন, "কুমারস্বামীর বই [সূচীশিল্পের চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে] আমার প্রভূত উপকার করেছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং ক্রমেই অধিকতর নৈরাশ্যজনক।" (*Letters of Sister Nivedita*, Vol. II., p. 1008).

৩ *NCW*, Vol. 5, pp. 302-05.

৪ A. K. Coomaraswamy, Sources of His Wisdom, (compilation of 13 essays by Coomaraswamy, with an introduction by Dr. Rama P. Coomaraswamy), 1981.

৫ ঐ, পৃ. ৪৬।

৬ যথা, কুমারস্বামী ২৯ অগস্ট ১৯৪৬ তারিখে এক চিঠিতে লিখেছেন :

"...So I believe in the words of the Vedas, Buddha, Socrates, Ramakrishna, Muhammad, Christ and many others and in the timeless reality to which or to whom–according to the phraseology appropriate in each case–these bear witness. I do not believe that I am this man so and so, but that I am that Man in this man, and that He is one and the Same at once in all the temporary vehicles that He inhabits and quickens here and in His transcendence of them all." *(Ananda Kentish Coomaraswamy: A Biographical Racords,* compiled by Dr. S. Durai Raja Singam, 1981-84, p. 521).

Coomarswamy to Bernard Kelly, Nov. 5, 1945:

"A book to read at all costs is Swami Nikhilananda's 'Gospel of Sri Ramakrishna'–Vedanta Centre, New York, a fine translation of the Bengali memoir–by 'M'."

Coomaraswamy to F. S. C. Northrop, July 25, 1946:

"...Some of my Roman Catholic friends in England (one of who calls Sri Ramakrishna 'alter Christus') are most seriously considering, in view of the present contacts, *what* ought to be the future attitude of Roman Catholic Christianity to the 'Oriental Studies'." (*Letters of Ananda Coomaraswamy,* Edited by Dr. S. Durai Raja Singam, Vol. III).

৭ *Letters of Ananda Coomaraswamy,* Letter to Dr. John Layard, 11 August, 1947.

৮ *Essays of Wisdom,* pp. 97-98.

৯ *A Biographical Record,* p. 113.

১০ ঐ পৃ. ২৯১-৯২।

১১ কুমারস্বামী ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন থেকে ১৬ মার্চ ১৯০৯ চিঠিতে জেনেট অ্যাশবী-কে লেখেন :

"I borrowed here from my host's brother (Gaganendra Nath Tagore) a lovely picture (17th century), very early Italian in feeling, and sent it to Ethel to get reproduced. I hope you will see it. It is very full of Indian feeling–in almost every line and shade of colour it is expressive of this. You want to know the story to realise it completely. It is too long to tell here, but you can find it in Sister Nivedita's Cradle Tales of Hinduism." (*Ananda Coomaraswamy: The Bridge Builder. A Sudy of a Scholar-Colosssus,* by Dr. S. Durai Raja Singam, p. 17.).

১২ উল্লিখিত আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকার জন্য কুমারস্বামী তাঁর পরিচিতজনদের কাছে নিম্নের আমন্ত্রপত্র পাঠিয়েছিলেন :

"To meet Sister Nivedita, the author of 'The Web of Indian Life', on Sunday afternoon. Sister Nivedita will speak on 'The life of Indian Women in relation to Religion, Education and Nationalism.' It is hoped you will remain for tea."

জেনেট অ্যাশবী-লিখিত এই আলোচনা সভার বিবরণ :

"Campden. 25th January, 1908. A most interesting afternoon at the 'Norman Chapel'! Sunday tea, there, has become quite an institution since Ethel and Ananda Coomaraswamy came to live in it, last spring, but this was a special Sunday. Sister Nivedita (Miss Noble) author of 'The Web of Indian Life', had come to speak on Women's ideals in India and Ethel and Ananda had invited 30 or 40 people to meet her. She is an enthusiast with a beautiful voice and a gift of oratory, and has made the cause of India her own, especially its poetry and religion. Why she has entered an Indian religious Order and exactly what her function there is, it was impossible to gather from her romantic and rather involved utterances. She told several legends very charmingly–but when it came to a summing up– she merely qouted the beautiful prayer to Shiva, the Destroyer of ignorance. In the subsequent long discussion she took up the defensive line and was very crushing to several legitimate questions which rather spoilt the atmosphere of the meeting. This and a certain tendency to flatter and wheedle, made me both distrust her intellectual integrity, and set me against her personally. Far more interesting really was it to watch, in this strange shadowy mediaeval library, so full of a warm sense, of happy presences, the faces of the mixed assembly. The Coomaras have the instinct of hospitality and a wonderful and rare simplicity and warmath of manner (of heart really) which unlocks so many doors. They had asked Campden people like the Hands Haydons, Mrs. Dunn ; Maye Bruce

representing the County–ourselves, the Websters, Margarat Harwood–a farmer's wife–Woodroffe's glassman, Mr. Phillipson and all the remaining Guildsmen and their wives. They really showed up very well as specimens of average English folk. There were besides Kathleen Beardshaw who has just been acting 'Rose' in our Dekker play and is on the eve of a year in Paris with Jeanne and Ernest Herscher; Mrs. Mckay Alec's magnificent of Guardian angel from the Higlands–who with her rugged sense couldn't bear the 'fluff' and made audible and barely polite comments–and Mrs. Ole Bull–widow of the Norwegian Violinist!

But it was Ethel and Ananda who really made the occasion, as they have made the Norman Chapel–I mean its inner life...Both of them live in their enchanted chapel, which glows rose colour with linen and Morris hangings and Oriental crimsons, like two elves, creatures that you cannot gossip with, and that yet have something more human about them than the most ordinary of us. I am still afraid of him at times–the race instinct, and the horror of 'colour' will out–and now and again I can trace shreds of polygamous ancestry that make me shiver and drew back."

(Janet E. Ashbee–wife of G. R. Ashbee, the architect, designer and social reformer–records the above in the Ashbee Journals, 25th january 1908.). *Bridge Builder*, pp. 7-8.

১৩ কুমারস্বামী ভারত ও সিংহলের প্রাচীন অখণ্ড সংস্কৃতি সম্বন্ধে লিখেছিলেন উক্ত প্রবন্ধে:

"Great stress is laid [in The Web of Indian Life] on the essential unity of India. No one familiar with Indian philosophy, literature, music and art, can fail to recognize it; only to the superficial observer are the diversities greater than the unity. If Ceylonese fail to recognise it, and to feel themselves to be a living part of India, their ultimate insignificance is assured. There is little of value in the culture of Ceylon which is not derived from or shared with India, past or present. Nor can Ceylon develop apart from India, any more than a branch severed from a growing tree...And for Ceylon, once more the sure and certain road to insignificance and worthlessness, is the road of mental and spiritual severance from India; that road along which Ceylonese are hastening more and more."

১৪ Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 1209.

১৫ Coomaraswamy to Patrick Geddes, 15.1.1912:

"...Indeed the loss of Nivedita is very great, and I do not know how she can be replaced."

To Dinesh Ch. Sen, 10.1.1912:

"...I know how much you must feel the loss of Sister Nivedita. The news of her death came as a great shock to all of us here." (*Letters of Ananda Coomaraswamy)*.

সংযোজন

ইংরেজ অধিকারের ভারতবর্ষে চারু ও কারুশিল্প শিক্ষার দুর্গতি সম্বন্ধে কুমারস্বামী নানা রচনায় সকলকে সচেতন করতে চেয়েছেন। কলকাতা আর্ট স্কুলে হ্যাভেলের নবব্যবস্থার সমর্থনে তাঁর তথ্য ও যুক্তিতে পূর্ণ জোরালো ধারালো লেখাগুলি খুবই কার্যকর হয়েছিল। এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা, মডার্ন রিভিউ-এর ফেব্রুয়ারি ১৯১০ সংখ্যার *Schools of Art in India: A Reply to Mr. Cecil Burns.* ভারতের সরকারী আর্ট স্কুলগুলিতে কিভাবে একদিকে তৃতীয় শ্রেণীর বিদেশী নকলনবিশি চলেছে, অন্যদিকে চূড়ান্ত অবজ্ঞা ও অবহেলা দেখানো হচ্ছে দেশীয় চারু ও কারু শিল্পধারা সম্বন্ধে—তা তিনি চিরে চিরে দেখিয়েছিলেন কলমকে ছুরির মতো ব্যবহার করে। মনস্বিতা ও বুদ্ধিদীপ্তিতে পূর্ণ অনবদ্য সেই রচনা—ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপদ্ধতির নির্মম উদ্‌ঘাটন যাতে হয়েছে। সে লেখাটি সহজে প্রাপ্তব্য। কিন্তু ইংলন্ডের 'রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস'-এর ১৩ জানুয়ারি ১৯১০ তারিখের সভায় (যাতে হ্যাভেল তাঁর পূর্বকথিত প্রবন্ধ পড়েন) কুমারস্বামী যে-বক্তৃতা করেছিলেন, তার প্রতিবেদন পাওয়া কঠিন। শ্রীগৌতম হালদার সেটি 'জার্নাল অব দি রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস' থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। সেটি উপস্থিত করছি :

From: "Ananda Coomaraswamy: The Bridge Builder: Supplement-22." By Dr. S. Durai Raja Simgam.

Chapter: "Coomaraswamy, Rothenstein, Havell and the Royal Indian Society."

Ananda Coomaraswamy's ramarks at the meeting of the Royal Society of Arts (On January 13) at which Mr. E. B. Havell read a paper on "Art Administration in India." Reproduced from the Journal of The Royal Society of Arts, No. 985, Vol. LVIII (February 4, 1910).

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবনীন্দ্রনাথের 'বুদ্ধ ও সুজাতা'। স্টুডিও পত্রিকায় হ্যাভেলের প্রবন্ধে (১৫.১০.১৯০২) ব্যবহৃত। এডউইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' থেকে বিষয়বস্তু গৃহীত।
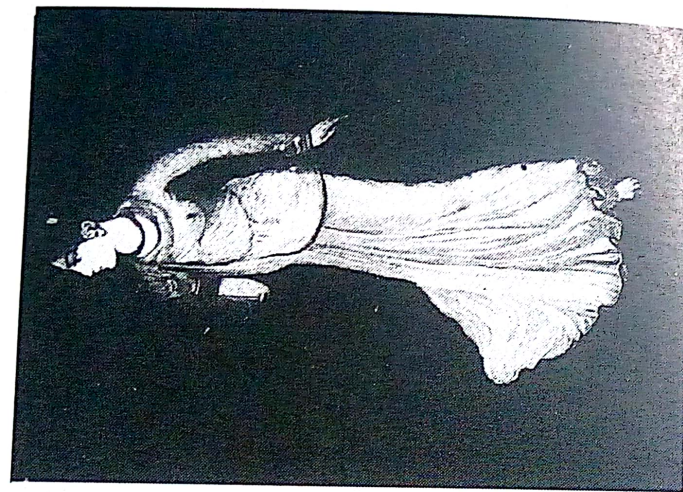
অবনীন্দ্রনাথের 'নিশাভিসার'। হ্যাভেলের উক্ত প্রবন্ধে ব্যবহৃত। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' থেকে বিষয়বস্তু গৃহীত।
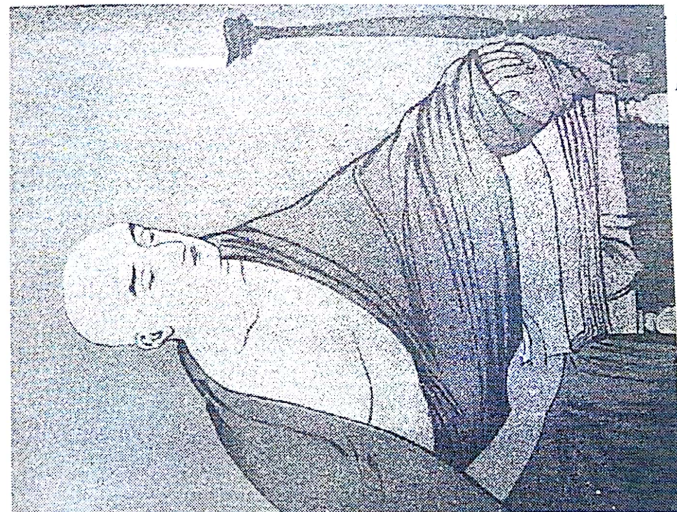
অবনীন্দ্রনাথের 'কথক ঠাকুর'। নিবেদিতার 'ক্র্যাডল টেলস অব হিন্দুইজম'-এর গ্রন্থমুখ চিত্র।

অবনীন্দ্রনাথের 'সীতা'। নিবেদিতা কর্তৃক আলোচিত।

historical, and archaeological interest, has attracted so little attention from European savants. This is the more unfortunate because the destructive agencies which are always at work in India are continually narrowing the possibilities of investigation. In India itself the very existence of an indigenous school of fine art is hardly recognised, but appreciation of the unique artistic resources of the empire has never been a prominent virtue either of the Anglo-Indian administration or of Indian patrons of art. The earliest of the existing examples of Indian pictorial art are the well-known fresco paintings in the Buddhist cave-temples at Ajanta, in the Bombay Presidency, which date from the sixth century. Though they are the only extant examples of that period, they are sufficient to show that the Indian painter, when emancipated from the restraints imposed by the rigid formalism of Hindu artistic canons and from the restrictions of Mahomedan bigotry, can interpret and enjoy to the full the infinite poetical suggestions of Indian life and Indian nature. The painting of that period besides being strongly impressed by the humanising influence of the teachings of Buddhism, was greatly affected by the artistic traditions of Greece, introduced by the followers of Alexander's army who settled in Northern India. When there came the great religious revolution which restored the power of Hinduism throughout the greater part of India, some of the Buddhist monks who fled through the passes of the Himalayas into Tibet and China brought their religion and their art into Japan. This is the explanation of the existence at the present day in some of the oldest temples of Japan of paintings, treasured as the most precious relics and rarely shown to Europeans, which closely resemble the [illegible] Buddhist art of India.

So the school of Ajanta carried its nature-loving traditions into the congenial atmosphere of far-off Japan, among a people whose artistic sympathies were entirely in the same direction. With the almost total extinction of the Buddhist religion this remarkable school of painting became extinct in India. In the Hindu caste system the profession of a painter ranks among the lowest of all the artistic crafts. For temple decoration the Brahmin priesthood always preferred the art of the sculptor. The scruples which kept the low-caste painters out of the temples also prevented their employment in embellishing the sacred writings of the Hindus; so after the disappearance of the Buddhists there is an interval of about nine centuries before painting as a fine art took root again in India. The Moguls re-introduced fresco painting, and brought with them Persian artists to illuminate and illustrate their historical writings, their classic literature, and their sacred manuscripts. Down to the time of Akbar the Great, or about the middle of the sixteenth century, the works of these Persian painters followed entirely the traditions of pure Persian art, and bore little trace of their Indian environment. Saracenic art, which was established in Northern India, was very largely influenced by the strict letter of the Mahomedan precept which forbade the artistic representation of nearly all living creatures, including humanity. Akbar, who took charge of the spiritual as well as the temporal welfare of his subjects, perceived with his keen artistic instinct how such a restriction fettered all higher artistic inspiration, and promptly swept the restriction away. With the whole wide field of Nature thus

"[illegible]" BY ABANINDRO NATH TAGORE

ইংল্যান্ডের 'দি স্টুডিও' পত্রিকায় (১৫.১০.১৯০২) হ্যাভেলের প্রবন্ধ 'Some Notes on Indian Pictorial Art'। এর মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ছবি। এটিই অবনীন্দ্রনাথের প্রথম বৈদেশিক সমাদর। প্রবন্ধটির শুরু—"It is to be regretted that the pictorial art of India, affording as it does a field which, though its limits may be small, is yet rich in artistic [পরের পৃষ্ঠাটি মুদ্রিত]

রাজা রবিবর্মা

রবিবর্মার 'প্রতীক্ষা'।

রবিবর্মার 'অশোকবনে সীতা'।

রবিবর্মার 'জটায়ুবধ'।
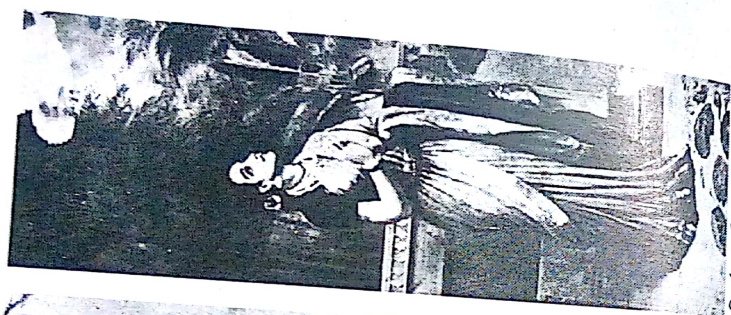
রবিবর্মার 'দময়ন্তীর হংসদূত'।

রবিবর্মার 'অহল্যা'।

কামারপুকুরের আলপথে চলতে চলতে গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণ) আকাশে মেঘের উপর বকের পংক্তি দেখে সমাধিস্থ। শিল্পী নন্দলাল। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ব্যবহৃত।

নন্দলালের ‘গোপালপুরের ধীবর’। কঠিন ব্রোঞ্জে মাদ্রাজের ধীবরমূর্তির রচনা চেয়েছিলেন নিবেদিতা—কাগজে কালিতে তারই এক রূপ ফুটিয়েছেন নন্দলাল।

নন্দলালের ‘হরিপুরা চিত্রাবলী’। জনজীবনের এইসকল ছবিতে যেন নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ।
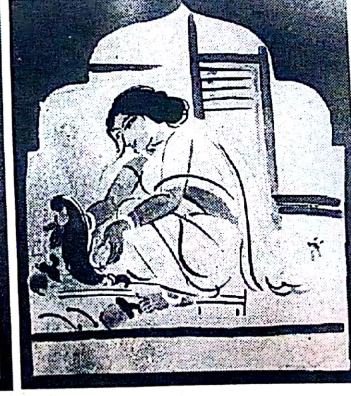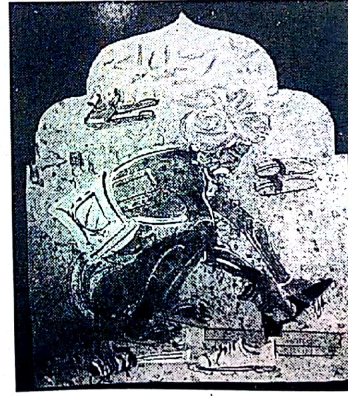
নন্দলালের 'হিমালয়'। হিমালয়ের উপরে চলমান দুই পদ শ্রীরামকৃষ্ণের।

নন্দলালের 'জননী'। মহেন্দ্রনাথ দত্তকে এই দুটি রেখাচিত্র নন্দলাল পাঠান প্রণাম জানিয়ে।

নন্দলালের 'কালী'।

নন্দলালের 'পার্থসারথি কৃষ্ণ'। (চিত্রাংশ)

নন্দলালের 'সমাধিস্থ শিব'। (চিত্রাংশ)
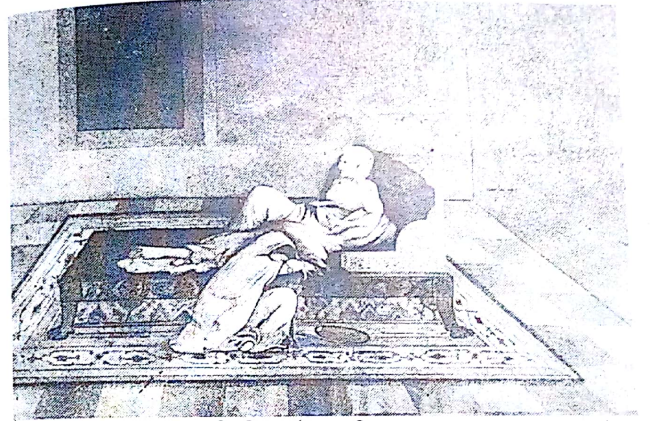
নন্দলালের 'মৃত্যুশয্যায় দশরথ'। নিবেদিতা কর্তৃক আলোচিত।

নন্দলালের 'কৈকেয়ী'। নিবেদিতা কর্তৃক আলোচিত।

নন্দলালের 'জগাই মাধাই'। নিবেদিতা কর্তৃক আলোচিত।

Dr. Coomaraswamy said that he so fully agreed with Mr. Havell's argument that there was little need for him to enlarge upon the same theme. He thought Mr. Havell had said rather too little than too much of the apathy of the British Government with regard to all matters connected with the Indian art. No one going for the first time into the Indian section of the museum at South Kensington was likely to come away with any special feeling of respect for, or any enlarged comprehension of the expression of Indian thought and feeling in art. The museum was rather an emporium of industrial art, valuable as far as it went, than an effective record of an Indian creative imagination. Then again Colonel Hanna's large collection had just been allowed to go to America because the Indian Government were indifferent to, and ignorant of, Indian art. As a smaller instance, he might cite the case of some small bronze replicas of a seventh or eighth century Buddhist image, which he had lately had made ; these had been purchased by several continental museums but refused at once by the two great museums in London, including the Indian museum already referred to. At South Kensington moreover there was not a single Mogul or mediaeval Indian painting of the first rank. It was the same in India. At the Bombay School of Art, where students might be observed making shadings from antique casts and drawing of Gothic or pseudo-classic architecture, there was not a single good specimen of mediaeval Indian painting or sculpture; and so far as painting was concerned, the same was true of the Madras Museum and School of Art. The same attitude was traceable in the whole of the Government educational policy, in which Indian art and music were alike calmly and totally ignored. Take only one example, the teaching of drawing; no one had thought of studying indigenous methods, or making use of them; antiquated South Kensington copy books represented the wisdom of the West in this respect for the greater part of India even now. The main difficulty seemed to be that English educationists in India wouldn't be brought to realise their own colossal ignorance. It seemed as if the English and Anglo-Indian mind were not only indifferant to, and ignorant of, Indian art and music, but determined that Indians themselves should remain in equal ignorance. He would also like to say a word with regard to the qualifications of European writers on Indian art. These were usually archaeologists or amateurs out of sympathy with the fundamental ideals of Indian thought, prejudiced in some cases against Indian religion, and possesed of few of the faculties of appreciation and interpretation which are demanded of a writer on European art, they have found it most easy to condemn and criticise and have felt little or no consciousness of their duty to interpret. The writer of books on art should aim to make his readers understand the art, to see the world as the artist saw it; at least, to know what the artist wished to say. Most writers on Indian art, in pointing out defects and limitations, have merely pointed out the obvious, and demonstrated the divergence of thier own from the Indian point of view; and the results could not be regarded as permanent contributions to the history of art. The European critic never seemed to penetrate behind the surface of an Indian sculpture and painting, or to have learnt its language; he did not perceive its intention, and, therefore, could not judge it on the only true basis, that of Leonardo's saying, that "that drawing is best which best expresses the passion that animates the figure." The writers he referred to did not know, and could not feel the passion that animates many an Indian work of art; how then could they interpret or criticise? Which was not to say that thier works had no value as records of historical fact; it merely showed that those who write, and those who accept such ideas, were not competent--as the Moguls or the Hindu rulers of India once were--to guide the art administration of the Government. The speaker was glad, as an Indian, to welcome

Mr. Havell's work as the begining of a new order of things, and though the study of Indian art could be hardly said to have well begun, there were signs that it would in the future progress more rapidly, and be pursued more intelligently than had hitherto been the case. With regard to Sir George Birdwood's theory that fine art did not exist in India, this appeared to be only a question of terminology; The distinction of fine and decoratve art was artificial, and though quite modern, we had progressed some little way even since the time when it was accepted as a matter of course. He could only say that if Sir George Birdwood choose to call the art of the Royal Academy or the Paris Salon, ''fine'', and such a figure as the Avalakitesvara of Mr. Havell's book (plate XI), ''decorative'', then he preferred decorative to fine art, and regarded the decorative as a profounder revelation, a more living utterance than the fine. Sir George Birdwood appeared to think that ''Fine Art'' did not exist in Europe before the time of Raphael. He made the great mistake, common to all European art critics, of calling ideal art, ''merely decorative,'' just because it was not ''realistic.'' To say, in this way, that the use of definite ''form'' such as the canons prescribed removed a given work from the category of fine art, was very much like saying that the use of sonnet form, or any other definite speech-mould prevented our regardińg a given poet's work as great or free! In any case it must be understood that the new consciousness of the ''Nature of Indian'' which lay behind the outward evidences of Indian nationalism, would be quite indifferent of academic terminology applied by Eropeans to the products of Indian imaginations and would demand from the British Government a recognition of the artistic as well as of every other phase of Indian culture. The British Government would be harshly judged by future generations for its philistine and ignorant indifference to Indian art and artists, and its policy would be unfavourably contrasted with that of the Hindu and Mogul rulers of the earlier, and in many respects, more cultured times. Not only did the speaker think, however, that it was the duty of the Government in India and Ceylon, at least, to continue the enlightened art policy of the Indian rulers whom thay supplanted, but he was convinced that nothing was more needed in Eropean art than the liberating and inspiring influence of Oriental, and especially of Indian art. He thought that influence was already left. He would not enlarge upon this piont, but would be very glad if the Chairman would call on Mr. Rothenstin, who was present, to speak as an practising artist, on the significance of Indian Art, in India and in Europe.

দ্বাদশ অধ্যায়

শিল্প-আন্দোলনের প্রধান প্রচারক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং নিবেদিতা

(প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-এ নানা বিখ্যাত বিদেশী চিত্রের নিবেদিতা-কৃত আলোচনা : অগুস্ত রঁদ্যা প্রসঙ্গ)

॥ ১ ॥

আধুনিক ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের বিশেষ সৌভাগ্য— সে তার আত্মপ্রকাশের পর্বে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত ও সাহসী ব্যক্তিকে স্বেচ্ছানিযুক্ত প্রচারসচিব হিসাবে পেয়েছিল। রামানন্দ শিল্পী নন, শিল্প-বিষয়ে সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল লেখকও নন—কিন্তু তিনি শিল্প-আন্দোলন ও তার সঙ্গে যুক্ত নবীন শিল্পীদের জন্য যা করেছেন, অন্য কারো পক্ষে তা সাধ্যাতীত। ঠিকভাবে বলতে গেলে, 'প্রবাসী'র মধ্য দিয়ে ওঁদের চিত্রনিদর্শনকে তিনি নাতিশিক্ষিত ও শিক্ষিত বাঙালির ঘরে-ঘরে বহন ক'রে নিয়ে যান, এবং মডার্ন রিভিউ-এর মধ্য দিয়ে তাদের পৌঁছে দেন শিক্ষিত বাঙালীর অতিরিক্ত বৃহত্তর ভারতের বিদগ্ধ মানুষদের কাছে, সেইসঙ্গে ভারতবিষয়ে আগ্রহী বিদেশীদের কাছেও। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিষ্ঠাপূর্ণ বীরত্ব ভুলবার নয়।

ওই কালের বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করলে রামানন্দের ভূমিকার গুরুত্ব বোঝা যাবে। একদা ভারতের চিত্রশিল্প বিশেষভাবে স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মহান স্থাপত্যকীর্তির, বা চৈত্যগুহার অভ্যন্তর-অংশ সজ্জিত করার জন্য ছবি দেওয়া হতো—সঙ্গে ভাস্কর্যও থাকত, মন্দির বা গুহার বাইরের অংশেও যাদের দেখা যেত। পারিবারিক ভবন চিত্রিতও করা হতো ; রাজা বা অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশিষ্ট শিল্পধারার প্রবর্তনও হয়েছিল (মুঘল, রাজপুত, কাংড়া) ; ছিল লোকশিল্পের বহমান ধারা, পুঁথিপত্র চিত্রিত করার রীতি ইত্যাদি। তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে যাঁরা স্থাপত্য-সংশ্লিষ্ট চিত্রনিদর্শনগুলি দেখতেন তাঁদের সশ্রদ্ধ কৌতূহলী দৃষ্টিতে অর্চিত হতো সেগুলি। সেইসকল এবং অন্য চিত্রাবলী

ঐতিহ্যধারাবতী বলে উপভোগের সমস্যা ছিলনা—কারণ সংস্কারলালিত মনে ছিল সমাদরের পূর্ব-প্রস্তুতি। অভিজাতবর্গের কাছে শিল্পীর সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতাও অল্পবিস্তর ছিল। আলোচ্যকালে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। একদিকে হ্রাস পেয়েছে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পেয়ে শিল্পকর্ম শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রেরণার বাহক হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার চিত্রাঙ্কনে আগ্রহী হয়েছেন। তাঁদের সেইসব কাজকে জনগোচর করার উপায় কী? বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে উপযুক্ত সংগ্রহশালার খুবই অভাব (দেশীয় রাজাদের ব্যক্তিগত কিছু সংগ্রহশালা অবশ্য ছিল), উপযুক্ত আকারে রসিকমণ্ডলী গড়ে ওঠেনি, ভারতবর্ষ পরাধীন এবং স্বত্বসর্বস্ব বলে রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক ভবনসমূহে শিল্পীর দীর্ঘ যত্নশীল সৃষ্টিকার্য করার সুযোগও নেই—সেই সময়ে এগিয়ে এলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাংলা ও ইংরাজি মাসিক পত্রিকা দুটিতে (প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ) বহু ব্যয়ে বহুবর্ণ ছবি ছাপিয়ে সেগুলি সর্বসাধারণের কাছে হাজির করতে লাগলেন—তার দ্বারা দেশের মানুষের চোখ ও মন তৈরী করে দিলেন। মনে রাখা দরকার, মহৎ সাহিত্য যত মন্দ মুদ্রণেই লোকের কাছে যাক, আস্বাদনের বিশেষ হেরফের হয়না—কিন্তু রঙিন ছবির উপযুক্ত প্রতিলিপি না হলে আবেদন হারিয়ে যায় বহুলাংশে, এবং শিল্পী লাঞ্ছিত হন অযথা সমালোচনায়। ওইকালে ভারতবর্ষে বহুবর্ণ ছবি ছাপার ক্ষেত্রে (বিশেষত সে ছবি যদি আবার সুকোমল জলরঙের হয়) যে-নিম্নশ্রেণীর অবস্থা বলবৎ ছিল, চিত্রশিল্প সম্বন্ধে ঔদাসীন্যও—তার হিসাব নিলে এক্ষেত্রে রামানন্দের আপ্রাণ প্রয়াসের মূল্য বোঝা যাবে। এখানে আরও স্মরণ করানো যায়, কেবল পত্রিকাতে ছবি ছাপিয়ে রামানন্দ নিবৃত্ত থাকেনি—ওইসব ছবির অ্যালবাম ছাপিয়ে স্বল্পমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থাও করেছিলেন।

রামানন্দ-সম্পাদিত পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা ওল্টালে যে-কেউ দেখতে পাবেন—ছবি সম্বন্ধে তাঁর কী প্রচণ্ড প্যাশন্। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত প্রবাসীর আগেও রামানন্দ প্রদীপ ইত্যাদি যেসব পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন—তাদের ছবিতে ভরিয়ে দিতে তাঁর চেষ্টার অবধি ছিলনা। ছবি সম্বন্ধে তাঁর বিপুল আগ্রহ—অথচ স্বদেশে সে-সময়ে উৎকৃষ্ট ছবির অভাব, বরণীয় চিত্রাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই মনে অনিশ্চয়তা—এইসব কারণ জড়িয়ে তিনি ভালোর সঙ্গে মন্দ ছবিও ছেপেছেন। সে যাই হোক, আমরা দেখি, রবিবর্মা ও ধুরন্ধরের ছবিকে বাংলাদেশে তিনিই জনপ্রিয় করেছেন। রবিবর্মার ছবি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, তাঁর উপযুক্ত জীবনী রচনা—রামানন্দ কী করেন নি! রবিবর্মার বিরুদ্ধে যখন প্রতিক্রিয়া জাগতে শুরু করেছে তখনো তিনি রবিবর্মাকে ত্যাগ করতে চাননি। শেষপর্যন্ত অবশ্য তা করেছেন—কেন, সেই চিত্তাকর্ষক কাহিনী তাঁর জবানীতেই একটু পরে দেখব। তার আগে শিল্প-আন্দোলনে রামানন্দের দান সম্বন্ধে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র অবনীন্দ্রনাথের মুক্ত স্বীকৃতি দেখে নেওয়া যাক (অন্য অনেকের স্বীকৃতিও আছে):

"রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ দেশের ঘরে-ঘরে। এই-যে ইন্ডিয়ান আর্টের বহুল প্রচার—এ এক তিনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা সম্ভব হতনা। আর্ট সোসাইটি পারেনি; চেষ্টা করেছিলুম, হলো না। রামানন্দবাবু একনিষ্ঠভাবে এই কাজে খেটেছেন, টাকা ঢেলেছেন, চেষ্টা করেছেন, পাবলিকে ছবির demand create করেছেন। কত বাধা তিনি পেয়েছিলেন।...উনি ঘুরে-ঘুরে কোথায় কী করতে হবে, কাকে দিয়ে করাতে হবে, গরিবেরও ঘরে-ঘরে, দেশবিদেশে সর্বত্র ছবির প্রচার করতে হবে—সবই নিজে করতেন। এ

আমরা কখনই পারতুম না। তিনিই হাত বাড়িয়ে ভার তুলে নিলেন। আমরা আর্টিস্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনা পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তাই নয়, নিয়মিত দক্ষিণা, কাঞ্চনমূল্য, তাও পাচ্ছি এখনো। কে ছাপত ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের হাতের ছেলেখেলার ছবি যদি-না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দবাবু?"[১]

॥ ২ ॥

শিল্পের বরেণ্য আদর্শ সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হতে রামানন্দর সময় লেগেছিল। কিন্তু তিনি প্রথমাবধি উচ্চশ্রেণীর সাংবাদিক (ইংরাজি ভাষার অধ্যাপনা ছেড়ে সাংবাদিকতাকে বৃত্তি ও ব্রত করেছেন)—তিনি জানতেন, সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে কিভাবে রচনাকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থিত করতে হয়। এই প্রয়োজনীয় সংবাদটি এখানে দেওয়া যায়—রামানন্দই বোধহয় প্রথম বিস্তারিতভাবে বাংলায় অজন্তার গুহাচিত্রের বিবরণ দিয়েছিলেন—প্রবাসীর একেবারে প্রথম সংখ্যায়, বাংলা ১৩০৮ (১৯০১) বৈশাখ—"অজন্টা গুহা চিত্রাবলী" প্রবন্ধে। বাংলার চিত্রশিল্পীদের অজন্তায় চিত্র নকল করতে যাওয়ার দশ বছর আগেকার এই ঘটনা।

রামানন্দর ওই সচিত্র আলোচনার মূল অবলম্বন গ্রিফিথস্ প্রকাশিত অজন্তা অ্যালবাম। রামানন্দ অজন্তার ছবিগুলির ব্যাপক বিষয়-পরিচয় দেন, তাদের ভিতর থেকে এদেশের সামাজিক ও ধর্মজীবনের কোন্ সংবাদ মিলেছে, তাও বলেন। তবে পণ্ডিত ও চিত্রপ্রিয় হলেও তিনি যেহেতু খাঁটি চিত্রসমালোচক নন, তাই ওইসব ছবির গুণাগুণের বিচারের সময়ে ফার্গুসন ও গ্রিফিথস্-এর মতামতের উপরই নির্ভর করেছেন। ফার্গুসনের ছিল কুণ্ঠিত সমাদর। "ফার্গুসন সাহেব বলেন যে, [রামানন্দ লিখেছিলেন] অজন্টা চিত্রগুলি আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রের সমতুল্য নহে; কিন্তু সেগুলি যে-যুগে চিত্রিত হইয়াছিল, তাৎকালিক ইউরোপীয় চিত্র অপেক্ষা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট।" গ্রিফিথস্-এর অধিক উৎসাহিত সমাদরবাক্যও রামানন্দ উদ্ধৃত করেন: "ওই স্থানটিতে বসে বছরের পর বছর ধরে সতর্ক পর্যবেক্ষণের পরে যদি আমি অজন্তা চিত্রাবলীকে শিল্প হিসাবে অত্যুচ্চ স্থানে স্থাপন করতে ইচ্ছা করি তাহলে আশা করি আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। এইসব শিল্পকর্মের লক্ষণীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এদের নির্মাণকৌশল এমন সুচারু, ধারাবাহিক রীতিরক্ষায় এরা এমন অবিচলিত, ডিজাইনের ব্যাপারে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রাণবন্ত, সেইসঙ্গে সুন্দর রূপাঙ্কন ও বর্ণবিন্যাসে এমন সুস্পষ্ট আনন্দোৎফুল্ল যে, এদের আমি ইতালির প্রাচীন শিল্পসমূহের সঙ্গে একাসনে না বসিয়ে পারিনা, যাদের সম্বন্ধে পৃথিবী প্রশংসায় ভরপুর।...এইসকল বৌদ্ধ শিল্পীরা মণ্ডনশিল্পের সর্বোচ্চ ও সুমহান নীতি এবং আদর্শ পুরোপুরি বুঝতেন।" [অনূদিত]

এর পাশে রামানন্দর মন্তব্য নিতান্ত কাঁচা। তিনি তৎকাল-চলিত এই ধারণায় বাঁধা দিলেন—ভারতীয় চিত্রে শরীরগঠনজ্ঞান নেই। তবে ভাবপ্রকাশের প্রশংসা করেছেন:

"অজন্টা গুহা চিত্রাবলীতে চিত্রকরগণ অনেক স্থলে ললনাদিগের চক্ষু বড়োই দীর্ঘ করিয়াছেন। টানা চোখের মতো আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পীন পয়োধর ও গুরু নিতম্বেরও প্রশংসা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কিছুতেই স্বভাবকে অতিক্রম করা উচিত নয়। অজন্টা গুহার ছবিগুলিতে নারীগণের স্তন ও নিতম্ব স্বাভাবিক অপেক্ষা পীনতর ও পৃথুতর করিয়া আঁকা হইয়াছে। কিন্তু নরনারী-দেহচিত্রণে অপরাপর বিষয়ে এই প্রাচীন চিত্রকরগণ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অঙ্গুলিভঙ্গ যে কতপ্রকার আছে বলা যায়না।

মিনতি, রোষপ্রদর্শন, আদর প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন কার্যে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার ভঙ্গি। কিন্তু এই প্রাচীন শিল্পীগণ ভালো করিয়া পা-আঁকিতে পারেন নাই। নারীগণকে প্রায়ই বিবসনা বা অর্ধনগ্না আঁকা হইয়াছে, কিংবা এরূপ বস্ত্র পরানো হইয়াছে যাহাতে দেহের গঠন বুঝিতে পারা যায়।"

রামানন্দর ব্যাপক শিল্পপ্রীতি, সেইসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পসৌন্দর্য বুঝতে অক্ষমতা—দুইই পুনশ্চ দেখা গেল প্রবাসীর প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষের শিল্প' প্রবন্ধে। ভারতের নানাশ্রেণীর প্রাচীন শিল্পের বিবরণ দেবার পরে তিনি তার অবনতির কারণ দেখিয়েছিলেন— এবং রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির উক্তি মান্য করে ইউরোপীয় লেখকদের প্রতি আনুগত্যে জানিয়েছিলেন—ভারতীয় ভাস্কর্য গ্রীক ভাস্কর্যের সমতুল হতে পারেনি।[২]

॥৩॥

রামানন্দ বদলেছিলেন। দিক বদলে তাঁর নবযাত্রা। রবিবর্মা থেকে চলে যান অবনীন্দ্রনাথে।

রামানন্দ কেন তাঁর অতিপ্রিয় রবিবর্মাকে ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথকে বরণ করলেন, তার কারণ একবার বিতর্কমুখে স্পষ্ট তীক্ষ্ণ ভাষায় লিখে জানিয়েছিলেন। নবভারতীয় চিত্রকলার বিরোধিতা কেবল পাশ্চাত্যপন্থীরাই করেন নি, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের পন্ডিতরাও করেছিলেন—যেমন অক্ষয়কুমার মৈত্র বা রমাপ্রসাদ চন্দ। শিল্পাদর্শ ও শিল্পরীতি বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে রমাপ্রসাদের তর্ক হয়। প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ ১৩২০ সংখ্যায় "ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা" প্রবন্ধে রমাপ্রসাদ বলেন—অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত চিত্রকলার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ব্যাপক বিরূপতা আছে, আপত্তিকারীদের মধ্যে প্রাচীনপন্থীরাও আছেন, যদিও অবনীন্দ্রনাথের দাবি তিনি প্রাচীন শিল্পকলার অনুগামী। রমাপ্রসাদের বিশেষ অভিযোগ—নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলায় 'স্বভাবানুকরণ' একেবারে নেই—যা ছিল অজন্তার চিত্রকলায় বা ভারতীয় ভাস্কর্যে। ভারতের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র উদ্ধৃত করে রমাপ্রসাদ নিজ মতের সমর্থন করতে চেয়েছিলেন—হ্যাভেলের মন্তব্যও সেই কাজে লাগান।

রমাপ্রসাদ চন্দের আক্রমণে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় খুবই বিরক্ত হন, ঝাঁঝালোভাবে উত্তর দেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদের আপত্তিকে তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন—ইংরাজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হলেই যেমন কেউ পাশ্চাত্য চিত্র-বিশেষজ্ঞ হয়না, তেমন সংস্কৃতে পণ্ডিত হলেই কেউ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার মর্মজ্ঞ হয়ে পড়বেন এমন কথা নেই। হ্যাভেলের উক্তিকে সমর্থক প্রমাণরূপে রমাপ্রসাদ তুলেছিলেন। রামানন্দ বললেন, "হ্যাভেল প্রভৃতির প্রশংসা যদি এক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে অন্যত্রও অন্তত বিবেচ্য হওয়া উচিত। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, হ্যাভেল, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকরগণের বিশেষ অনুরাগী।" রমাপ্রসাদ চন্দ-উপস্থাপিত "স্বাভাবিক" শিল্পের দৃষ্টান্তগুলিকে রামানন্দ নাড়াচাড়া করেন। "[অজন্তার] অধিকাংশ ছবির প্রতিলিপি পুস্তকে ও ফটোগ্রাফে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে সেগুলিকে তো কোনোক্রমেই স্বাভাবিক বলা যায়না।...ভারতের নানা স্থানে শত-শত প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গিয়াছে— তাহার অধিকাংশই 'অস্বাভাবিক'।" রমাপ্রসাদ "স্বাভাবিক" মূর্তি বলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর যে-দুটি ভাস্কর্যের ছবি তাঁর প্রবন্ধমধ্যে দিয়েছিলেন, তাদের উল্লেখ করে রামানন্দ লেখেন— "ওই

মূর্তি যদি স্বাভাবিক হয় তাহা হইলে অবনীন্দ্রবাবু এবং তাঁহার ছাত্রদের আঁকা এরূপ অনেক ছবির নাম করিতে পারি যেগুলি ওইরূপ স্বাভাবিক।"

অতঃপর রামানন্দ আহত, তীব্র, অথচ গভীর ভাবে ও ভাষায় শিল্প-প্রচারে তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকা ও অভিজ্ঞতার কথা বলেন, এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেন— ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণাতেই তিনি নব্যচিত্রকলার সমর্থনে নেমেছিলেন :

"আমি আমাদের দেশের আমার মতো শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে দেশী বিদেশী ছবি কম ঘাঁটিয়াছি বলিয়া বোধ হয়না। দেশীয় আধুনিক ভিন্ন-ভিন্ন রীতির ছবি ছাপিয়া অর্থ 'নষ্ট' করিয়াছি এবং বিদ্রূপভাজন হইয়াছি সমুদয় ভারতবর্ষীয় সম্পাদকের চেয়ে বেশি। তাহাতে আমার চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার জন্মিয়াছে মনে হয়না। তবে আমার ধারণা এই হইয়াছে যে, অবনীন্দ্রবাবু ও তাঁহার ছাত্ররা চিত্রকলার প্রাণের সন্ধান পাইয়াছেন এবং অনেকে অতি উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিয়াছেন। সঙ্গীতনিপুণ ওস্তাদের দুএকটা মুদ্রাদোষে যেমন তাঁহার গুণ ঢাকা পড়েনা, তেমনি নবীন শিল্পীদের কোনো-কোনো ছবিতে ম্যানারিজ্‌মের আতিশয্য থাকিলেও তাহা ধর্তব্য নয়, এবং এই ম্যানারিজ্‌ম সব ছবিতেও আছে এরূপ মনে করা ভুল। হ্যাভেল সাহেবের মত যদি অন্য বিষয়ে গ্রাহ্য হয় তাহা হইলে নবীন শিল্পীদের তিনি যে-প্রশংসো করিয়াছেন, তাহা অবজ্ঞেয় হইতে পারে না।

"আমি একসময় রবিবর্মা ও তাঁহার সম্প্রদায়ের গোঁড়া ছিলাম। আমার লেখা তাঁহার সচিত্র জীবনচরিত এখনও বাজারে বিক্রি হয়। আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। ৫/৬ বৎসর পূর্বে ছবি সম্বন্ধে স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতার সহিত উত্তেজিতভাবে চিঠি লিখিয়া রবিবর্মার পক্ষাবলম্বনপূর্বক তর্ক করিয়াছিলাম। আমার চিঠির উত্তরে সেই মনস্বিনী বত্রিশ পৃষ্ঠার এক চিঠি লিখিয়া, একটু বিবেচনার পর, তাহা আমাকে পাঠান নাই। তাঁহার সেই চিঠি বোধহয় এখনও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকটে আছে। পরে স্বর্গীয়া লেখিকারই মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি এই ভাবিয়া উহা আমাকে পাঠান নাই যে, আমি ছবি দেখিতে-দেখিতে উহার মর্মজ্ঞ হইব, তর্কদ্বারা আমার চোখ খুলিবে না। মর্মজ্ঞ হইয়াছি কিনা জানিনা, কিন্তু এখন তাঁহার যেরূপ ছবি ভালো লাগিত আমিও তদ্রূপ ছবির অনুরাগী হইয়াছি।...কেবলমাত্র স্বভাবের অনুকরণ বা বস্তুতন্ত্রতা যে আর্ট নহে, তাহা বুঝিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছে।"[৩]

একই ধরনের কথা রামানন্দ অন্যত্রও বলেছেন, যেমন :

"তিনি [নিবেদিতা] আমার কাগজে লেখায় কয়েকটি বিষয়ে আমার চোখ ফুটিয়াছিল। আমি প্রথম-প্রথম রবিবর্মার ছবির প্রতিলিপি ছাপিতাম। তিনি ক্রমাগত আমার সহিত তর্কযুদ্ধ করিয়া আমার এই বোধ জন্মান যে, রবিবর্মা ও তদ্বিধ অন্য ছবির রীতি ভারতীয় নহে, এবং পাশ্চাত্যরীতির চিত্র হিসাবেও সেগুলির উৎকর্ষ নাই। চিঠিতে ছাড়া এসব ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সহিত মৌখিক কথা যখন হইত, তখন কথা বলার কাজ তিনিই বেশি করিতেন, আমি বেশির ভাগ শ্রোতার কাজ করিতাম।...গ্রীক-গান্ধার মূর্তিশিল্প যে, ভারতীয় মূর্তিশিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, এবং গান্ধার মূর্তিশিল্পের বাহ্য কারিগরি গ্রীক হইলেও তাহাতে প্রাণ যতটুকু আছে তাহা যে ভারতীয়, তাহা তিনি প্রদর্শন করেন। অজন্টা গুহা-বিহারের প্রাচীরচিত্রে অঙ্কিত চিত্রাবলী ছাড়া গুহাবলির স্থাপত্যাদিও যে প্রশংসনীয়, নিবেদিতা

কয়েকটি সচিত্র প্রবন্ধে তাহা প্রদর্শন করেন।"[৪]

॥ ৪ ॥

রামানন্দের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় এবং মডার্ন রিভিউ-এর নানাবিধ রচনায়, বিশেষত রাজনৈতিক রচনার ব্যাপারে, উভয়ের সহযোগিতার বিস্তৃত ইতিহাস অন্যত্র ('নিবেদিতা লোকমাতা', ২য়, পৃ· ২৯২-৩০৩) বলেছি। শিল্প সম্বন্ধে সহযোগিতার বিষয়ে, নিবেদিতার ১৮ জুলাই ১৯০৬, চিঠিতে দেখি, তিনি প্যুভি দ্য শ্যাভান-এর St. Geneviev's Watch Over Paris ছবিটি বাংলা পত্রিকায় [প্রবাসী] প্রকাশের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। অল্পদিনের মধ্যে ৯ অগস্ট ১৯০৬, চিঠিতে উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্ত্য চিত্রের একটা তালিকা ক'রে তাদের প্রতিলিপি পাশ্চাত্ত্য থেকে চেয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে সেগুলি বাংলা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিতে পারেন। ছবিগুলির প্রতিলিপি পেয়ে তিনি ৫ ডিসেম্বর তৃপ্তির সঙ্গে লিখেছেন, "আমাদের পত্রিকায় ওগুলি বহু মাসের খোরাক জোগাবে।" বাংলা পত্রিকায় তিনি বস্টন পাবলিক লাইব্রেরির ছবি ও বিবরণ ছাপাতে চেয়েছেন—তা দেখা যায় তাঁর ১২ ডিসেম্বর ১৯০৬, চিঠিতে। এই লাইব্রেরির স্থাপত্য, তাঁর মতে, আধুনিক পৃথিবীতে নগরস্থাপত্যের সেরা নিদর্শন।[৫]

নিবেদিতা যে, প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য ছবি বেছে দিচ্ছেন, একথা রামানন্দ লিখেছেন প্রবাসীর চৈত্র ১৩১৩ সংখ্যায়। প্রবাসীর ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যাতেও লিখেছিলেন :

"ভগিনী নিবেদিতা—১৩১৩ হইতে দেশী বিদেশী বহু প্রসিদ্ধ চিত্রের চিত্রপরিচয় প্রভৃতি প্রবাসীতে ইংরাজিতে লিখিতেন। তাহার বাংলা অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইত। কিছুকাল পূর্বে ইহার মৃত্যু হইয়াছে।"

প্রবাসী প্রকাশের প্রায় ৬ বৎসর পরে জানুয়ারি ১৯০৭, মডার্ন রিভিউ বের হয়। এবার ইংরেজি মাসিকে সরাসরি নিবেদিতার শিল্পসম্বন্ধীয় লেখা বেরুতে থাকে। এদেশের প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র, উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্ত্য চিত্র এবং সমকালীন ভারতীয় চিত্র সম্বন্ধে তাঁর অনেক লেখা বেরিয়েছে।

নিবেদিতা কলাকৈবল্যবাদী ছিলেন না। জীবনের সর্বাত্মকতায় বিশ্বাসী তিনি, কোনো কিছুকেই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি। তাঁর ব্যাপক গভীর দৃষ্টিতে ধর্ম-সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান—সকলই অখণ্ড প্রাণ-উৎস থেকে উদ্ভূত এবং রক্ত-সম্বন্ধে আবদ্ধ। আবার আদর্শবাদী হিসাবে জীবনের শ্রেয়-সংগঠনে আগ্রহী ছিলেন, তাই শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ধারাপথের কথাও ভেবেছেন। এক্ষেত্রে আত্মখণ্ডনের সমালোচনা আসতে পারে জেনেও তিনি নিজ মতে অকুতোভয়, কারণ মানবজীবনে শিব-বোধকে অবলম্বন করলেই তবে সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ ঘটবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই জন্য আন্দোলনের মনোগঠনের উদ্দেশ্যে যেসব চিত্র তিনি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্বাচন করেছিলেন, তাদের মধ্যে তাঁর নীতিবাদী চিন্তার প্রকাশ আছে। তাঁর চিঠি থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পারি, সেগুলি থেকে আরও দেখতে পাব, পাশ্চাত্ত্যশিল্পের জগতে তাঁর কতখানি প্রবেশ ছিল, বা সেখানে প্রবেশে তিনি কতখানি আগ্রহী ছিলেন।

নিবেদিতা তাঁর শিল্পী-বন্ধু এরেনজার কুককে—উভয়ের পরিচিত ইংরাজ শিল্পী ওয়টস্-এর মৃত্যুতে লিখেছিলেন (৭·৭·১৯০৪) :

"ওয়টস্ মারা গেছেন—দুঃখ পাওনি কি? আমার তো মনে হয়, তিনি এমন মানুষ যাঁর খ্যাতি যত দিন যাবে বাড়বে। নিশ্চয় তিনি একদিন ১৮৫০—১৯০০ কালপর্বে ইংরাজি চিত্রকলার ক্ষেত্রে টিশিয়ান বলে গণ্য হবেন।"

জর্জ ফেডরিখ ওয়টস্ (১৮১৭—১৯০৪) সম্বন্ধে এই সংবাদ পাই : তিনি কল্পনাময়, মানবতন্ত্রী রূপক-চিত্র অঙ্কনকারী ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী। তাঁর শিক্ষার পটভূমিতে ছিল তিশিয়ানের আঁকা দেহাবয়ব। মস্ত ক্যানভাসে ছবি আঁকতেন, সেগুলি ব্লেকের সাংকেতিক কল্পনার কথা স্মরণ করায়, তাদের বর্ণরূপ সুন্দর কিন্তু কম্পোজিশন ও ড্রইং-এ জোর কম। ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ-যুগের মানুষ তিনি—তার দুঃখরূপও জেনেছেন— দরিদ্র্যের জীবনযন্ত্রণাকে শিল্পে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন।[৬] ওয়টস্-এর বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'আশা' (Hope)। আধ্যাত্মিক আকৃতি ও উচ্চ আদর্শে চালিত শিল্পীর এই রূপক-ছবিটিতে আশা-কে দেখা যায় এক সুন্দরী নারীমূর্তিরূপে—ভূমণ্ডলের উপর কর্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত। তাঁর পরিধানে নীল বস্ত্র—দিব্য আলোকের আভাস সেখানে—যার সঙ্গে আশার চির সম্পর্ক। কিন্তু আশা অপরপক্ষে আচ্ছাদিত-দৃষ্টি—তিনি দেখেনও না, দেখাও দেননা।" এই চিত্রে, কবি ও ঋষির প্রজ্ঞা একসঙ্গে প্রকাশিত— সেন্ট পল এবং খ্রীস্টের।"[৭]

মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ১৫ নভেম্বর ১৯০৬, চিঠির গোড়ার দিকে স্বাধীনতা ও ত্যাগের প্রসঙ্গ আছে। নিবেদিতা বলেছেন, যদি কেউ স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধক মধুরতম সুখ থেকে নিজেকে মুহূর্তমধ্যে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, সেই কাজই হবে তার পক্ষে ত্যাগের এক সুন্দরতম অভিব্যক্তি। এর সঙ্গে থাকা চাই অব্যাহত নিষ্ঠা, এবং—

"আর একটি জিনিস আছে—অপূর্ব সহজতা—যা অটল দৃঢ়তার অংশ। দার্জিলিঙ ছেড়ে আসার সময়ে যখন লেখার টেবিল থেকে বার্ন জোনস-এর (Burne Jones) আঁকা হোলি গ্রেল-এর (Holy Grail) ছবি খুলে নিচ্ছি তখন ভাবছিলাম—হোলি গ্রেল-এর এঞ্জেল হওয়া কী অপূর্ব ব্যাপার! আহা যদি কেউ উপলব্ধি করে যে, ওই প্রকার সহজ পূজাই জীবনের কর্তব্য— এবং সেই উদ্দেশ্যে সে নিজেকে নিবেদন ক'রে দিতে পারে!! আর তার পরেই দেখলাম— সকলেরই নিজস্ব হোলি গ্রেল আছেন। মানুষের কাজ হলো, যেখানেই তাঁর দর্শন পাক, নির্নিমেষ নয়নে তাঁর পূজা ক'রে যাওয়া।"

বার্ন জোনস্ (১৮৩৩—৯৮) ধর্মীয় চিত্রশিল্পী হিসাবে বিখ্যাত। তাঁর চার্চে যোগদানের কথা হয়েছিল— রসেটির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে জীবনের ধারাবদল হয়ে যায়। প্রাচীন কাব্য, ব্যালাড, ধর্মীয় লোকশ্রুতি ইত্যাদি অবলম্বনে ছবি আঁকতে থাকেন। ইতালি ভ্রমণের ফলে স্টাইল ও ভিশনে বিস্তৃতি আসে। বিরাট আকারে ছবি আঁকলেও খুঁটিনাটিতে নজর ছিল। মোজেয়িক-ভাব ছিল ছবিতে। উইলিয়ম মরিসের সহযোগিতায় মণ্ডনধর্মী কাজও করেছেন। 'স্টার অব বেথলিহেম' তাঁর সুপরিচিত ছবি, যার মধ্যে মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীসংঘের চেতনা ব্যাপ্ত।[৮]

॥ ৫ ॥

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকার জন্য পাশ্চাত্ত্য চিত্র চেয়ে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে ৯ আগস্ট ১৯০৬ তারিখেও চিঠি লিখেছেন। তার মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের

অনেকটাই স্পষ্ট :

"আমার জন্য এখন তুমি একটা কাজ করো। উৎকৃষ্ট ছবির সস্তা প্রতিলিপি আমেরিকায় খুবই পাওয়া যায়। তাদের কিছু আমি চাই। জোগাড় করে দিতে পারবে? ব্যক্তিগতভাবে আমার কাজে লাগতে পারে এমন সৌখিন জিনিস চাইনা—চাই প্রচলিত চিত্র। এমন চাওয়ার হেতু, একটা বাংলা পত্রিকায় সেসব ছবি টীকাভাষ্যসমেত প্রকাশ করার সুযোগ এসেছে—তার দ্বারা উচ্চশ্রেণীর পাশ্চাত্যশিল্প সম্বন্ধে সঠিক ধারণা তৈরি করে দিতে পারব। যদি সম্ভব হয় এগুলি আমার চাই :

"মিলে (Millet), আঞ্জেলাস (Angelus) এবং লা ব্লাঁশিসোজ (La Blanchisseuse); রসেটী (Rossetti), অ্যানানসিয়েশন্ (Annunciation), বেআটা বেআট্রিক্স (Beata Beatrix), আসট্রাটে সিরিকা (Astrate Sirica); বঁগেরো (Bonguereau)—ম্যাডোনা আন্ডার দি ভাইনস্ (Madonna under the Vines)। এই শিল্পীর অন্য ছবির কথা জানি না—জানতে পারলে খুশি হব।

মূলার (Muller), ক্রাইস্ট বিফোর দি ডক্টরস্ (Christ Before the Doctors)। আমি নিজে এই ছবিটা পছন্দ করি না, কিন্তু নবানুরাগীরা সর্বদাই তা করে।

"রাফায়েল (Raphael) কিছু ছবি। কী—তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই যতক্ষণ তা ম্যাডোনা হচ্ছে।

"মিকেলাঞ্জেলো (Michael Angelo)—এঞ্জেল, কি ওই ধরনের কিছু। কিন্তু 'দি টুম্ব অব লোরেঞ্জো' (The Tomb of Lorenzo) নয়। ওটা সহ্য করতে পারি না। 'দি ক্রিয়েশন অব ম্যান' (The Creation of Man) অতি সুন্দর।

"তিশিয়ান (Titian), ভেরোনেজ (Veronese)—এবং অন্য ভিনিশীয় শিল্পীর একটি কি দুটি ছবি।

"ক্রিভেলি, বলোনা (Crivelli, Bologna), অ্যানানসিয়েশন।

"নমুনা চাই— চীমাবুয়ে (Cimbue), জিয়ত্তো (Giotto), পেরুজীনো (Perugino), ফ্রা আঞ্জেলিকো (Fra Angelico), বার্তোলোমেও (Bartolommeo), বতিচেল্লি (Botticelli)।

"যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, আমি কিন্তু 'রিলিজিয়াস্' ছবি চাই, 'ক্লাসিক্যাল' কদাপি নয়।

"এছাড়া খুবই আনন্দিত হব যদি শিকাগোয় থাকা ওকেন ভার্জিন অব নুয়েমবেরী (Oaken Virgin of Nuembery) এবং নাইক-এর (Nike) একটা ফটোচিত্র পাঠাতে পারো। আমার ধারণা, ওইসব জিনিসের প্রতিলিপি আমেরিকায় ৫ বা ১০ সেন্ট দামে পাওয়া যাবে। আমি মুদ্রিত প্রতিলিপিগুলি স্কুলের জন্য চাই; তবে ফটোগ্রাফ নয়, কারণ ভালো ফটোগ্রাফ সব সময়েই ব্যয়সাধ্য। ...স্যাঁত জেনভিভ্ (Saint Genevieve) প্যারিস নগরীর দিকে তাকিয়ে আছেন—যে ভাবেই হোক, এই ছবির পুনর্মুদ্রণ করাতে হবে। কী সুন্দর তিনি।"

নিবেদিতার দ্বারা উল্লিখিত শিল্পীদের কয়েকজনের বিষয়ে অল্পবিস্তর তথ্য জানাতে পারি।

মিলে (Jean-Francois Millet) ১৮১৪-১৮৭৫, ফরাসি শিল্পী, গ্রাফিক আর্টে দক্ষ, নিজেকে 'কৃষকাধিক কৃষক' রূপে পরিচায়িত করতে ভালবাসতেন। কঠিন পথ বেয়ে উঠেছেন, নানা ধরনের ছবি এঁকে গ্রাসাচ্ছাদন করতে হয়েছে, ১৮৪৭-এ অ্যাকাডেমিতে প্রবেশাধিকার পান, সাফল্য পান অনেক পরে। পরিণত পর্বে খামার-শ্রমিকদের ধর্মজীবন ও পরিবারজীবনের ছবিই আঁকতেন। একদা র‍্যাডিকাল বলে চিহ্নিত হলেও পরবর্তী বিচারে মর্যাদামায় ঐতিহ্যপন্থী বলে গৃহীত।[৯]

এঁর দুটি ছবি বিখ্যাত—'দি আঞ্জেলাস' (The Angelus) এবং 'দি গ্লিনার্স' (The Gleaners)। আঞ্জেলাস ছবিটি সুমহিম। "মানুষের শিল্পকে যদি অমরতার গৌরবে ভূষিত করা যায় তাহলে চিত্রিত কৃষক দুটি অমর সৃষ্টি।"[১০]

আঞ্জেলাস নিবেদিতার চেষ্টায় মুদ্রিত হয়েছিল প্রবাসীর অগ্রহায়ণ ১৩১৩ সংখ্যায়। ছবিটির বিষয়ে এক গভীররসাত্মক আলোচনায় নিবেদিতা দুটি বিষয়কে তুলে ধরেন—এক, পাশ্চাত্যের মনোজগতে, বিশেষত ক্যাথলিক দেশগুলিতে, খ্রীস্টীয় ভাবনা কী-রকম ওতঃপ্রোত; দুই, রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজমের দ্বন্দ্ব কিভাবে মিটতে পারে। শেষোক্ত প্রশ্নে নিবেদিতা বলেন, এই দ্বন্দ্বের বাস্তব অস্তিত্ব কেবল ক্ষুদ্র মনের রচনাতেই আবদ্ধ। মিলে-র আঞ্জেলাস ছবিতে এই দ্বন্দ্বের ভেদরেখা কিভাবে বিলুপ্ত, নিবেদিতা তা দেখতে চেয়েছেন। "মিলের চেয়ে বড় রিয়ালিস্ট সম্ভব নয়। তিনি সেই ক্ষুদ্র শিল্পীগোষ্ঠীর নেতা যাঁরা বারবিদোঁ-এর ফরাসি গ্রামটিকে ইউরোপীয় শিল্পের জগতে পবিত্র নাম-রূপে চিহ্নিত করেছেন। অথচ মিলে-র মহান সৃষ্টি আঞ্জেলাস-এর উপর আইডিয়ালিজমের যে-প্রকার জ্যোতিঃপাত হয়েছে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় কি?" ছবিতে দেখা যায়, আলুক্ষেতে কর্মরত কৃষকদম্পতি সন্ধ্যার সময়ে যেই শুনেছে চার্চের ঘণ্টা অমনি হাতের যন্ত্র ফেলে দাঁড়িয়ে পড়েছে নতমস্তকে প্রার্থনায়। "এই ছবিতে এমন কিছু নেই যা মিলের কাছে সরাসরি প্রকৃতি থেকে আসেনি। দৃশ্যের সব অংশই বাস্তবের রূপায়ণ। কিন্তু"—নিবেদিতা যোগ করেছেন— "ওর রূপকার ফটোগ্রাফার-জাতীয় নন—তিনি কবি, তিনি দ্রষ্টা। এক মহৎ মানুষের হৃদয় ও মন প্রকৃতির ভাষ্য রচনা করেছে এখানে। ...এ হলো রিয়ালিজম্, এ হলো আইডিয়ালিজম্।" এ-কথার ব্যাখ্যায় নিবেদিতা বলেছেন, একটি জাতির জীবনে "আইডিয়ালিজম্' দীর্ঘ ধারাবাহিক অনুসৃতিতে হয়ে ওঠে 'রিয়ালিটি'। এই সূত্রে খ্রীস্টীয় সংস্কৃতির এক গভীর দিক উম্মোচন তিনি করলেন :

"আঞ্জেলাস শব্দটির অর্থ প্রার্থনা বা এক ধরনের পূজা। এই প্রার্থনায় পুণ্যবতী কুমারী 'জননী মেরীর সমীপে দেবদূতীর বন্দনা-শব্দাবলী উচ্চারিত হয়। মেরী হতে যাচ্ছেন খ্রীস্টজননী :

"প্রণতি তোমায় ওগো করুণাময়ী মেরী! তোমাতে আবির্ভূত প্রভু! নারীকুলে ধন্য তুমি, আর ধন্য তোমার গর্ভপুষ্প—যীশু।' বিশেষার্থে এই বন্দনা অবতারের জন্য খ্রীস্টানের আবাহনী; অন্য সকল কিছু অপেক্ষা এই প্রার্থনা মানব ও ঈশ্বরের রহস্যময় মিলনের ঘনিষ্ঠ রূপকে ব্যঞ্জিত করে। খ্রীস্টানেরা বিশ্বাস করেন, এই প্রার্থনাই যীশু-রহস্যের সংহত রূপ। ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিকরা তাই সকাল দুপুর ও সন্ধ্যার একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করবেনই। ক্যাথলিক-প্রধান দেশে, কিংবা ক্যাথলিকভাব-নির্ভর ধর্মভবনে, এই প্রার্থনা করার জন্য চার্চে ঘণ্টাধ্বনি হয়—তখনি থেমে যায় ক্ষণকালের জন্য সকল কাজ, আর শান্তভাবে উচ্চারিত হয় ওই শব্দগুলি।"

মিলের আলোচ্য ছবিটিতে চিত্রিত-বিষয় সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছেন, "ক্ষেতে কাজ করার সময়ে হঠাৎ বেজেছিল আঞ্জেলাস-ঘণ্টা—আর তখন ঘণ্টার শব্দ, কৃষকদম্পতির সহজ ভক্তি জড়িয়ে গিয়েছিল স্বর্গ-মর্ত্যের মহানাট্যে।" নিবেদিতার প্রশ্ন—"ছবিটির দিকে তাকিয়ে আমরা কি কৃষকদম্পতির কথা ভাবি, কিংবা ক্ষেত ও ক্ষেত-পরিষ্কার করার কোদালটির কথা—কিংবা এমনকি দূরের চার্চের কথা ?" তাঁর উত্তর—"না—আরও অনেক বৃহৎ ও মহৎ সত্য ঘনিয়ে আসে মনে—প্রার্থনায় সুপবিত্র একটি গোটা জাতির শ্রম—তারই কথা।"

সুতরাং নিবেদিতার "সর্বদাই মনে হয়েছে, আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের জন্য এই ছবিতে আছে একটি বিশেষ বার্তা।" তিনি বলতে চেয়েছেন, ভারতীয় জনজীবন থেকে বাস্তব ছবি তুলে নিয়ে, বাস্তবতাকে রক্ষা করেও, কিভাবে তাকে আদর্শ-চেতনার পূর্ণ করে তোলা যায়, তার দৃষ্টান্ত ভারতীয় শিল্পীরা গ্রহণ করতে পারবেন এই ছবি থেকে।

প্রবাসীর জন্য চিত্রনির্বাচনকালে নিবেদিতা এক বিশেষ উদ্দেশ্যচালিত ছিলেন—কতকগুলি ভালো ছবির বিক্ষিপ্ত প্রদর্শনী তাঁর উদ্দেশ্য ছিলনা। বলাবাহুল্য এক ব্যাপক শিল্পসংস্কৃতি গড়ে তোলাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। সেই সচেতন উদ্দেশ্যের কথা তিনি প্রবাসীর চৈত্র ১৩১৩ সংখ্যায় তখনো জীবিত শিল্পী ডগনান বুভার্ট-এর (Dagnan Bouvert) একটি ছবির—'ম্যাডোনা অ্যাণ্ড চাইল্ড'—ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছিলেন। সুপরিচিত বিশ্ববন্দিত পাশ্চাত্ত্যচিত্রের বদলে কেন তিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাশ্চাত্ত্যচিত্র নির্বাচন করছেন যেগুলিতে ধর্মভাবনা থাকলেও বাস্তব জনজীবনচ্ছবি সুস্পষ্ট, তার একটা কৈফিয়ত তাঁকে দিতে হয়েছিলই। বুভার্ট-এর ম্যাডোনা-নামাঙ্কিত ছবিটি কি সত্যিই ম্যাডোনার ? ছবিতে আঁকা মাতৃমূর্তি কি কোনো এক ইতালীয় কৃষকরমণীর, কিংবা এক খ্রীস্টীয় সন্ন্যাসিনীর নয় ? খুঁটিনাটি বাস্তবতা-রক্ষিত এই ছবিতে মাতা ও পুত্রকে যে-লতাকুঞ্জে অবস্থিত দেখা যাচ্ছে তা পরিষ্কার ইতালির কোনো খামার বা কুটীরদ্বারের দ্রাক্ষাকুঞ্জ। মাতার অঙ্গে সাধারণ পশমী গাউন, পায়ে ভারী কাঠের জুতা—যা কৃষকরমণীর হতে পারে আবার সন্ন্যাসিনীরও হতে পারে। "কিন্তু ছবির খুঁটিনাটি সবকিছু সাংকেতিকতায় আকীর্ণ। তা আমাদের অনুভব করিয়ে দেয়—ওই মাতা যীশু-জননী নন, আবার প্রতীয়মান কৃষকপত্নীও নন—ও যেন মানুষের একান্ত সত্তা থেকে উদ্ভিন্ন সবপ্রিয় এক ভাবনা।" মিলের আঞ্জেলাস বা প্যুভি দ্য শ্যাভান-এর স্যাঁত্ জেনভিভ্ ছবির মতো এখানেও বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের মিল ঘটেছে এবং দেখা যাচ্ছে "আধুনিক কালেও সুন্দরতম কিছু ছবির বিষয় ধর্মীয়—খ্রীস্টীয়।"

নিবেদিতা অতীতের যাদুঘরে আদর্শকে বন্দী রাখতে চাননি বলেই ওইসব ভাবনার আধুনিক যুগোচিত রূপায়ণকে তুলে ধরেছেন। কয়েক মাস ধরে এইসব ছবি প্রকাশ করে যাবার ঔচিত্য সম্বন্ধে বলেছেন, এই "প্রাক্তোচিত" কাজের দ্বারা "পঠাকদের মধ্যে একালের ইউরোপীয় শিল্পের বিষয় এবং রীতি সম্বন্ধে একটা সাধারণ বোধের সৃষ্টি করা যাবে।" তাঁর ইচ্ছা, এর পরে তিনি পুরনো ধ্রুপদী চিত্রের পুনর্মুদ্রণ করাবেন, যা দেখিয়ে দেবে কোন্ ঐতিহ্যের শক্তি আছে বর্তমানের সৃষ্টিগুলির পিছনে। আগে ধ্রুপদী ছবি না-ছাপার কারণ, "পাঠকরা যদি গোড়াতেই বতিচেল্লীর 'ভার্জিন অ্যান্ড চাইল্ড', হবেমা-র (Meindert Hobbema) 'অ্যাভিনিউ অব ট্রিজ্ অ্যাট মেড়লহারনিস্ (Avenue of Trees at Meddelharnis), রাফায়েল-এর কয়েকটি ম্যাডোনা এবং লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির 'লাস্ট সাপার' দেখে নেন, তাহলে তাঁরা আর আধুনিকদের লঘুতর সৃষ্টির দিকে চোখ দেবেন না।"

[প্রবাসীতে কিছু আগেই কিন্তু পুরাতন বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা পাশ্চাত্ত্যচিত্র বেরিয়েছে, তবে সে সকল মুদ্রণের পিছনে কোনো বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না।]

নিবেদিতা এর পরে নূতন ও পুরাতন শিল্পীদের মনোজগৎ এবং সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা এখনো মনে রাখার জিনিস :

"চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে পুরনো কালের মানুষেরা অনেক বেশি গভীর ও নিবিড়। তার ফলে তাঁরা সৃষ্টিতে এমন-সব পরিকল্পনা এনেছেন যাদের চারিদিকে চিরন্তনতার পরিমণ্ডল। তাঁদের স্টাইলে আছে বৃহতের গরিমা। আর আধুনিকদের কাজ হালকা ধাঁচের, অধিক ব্যক্তিগত প্রকৃতির, চকিতে অন্তর্হিত হয় এমন অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখতে সচেষ্ট। তদনুযায়ী এইসব ছবি যেমন সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতি জাগায় তেমনি তা মন থেকে দ্রুত অপসৃত হয়েও যায়। এরা যখন ব্যর্থ তখন তার মূলে থাকে তুচ্ছতা ও অতিনাটকীয়তা ; অপরদিকে পুরাতন শিল্পীরা সর্বদাই ঐকান্তিক, কদাপি আত্মসচেতন নন, হয়ত নানাদিক দিয়ে আড়ষ্ট, স্থূল বা আতিশয্যপূর্ণ, কিন্তু তাঁরা 'ভাল্‌গার' এই অপবাদ দেওয়া যাবেনা।

"এইসকল পার্থক্যের একটা বড় কারণ, ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সময়ের ইতালি, জার্মানী এবং হল্যান্ডের শিল্পীদের ক্ষেত্রে আধুনিক শিল্পীদের তুলনায় বিষয় নির্বাচনের সুবিধা ছিল খুবই সংকীর্ণ। প্রথম দিকে, ইতালির ক্ষেত্রে অন্তত, শিল্পীরা ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অপর বিষয়ে ছবি কম এঁকেছেন। তারপর তাঁরা গ্রীক ও ল্যাটিন ক্লাসিক সাহিত্যের বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন—ফলে পেয়ে যাই ভেনাস, ঊষাদেবী, সূর্যদেবতা এবং অনুরূপ আরও বিষয়ে ছবি। হল্যাণ্ডেই রিয়ালিজমের জন্ম—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনের সাধারণ বিষয় নিয়ে ছবি আঁকার শুরু হয়। আর এখন তো দেখে শুনে মনে হয়, অধিকাংশ শিল্পীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যেন এমন কিছু আঁকব, যা আগে কখনো আঁকা হয়নি। তবু এখনো ইউরোপের স্বাপ্নিক ও কবিরা—চিত্রশিল্পীরা তো রঙের ভাষায় কথা-বলা কবি ছাড়া কিছু নন—মাঝে মাঝেই প্রাচীন ধর্মীয় বিষয়ে মন ফিরিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে হয়ত শিল্পীর মনে এমন চিন্তাভাবনা জাগরূক আছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত-না তিনি পুরনো বড় শিল্পীদের মতো করে 'ম্যাডোনা' বা 'লাস্ট সাপার'-এর ছবি আঁকছেন ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের শক্তির পুরো মাপ বুঝিয়ে দিতে পারছেন না। কিংবা হয়ত এরও চেয়ে সূক্ষ্মতর তাঁদের ধারণা—তাঁরা সাধারণ ভাষায় সমুচ্চ আদর্শকে ব্যক্ত করতে ইচ্ছুক।"

জাতীয়তার আদর্শ স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং সে জাতীয়তা যেন আন্তর্জাতিকতার আকাশবিস্তার পায় সেজন্য উৎকণ্ঠিত ভগিনী নিবেদিতার মন—প্রবাসীর বিদেশী চিত্রালোচনাগুলিতে সেই মনের পরিচয় বারেবারে দেখা গেছে। জুল বের্ত-এর (Jules Berton) 'কৃষক তরুণীরা' নামে দুটি ছবির তিনি আলোচনা করেছেন প্রবাসীতে (আষাঢ় ১৩১৪)। ছবি দুটি তাঁর কাছে "সুন্দর ও শক্তিশালী—তবু তারা কী সহজ এবং সাধারণ জীবনের সত্যরূপ।" একটি ছবির তরুণীটি সূর্যোদয়ের সময়ে কাজে বেরিয়ে মুগ্ধ মনে দাঁড়িয়ে পড়েছে— দেখছে, পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে লার্ক-পাখি গান গাইতে-গাইতে। অন্য ছবির কৃষক মেয়েটি ফিরছে দিনান্তের সঞ্চয় নিয়ে গৃহপথে, ছন্দোময় পদে। নিবেদিতার বক্তব্য হলো, উভয় ক্ষেত্রেই ছবির সৌন্দর্য আছে বাইরের রূপের অন্তরালে। একটি ক্ষেত্রে এক ভাবাচ্ছন্ন শিশুহৃদয় যেন পাখির গানের সঙ্গে একতানে বাজছে, অন্যক্ষেত্রে সুদৃঢ় শ্যাম

মুখচ্ছবিযুক্ত মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়েছে সুষম শরীরের তরঙ্গ তুলে। এখানেও নিবেদিতার ক্ষোভ ভারতের দিকে তাকিয়ে : "ও-হেন সৌন্দর্যের চেহারা তো ভারতের পথে-ঘাটে সর্বদা দেখা যায়। দিবারাত্র কত শতবার লোকে শ্রমিক-নারী ও কৃষক-নারীর মধ্যে ঠিক এমনই রাজ্ঞী-মহিমা দর্শন করে—কিন্তু সে-রূপ শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে এবং সহানুভূতির চোখে দেখছে, এমন মানুষ কোথায় ?"

উৎকৃষ্ট ছবির দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি মডার্ন রিভিউ-এর ১৯০৭ সংখ্যায় গিদে রেনী-র (Guido Reni) 'দি পিকচার অব বিয়েত্রিচে চেঞ্চী' (The Picture of Beatrice Cenci) প্রকাশ করান। পিতৃঘাতিনী বলে কথিত কিন্তু নিজ অপরাধ স্বীকারে অস্বীকৃত, বধ্যভূমিযাত্রী, বিয়েত্রিচে চেঞ্চীর সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীকে ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা বের্তলত্তি (Bertolotti) কিভাবে বিচলিত করেছেন, তার সংবাদ দেবার পরে নিবেদিতা স্বীকার করেছেন, "তথ্য যাই হোক, এর সৌন্দর্য প্রশ্নাতীত" এবং তিনি মেনে নিয়েছেন এই দাবি, "এটি সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাদময় চিত্র।"

নিবেদিতার মন বিশেষভাবে নিয়োজিত ছিল শিল্পসৃষ্টির মূলে সক্রিয় সামাজিক প্রেরণা সম্বন্ধে। একাদিক্রমে সাতটি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ছবি ছাপার পরে তিনি জানিয়েছেন, এর মধ্যে ৬টি ফরাসি শিল্পীর, এবং মাত্র একটি জার্মানের। তাঁর কালের ফরাসিরা সারা পৃথিবীর সামনে বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, কৃষি, কলাশিল্প— সর্ববিষয়ে সৃষ্টিধর্মী আত্মঘোষণা ক'রে যাচ্ছিল। এর পিছনে তিনি জাতীয়তার প্রেরণা দেখলেন। জানাতে ভুললেন না, সে ভাব এখনো সম্ভাবনায় উর্বর। ইঙ্গিত করলেন, নবপ্রজন্মের ভারতীয়রা শিল্পসৃষ্টিকালে তাকে গ্রহণ করতে পারে। এমনকি যে একমাত্র জার্মান ছবিটি ছেপেছিলেন— রিচার-এর (Ritcher) কুইন লুইজ—(প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪)—তার মধ্যেও একই ভাব। প্রাসিয়ার এই সুন্দরী রানী সম্রাট নেপোলিয়ানের কাছে স্বদেশের স্বার্থের জন্য প্রার্থনা ক'রে উপহসিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন— সেই অপমান জার্মান জাতির মর্মে বিঁধেছিল। পরবর্তী পুনরুত্থানকালে তাই জার্মানীর কাছে উইলিয়ম কাইজারের মাতা এই নারী লাভ করেছিলেন রক্ষয়িত্রী দেবী-মহিমা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নেপোলিয়ানের রিসেপশন্-ব্যাঙ্কোয়েটে রানী উপস্থিত। রীতি অনুযায়ী সাজসজ্জা করেছেন—কিন্তু ভাবে-ভঙ্গিতে মহিমান্বিতা সেই সুন্দরী নারীর মুখমণ্ডল পূর্ণ হয়ে আছে দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ভালবাসায়—বিপর্যয়ের মধ্যেও তা দৃঢ়, দারিদ্র্যের মধ্যেও ধৈর্যশীল এবং মাধুর্যময়। জাতির দুঃখদিন বলে, কেবল মাথার মুকুট এবং হাতের বিয়ের আংটি ভিন্ন তিনি অন্য অলঙ্কারহীন। তাঁর উন্নত ললাটে বুদ্ধির প্রভা। "দূরলগ্ন সমুজ্জ্বল স্বচ্ছ দৃষ্টি। গাম্ভীর্য ও সরলতায় পূর্ণ তাঁর মুখ। তা দেখিয়ে দেয়—রাজন্যবর্গের মধ্যে উপবিষ্ট, জাতীয় ব্রতধারিণী এই নারী একই সঙ্গে অতুলনীয়া নারীত্বের প্রতিভূ—শুচিতায়, নম্রতায়, অম্লান সহজতায় পূর্ণ। মন তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভূষিত, কিন্তু হৃদয় শিশুর মতো।"

নিবেদিতার পূর্বোক্ত ৯ অগস্ট ১৯০৬ তারিখের চিঠির প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারি। দেখা যাবে, অ্যানানসিয়েশন বিষয়ে আঁকা ছবির সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা। রসেটী-র (Rossetti) এবং ক্রিভেলী-র (Crivelli, Bologna) অ্যানানসিয়েশন ছবি তিনি চেয়ে পাঠিয়েছেন। রসেটীর অ্যানানসিয়েশন ছবিটির একটি বর্ণনায় পাই—ভার্জিন মেরী শায়িত

ছিলেন, তাঁকে জাগিয়ে তুলেছেন এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল, এঞ্জেলের হাতে-ধরা লিলি ফুল। ফুলটি ভাব-প্রতীক। কুমারী জননী নিজ ভাগ্যকে স্বীকার করে বলেছিলেন, এক্কে আংকিল্লা ডমিনি (Ecce Ancilla Domini)। "'উষার সঞ্চার'। শুভ্র শয্যায় শয়ান তিনি—জাগরিত। ভীত নন, তবু কেঁদেছেন সূর্যোদয় অবধি—হৃদয় পূর্ণ হয়েছে গভীর সম্ভ্রমে, কারণ লগ্ন সমাগত।"[১১]

রসেটী তাঁর এই বিখ্যাত ছবিটি মাত্র ২১ বছর বয়সে এঁকেছিলেন। মেরীর মুখচ্ছবি একেবারে রসেটীর বোনের মতো; এঞ্জেলের মাথা ভাস্কর টমাস উলনারের মাথার প্রতিরূপ।

নিবেদিতার বিশেষ অনুরাগ ছিল রসেটী এবং প্রি-রাফায়েলাইট ব্রাদারহুড-গোষ্ঠীর শিল্প সম্বন্ধে। দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটী (১৮২৮-৮২) কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে ১৮৪৮ সালে এই আন্দোলন শুরু করেন। যুক্ত ছিলেন হান্ট, মিলে, ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন, বার্ন জোনস্, জন রাসকিন প্রমুখরা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটেন যখন কারিগরি শিল্পের যুগ থেকে যন্ত্রশিল্পের যুগে উত্তীর্ণ হচ্ছে, সেই পরিবর্তনকালে শিল্প হয়ে পড়ে কৃত্রিম ও দিশাহারা। এই সময়ের মন্দ রুচি এবং অনুর্বরতা থেকে শিল্পকে বাঁচাতে এই ব্রাদারহুড নিসর্গ-অনুশীলন এবং সুদৃঢ় কারিগরি রীতির অনুসরণ শুরু করেন। রাফায়েল-যুগের আগেকার সহজ আলঙ্কারিক রীতিই তাঁরা নিতে চেয়েছিলেন—যেমন ছিল বেনৎজো গৎজোলি-র (Benozzo Gozzoli) সহজ সরল আলঙ্কারিক রীতি। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ভাবধারাকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন উইলিয়ম মরিস, বার্ন জোনস্। তাঁরা পুরনো শিল্পরীতি অনুযায়ী গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতেন— যা যন্ত্রনির্মিত জিনিসের প্রাণহীনতা থেকে জনরুচিকে রক্ষা করবে।[১২]

রসেটী সম্বন্ধে আরও বলে নেওয়া যায়, গোড়ার দিকে তিনি চড়া রঙের দ্বি-মাত্রিক ছবি আঁকতেন। তাঁর রীতি অন্য অনেক শিল্পীর দ্বারা বহুল অনুসৃত হলেও রেখাবিন্যাসে দুর্বলতার জন্য সেসব স্থায়ী গৌরব পায়নি। রসেটী কবিও ছিলেন। মধ্যযুগীয় বিষয় ও রীতিতে রচিত তাঁর অনেক কবিতা বিখ্যাত।[১৩] যাই হোক, নিবেদিতা রসেটীর ছবির ক্ষেত্রে রেখাবিন্যাস নিয়ে ব্যস্ত হননি—ওঁর ছবির ভাব-স্বপ্নময়তাই তাঁকে আবিষ্ট করেছিল। রসেটীর কবিতার ক্ষেত্রেও একই অনুভূতি। মিস ম্যাকলাউড তাঁকে একটি ফটো পাঠান, সেটি পেয়ে মুগ্ধ তিনি, ২৬· ১২· ১৯০৬ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন :

"গত রবিবার তোমার পাঠানো ফটোটি এসেছে— কী অপূর্ব! কী অপূর্ব সেই স্টুডিও যেখানে ওটি তোলা হয়েছে! সুন্দর মর্মরের আভা, রহস্যময় মুকুর, অনালোকিত অস্বচ্ছ জানালা—সব জড়িয়ে রসেটী-কবিতার রসানুভূতি।"

ভারতীয় 'জীবনজাল'-এর আলোছায়াপথে সঞ্চরণের সময়ে পাশ্চাত্ত্য চিত্রের অনুষঙ্গ নিবেদিতার মনে জেগে উঠত। বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে এক পুরনো বাড়িতে থাকতেন। সার সার পুরনো বাড়ির মধ্য দিয়ে চলে-যাওয়া আঁকাবাঁকা গলিটিকে তিনি কলমের কোমল আঁচড়ে এঁকে তুলে দিয়েছেন সাহিত্যের সত্রে। সন্ধ্যায় নিবেদিতা ছাতে উঠতেন, "প্রথম যুগের ইতালীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত ছাতটির" বর্ণনাও তিনি করেছেন। তাঁর মন কেড়েছে ছাতে ওঠার রহস্যময় সিঁড়িটি ;

"আ-হা! ওই সিঁড়িটি! ওই সিঁড়ি দিয়ে ক্রিভেলির ছবির এঞ্জেল সহজেই নেমে আসতে পারেন পরমধন্য নারীর [মেরীর] কাছে—ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়েছে ওঁর দেহমধ্যে—এই

বার্তা বহন ক'রে।"

এমন একটি সিঁড়ি দিয়ে নিবেদিতা অন্যান্যদের সঙ্গে ছাতে উঠে বসেন।—

"সকাল ও সন্ধ্যার পূজার সময়ে প্রতিটি প্রতিবেশীর ঠাকুরঘর থেকে ভেসে আসে ঘণ্টাধ্বনি। গোধূলিলগ্নে—নবোদিত চন্দ্র তখনো নিমগাছের মাথায় স্পষ্ট পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি—মনে ঘনিয়ে আসে পরিবেশের উপযোগী মহৎ চিন্তারাশি—আর তখনি যেন সরে যায় অনন্তের অবগুণ্ঠন। আমার মন্দির আমাদের এই ছাতটি—মৌন নীরব—জগৎসংসার থেকে বহুদূরে যেন। সেখানে, কিংবা দিনের বেলায়, দেওয়ালের ছায়ায়, কিংবা দরজার কাছে গড়িয়ে-আসা সূর্যের আলোর কাছে, কিংবা তারকাখচিত মধ্যরাত্রে—কোনো সময়েই ফ্রিজেলির দেবদূত মন থেকে সরে যাননা। আমাদের পক্ষে এই প্রত্যাশা মনে জাগিয়ে নীরবে অপেক্ষা না ক'রে উপায়ও থাকেনা—যদি নেমে আসে আমাদের হৃদয়ে দেবতার আলোক!"[১১]

ম্যাডোনা ছবিতে নিবেদিতা একেবারে আবিষ্ট। বিভিন্ন ধরনের ম্যাডোনা-ছবির উল্লেখ করেছেন চিঠিপত্রে। যথা—

মিস ম্যাকলাউডকে, ২১-২-১৯০৬

"ভাবছি, এই সপ্তাহে মঁসিয়ে ওতকুর-কে (M. Hautecoeur) ১২ ফ্রাঁ দামের ম্যাডোনা ছবির অর্ডার দেব, এমন ছবি যাতে দেবদূত নেই। – ম্যাডোনা ছবিটি এক হিন্দু মহিলার পূজাঘরের জন্য প্রয়োজন।"

একই জনকে, ২-৫-১৯০৬

"মঁসিয়ে ওতকুর-কে এক পাউন্ড পাঠিয়েছি— প্রতি কপি ১২ ফ্রাঁ দামের—শিশু দেবদূত ছাড়া (Cherub)—সিস্টিন ম্যাডোনার ১২ কপি ছবির জন্য। –আমাদের একটি খালি ঘরে ম্যাডোনার মস্ত একটি ছবি রাখা হয়েছে, তার ফলে ঘরটি যেন শাপেল দ্য সাঁন ইসত্ (Chapel di san eist) হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

একই জনকে, ১৮-৭-১৯০৬

"ইতিমধ্যে আমি মঁসিয়ে নোবেলকে ম্যাডোনা ছবির জন্য ব্যস্ত করেছি, কেননা যা পেয়েছি তা কাজে লাগাবার পক্ষে আকারে খুবই ছোট।"

মেরী হেলকে, ২৫-২-১৯০৯

"কিছুকাল আগে আমি ভাবলিনে বতিচেল্লীর 'ম্যাডোনা অব দি ম্যাগনিফিক্যাট'-এর রঙিন প্রতিলিপি কিনেছি— তাতে সস্তার সোনালি কোণ— কুড়ি কি চল্লিশ সাঁতিন (১ ফ্রাঙ্কের শতভাগ) দামে—ঠিক মনে নেই কত দামে। সস্তার রোমান ক্যাথলিক দোকান থেকে কিনেছিলাম— দোকানটি সস্তা দামের 'সেক্রিড হার্ট' এবং অন্যান্য বিষণ্ণ ধরনের ভক্তিমূলক কমদামী ছবিতে ভর্তি ছিল। এই ম্যাডোনা-ছবিটি ১৫"×১২" মাপের। দোকানদার বলল, ফ্লোরেন্সে ছাপা। আপনি কি আমাকে এই ছবিটির এবং প্রাচীন মহাশিল্পীদের ছবির সস্তাদামের ভালো প্রতিলিপি পাঠাতে পারেন—যা ফ্লোরেন্সে বা পিস্তইয়া-তে পাওয়া যায়? একটা দুটো ছবির জন্য দাম দেব বলে আপনাকে অপমান করতে চাইনা। কিন্তু যদি কোনো কারবারীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয় তাহলে আমি অনেক কিনতে পারি। এই 'ম্যাডোনা অব দি ম্যাগনিফিক্যাট' ছবিটি আমার কাছে অবর্ণনীয় সুন্দর—টাঙানো আছে

দেওয়ালের উপর। ভারতের জন্য এ-রকম অর্ধডজন চাই।"

একই জনকে, ৮-৬-১৯০৯

"আমার জন্য চিত্রসন্ধানে আপনি যে-চেষ্টা করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আপনি ইতালিতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আমি অবশ্যই অপেক্ষা করতে পারি। এবং অবশ্যই—বতিচেল্লী-র,ফ্রা আঞ্জেলিকো-র বা তাঁদের ধরনের যে-কোনো মহান চিত্রই যে-কোনো আকারে যে-কোনো সময়েই পাওয়া যাক—সাদরে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আমি আপনাকে যেসব জিনিসের কথা বলেছিলুম সেগুলি হলো আকারে বৃহৎ এবং জমকালো ধরনের— চওড়া দেওয়ালে লাগালে খুবই মন টানবে। ভুল ধারণায় ভরা মানুষদের অনভ্যস্ত চোখের কাছে আকর্ষক ক'রে তুলবার জন্য দারুণ মতলব। এই বাড়ির [নিবেদিতা তখন ভীজবাডেনে ছিলেন] এক মহিলা ফ্লোরেন্সের সঙ্গে পরিচিত। তিনি বললেন, ওসব ছবি বড়ো-বড়ো উৎসবের সময়ে চার্চের বাইরের অস্থায়ী দোকানে বিক্রি হয়। কথাটা ঠিক বলেই মনে হয়। হয়ত সব রবিবারেই বিক্রি হয়। ভারতীয়রা সব ধরনের ম্যাডোনাকেই ভালবাসে—এবং সকল প্রকার সুন্দর রঙকে। খুবই কৃতজ্ঞ হব যদি আপনি সন্ধানকাজ চালিয়ে যান। – অন্য সবকিছু অপেক্ষা একটি সুন্দর ছবি দেওয়ালকে করে প্রার্থনাস্থল, ঘরকে করে ভবন।"

একই জনকে, ২০-১-১৯১০

"আপনি? —নাকি মিসেস হেল?—কে অপূর্ব রঙিন ছবিগুলি পাঠিয়েছেন? এমন-সব দারুণ জিনিস আমি অবশ্যই চাইনি। এ যেন আনন্দের মহাভোজ!"

॥৬॥

চিত্রশিল্প অপেক্ষা ভাস্কর্য সম্বন্ধে নিবেদিতার আগ্রহ মোটেই কম ছিলনা, এ-কথা একাধিকবার বলে এসেছি। মিস ম্যাকলাউড সম্ভবত তাঁর ভাস্কর-বন্ধু টুইডস্-এর (Tweeds) সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ঘটিয়ে দিতে উৎসুক ছিলেন। নিবেদিতার তাতে আগ্রহ ছিল, কিন্তু এ কথাও তিনি না-জানিয়ে পারেন নি, যে, উক্ত ভাস্করের কার্যাবলী সম্বন্ধে তাঁর মিশ্র মনোভাব। ২৯-৮-১৯০৬ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন :

"আমি ওঁর 'বাস্ট অব ফ্রান্স'-এর [ফ্রান্সের কোনো প্রতীক মূর্তি?] জন্য যতখানি আগ্রহী, ততখানি আগ্রহী নই 'ওয়েলিংটন মনুমেন্ট' বা 'রোডস্ স্ট্যাচু'র জন্য। হাঁ, ঠিক, মানুষকে রোজগার করতে হবে [শেষোক্ত দুই বস্তু রোজগারের জন্য করা] কিন্তু আমার কাছে প্রথমটি অনেক বেশি প্রেরণার বস্তু।"

এই কথার পরেই নিবেদিতা প্যারিস এগজিবিশনে রদ্যাঁর শিল্পভুবনে আত্মহারা বিচরণের কথায় চলে এসেছিলেন :

"রদ্যাঁকে জানা—কী অসাধারণ কাণ্ড! সেই সঙ্গে লালীককে জানাও। বলতে ভয় হয় তবু বলছি— রদ্যাঁ ও গ্রীকদের মধ্যে সাম্য অনেকই আছে— কারণ আমি ভালবেসেছি 'ডাইং গ্লাডিয়েটরস্' [রোমের ক্যাপিটাল প্রাসাদের মিউজিয়ামে রক্ষিত এই মূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ কিছু আগেই, আগস্ট ১৮৯৬-এ দেখেছেন]—'ইমেজেস্' এবং 'ও মর্তকে'। তাই বলে রদ্যাঁর পৃথক তাৎপর্যেও সন্দেহ নেই। তোমার কি মনে পড়ে, কিভাবে মিসেস লেগেট এবং আমি সেই অপূর্ব বৎসরটিতে [১৯০০] এক রবিবারের অপরাহ্ণে রদ্যাঁর প্রদর্শনীতে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেছি এবং বাসায় ফিরে দিনের পর দিন সে-বিষয়ে কথাবার্তা

বলেছি ?"

কেবল নিবেদিতা নন, স্বামী বিবেকানন্দও ওই সময়ে রদ্যাঁর শিল্পভুবনে প্রবেশ করেছিলেন। মৌল প্রাণশক্তি এবং এপিক গরিমা সম্বন্ধে আকর্ষণের জন্য স্বামীজী রদ্যাঁর ভাস্কর্যকে উল্লাসের সঙ্গে দেখবেন, তা ধরে নেওয়া যায়। রদ্যাঁর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ পরিচয়ের বিষয়ে সংবাদ পাওয়া গেছে।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী প্যারিস বিশ্বমেলার (The Exposition Universelle Internationale) অঙ্গীভূত ধর্মসমূহের ইতিহাস-কংগ্রেসে (Congress of the History of Religions) যোগদান করেছিলেন। 'ধর্মীয় ইতিহাস কংগ্রেস' শিকাগো ধর্মমহাসভার মতো বৃহৎ ব্যাপার না হলেও, 'প্যারিস বিশ্বমেলা' অসাধারণ ঐতিহাসিক কাণ্ড হয়ে উঠেছিল। 'পরিব্রাজক' বইয়ে স্বামীজী বিশ্বমেলার প্রকাণ্ড কাণ্ডের উল্লেখ করেছেন। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধে (মার্চ ১৯৬৭, মার্চ ১৯৬৯) ওই ব্যাপারে নানা সংবাদ দিয়েছেন। সেকালে সম্ভবপর বহুবিধ বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের চমকপ্রদ নমুনা যেমন এই প্রদর্শনীতে ছিল, তেমনি প্রদর্শনী উপলক্ষে আহূত নানা বিদ্যা-সম্মেলনে হাজির ছিলেন পাশ্চাত্ত্য জগতের অজস্র নামী শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের দল। ভারত থেকে জগদীশচন্দ্র বসুও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী আতিথ্য নেন তাঁর আমেরিকান বন্ধু মিঃ লেগেটের বাসভবনে। "মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে [স্বামীজী "পরিব্রাজক" বইয়ে লিখেছেন] ভোজনাদি-ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী ও যশস্বিনী নরনারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন। ... কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক-গায়িকা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ সমাবেশ...তাঁর গৃহে। সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষী-মনঃসংঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ... ।"

প্যারিস প্রদর্শনীতে স্বামীজী অনেকবার গেছেন, প্রায়ই তাঁর সঙ্গী হতেন সমাজবিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেস। এই প্রদর্শনী, স্বামীজীর ভাষায়, "অপূর্ব ভূস্বর্গ সমাবেশ।" এই প্রদর্শনীতে তিনি Art Unveiling Nature নামক ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি।

প্যারিসের এই বিশ্বমেলাতেই বিশ্বসমাবেশে রদ্যাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। রদ্যাঁ-বিষয়ক একাধিক গ্রন্থে এই মেলাতে তাঁর বিশাল শিল্পপ্রদর্শনীর বিবরণ দেওয়া আছে। আমরা জেনেছি, এই প্রদর্শনীর দ্বারা রদ্যাঁ "চাঞ্চল্য" সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। শিল্পবস্তু রাখার জন্য তিনি ২০০ ফুট লম্বা, ৪০ ফুটেরও বেশি উঁচু বাড়ি তৈরি করান। শুধু বাড়ি তৈরি করতেই খরচ হয় ৮০,০০০ ফ্রাঁ, বা আরও বেশি। এর সঙ্গে ছিল রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ের বিপুল ব্যয়। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ২০,০০০ ফ্রাঁ-এর উপরে তিনি ৬০,০০০ ফ্রাঁ ধার করেন। শেষ পর্যন্ত ধার ১,৫০,০০০ ফ্রাঁ-এ পৌঁছয়। এর জন্য তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু তিনি যেন বাজি ধরে গোটা সভ্যজগতের সম্মুখীন হতে চেয়েছিলেন। নিজ শিল্পকীর্তির পক্ষে প্রচারে নামিয়েছিলেন সেকালের সেরা শিল্পীদের (যথা, Eugene Carriere, Jean-Paul Laurens, Claud Monet, Albert Besnard); সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পসমালোচকেরা (যথা, Roger Miles,

Octave Mirbean)। সেই "জীবন প্রদর্শনীতে...সৌন্দর্য মন্দিরে,...বৃহতের মধ্যে বৃহৎ" শিল্পীর সৃষ্টিসম্ভার দেখবার জন্য শিল্প সমালোচকরা সকলকে আহ্বান করেছিলেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী (Georges Leygues); রদ্যাঁর সম্মানে আয়োজিত ডিনারে যোগ দেন একশোর বেশি শিল্পী ও সাহিত্যিক (যাঁদের মধ্যে অস্কার ওয়াইল্ড, তুলো লত্রেকও ছিলেন ; অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন, "রদ্যাঁ নিঃসন্দেহে ফ্রান্সের সবচেয়ে বড়ো কবি")। রদ্যাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছিল। একদিকে তিনি প্রতিভাবান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন, অন্যদিকে নানাদেশের বিপুল ধনী শিল্প-সংগ্রাহকরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর শিল্পবস্তু সংগ্রহের জন্য। ফলে, দেনা শেষ হয়েও তাঁর হাতে অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে গিয়েছিল। ফিলাডেলফিয়া, কোপেনহেগেন, হামবুর্গ, ড্রেসডেন, বুদাপেস্ট ইত্যাদি স্থানের মিউজিয়ামগুলির তরফে তাঁর শিল্পবস্তু কেনা হয়।

প্রদর্শনীতে রদ্যাঁ নিজেকে একেবারে ঢেলে দিয়েছিলেন। "প্রদর্শনীমধ্যে তিনি তাঁর সারাজীবনের সেরা কাজ সন্নিবিষ্ট করেন— ছোট বড়ো মিলিয়ে দেড়শোরও বেশি ভাস্কর্য, কুড়ি কি তারও বেশি চিত্র, এবং ড্রইং-এর কিছু নমুনা। তাঁর সুপরিচিত কাজগুলি সবই সেখানে ছিল— 'দি ম্যান উইথ দি ব্রোকেন্ নোজ' থেকে 'দি বার্গার অব ক্যালে', 'দি কিস', 'দি থিঙ্কার', 'দি প্রডিগাল' এবং আরও এগিয়ে—'বালজাক' পর্যন্ত। এর সঙ্গে ছিল 'দি গেটস অব হেল'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ,...এবং 'অ্যাসেনড্যান্সি।' ...সাম্প্রতিক কাজগুলির মধ্যে এসেছিল, 'ফন্ অ্যাবডাকটিং এ ওম্যান', এবং 'হ্যান্ড অব গড'।"[১৫]

স্বামীজীর সঙ্গে রদ্যাঁর ও অন্য শিল্পী ও মনীষীদের দেখা-সাক্ষাতের বিষয়ে অ্যালবার্টা স্টার্জেস (পরে লেডি স্যান্ডউইচ) তাঁর মাসীমা মিস ম্যাকলাউডকে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯০০ চিঠিতে লিখেছেন :

"Swami was in a splendid mood last night and our little dinner was consequently a great success...He enjoyed seeing Paris, and was meeting all the artists and thinkers, Rodin etc. and just in the spirit of the French tongue and mind...Swami will go to Brittany next Monday, as Thursday he goes to visit a French painter of note in the country."[১৬]

॥ ৭ ॥

আগেই বলেছি, মডার্ন রিভিউ-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই নিবেদিতার লেখা বেরুতে থাকে। ১৯১১ অক্টোবর মাসে যখন তাঁর দেহান্ত হয় সেই মাসের মডার্ন রিভিউ-এও তাঁর একাধিক লেখা বেরিয়েছে, পরের মাসেও বেরিয়েছে— বেরিয়ে গেছে আরও কিছুদিন। এই রচনাগুলির বড়ো অংশ শিল্পবিষয়ে। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি বিষয়েও এই পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ ও নোট লিখেছেন। স্মর্তব্য, এই পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ শিল্প বিষয়েই।

১৯০৭-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি—এই দুই সংখ্যায় প্রকাশিত নিবেদিতার "দি ফাংশন অব আর্ট ইন শেপিং ন্যাশন্যালিটি" নামক অসাধারণ লেখাটিকে—অন্তত তার জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত অংশকে—স্বচ্ছন্দে নবশিল্প আন্দোলনের মহাসনদ বলা যায়। এর প্রতিটি বাক্যে সুগভীর সুবিস্তৃত চিন্তার ঘনরেখা, শব্দগুলিতে রোমাঞ্চিত হৃদয়ের নিবিড়

উত্তাপ। এই পর্বে অন্য কয়েকজন শিল্প সমালোচকের বিস্তৃত তথ্যমূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা আছে, উচ্চাঙ্গের শৈলীতে তীক্ষ্ণ নিপুণ বিশ্লেষণও মেলে— কিন্তু চরম উদ্দীপ্ত বাক্যাবলী রচনার গৌরব নিবেদিতারই, যাতে কখনো বিদ্যুৎ-ঝলক কখনো-বা আকাশ-বিস্তার। অনেক 'সামান্য' নিবেদিতার প্রতিভাস্পর্শে 'অসামান্য' হয়ে উঠে দেখিয়ে দিয়েছে— তারা সত্যই অসামান্য ! রচনাকে প্রেরণা করে তুলবার দিব্যশক্তি ছিল তাঁর একথা স্বীকার্য—তা স্বীকৃত হয়েছে সমকালেই।

উল্লিখিত প্রবন্ধের গোড়াতে নিবেদিতা শিল্পের সঙ্গে ঐতিহ্যগত অনুষঙ্গের গভীর সম্পর্কের কথা তোলেন। জীবনের লক্ষ্য ও লক্ষণ অবশ্যই পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তা যেন আত্মক্ষয়ের পথে না যায়, অতীত কীর্তি বিস্মরণের মতো উদ্‌ভ্রান্তি ও অপ্রকৃতিস্থতা যেন তাতে না থাকে। গ্রীক হেলেন যদি আসে আসুক—কিন্তু চিতোরের পদ্মিনীকে সরিয়ে নয়। শত শত শতাব্দীর ভারতীয় নারী-আদর্শের বিকল্প যেন না হয় ফিচেল, ছেনাল মেয়েদের জীবন। নিবেদিতা দেখেছেন, ভারতবর্ষ বহু যুগ ধরে শিল্পসৃষ্টির উর্বরভূমি—প্রতীক-উপাসক বলে এখানে রূপের সংস্কার দৃঢ়মূল। "হিন্দুধর্ম একাংশে প্রতীক শিক্ষার সুমহান বিদ্যালয়। এখানে প্রতিটি কৃষক, বাজারের সামান্য ক্রেতা বা ব্যাপারীও, ছবি কিংবা মূর্তি কিংবা পাত্র কিংবা যে-কোনো ধরনের অলঙ্কৃত প্রতীক ভালবাসে। ইতালির সম্বন্ধে যা বলা হয় সেইভাবে বলা যায়, এ দেশেরও দৃষ্টির সংস্কৃতি নিখুঁত। আর মূর্তিপূজার পুরাতন অভ্যাসের ফলে এখানে চোখ থেকে হৃদয়ে পৌঁছানোর ঘুরপথ হয়ে গেছে সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি।" ভারতে তাই শিল্পের ভাষা সর্বজনীন। বহুভাষী ভারতীয়রা যখন একে অন্যের মুখের ভাষা বোঝেনা তখনো কিন্তু তারা অখণ্ড জাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় জীবনচর্যাগত নানা রূপের আকৃতিকে সহজে বুঝে নেয়। "এক্ষেত্রে শিল্প আমাদের দেয় এক মহান সাধারণ ভাষা। সে জন্য জাতীয় পুনর্গঠনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হতে পারে শিল্প।" অতীতে ভারত বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পযুগ সৃষ্টি করেছে। "এলিফ্যান্টার ভাস্কর্যে হিন্দুধর্মের সমন্বয়ী বোধ গভীরভাবে মুদ্রিত। অজন্তার চিত্র নির্মাণ করেছিল যে-শক্তি, তা প্রকৃতির উপভোগে ও রূপরচনায় একালের যে-কোনো বাস্তববাদী শিল্পীগোষ্ঠীর মতোই মুক্তমন ও প্রাণবন্ত। সাঁচী, অমরাবতী ও গান্ধারের নির্মাতা এবং খোদাইকাররা, ধারাবাহিক শিল্পবিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত—পর পর কয়েক শতাব্দীর উৎসাহতরঙ্গের ফলপরিণতি।" নিবেদিতা এই সঙ্গে যোগ করেছেন, মুসলিম সাম্রাজ্যকালেও ভারতের সৃষ্টিশীল শিল্পধারা অব্যাহত ছিল। তখন বিষয় বদল হয়েছে, কিন্তু নবগৃহীত বিষয়ে ভারতীয় ধারার স্বাক্ষরের চিহ্ন থেকেই গেছে। এমনই এক ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশ শিল্পে নবযুগ সৃষ্টি করতে পারে, যদি সে বহমান শিল্পসংস্কৃতিকে স্বীকার করে নতুন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হয়। নিবেদিতা দৃঢ়ভাবে বলেছেন, একজন ভারতীয়ের পক্ষে উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অনুশীলন করা সহজসাধ্য, সেই অনুশীলিত মন নিয়ে সে গথিক শিল্প উপভোগ করতে পারবে, কিন্তু সে বস্তু সে সৃষ্টি করতে পারবে না, কারণ ওর অনুষঙ্গের সঙ্গে তার স্নায়ু-সম্বন্ধ নেই। এর বিপরীতটাও সত্য।

"কোনো সত্যকার কবি যেমন স্বেচ্ছায় তাঁর সকল কবিতা বিদেশী ভাষায় লেখার সিদ্ধান্ত করতে পারেন না, তেমনি কোনো শিল্পী 'জনগণের বোধ্য' রূপে ছাড়া নিত্যধর্মী শিল্প রচনা করতেও পারেন না। সাহিত্য, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য এবং অনুরূপ সকল বিষয়ের মহান অভিব্যক্তিগুলি অনেকাংশে মানব হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন—মানব হৃদয়ের সহানুভূতি লাভের জন্য—আর মানুষ তো সে কান্না মানুষের অজানা ভাষায় কাঁদে না।"

শিল্পে সর্বজনীন আবেদনের প্রসঙ্গ নিবেদিতা তুলেছিলেন। "যে সৌন্দর্য বিশুদ্ধ তা অবশ্যই সমগ্র মানব-সমাজের বোধগম্য।" উড়িষ্যার দরজা কোনো বিদেশী সৃষ্টি করতে পারবে না, প্রাচীন মিশরের মন্দিরও তেমনি ভিন্-দেশীয় মানুষের দ্বারা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওসব বস্তুর সৌন্দর্য সকল রুচিশীল মানুষই উপভোগ করতে পারেন। ইউরোপীয় ম্যাডোনার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছিলেন। কলকাতা শহরে রাস্তার ধারে ছবির দোকানে টাঙানো আছে অজস্র ম্যাডোনা-ছবি—তার ক্রেতা কেবল খ্রীস্টানরা নন। দিব্যশিশু যীশুকাহিনী যারা জানেনা এমন মানুষও সে ছবি সংগ্রহ করে—কেন ?

"শেষ পর্যন্ত ওঁরা তো মা আর শিশু—সে বস্তুকে বোঝেনা পৃথিবীতে এমন কোন্ মানুষ আছেন ?…মহান্ শিল্পের চিরন্তন মানবিকতার অংশ তার স্থানীয় রূপকে অতিক্রম করে যায়।"

তবু ইউরোপীয় শিল্পাদর্শের অন্ধ অনুসৃতিতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের এত আগ্রহ কেন ? তা কি তার বাস্তবধর্মিতার জন্য ? (নিবেদিতা এই অতি কটু কথাটা এখানে বলেন নি যে, তা ঘটতে পারে পরাধীনের হীনম্মন্যতার কারণে কিংবা অর্থ লাভের জন্য)। তিনি এ-কথা মানেন নি যে, ভারতীয় চিত্রশিল্পে পারসপেকটিভ বোধ নেই। 'রাম সীতার অভিষেক' বিষয়ে আঠারো শতকের এক অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা ছবির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সেখানে আছে কোন নিখুঁত খুঁটিনাটি বস্তুসমাবেশ (ম্যাগনিফাইং কাঁচে যার পুরো রূপ ধরা পড়বে), যার চেয়ে বেশি কিছু মধ্যযুগের ডাচ-ছবিতেও মিলবে না।" একইভাবে লখনৌ-এর নবাবগণের চিত্রাবলীর বাস্তব রসের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অজন্তার কথাও তিনি আনেন যার শিল্পীরা গ্রীকদের মতো করেই মানবশরীর দেখেছেন। কিন্তু ওসব ছবির বাস্তবতাকে ভাস্বর করেছে ব্যঞ্জনার দ্যুতি, যা দেখলে মনে হয়, 'শেষ হয়ে হইল না শেষ।' নিবেদিতার দুঃসাহসিক মন্তব্য : "আমার দেখা গ্রীকশিল্পের সুন্দরতম জিনিস কিন্তু হাইনে-কথিত 'আমাদের প্রিয় মিলো-র রমণী মহোদয়া' ['ভেনাস ডি মিলো'] নন—তা হলো একটি অলঙ্কৃত পাত্র থেকে মিস জেন হ্যারিসনের করা ড্রইং—যাতে রাজহংসের পিঠে সমাসীনা এক নারীকে দেখা যাচ্ছে।" এই ছবির সৌন্দর্য ব্যাখ্যা নিবেদিতা করেছেন। রাফায়েলের ম্যাডোনা সম্বন্ধেও বলেছেন—তার মধ্যে কোনো রোমান সুন্দরীকে দর্শনের চেষ্টা করা অপেক্ষা শিল্পীর অভিব্যক্ত মনোরূপকেই রসিক দেখতে চায়, কারণ "চিত্র—ফটোগ্রাফ নয় ; শিল্প—বিজ্ঞান নয় ; সৃষ্টি মানে নয়—অনুকরণ।"

তাহলে ইউরোপীয় শিল্প থেকে শিক্ষার্থী কোন্ আকর্ষণের বস্তু খুঁজে পায় ? নিবেদিতার উত্তর :

"সে আকর্ষণ আছে—ইউরোপীয় শিল্পাদর্শ শিল্পীর কাছে ব্যক্তিসত্তা উন্মোচনের যে-সুযোগ এনে দেয় তার মধ্যে। পাশ্চাত্যদেশে শিল্প কারুশিল্পীদের বংশানুক্রমিক বৃত্তি নয়। আধুনিককালে অন্তত তা বিরাট মনের বিশ্বদৃষ্টি প্রকাশের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতপক্ষে তা নিয়েছে কাব্যেরই ধারা—তদনুযায়ী তা যে-ভাবেই হোক উদ্ভূত প্রেরণার উন্মোচনক্ষেত্র হয়ে উঠত সক্রিয়। ভারতবর্ষে অপরদিকে শিল্প কারুকৃতি বলে গৃহীত। ফলে তা আবদ্ধ থেকে গেছে বিশেষ জাতিমধ্যে।"

সে জন্য দিল্লী বা লখনৌ-এর শিল্পীদের মধ্যে বংশানুক্রমে অর্জিত রীতিনৈপুণ্য যতই থাক, নূতনের চেতনা নেই। নিজস্ব মহান্ স্টাইল তৈরীর ভাবনায় আক্রান্ত হননি ওইসব শিল্পীরা। "কারণ জাতিবৃত্তি থেকে আসে অভ্যাস, এবং অভ্যাস উচ্চনৈপুণ্যের সৃষ্টিকারী হলেও কল্পনাকে আবদ্ধ করে ফেলে গণ্ডীতে।"

এইসূত্রে তিনি ইউরোপের মধ্যযুগের শিল্প-জাগরণের কথা এনেছিলেন। ওই কালের পশ্চিমী শিল্পীরা একদিকে নিজেদের মুক্ত করেছিলেন পুরাতনের অনুকৃতি থেকে, অন্যদিকে তাঁরা নবোদ্ভূত সমষ্টিচেতনার প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যেমন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী জিয়ত্তো প্রকাশ করেছেন দান্তের স্পর্শ-শিহরিত যুগকে।

এইখানে নিবেদিতা তাঁর মূল বক্তব্যে পৌঁছে গেছেন। ভারতীয় শিল্পী নিজেকে সংকীর্ণ 'জাতি'-বৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করে যুগের মন ও হৃদয়ের বৃহত্তর ভাবধারার কাছে আত্মনিবেদন করুক। কেননা "**যে মানুষ তাঁর যুগের সামগ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নন, তিনি সেই সংস্কৃতির চরম প্রকাশ ঘটাতেও সমর্থ নন।**" এ জিনিস চিন্তাহীন বৈদেশিক অনুকৃতিতে ঘটানো যাবেনা। তাছাড়া সমকালীন ইংলণ্ডের শিল্প থেকে গ্রহণের উপযোগী বস্তুও তিনি দেখেন নি। ইংরেজের শিল্প হারিয়ে গেছে, কারণ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্যবাদীরা আত্মিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম করেনা—আর তেমন সংগ্রাম ছাড়া শিল্প হয় না। শিল্পে সেই সংগ্রামী চেতনা প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্প যদি স্থূল চেহারাও নেয়—তবু "রঙের সেই স্থূলতাও শ্রেয়, যদি তার পিছনে চিন্তার যন্ত্রণা থাকে।" নিবেদিতা দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছেন, "**শিল্পক্ষেত্রে জাতীয় ধারা বলে একটা জিনিস আছে।**" কিন্তু স্পষ্টভাবে এ কথাও বলেছেন, "**ভারতের প্রয়োজন হলো, জাতীয় ধারার সঙ্গে ইউরোপের আঙ্গিক জ্ঞানের সংযোজন।**" সুচারুভাবে বলেছেন, "**মহান শৈলীর বৈশিষ্ট্য হলো, তা আত্মাবমাননা না ঘটিয়ে নতুন জ্ঞানকে আত্মসাৎ করতে পারে**"। তাঁর সিদ্ধান্ত এই :

"ভাষার নিজস্ব কোনো গৌরব নেই। তার গৌরব নির্ভর করে পশ্চাতের শক্তির উপরে, যা শব্দকে ঠেলে এগিয়ে দেয়। শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। ভারতে শিল্পের পুনর্জন্ম একমাত্র ঘটতে পারে যদি তাকে ভারতীয় জাতীয়তা নামক শক্তিশালী মহাস্বপ্নের সচেতন সেবক ও কবি করে তোলা যায়।" [এখানে সবিনয়ে স্বীকার করি, নিবেদিতার মহান রচনার ভাষান্তর সম্ভব নয়— অন্তত আমার সাধ্যে তা নেই। নিবেদিতার লেখার প্রাণশক্তি এই অনুবাদে ফোটেনি।]

মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত নিবেদিতার এই রচনা ; এই সঙ্গে **'The Place of Foreign Culture in a True Education', 'On the Influence of History in the Development of Modern India'.** লেখা দুটি ; প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের বিষয়ে নানা রসগ্রাহী আলোচনা ; বারাণসী, রাজগীর, চিতোর, মগধ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ প্রভৃতি স্থানের উপরে লিখিত প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বমূলক প্রবন্ধাবলী ; এলিফ্যান্টা, সর্বোপরি অজন্তার উপরে সুদীর্ঘ রচনা (যা কেবল অজন্তার চিত্রাবলীর প্রসঙ্গেই নয়, তার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে মৌলিক চিন্তাপূর্ণ বক্তব্যেও সমৃদ্ধ) ; এবং 'ক্লাসিকাল ইউরোপের শহর পম্পেই' প্রবন্ধ—এই সব রচনার কথা মনে রাখলে সন্দেহ থাকেনা যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মডার্ন রিভিউ পত্রিকাকে কলাশিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্পদে সম্পন্ন করেছিলেন নিবেদিতাই।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ', প্রবাসী, পৌষ ১৩৫০, পৃ· ২৬১।

২। "নানাপ্রকার গৃহ, মন্দির ও গুহানির্মাণে যে প্রাচীন আর্যদিগের বিশেষ দক্ষতা ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বৌদ্ধযুগেই ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ উন্নতি হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্করগণ নিজ-নিজ নৈপুণ্যের অনেক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এ-বিষয়ে কখনও গ্রীকদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। গ্রীক ভাস্করেরা মানুষ ও দেবদেবীর মূর্তিতে সৌন্দর্যের যে-আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, হিন্দু শিল্পীগণ তাহার নিকটেও যাইতে পারেন নাই।···মন্দিরাদির গঠনপ্রণালী এবং তাহাদের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্বন্ধেও ওইসকল কথা খাটে। ইহা ফর্গুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্পসমালোচকদের মত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তও এই মতে সায় দিয়াছেন। তিনি বলেন, কপিল ও কালিদাসের দেশে প্রতিভার অভাব ছিলনা ; কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকে ক্রমে ব্যবসায়ে বিমুখ হইয়া পড়ায় ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিতকলাগুলি নিম্নশ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। এমত অবস্থায় প্রতিভার পরিচয় কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে ? বার্ডবুড় সাহেব আরও একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুদের পৌরাণিক অনেক দেবদেবী এবং তাঁহাদের অবতারগণের মূর্তি অস্বাভাবিক। হিন্দু শিল্পীগণ ধর্মভাবের প্রেরণায় তাঁহাদের ভাস্কর্য ও চিত্রে অন্ধভাবে পুরাণোক্ত বর্ণনার অনুসরণ করিয়াছেন ; সৌন্দর্যসৃষ্টির চিন্তা তাঁহাদের মনে আসে নাই ; কিন্তু যেখানেই তাঁহারা পৌরাণিক বর্ণনা ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিয়াছেন, সেখানেই সৌন্দর্যরচনায় বহু পরিমাণে সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন।" ['ভারতবর্ষের শিল্প', সম্পাদকীয় রচনা, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩০৮]

৩। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২০, পৃ· ১৯২। রমাপ্রসাদ চন্দের 'ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা' প্রবন্ধের শেষে রামানন্দের মন্তব্য।

৪। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'ভগিনী নিবেদিতা', উদ্বোধন মাঘ ১৩০৫, পৃ· ২০।

৫। মিসেস ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার ১২· ১২· ১৯০৬ পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ এই :

'যুম [মিস ম্যাকলাউড] আমাকে ওয়াল পেপারের দুটি নমুনা পাঠিয়েছে— দারুণ। ওগুলি জলের পাশে রূপোলি বার্চের রেখাঙ্কনের মতো। সে আমাকে বস্টন পাবলিক লাইব্রেরির চমৎকার সিঁড়ির সচিত্র পোস্টকার্ডও পাঠিয়েছে। আচ্ছা, মিঃ থর্প কি ওই জিনিসটির এমন একটা ফটো পাঠাতে পারেন না যা পত্রিকায় ছাপা যাবে ? আমি বিশেষভাবে চাই, ভারতীয় জনগণ ফ্রেস্কোর এইপ্রকার ব্যবহার জানুক। আমার এও মনে হয়, বস্টন পাবলিক লাইব্রেরি সম্ভবত পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক নগর-স্থাপত্যের নিদর্শন। অর্থাৎ আমি এই বলতে চাই, এর মধ্যে উচ্চতর আদর্শকে যেমন নিবিড়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে সে রকম অন্য ভবনে নেই। তাই এর কিছু বিবরণ পেলে বাংলা পত্রিকায় প্রকাশ করা আমার বাসনা।"

৬। **Encyclopedia of Painting**, Edited by Bernard S. Myers. p. 501.

৭। **World Famous Paintings**, George Frederick on Watts, 'Hope', p. 396

৮। **The World's Greatest Paintings**, Vol. I., Sir Edward Coley on **Burne Jones.**

৯। **Encyclopedia of Painting** (Editor, Bernard S. Myers.), p. 342.

১০। **World Famous Paintings** (Adrian Bury, A.R.W.S.. and Charles Richard Cammell. London) p. 226.

১১। **The Hundred Best Pictures** (Edited by C. Hubert Letts, London) p. 28.

১২। **Encyclopedia of Painting** (Edited by S. Myers), p. 402.

১৩। Ibid, p. 424.

১৪। NCW, Vol.II, p. 300, *Our Zenana Terrace.*

১৫। **Auguste Rodin**, by Robert Descharnes and Jean-Francois Chaburn (Park Lane, New Yerk.).
The World of Rodin, by William Harlan Hale and the Editors of Time-Life Books. (Time-Life International, Naderland, B.V.)

১৬। "Swami Vivekananda in Paris," by Swami Vidyatmananda, **Prabuddha Bharata**, March 1967.

১৭। "Coronation of Sita and Rama" ছবিটি নিবেদিতার মন একেবারে কেড়ে নেয়। মডার্ন রিভিউ-এর আলোচ্য প্রবন্ধের আগেই তিনি প্রবাসীতে (আশ্বিন ১৩১৩) ওই ছবিটির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে বলেছেন, 'দেবসভা' অঙ্কনের ক্ষেত্রে ছবিটি যে-কোনো ইউরোপীয় চিত্রের সমতুল এবং যে অসাধারণ সহজতা ও সম্পূর্ণতার সঙ্গে তা এখানে চিত্রিত হয়েছে সে রকম কিছু তিনি অন্যত্র দেখেন নি। অনুরূপ ধরনের ইতালীয় চিত্রের সঙ্গে ঐক্য ও পার্থক্যের আলোচনায় উভয় দেশের সামাজিক সংস্থিতির চরিত্র বিশ্লেষণও করেছিলেন। এই ছবির পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য : "We may note also, in this old Indian picture, the perfect correctness of the perspective. There is no doubt in the artist's mind that the vertical is always the vertical, and the parallel lines converge as they recede." (NCW III, pp. 85-86).

ছবিটি নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন, **The Holy City**, (NCW, II, pp. 358-60)। শিল্পের পটভূমিকা হিসাবে ভারত ও ইতালীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করে বলেছিলেন : ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলিতে জাতীয় আদর্শ অপেক্ষা নাগরিক আদর্শের প্রাধান্য ছিল। দেশ সেখানে যেন নগরের সঙ্গে জুড়ে থাকা একটা জিনিস। তাই সেখানে স্পষ্টভাবে চিন্তার মধ্যে আনা হয়েছে— মেমফিস, থিবস, জেরুজালেম, টায়র,

দামাস্কাস, এফিসাস, এথেন্স, রোম, কার্থেজ— সেইভাবে আসেনি ইজিপ্ট, জুডা, সিরিয়া, গ্রীস, ইতালি, স্পেন, আফ্রিকা। এই নাগরিক আদর্শ প্রভাব ফেলেছে ইহুদীধর্ম ও পরবর্তী খ্রীস্টধর্মের উপর। ইহুদী ধর্ম-প্রবক্তারা স্বর্গকে নব-জেরুজালেমের আদলে কল্পনা করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপের স্বাপ্নিকেরা স্বর্গ-কল্পনার সময়ে কোনো দেশের ছবির বদলে নগরের ছবিই ফুটিয়ে তুলতেন। "এমন-কি দান্তে ও জিয়ত্তো উভয়েই তাঁদের মনের বিরাট পরিধি সত্ত্বেও পৌরস্বাপ্নিক ছিলেন, তাই তাঁদের মনে স্বচ্ছন্দে এসে গিয়েছিল এই কল্পনা : বিয়েত্রিচে স্বর্গলোকেও জ্যোতির্ময়ী থাকবেন যেমন তিনি ছিলেন ফ্লোরেন্সে।" বাহ্যত মনে হবে, এই ধরনের পৌর ভাবাবেগ ভারতে ছিলনা। যে-বারাণসী জেরুজালেমের মতোই পুণ্য নগরী— একটি নয় তিনটি ধর্মের কাছে— সেই বারাণসীও চরিত্রগতভাবে নাগরিক নয়, জাতীয় বস্তু। তার পবিত্র এলাকার মধ্যে ভারতের প্রতিটি রাজ্যই প্রাসাদ তৈরি করেছে ; প্রতি ধর্মের মন্দির আছে ; রয়েছে চতুষ্পাঠী, অন্নসত্র, সেখানে সবাই শিক্ষা, অন্ন, আশ্রয় পায় ; বিশেষ স্থানবোধে তা আবদ্ধ নয়। উল্টোদিকে আবার ভারতে সব যুগেই বিখ্যাত নগরী আছে— চিতোর, দিল্লী, অমৃতসর, পুনা, কাঞ্চীভরম, তৎসহ অযোধ্যা—যার রূপ দেখা যায় আলোচ্য ছবিটিতে। এই ছোট ছবিটিতে কোমল উজ্জ্বল বর্ণ, ভারতীয় মিসাল-তুল্য ধর্মপুঁথি চিত্রণের রীতি, পশ্চাদপটে অযোধ্যার প্রাচীর ও বুরুজ, তারপরে দিগন্তের উপরে একফালি আকাশ। "যাঁরা ইতালীয় শিল্পীদের আঁকা 'ম্যাডোনা ও শিশু' ছবির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এই ছবির সামনের দিকের মূর্তিগুলির রূপ সহজেই বুঝতে পারবেন। খাঁটি মুক্তোর দ্বারা অলঙ্কৃত রাজছত্র, যা রোমক গির্জার ব্যালডাকিনো-র [বাগদাদ থেকে আমদানীকৃত ঘন অলঙ্কৃত স্বর্ণাদিখচিত সিল্ক বা ফ্যাব্রিক] কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তার নীচে দুই জনের উপযোগী সিংহাসনে উপবিষ্ট রাম-সীতা। রামের হাতে অতি সুন্দরভাবে রচিত এক শ্বেতপদ্ম, যা দেবদূতের হাতে-ধরা অ্যানানসিয়েশন লিলির কথা স্মরণ করায়। রাজার ডানদিকে দণ্ডায়মান ভ্রাতারা, রাণীর বামদিকে তাঁর সহচরীরা, আর রাজারাণীর পদতলে নতজানু হনুমান। রয়েছে অযোধ্যার উদ্যানের দৃশ্য। পিছনে দুর্গপরিখা—সেখানে স্নানার্থীরা, এবং জলে ক্রীড়ারত একজোড়া হস্তী ও হস্তিনী। রাজতরণীও আছে পুরো জাঁকজমক নিয়ে। কিন্তু দুর্গপরিখার বাইরে নীল আকাশপটে তুষারশুভ্র অযোধ্যার ভবনগুলির অঙ্কনেই শিল্পী তাঁর সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হয়ত ছিল একটি নিখুঁত প্রাসাদ অঙ্কন, কিন্তু তিনি কার্যত আমাদের দিয়েছেন জীবনস্পন্দনে এবং গতি ও আনন্দে পূর্ণ একটি নগরী। সে নগরী কিন্তু স্বর্গীয়। মানবিক দৃশ্যকে মর্ত্য ও স্বর্গের মিলনভূমিতে এমন স্বপ্নময়ভাবে সুষম ছন্দে অন্য কোথাও স্থাপন করা হয়েছে কিনা সন্দেহ।"

নিবেদিতা কি এল গ্রেকোর (১৫৪৮ ?-১৬২৫) ছবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ? সম্ভবত নয়, তাঁর লেখায় ওই শিল্পীর উল্লেখ নেই। ওই শিল্পী নিবেদিতার কালে সমাদৃত ছিলেন না, তাঁর মহিমার আবিষ্কার পরে ঘটে। তিনি জাতিতে গ্রীক, জন্ম ক্রীটে, তিনতোরেত্তোর শিল্পশালায় শিক্ষা, স্পেনের টোলেডোতে এক অখ্যাত গির্জায় রয়েছে তাঁর সেরা শিল্পসম্ভার। কিন্তু রেনেসাঁস পর্বে তাঁর মতো মিস্টিক শিল্পী আর কেউই ছিলেন না। তাঁর ড্রইং নিয়মহীন, মূর্তিগুলি অসাধারণ দীর্ঘ, তাদের মাথা ছোট, ভঙ্গিতে খেয়ালিপনা, বড়ো বড়ো বিষণ্ণ চোখ অন্তরের বিচিত্র ভাষায় মুখর। এল গ্রেকো-র বিখ্যাত ছবি টোলেডো নগরী—তার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীর অযোধ্যা নগরীর তুলনা করা হলে খুবই চিত্তাকর্ষক হতো। উভয় ছবির ঐক্য আছে স্বর্গ মর্ত্যের সীমারেখা মুছে দেওয়ার সামর্থ্যে, কিন্তু পার্থক্যও সুগভীর। ভারতীয় শিল্পীর অযোধ্যা রামরাজ্যের রাজধানী, মর্ত্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন অবতার ও তাঁর সঙ্গিনী এবং সঙ্গীরা। সুতরাং মর্ত্য সহজেই পৌঁছে গেছে আকাশলোকে। এল গ্রেকোর ছবিতে কিন্তু স্বর্গলোকেরই প্রাধান্য—যা আকর্ষণ করছে মর্ত্যকে ঊর্ধ্বে, যেখানে এঞ্জেল-পরিবৃত ম্যাডোনা উপবিষ্ট। ভারতীয় শিল্পীর কাছে মর্ত্য ও স্বর্গের মিলন স্বাভাবিক বলে কোমলোজ্জ্বল কমলা, হলুদ ও শ্বেতবর্ণের বিন্যাস সেখানে ; ছবিটি আনন্দোৎফুল্ল। আর, এল গ্রেকো এনেছেন নৈশ আকাশকে, বিচিত্র বাতাসে দীর্ণ মেঘ, যেন যন্ত্রণাকাতর চন্দ্র এবং তারই মধ্যে আত্মার নগরীর মতো একটি নগরী, ঈশ্বরকে অন্তরে গ্রহণ করে সুরক্ষিত। ['পকেট বুক অব ওল্ড মাস্টার্স' (সম্পাদক হারমান জে ওয়েফলার) বইয়ে সমারসেট মম-এর 'অফ হিউম্যান বন্ডেজ' উপন্যাস থেকে এল গ্রেকো সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোচনা সংকলিত হয়েছে।]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারত-শিল্পে গ্রীক প্রভাবতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ-ওকাকুরা-হ্যাভেল- কুমারস্বামী এবং নিবেদিতা

॥ ১ ॥

ভারত-শিল্পের একালীন আলোচনার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক প্রসঙ্গ—এই শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাপারে গ্রীসের ভূমিকা কী ছিল ? এ সম্বন্ধে একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মস্ত মস্ত দাবি হাজির করেছেন, অন্যদিকে আবার অনেক ভারতপক্ষীয় লেখক তা খণ্ডন করবার চেষ্টাও করেছেন। বিষয়টি বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত। নিবেদিতার চিঠিতে বিষয়টির উল্লেখ আছে। এখানেও দেখি—এই বিশেষ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যেসব কথা বলেছিলেন তার অনেকখানি নিবেদিতার মধ্য দিয়ে অন্য কিছু বিশেষজ্ঞের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

আমরা যে-কালের আলোচনা করছি তখন বিষয়টি নিছক প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক না-থেকে আধা-রাজনৈতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে কিভাবে ইতিহাসের বিকার ঘটাচ্ছিল সে সম্বন্ধে দুঃখের বিদ্রূপ করে স্বামী বিবেকানন্দ ২১ নভেম্বর ১৮৯৬-এর 'ব্রহ্মবাদিনে' 'ডঃ পল ডয়সন অব দি ইউনিভার্সিটি অব কিয়েল' প্রবন্ধে বলেছিলেন : "ইউরোপে সংস্কৃতচর্চার প্রথম যুগের পণ্ডিতেরা বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতার চেয়ে অনেকগুণ বেশি কল্পনাশক্তি নিয়ে সংস্কৃত অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁরা অল্পই জানতেন, সেই অল্পবিদ্যা ছিল তাঁদের ভরসাস্থল, আর প্রায়ই তাঁরা সেই অল্পবিদ্যার অতিরিক্ত আড়ম্বর করতেন।" "এর পরে এলেন একদল প্রতিক্রিয়াশীল স্থূলদর্শী সমালোচক, যাঁরা আবার সংস্কৃতের সামান্যই জানতেন, বা প্রায় কিছুই জানতেন না, সংস্কৃতচর্চা থেকে কিছু পাওয়া যাবে এমন বিশ্বাসও তাঁদের ছিলনা এবং (প্রাচ্যের) সব কিছুকে বিদ্রূপ করতে তাঁরা বড়ই দড় ছিলেন।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ·

১৮৫)। ম্যাক্সমূলার বা পল ডয়সনের মতো যথার্থ সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে স্বামীজী ব্যতিক্রম বলে গণ্য করেছিলেন (যদিও প্রয়োজনমতো এঁদের মতের প্রতিবাদও তিনি করেছেন) কিন্তু অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ ছিলেন "অতি ক্ষিপ্র সিদ্ধান্তকারী এবং সহানুভূতিশূন্য।"

এঁদের হাতে পড়ে প্রাচীন ভারতের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, স্বামীজী সে সম্বন্ধে বললেন :

"সহসা এক শুভ প্রভাতে বেচারা হিন্দুরা জেগে উঠে দেখল—যা-কিছু তার ছিল সবই লোপাট হয়ে গেছে। এক বিচিত্র জাতি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তার শিল্পগৌরব, অন্য এক জাতি নিয়েছে স্থাপত্য, আরও এক জাতি হস্তগত করেছে তার প্রাচীন বিজ্ঞানের অবশিষ্ট বস্তুগুলি। শুধু তাই ? তার ধর্মও তার নয়। হাঁ হাঁ, বহির্দেশ থেকে সে বস্তুর ভারতে আবির্ভাব হয়েছে পহ্লব-জাতীয় প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে।" (ঐ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫)।

আরো ১৪ বছর পরে নিবেদিতা এইসব কথার সমধ্বনি করার পরে লিখলেন : "বর্তমানে ভারত বহু জায়গা থেকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল।...ওই ধরনের আক্রমণাত্মক মতবাদের আসল পাওনা হলো ওদের হেসে উড়িয়ে দেওয়া—কিন্তু হায় [পরাধীন] ভারত বর্তমানে সে অবস্থায় নেই।"

ভারতের প্রাচীন শিল্পের ব্যাপারে ঐসব বিরূপ থিয়োরির খণ্ডনে সচেষ্ট হয়ে নিবেদিতা লিখেছেন :

"সরল সত্যের নামে এই যেসব পক্ষপাতযুক্ত শরক্ষেপ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে ভারতীয়দের কাছে বোধহয় নৈরাশ্যজনক হলো এই মতবাদ—এমনকি তাদের প্রাচীন শিল্পসম্পদ পর্যন্ত প্রধানাংশে বিদেশীয় উৎসের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তৈরি, যে ঋণকে 'সুচতুরভাবে ঢাকা হয়েছে সাড়ম্বর দেশীয় সাজে'।" (NCW, vol. IV, p. 63)

নিবেদিতা তাঁর 'দি এনসেন্ট অ্যাবী অব অজন্তা' প্রবন্ধে (মডার্ন রিভিউ, জানুয়ারি, জুলাই, অগস্ট ১৯১০) বহু পৃষ্ঠা ধরে প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্পগত আলোচনায় ভারত-শিল্পের উপর গ্রীক প্রভাবের অতিরঞ্জিত দাবি খণ্ডনের চেষ্টা করেছিলেন।

সে প্রসঙ্গে আসার আগে পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে নিবেদিতা একই বিষয়ে আর কী করেছিলেন তা দেখে নেওয়া উচিত। কিন্তু কম দরকারী নয় এ-সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করা—নিবেদিতার মনে যার প্রচুর প্রভাব পড়েছিল। তবে স্বামীজীর কথাগুলিকে যতক্ষণ পর্যন্ত-না নিবেদিতা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক উপাদানের দ্বারা পরীক্ষিত দেখেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করেন নি, এমনও লক্ষ্য করা যায়।

আমরা দেখি, স্বামীজী বহুবার নানাপ্রসঙ্গে হিন্দু ও গ্রীক, এই দুই সভ্যতার তুলনা করেছেন। তাঁর কাছে এই দুই সভ্যতা দুটি ভাবের প্রতীক। অন্তর্মুখ অধ্যাত্মভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিন্দু সভ্যতায়, আর বহির্মুখ ঐহিক সভ্যতার উৎকর্ষ গ্রীক সভ্যতায়। নৈসর্গিক পরিবেশ সভ্যতা দুটির গঠনে কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল স্বামীজী তা বিশ্লেষণ করার পরে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন—ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ছড়িয়েছে সমগ্র প্রাচ্যভূমে আর গ্রীক সভ্যতার প্রভাব সমস্ত ইউরোপে। শেষোক্ত প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য :

"ইংলণ্ড, বস্তুতপক্ষে গোটা ইউরোপ, তার সভ্যতার জন্য গ্রীসের কাছে ঋণী। ইউরোপের সকল কণ্ঠস্বর গ্রীসেরই প্রতিধ্বনি। স্থাপত্যে, গৃহসজ্জায়, গ্রীসের ছাপ। তার বিজ্ঞান ও শিল্প গ্রীসীয় ছাড়া কিছু নয়।" (ঐ, ৩য়, পৃ· ২৬৯-৭১)

স্বামীজী একাধিক ক্ষেত্রে গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের তুলনাও করেছেন, যার মোট কথা "গ্রীক শিল্পের প্রাণ বাস্তবানুকরণে—সকল খুঁটিনাটি-সুদ্ধ। অপরপক্ষে ভারতীয় শিল্পের প্রাণ আদর্শের রূপায়ণ প্রয়াসে।" শিল্পের ক্ষেত্রে নিছক বাস্তবানুকরণের সমালোচনা স্বামীজী করেছেন এই বলে : "গ্রীক শিল্পী বা তাঁদের অনুকারীদের শক্তি নিয়োজিত হয়েছে, ধরা যাক একখণ্ড মাংস চিত্রণে ; তাতে তাঁরা এতই সফল যে, কুকুর পর্যন্ত সেটিকে সত্যকার মাংসখণ্ড ধরে নিয়ে কামড় দিতে ছুটেছে।" স্বামীজী বিদ্রূপ করে বলেছেন, "এক্ষেত্রে কুকুরের সামনে একখণ্ড মাংস ফেলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায় !" (ঐ, ৫ম, পৃ· ২৫৮)

উল্টোপক্ষে ভারতীয় শিল্পের আদর্শমুখী চরিত্রের প্রশস্তিকারক বিবেকানন্দ কিন্তু স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন, পুরো বাস্তববিচ্ছিন্ন হলে শিল্পের প্রাণশক্তি হারিয়ে যায়।:

"ভারতের প্রবণতা আদর্শকে, অতীন্দ্রিয়কে, রূপায়িত করায়—কিন্তু তা অধঃপতিত হয়েছে উদ্ভট মূর্তি অঙ্কনে। খাঁটি শিল্প পদ্মের সঙ্গে তুলনীয়—যা মৃত্তিকা থেকে ওঠে, সেখান থেকেই আহার্য সংগ্রহ করে, মৃত্তিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়না—কিন্তু সে মাথা তুলে থাকে উর্ধ্বে। সেইভাবে শিল্পের সম্পর্ক অবশ্যই থাকা চাই প্রকৃতির সঙ্গে। যেখানে সেই সম্পর্কের ছেদ হয়েছে সেখানে তার পতনও হয়েছে—অথচ তাকে প্রকৃতির উপরে উঠতেও হবে।"

তা হলেও শিল্পে ভাবপ্রকাশের ব্যাপারটির উপরে স্বামীজী খুবই জোর দিয়েছেন :

"স্থাপত্যের সঙ্গে ঘরবাড়ির তফাত হলো—প্রথম ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশিত হয়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োজন মেনে একটা আকার খাড়া করা হয়।" (ঐ, পৃ· ২৫৮-৫৯)

তাই বলে স্বামীজী গ্রীক শিল্পের সমঝদার ছিলেন না এমন নয়। বাস্তবধর্মিতার চূড়ান্ত শক্তিতে সমৃদ্ধ এই শিল্পের গুণমহিমা তিনি স্বীকার করতেন। ক্ষেত্রবিশেষে পাশ্চাত্ত্য শিল্প ভাবপ্রকাশক, তাতেও তাঁর সন্দেহ ছিলনা। কেবল শেষোক্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের দিকে তিনি দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

গ্রীকশিল্প ও ভারতশিল্পের দৃষ্টিভঙ্গিগত গভীর পার্থক্য অনুভব করে, এবং দীর্ঘদিন ধরে উভয় শিল্প স্বচক্ষে দেখার পরে, বিবেকানন্দের পক্ষে গ্রীক প্রভাবে ভারতীয় শিল্পের সূচনা ও বিকাশ হয়েছে—পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের এই সুখী সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তকে স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। সেজন্য উক্ত ধারণার খণ্ডনে তিনি কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। সেকাজ করেছেন ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০, 'প্যারিস কংগ্রেসে'র এক অধিবেশনে। তিনি স্বয়ং ঐ অধিবেশনের যে-সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে পাই :

"কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটি সংজ্ঞা গ্রীক জ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া, এবং গ্রীকরা ভারতপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, ভারতের যাবতীয় বিদ্যায়—সাহিত্যে জ্যোতিষে গণিতে, গ্রীক সহায়তা দেখিতে পান। শুধু তাহাই নহে, একজন অতিসাহসিক লিখিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিদ্যা গ্রীকদের বিদ্যার ছায়া।" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, পৃ· ৫০)

যেসব যুক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় বিদ্যার উপরে গ্রীক প্রভাব কল্পনা করেন, তাদের ফাঁক দেখিয়ে দেবার পরে স্বামীজী ব্যঙ্গ-কৌতুক মিশিয়ে লিখেছেন :

"ওই প্রকার কালিদাসাদি কবিপ্রণীত নাটকে 'যবনিকা' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া যদি ওই সময়ের যাবতীয় কাব্য নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি [আপতিত ?] হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে, আর্যনাটক গ্রীকনাটকের সদৃশ কিনা ? যাঁহারা উভয় ভাষার নাটক

রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ওই সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনাজগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিন্ কালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক কোরস্ কোথায়? সে গ্রীক যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্যনাটকে তাহার বিপরীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্যনাটকে আর এক।

"আর্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীকনাটকে আদৌ তো নাই, বরং শেক্সপীয়রপ্রণীত নাটকের সহিত ভূরি-ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে। অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, শেক্সপীয়র সর্ববিষয়ে কালিদাসাদির নিকট ঋণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া।

"শেষ—পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের আপত্তি তাঁহারই উপর প্রয়োগ করিয়া ইহাও বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে, কোনও হিন্দু কোনও কালে গ্রীক ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণ ওই গ্রীক প্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।

"তদ্বৎ আর্যভাস্কর্যে গ্রীক-প্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রম মাত্র।" (ঐ, পৃ· ৫০-৫১)

॥ ২ ॥

ভারতীয় 'ভাস্কর্যে' গ্রীক প্রভাবতত্ত্বকে খণ্ডন করবার জন্য স্বামীজী কোন্ যুক্তি প্রয়োগ করতেন তা যথেষ্ট না জানলেও কিছুটা অনুমান করা যায় ভারতীয় 'স্থাপত্যে'র উৎপত্তিতে গ্রীক প্রভাবতত্ত্বকে খণ্ডন করার জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের যুক্তিসমূহ থেকে। রাজেন্দ্রলাল সেকাজ স্বামীজীর বহু আগেই করেছেন এবং স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে এক্ষেত্রে সংঘর্ষ প্রধানত ফার্গুসনের। তা অধিকন্তু হয় কানিংহাম ও মিসেস ম্যানিং-এর সঙ্গে। একথা স্মরণ করা প্রয়োজন, রাজেন্দ্রলাল যখন ফার্গুসন প্রমুখের মত খণ্ডন করেছিলেন তখন মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পার আবিষ্কার হয়নি।

পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরির কাজ হিন্দুরা গ্রীক-বিজেতাদের কাছ থেকে প্রথম শিখেছিল—এই চালু-করা ধারণার প্রতিবাদে রাজেন্দ্রলাল ১৮৭০ সালে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যার সমালোচনা করেন ফার্গুসন ১৮৭১ সালে 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি'র পৃষ্ঠায়। রাজেন্দ্রলাল তাঁর বক্তব্য পুনরায় প্রকাশ করেন 'Antiquities of Orissa' গ্রন্থে। তার বিরুদ্ধে ফার্গুসন আবার লেখেন তাঁর 'History of Indian and Eastern Architecture' গ্রন্থে। তার উত্তর দেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর প্রসিদ্ধ 'Bodh Gaya' গ্রন্থে। এই সমস্ত তর্ক-বিতর্ক থেকে দেখা যায়, রাজেন্দ্রলাল যেখানে শান্ত তথ্যনিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে নিজের বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন সেখানে ফার্গুসন-সাহেব রাজেন্দ্রলাল মিত্র নামক বাবুটির অনধিকারচর্চায় বিরক্তি প্রকাশ করাকেই উপযুক্ত উত্তর ভেবেছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ফার্গুসন উক্ত বাবুর মত স্বীকার না-করে পারলেন না।

ফার্গুসনের আগের মত ছিল :

"ভারতীয়রা এই স্থাপত্যশিল্প প্রথম শিক্ষা করে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকদের কাছ থেকে।"[১]

"আমরা দেখে বিস্মিত হইনি যে, খ্রীস্টাব্দ-সূচনার কাছাকাছি সময়ে প্রথম পর্যায়ের বৌদ্ধ গুহাগুলিতে কাষ্ঠনির্মিত আকারাদির নকল করা হয়েছে প্রস্তর গঠনে, কারণ আমরা জানি যে, যতদিন-না গ্রীকরা ভারতীয়দের অধিকতর টেকসই বস্তু-দ্বারা নির্মাণ করার শিক্ষা দিয়েছে তার আগে পর্যন্ত ভারতে কোনো প্রস্তরস্থাপত্য ছিলনা।"[২]

"কোনো-কোনো মানুষের মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি করবে যদি একথা তাদের বলা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব আড়াই শো বছর আগে পর্যন্ত ভারতে কোনো প্রস্তরস্থাপত্য ছিলনা।"[৩]

হুবহু অনুসরণ করবে না-কি ? অথচ অশোকস্তম্ভের মৌলিক স্থাপত্যরীতির সঙ্গে গ্রীক স্থাপত্যরীতির ঐক্যই বা কোথায় ?

ফার্গুসনের যুক্তিকে বিধ্বস্ত করার পরে রাজেন্দ্রলাল মিসেস ম্যানিংকে চ্যালেঞ্জ করেন। উনি কোথায় পেলেন— আলেকজান্ডার ভারতে গ্রীকশিল্পী রেখে গিয়েছিলেন ? দিগ্বিজয়ী রাজা অভিযানের সময়ে স্থপতি বা ভাস্কর সঙ্গে নিয়ে যান বিজিত দেশে রেখে আসবার জন্য—অভিনব সংবাদ বটে। আলেকজাণ্ডার কয়েক মাস মাত্র ভারতে ছিলেন, সেই সময়ে নিজের সামরিক কৃতিত্ব দেখাতেই ব্যস্ত ছিলেন— সেই ফাঁকটুকুর মধ্যে তিনি রক্ষণশীল ও গর্বিত হিন্দুদের সামনে গ্রীকসভ্যতার এমন নমুনা দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁরা অভিভূত হয়ে অনুকরণ করতে শুরু করে দিলেন ? বিচিত্র যুক্তি বটে। আর আলোকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারীরা এমন পদার্থের ছিলেন না যে, তাঁরা অশোককে প্রভাবিত করতে পারেন।

রাজেন্দ্রলালের রচনায় আঙ্গিকগত অনেক বিচার ছিল, এখানে তাদের উল্লেখ করলাম না। ফার্গুসন, রাজেন্দ্রলালের যুক্তিশরে বিদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে অনেক কটূক্তি করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল—গ্রীক অভ্যুদয়ের আগেই ভারতে প্রস্তরস্থাপত্য ছিল। ১৮৭৫ সালে রাজেন্দ্রলালের 'Antiquities of Orissa' বেরোয় ; পরের বছরে বেরোয় ফার্গুসনের 'History of Indian and Eastern Architecture'। এই বইয়ে ফার্গুসন অশোকের আগে ভারতে কাষ্ঠস্থাপত্যের অতিরিক্ত প্রস্তরস্থাপত্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও মেনে নেন যে, বাড়ির ভিত্তি তৈরির কাজে, প্রাচীন তোরণ সেতু প্রভৃতি তৈরির কাজেও, পাথর ব্যবহার করা হতো—এবং সে প্রাচীরের উচ্চতা কখনো কখনো তিরিশ ফুটও হতো—মেগাস্থিনিসের সাক্ষ্য থেকে যা জানা যায়। রাজেন্দ্রলাল ধারালো ভাষায় এই অদ্ভুত বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন। ফলে ফার্গুসনের অবস্থা সকরুণ। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজেন্দ্রলালের পুরো মত মেনে নিতে হয়। ১৮৭৯ সালে 'ইনস্টিটিউট অব ব্রিটিশ আর্কিটেক্টস'-এ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ফার্গুসন বললেন :

"এটা সুস্পষ্ট যে, যে-ক্ল্যাসিক্যাল রীতির সঙ্গে আফগান [গান্ধার] রীতি মিশ্রিত—দু-একটি বিক্ষিপ্ত ক্ষেত্র বাদ দিলে তা কদাপি সিন্ধুনদ অতিক্রম করেনি। কারণ এই আফগান রীতি—সিন্ধুনদের অপর পারে খ্রী·পূ· তৃতীয় শতাব্দী থেকে বলবৎ ও পরবর্তীকালে প্রসারিত—এমন একটি রীতির সম্মুখীন হয়েছিল যা পুরো ভারতীয় এবং মৌলিক। এই ভারতীয় রীতিকে যদি ভারতসীমার বাইরে পশ্চিমদিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া নাও হয়, তা উল্টোপক্ষে অবশ্যই বাহির থেকে আমদানি করাও হয়নি। এই রীতির উদ্ভাবন এবং নিখুঁত রূপবিধান ভারতেই হয়েছে—তারপর তা প্রসারিত হয়েছে ভারত-চীন সংস্কৃতি-প্রভাবিত দেশসমূহের মধ্য দিয়ে পূর্বদিকে।" (রাজেন্দ্রলালের 'The Indo-Aryans' গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছে 'প্রস্তরস্থাপত্য' শিখেছিল, ফার্গুসন প্রমুখের এই দাবি নস্যাৎ হয়ে যাবার পরে, ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের একগুঁয়ে অংশটি স্বীয় মর্যাদারক্ষার উপায়রূপে অবলম্বন করল 'ভাস্কর্য'কে। ও-ব্যাপারটি ভারতীয়রা নিশ্চয় গ্রীকদের কাছে শিখেছিল, বিশেষত যখন গান্ধারশিল্প নামক শিল্পনমুনাগুলি পাওয়া গেছে, যাতে বৈদেশিক প্রভাবের স্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। জেনারেল কানিংহাম সদাপে লিখেছেন :

"আমি মিঃ ফার্গুসনের এই ভাবনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত— ভারতীয়রা খুব সম্ভব গ্রীকদের কাছ থেকে ভাস্কর্যশিল্প শিখেছিল।" (রাজেন্দ্রলালের 'The Indo-Aryans' গ্রন্থে

উদ্ধৃত)।

কানিংহাম খুবই চড়া ভাষায় নিজ মত জানিয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল সেই মতের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেন—গ্রীকদের আগমনের আগেই ভারতে ভাস্কর্যের সূত্রপাত হয়েছিল।[৬]

॥৩॥

রাজেন্দ্রলাল যেখানে ভূমি ছেড়ে দিলেন—স্বামীজী দাঁড়ালেন সেখানে এসে। রাজেন্দ্রলাল সাফল্যের সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎপত্তির মূলে গ্রীক প্রভাব—এই বক্তব্যকে খণ্ডন করেন। কিন্তু তিনি অপরপক্ষে ভারতীয় ভাস্কর্য অপেক্ষা গ্রীক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্বকে সোৎসাহে মেনে নেন। উদয়গিরির ভাস্কর্যে গ্রীক প্রভাব নেই, তা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি গ্রীক ভাস্কর্যের তুলনায় উদয়গিরির ভাস্কর্যের আপেক্ষিক অপকর্ষকে অন্যতম প্রমাণরূপে হাজির করেছিলেন।[৭] আবার এও দেখা যায়, ফার্গুসন ভারতীয় ভাস্কর্যের শিল্পসৌন্দর্যের বিষয়ে বহু জায়গাতেই চমৎকার মন্তব্য করেছেন। ভারতীয় ভাস্কর্যের কিছু নিদর্শনকে তিনি নিজক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিল্পসৃষ্টি মনে করতেন, একথা স্বামীজী মেরী হেলকে লেখা ৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ তারিখের চিঠিতে জানিয়েছেন।[৮]

ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গ্রীক প্রভাবতত্ত্ব খণ্ডনে রাজেন্দ্রলালের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ওইকালে কতখানি গৃহীত হয়েছিল সন্দেহজনক ; কেননা বিখ্যাত ভারতীয়রা পর্যন্ত ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনায় গ্রীক ভাস্কর্যের অধিক উৎকর্ষ স্বীকার করতে তৎপর ও প্রস্তুত ছিলেন, যেমন রমেশচন্দ্র দত্ত।[৯] সেই পরিস্থিতিতে স্বামীজী যে কেবল ভারতীয় শিল্পের উৎসভূমিতে গ্রীক প্রভাবতত্ত্বকে অগ্রাহ্য করলেন তাই নয়, আরো অগ্রসর হয়ে বললেন—ভাবপ্রকাশের ক্ষমতায় ভারতীয় ভাস্কর্য গ্রীক ভাস্কর্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর—অধিকন্তু ভারতের কাছেও গ্রীক ভাস্কর্যের ঋণ আছে, (তাঁর 'পরিব্রাজক' বইয়ের ডায়েরি-নোটে সে কথা পাই), যদিও আমরা দেখি, ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনায় গ্রীক ভাস্কর্যের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা স্বয়ং স্বামীজীর মধ্যেই দীর্ঘদিন বজায় ছিল।

যতদূর পেয়েছি তদনুযায়ী, ২৮ মে ১৯৮৬ তারিখে লন্ডনে ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আলোচনাকালেই স্বামীজীকে আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁর পরিণত ধারণাকে প্রথম প্রকাশ করতে দেখা গেছে। স্বামীজীর শিল্পী-বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ 'প্রবুদ্ধ ভারতের' নভেম্বর ১৯০৬ সংখ্যায় 'স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড আর্ট' প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন তার মধ্যে পাই : অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে স্বামীজীর আলোচনাকালে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রসঙ্গ এসেছিল। অধ্যাপক বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে গ্রীক স্থাপত্য ভাস্কর্যের কিছু ঐক্য, সেইসঙ্গে গ্রীস ও ভারতের যোগাযোগের কথা বলে, গ্রীসের কাছে এ-ব্যাপারে ভারতের ঋণের কথা তোলেন। স্বামীজী তাঁর কথা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন : একই যুক্তিতে গ্রীসের শিল্পের উপরে ভারতীয় শিল্পের প্রভাবের কথা ঘোষণা করা যায়। তাছাড়া, বৌদ্ধ ভাস্কর্যের সঙ্গে গ্রীক ভাস্কর্যের কোনো সমরূপতা নেই। গ্রীক ভাস্কর্যে যেখানে বহিঃপ্রকৃতির রূপায়ণের প্রয়াস দেখা যায়, সেখানে ভারতীয় ভাস্কর্যের চেষ্টা অন্তঃপ্রকৃতির রূপায়ণ, যা করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্প বস্তুরূপকে অগ্রাহ্য পর্যন্ত করেছে। গ্রীকরা যদি স্থাপত্য শেখাতে ভারতে এসে থাকে তাহলে তারা ভারতীয় স্থাপত্যের ত্রুটি শোধরাবার চেষ্টা করল না কেন, যখন দেখল ভারতীয় স্থাপত্য ভর্তি হয়ে আছে ভাস্কর্যে, যা গ্রীক রীতির অনুমোদিত নয় ? গ্রীকরা বস্তুতপক্ষে ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, শিল্প শেখাতে নয়।

প্রিয়নাথ সিংহ এই সূত্রে স্বামীজীর মুখে আরো শুনেছেন : ভারতের হিন্দু বা মুসলমান

স্থপতি ভাববিকাশে ব্যর্থ হয়না। রাজপুতানার আলোয়ারে ভ্রমণকালে স্বামীজী একটি সমাধি-গম্বুজের সৌন্দর্য ও নিখুঁত ভাবপ্রকাশের শক্তি দেখে মোহিত হয়েছিলেন। আগ্রার তাজমহল সম্বন্ধে বলেছিলেন, এই পাথরের কিছু অংশ নিংড়ালে সম্রাটের প্রেম ও যন্ত্রণার রক্তবিন্দু ঝরে পড়বে। কলকাতাকে তখন 'প্রাসাদনগরী' বলা হতো ; স্বামীজীর কাছে তা উপর-উপর সাজানো বাক্স-নগরী। রাজপুতানায় তখনো বর্তমান হিন্দুস্থাপত্য সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন, সেখানকার ধর্মশালাকে দেখলে মনে হবে, তা হাত বাড়িয়ে যেন আতিথ্য নেবার জন্য ডাক দিচ্ছে ; মন্দির দেখলে মনে হবে, তার ভিতরে বাইরে দিব্যভাব বিকীর্ণ। গ্রাম্য কুটীরের বিভিন্ন অংশে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য থাকে। তার গঠনে গৃহকর্তার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। এসব কথা বলার সঙ্গে স্বামীজী যোগ করেছিলেন, যথার্থ ভাবপ্রকাশক স্থাপত্য তিনি ইউরোপে কেবল ইতালিতে দেখেছেন।

স্বামীজী অবশ্যই গ্রীক শিল্পের বিরাট শক্তি ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। খ্রী·পূ· পঞ্চম শতাব্দীতে ফিডিয়াস প্রভৃতির রচনায় অভিব্যক্তির সৌন্দর্য সম্বন্ধে মুগ্ধতা জানিয়ে তিনি এক 'কলাবিদ্যানিপুণ' ফরাসী পণ্ডিতের এই উক্তি তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন : "(ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালী-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ...ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে-কালে নির্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খ্রী·পূ· পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায় ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হইয়া ওঠে।" এইকালে ফিডিয়াস, স্বামীজীর মতে, প্রতিভাবলে 'মহাশিল্পী'। তাঁর রচনা সম্বন্ধে স্বামীজী এই বিশেষজ্ঞ-উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন : "[ফিডিয়াসে] অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব, যাহা কোনোকালে মানবমনে আপন অধিকার হারাইবে না।" তবু শেষ পর্যন্ত সব জড়িয়ে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাস্কর্যকে স্বামীজী সর্বোচ্চে স্থাপন করেছেনই, বিশেষত অধ্যাত্মভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে। হ্যাভেলের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য শিল্পের পক্ষে যিনি বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলেন সেই রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে স্বামীজী শিল্পের প্রাণধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন :

"পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্পসৌন্দর্য দেখে এলুম কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাহদের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল, সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে আছে।"
(বাণী ও রচনা, ৯ম, পৃ· ১৮৬)

স্বামীজী গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পের ভাবগত পার্থক্য নির্দেশ করেছেন প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে আলোচনাকালে :

"গ্রীসীয়দের যীশুমূর্তি সম্বন্ধে স্বামীজী বললেন, ওঁরা কখনই যীশুর অন্তর্জীবনের বিকাশের রূপ অনুরাগের সঙ্গে অনুধাবন করতে পারেন নি। তা যদি পারতেন তাহলে ওঁরা তাঁকে অমন পেশীসমৃদ্ধ চেহারায় আঁকতে পারতেন না। এক্ষেত্রে বুদ্ধমূর্তির খুবই প্রশংসা করতে হয়। কোনো জাতির শিল্পকলার অনুশীলন করলেই তার অধ্যাত্মপ্রকৃতির রূপ বোঝা যায়। গ্রীকরা যে কখনো সমুচ্চ অধ্যাত্মস্তরে উঠতে পেরেছিল তার প্রায় কোনো নিদর্শনই নেই গ্রীসীয় শিল্পে। অপরপক্ষে ভারতীয় শিল্প কেবল অধ্যাত্ম ভাবপ্রকাশের

প্রয়াসে নিয়োজিত থেকে অগ্রাহ্য করেছে বস্তুজগৎকে, ফলে নিজেও অধঃপতিত হয়েছে।"

॥ ৪ ॥

ভারত-শিল্প ও গ্রীক-শিল্প বিষয়ে তুলনামুখে স্বামীজী কী বলেছিলেন তা একটু বেশি সময় নিয়ে উপস্থিত করার কারণ—নিবেদিতা এক্ষেত্রে স্বামীজীর বক্তব্যকে গ্রহণ করেন এবং তা সঞ্চারিত করে দেন (অন্তত সে চেষ্টা করেন) অন্যান্যদের মধ্যে।

স্বামীজীর মনোভাব সম্বন্ধে নিবেদিতা তাঁর ১৪ জুন ১৮৯৮ তারিখের ডায়েরি-নোটে লিখেছেন :

"স্বামীজী আমাদের নিকট গান্ধার ভাস্কর্যের বর্ণনা করিলেন। সেগুলিকে তিনি নিশ্চয় পূর্ববৎসরে লাহোর মিউজিয়ামে দেখিয়াছিলেন। শিল্পবিষয়ে শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষ কোনোদিন গ্রীসের চরণতলে বসিয়াছিল—এই ইউরোপীয় থিয়োরী খণ্ডন করিতে তিনি ঘৃণাপূর্ণ উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেন।" ('স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে', ভগিনী নিবেদিতা, ১৩৫৮, পৃ· ৫৭)

১৮৯৮ সালে স্বামীজীর কাছ থেকে প্রাপ্ত এই ভাব নিবেদিতা নিশ্চয়ই ওকাকুরার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ওকাকুরা তা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনাকালেও পেতে পারেন। নিবেদিতা ঐ চিন্তাগুলিকে 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' বইয়ে পরিবেশন করার জন্য ওকাকুরাকে প্রণোদিত করেন, তাও অনুমেয়। তারপর ঐ বইয়ের ভূমিকায় নিবেদিতা বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন :

"ইতিমধ্যেই যাঁরা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ সমস্যাদির গভীরে নিমজ্জিত, কেবল তাঁরাই ভারতীয় ভাস্কর্যের উপরে গ্রীক প্রভাবের তথাকথিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মিঃ ওকাকুরার মতামতের অসাধারণ মূল্য উপলব্ধি করবেন। পৃথিবীতে অপর যে এক মহান শিল্পধারা আছে সেই চীন শিল্পধারার প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ ওকাকুরা উক্ত গ্রীক প্রভাবতত্ত্বের উদ্ভট অসারত্ব দেখাবার অধিকারী। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় বিকাশধারার সঙ্গে প্রধান আত্মীয়তা চীন ধারারই। তবে এর পশ্চাতের কারণ সন্ধান করতে হবে এশীয় শিল্পের প্রাচীন সাধারণ উৎসের মধ্যে—যার উপরকার তরঙ্গরেখা একই সঙ্গে দেখা যায় গ্রীসের তটে, আয়ারল্যাণ্ডের পশ্চিম প্রান্তের সর্বশেষ অংশে, ইট্রুরিয়া, ফিনিসিয়া, মিশর, ভারত এবং চীনে। এমনই একটা মতবাদের মধ্যে মিলবে 'কে আগে কে পরে' তাই নিয়ে মানসিক অবনতি-বিধায়ক বিতর্কক্ষেত্রে উপযুক্ত সন্ধিচুক্তির শর্ত এবং গ্রীস স্থাপিত হবে তার যোগ্য স্থানে—তবে সে গ্রীস প্রাচীন এশিয়ার একটি প্রদেশ, যার সম্বন্ধে পণ্ডিতরা দীর্ঘদিন ধরে মনে করে আসছেন—তা হলো মহান নর্স (প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভীয়) গাথাসমূহের আসগার্ড পটভূমিকা। একই সঙ্গে এই মতবাদের দ্বারা ভবিষ্যতের বিদ্যানুশীলনের ক্ষেত্রে এক নতুন জগৎ খুলে গেল, যেখানে অতীতের বহু ভ্রান্তির সংশোধন করা যাবে—অধিকতর সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির দ্বারা।" (নিবেদিতা-কমপ্লিট ওয়র্কস্ ৩য়, পৃ· ৩৯)

এর পরে, 'মডার্ন রিভিউ' প্রকাশমাত্রে প্রথম সংখ্যাতেই (জানুয়ারি ১৯০৭) নিবেদিতা 'Function of Art in Shaping Nationality' প্রবন্ধে গান্ধার শিল্পের প্রসঙ্গ অল্প করে উপস্থিত করেছিলেন। তারপরে, ১৯০৯ জুলাই মাসের 'মডার্ন রিভিউ'-এ কুমারস্বামীর

'Mediaeval Sinhalese Art' গ্রন্থের সমালোচনাকালে ঐ প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত বড় আকারে তুলে ধরেন। কুমারস্বামী তাঁর গ্রন্থমধ্যে স্বীকার করেছেন, তিনি আগে ভারতশিল্পে গ্রীক প্রভাবের গুরুত্বকে মেনে নিতেন।

"সেই সময়ে [কুমারস্বামী লিখেছেন] আমি গ্রুণ্ডেল প্রমুখের এই মত গ্রহণ করেছিলাম—আদর্শরীতির বুদ্ধমূর্তি ভারতের জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন বিদেশীরা। তারপর কিন্তু এই সূত্রে উদ্ভূত নানা সমস্যাসকুল প্রশ্নের ক্ষেত্রে ওহেন সরলীকৃত সমাধানের ঔচিত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ খুঁজে পেয়েছি এবং আমাকে বিশ্বাস করতে হয়েছে যে, ভারতশিল্পের উপর গ্রীক প্রভাব এক বিশেষ কালপর্বে যতই ব্যাপক হোক, শেষ পর্যন্ত তা অতি গভীর বা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটাই নয়।"

কুমারস্বামীর মত পরিবর্তনের মূলে কি নিবেদিতার প্রভাব নেই, বিশেষত আমরা যখন দেখি যে, কুমারস্বামী ওকাকুরার মতো করে 'এশিয়ায় আদিপর্বে এক সাধারণ শিল্পধারার অস্তিত্বে' বিশ্বাস করেছিলেন? নিবেদিতা কুমারস্বামীর মতের সারসংক্ষেপ করেছেন এই বলে :

"ডঃ কুমারস্বামী গ্রীস সম্বন্ধে বর্তমানে চলিত অসার কথাবার্তার দাস নন। গ্রীক মনকে প্রাচীন বা আধুনিক পৃথিবীর সৌন্দর্যচেতনার একমাত্র স্বীকৃত উৎস বলে মানতে তিনি গররাজি। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, গ্রীসের গৌরব কোনো বিশিষ্ট রূপকে প্রথম সৃষ্টি করায় যতখানি না, ততোধিক তাকে বিকশিত করে তোলার মধ্যে; এবং তিনি গ্রীক ও এশিয়ার রূপ-পরিকল্পনার সাধারণ উৎস সম্বন্ধে অবিরত জোর দিয়ে যেকথা বলার চেষ্টা করেছেন, তাঁর সেই বক্তব্য নিঃসন্দেহে যথার্থ।"

কুমারস্বামী ১৯০৮ সালের 'কোপেনহেগেন কংগ্রেস অব ওরিয়েন্টালিস্টস্'-এ ভারতীয় শিল্পে গ্রীক প্রভাব বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র পড়েন। সে লেখা পুস্তিকাকারে বেরোয়। 'মডার্ন রিভিউ'-এর আগস্ট ১৯১১ সংখ্যায় নিবেদিতা তার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। কুমারস্বামী পূর্ববৎ গ্রীক ও হিন্দু শিল্পের সাধারণ উৎসক্ষেত্রের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এছাড়া কুমারস্বামীর আরো যেসব কথা নিবেদিতা তুলে ধরেন তাদের মধ্যে রয়েছে বিবেকানন্দের বক্তব্যের পুরো অনুসৃতি। ভারতে মূর্তির উৎপত্তি গ্রীসের দ্বারা নয়, স্বাধীনভাবেই হয়েছে—কুমারস্বামীর এই বক্তব্যের পক্ষে যুক্তিগুলিকে 'সুনিপুণ এবং বিশ্বাসযোগ্য' বলে অভিহিত করার পরে নিবেদিতা লিখেছেন :

"ডঃ কুমারস্বামীর মতানুসারী, গ্রীসমত যুক্তির মধ্যে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হলো—মূর্তিনির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রীস ও ভারতের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। গ্রীকরা মানুষকেই রূপায়িত করতে ইচ্ছুক।—অপরপক্ষে ভারতবাসীর কাছে মানবশরীর পর্যন্ত অতিপ্রেত ভাবব্যঞ্জনার সৃষ্টি করার প্রয়োজন সিদ্ধ করলেই তবে সুন্দর বলে গৃহীত হয়। তার গৌরব সম্পূর্ণত অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার গৌরব। গ্রীক-পূর্বকালে ভারতীয় শিল্পে অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে মূর্তিনির্মাণ শুরু হয়েছিল, তার রূপ ভারহুত এবং সাঁচীতেই দেখা যায়।" (স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং এই কথাগুলি ম্যাক্সমুলারকে বলেছিলেন, একটু আগে তা দেখেছি)।

নিবেদিতা এই সঙ্গে বলেছেন : "ডঃ কুমারস্বামী [অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে মূর্তিনির্মাণ করা হতো, এই কথার] অতিরিক্ত এও বলতে পারতেন—কেবল মানবরূপকে প্রকাশের জন্যও মূর্তিনির্মাণ করা হয়েছে, তা দেখা গেছে কার্লিতে—যা মহান চৈত্যের বহিরবয়বের অঙ্গাঙ্গি

বস্তু।"

নিবেদিতা আরো বলেছেন : "এই সকল যুক্তির উপরে রয়েছে এই চূড়ান্ত তথ্যটি—কুষাণ যুগের বা তথাকথিত গান্ধার যুগের বিদেশীয় প্রভাব বিলুপ্তির পথে যাবার পরেই ভারতীয় শিল্প তার মহান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র অর্জন করে।"

আলোচ্য বিষয়টি যাতে কেবল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে আবদ্ধ না-থেকে সাধারণ শিক্ষিত ভারতবাসীর অনুধাবনের বিষয় হয়ে ওঠে—নিবেদিতা সেজন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। 'সাম্রাজ্যপন্থী ঐতিহাসিকদের' মিথ্যা প্রচারের প্রতিরোধ এবং জাতীয় ইতিহাসের অস্বীকৃত গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্যই তাঁর অতীব উৎকণ্ঠা। "সকল সময়ে সকল বিষয়বস্তু ইউরোপের কাছ থেকে ধার করা হয়েছে [নিবেদিতা বললেন]—ইউরোপের এই পূর্বনির্ধারিত ধারণা ভারতীয় মৌলিকতা ও আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে অবর্ণনীয়ভাবে নৈরাশ্যকর।" তাই তিনি যখন 'মডার্ন রিভিউ'-এর ১৯০৭ অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় হ্যাভেলের গ্রন্থ সমালোচনা করেছিলেন তখন ঐ প্রশ্নটিও তোলেন। তাঁর সেই আলোচনাতে জানান—হ্যাভেল ভারত ও গ্রীক শিল্পের ভাবাদর্শগত পার্থক্যের উল্লেখ করেছিলেন। (সেই বিবেকানন্দ!)। হ্যাভেল বলেছেন :

"গ্রীকরা যেমন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন তৈরি করেনি, তেমনি তারা ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলাও সৃষ্টি করেনি। গ্রীকদের শিল্পাদর্শ ভারতীয় শিল্পাদর্শ থেকে মূলগতভাবে পৃথক। গ্রীকরা কখনই ভারতীয় শিল্পের উপরে তাদের আদর্শকে চাপায় নি। ভারতীয় শিল্প তার মৌল স্বভাবে ভারতীয় চিন্তা এবং ভারতীয় শিল্পপ্রতিভারই সৃষ্টি।"

হ্যাভেলের এইসব কথার উল্লেখ করার পরে নিবেদিতা জানাতে ভোলেন নি, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদানপ্রদান হয়েই থাকে, সুতরাং যেমন "ভারতীয় বিবর্তনে গ্রীক সংস্রব যে একটা শক্তিশালী ব্যাপার হতে পারে তা আমাদের চিন্তাক্ষেত্রের বাইরে থাকেনা," তেমনি উল্টোদিকে [নিবেদিতা হ্যাভেলের কথা উদ্ধৃত করেছেন]—"ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাব কেবল বাইজান্টীয় শিল্পে নয়, মধ্যযুগের গথিক ক্যাথিড্রলের উপর পরিষ্কার দেখা যায়।" এইসঙ্গে ভারহুত ভাস্কর্য প্রভৃতি যে, গ্রীক প্রভাবের চিহ্ন না-নিয়ে উদ্ভূত হয়েছিল, তাও জানাতে নিবেদিতা ভোলেন নি।

॥ ৫ ॥

এসব সত্ত্বেও নিবেদিতা সন্তুষ্ট ছিলেন না। যথেষ্ট এবং অকাট্য যুক্তি যেন পাওয়া যাচ্ছে না—তাঁর মনে হয়েছিল। তিনি নিজে উপযুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্পগত কারণ সন্ধান করতে থাকেন এবং ১৯১০ জানুয়ারিতে অজন্তা, ইলোরা দর্শন করে তেমন কারণ আবিষ্কার করতে পেরে উল্লসিত হন। ৭ এপ্রিল ১৯১০ তারিখে চিঠিতে হ্যাভেলকে লেখেন :

"যেখানে ইলোরার খিলান-পথের মধ্যে অসাধারণ ভাস্কর্যগুলি রয়েছে সেখানে গ্রুণ্ডেল কি করে কঠোর সমালোচনামুখে বললেন যে ('Buddha Art in India' গ্রন্থে, পৃ· ৩০) হিন্দুরা যথার্থ ভাস্কর্য গড়ে তুলতে অসমর্থ ছিল? তাঁর কথার অর্থ কী, বোঝা যাচ্ছে না।"

আলোচ্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয়-কুলে গ্রুণ্ডেলেরই ছিল সবচেয়ে জোরালো মত। নিবেদিতা হ্যাভেলকে উক্ত চিঠিতে লেখেন : "ইচ্ছা হয়, আপনার সঙ্গে বসে গ্রুণ্ডেলের লেখা পড়ি প্রতি পৃষ্ঠা ধরে, প্রতি লাইন ধরে।" এই কথাগুলি দেখিয়ে দেয়, শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে হ্যাভেলের সঙ্গে নিবেদিতার কী-ধরনের ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান ছিল।

মাসখানেকের মধ্যে নিবেদিতা ৫ মে, ১৯১০ তারিখের এক চিঠিতে মিসেস ওলি বুলকে লিখলেন :

"তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়রা মোটেই গ্রীকদের কাছ থেকে মূর্তিনির্মাণ শিক্ষা করেনি। স্পষ্টতই তারা নিজেরাই নিজেদের রীতি উদ্ভাবন করেছিল—বাংলার উত্তর-পশ্চিম কলোনিগুলিতে, বুদ্ধগয়া এবং বারাণসীতে। ভেবে দ্যাখো কি কাণ্ড—আমি তা প্রমাণ করতে—করতে—করতে পারব।

"মিঃ হ্যাভেল অস্পষ্টভাবে কিছু ইঙ্গিত করেছেন। সেখানে আমি একের পর এক নির্দিষ্ট স্পষ্ট তথ্য দিয়ে যাব। গতকাল রচনাটি খোকার [জগদীশচন্দ্র বসু] কাছে পড়েছি, প্রমাণের চিত্রাদিও দেখিয়েছি। সে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেছে।"

এই ব্যক্তিগত চিঠিতে নিবেদিতা খুবই আত্মবিশ্বাসের সুরে কথা বলেছেন। পরের সপ্তাহেই (১২ মে) মিসেস বুলকে পুনশ্চ লিখলেন :

"মডার্ন রিভিউ পড়ো তো? সেখানে আমি ভারতীয় ভাস্কর্যে গ্রীক প্রভাব বিষয়ে নবভাবনামূলক ধারাবাহিক অসাধারণ প্রবন্ধ লিখেছি।"

উক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধের 'অসাধারণত্ব' সম্বন্ধে নিবেদিতার সুতৃপ্ত ঘোষণার মূলে নিজের রচনাগুণে অতিবিশ্বাস নয়—আসল কথাটা এরপরেই তাঁর চিঠিতে পাওয়া গেছে :

"শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের কাছে ইউরোপের ঋণ সম্বন্ধে স্বামীজীর একেবারে বেপরোয়া উক্তিগুলি এখন আমার মনে হচ্ছে যুক্তিযুক্ত।"

নিবেদিতার গবেষণামূলক সেইসব যুক্তিসমৃদ্ধ ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৯০৯-এর জানুয়ারি, জুলাই ও অগস্ট সংখ্যায়— 'The Ancient Abbey of Ajanta' নামে। এর মধ্যে তিনি বিশেষভাবে গ্রীক প্রভাবতত্ত্ব খণ্ডনের চেষ্টা করেন। যেসব লেখকের মতকে তিনি খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর 'Early History of India'-তে "সবচেয়ে গোঁড়ামি এবং পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার বশ্যতা দেখিয়েছেন।" প্রত্নতাত্ত্বিক ভারতবর্ষকে যিনি সর্বাধিক জেনেছেন সেই ফার্গুসনের মনোভাব কিন্তু এক্ষেত্রে নমনীয়। নিবেদিতা বিশেষভাবে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন পূর্বকথিত জার্মান পণ্ডিত গ্রুন্ডেল-এর মতকে, কারণ সেই মতই ছিল সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী।

যে-সকল প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও শিল্পগত যুক্তি নিবেদিতা সুচারুভাবে উপস্থিত করেছিলেন, তাদের এখানে আনা সম্ভব নয়। তাঁর মোট সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় :

ভারতশিল্পের উদ্ভবে গ্রীক প্রভাব নেই। বৌদ্ধপূর্ব যুগ থেকে ভারতে সেকুলার ভাস্কর্য আছে (কার্লি, ভারহুত), যাদের বিদেশীয় বলে কেউ দাবি করেনা।

ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রতীক একই উৎস থেকে উদ্ভূত হতে পারে।

বৌদ্ধশিল্পের উদ্ভব মগধ থেকে। এখান থেকে দর্শন যেমন সর্বত্র ছড়িয়েছে তেমনি ছড়িয়েছে শিল্পও।

ভারতশিল্প তার উদ্ভবকালে নয়, পরবর্তী কালে বিদেশী প্রভাব নিয়েছে—নিজ ভিত্তি ঠিক রেখেই। প্রাচীনতর মৌর্য শিল্পে আন্তর্জাতিক আকার আছে, কিন্তু কোনোভাবেই তাতে মননগত অনুকৃতি নেই। "যে-ভারত পৃথিবীতে বহুসংখ্যক বিরল মূল্যবান সম্পদের স্রষ্টা, সেই ভারত প্রাচীন দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক।" মথুরাশিল্পে গ্রীক প্রভাব

এসেছিল বাণিজ্যপথে ; আলেকজাণ্ডারের দ্বারা শিল্পে গ্রীক প্রভাব ছড়ায় নি।

গান্ধারশিল্পে গ্রীক প্রভাব আছে স্বীকার্য কিন্তু সেই প্রভাবের দ্বারা ঐ শিল্প উদ্ভূত হয়নি। ঠিকভাবে বলতে গেলে, ওখানে পূর্ববিধি বর্তমান-থাকা শিল্পই গ্রীক প্রভাব গ্রহণ করেছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গান্ধারশিল্পের সঙ্গে গ্রীকশিল্পের মূলগত পার্থক্য আছে। গ্রীকশিল্প মানবদেহ নিয়ে প্রধানত ব্যাপৃত, জীবজগৎ বা নিসর্গ জগতের সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ প্রায় নেই। "অলঙ্করণ-শিল্পের ক্ষেত্রে কঠিন শুদ্ধতা ও সংযম গ্রীকশিল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ।" অথচ গ্রীকশিল্পে প্রত্যাখ্যাত বস্তুগুলির প্রভূত প্রাধান্য দেখা যায় গান্ধারশিল্পে।

এই গান্ধারশিল্পও আবার অনেক পরে ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছে। তা প্রথম প্রসারিত হয়—ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূণ আক্রমণকালে, গান্ধারের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যখন প্রাণের দায়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েন। তারপর তা পুনশ্চ ঘটে অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের সময়ে, একই কারণে।

অজন্তাতেও গান্ধার প্রভাব আছে—কিন্তু তা আদিপর্বে নয়।

গান্ধারশিল্প ইউরোপের খ্রীস্টানশিল্পে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। "বাইজানটিয়ামের মধ্য দিয়ে গান্ধারশিল্প যে ইউরোপের খ্রীস্টানশিল্পের উপর প্রভাব ছড়িয়েছিল এই প্রসঙ্গটি, ধরে নেওয়া যায়, বিশেষ রকম প্রতিবাদের বিষয় হবেনা।"

গান্ধারশিল্পের গুণগৌরব সম্বন্ধে নিবেদিতা খুবই সচেতন ছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে একাধিক স্থানে সেকথা বলেছেন :

"গান্ধারশিল্প—ইউরোপের ক্লাসিক শিল্পের মহাকাব্যিক অনুভূতির সঙ্গে প্রাচ্যের অলঙ্কারসম্পদের মিশ্রণের অসামান্য চেষ্টা করেছে।"

"মগধ এমন সব প্রতীক সৃষ্টি করেছিল যাদের মহিমার সম্মুখীন হবার সাধ্য ছিলনা গান্ধারশিল্পের, কিন্তু মিশ্র-জটিল বিন্যাসের ক্ষেত্রে, স্থাপত্যের মাধ্যমে কাহিনী রচনায়, এবং অলঙ্করণের সমন্বয়ী মর্যাদা সৃষ্টিতে, গান্ধারশিল্প ও তার অনুগামী শিল্পাদি যে-মহিমা রেখে গেছে তার ধারে-কাছে অন্য কিছু পূর্বে পৌঁছেছে বলে মনে করা শক্ত—না, সাঁচীতেও তা ঘটেনি।"

গান্ধারশিল্পের মহিমাকথনে নিবেদিতা আরো অগ্রসর। তাঁর রচনার তেমন কিছু উপস্থিত করে প্রসঙ্গ শেষ করব :

"Epos থেকে Pathos-এ, মহাকাব্যিক বীরোচিত মহিমা থেকে মানবিক ভাবাবেগের মধ্যে, গ্রীকশিল্প পতিত হয়েছে বলে অ্যারিস্টটল বিলাপ করেছেন। কিন্তু Pathos-কেও যে বীরমহিমায় ভূষিত করা যায়, তা প্রাচ্যদেশ ভালই জানত। তা করা যায়—আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করে। গান্ধারশিল্পীরা বুদ্ধের মধ্যে সেই আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন। এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই প্রাচ্য সম্মোহনে ধরা পড়েছে। যে-বুদ্ধ দেহধারী মানব, তিনিই আবার মর্ত্যে অবতীর্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—এই চিন্তা তাদের অভিভূত করে ফেলেছিল। ক্লাসিক্যাল ইউরোপের প্রবণতা হলো—প্রতিটি ভাবনা-কল্পনার মানবিক এবং দুর্ধর্ষ শক্তিরূপের অর্হণা—এরই দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গান্ধারশিল্পীরা বুদ্ধ ও তাঁর সঙ্গীদের রূপনির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যেমন স্বয়ং বুদ্ধ, তেমনি তাঁর সুসমাচার প্রকাশের আবশ্যিক অংশ হয়ে দাঁড়ায় গান্ধারশিল্পের পূর্বোক্ত রীতি।"

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১। Fergusson. J, 'History of Architecture,' quoted in Mitra's 'The Antiquities of Orissa', vol I.
২। Fergusson, 'Architecture at Beejapoor.' Quoted in Mitra's 'The Antiquities of Orissa.'
৩। Fergusson, 'Eastern Architecture'. Quoted in Mitra's 'Indo-Aryans'.
৪। Mrs. Manning, 'Ancient and Mediaeval India'. Quoted in Mitra's 'The Antiquities of Orissa'.
৫। রাজেন্দ্রলালের 'Antiquities of Orissa' বইয়ে উদ্ধৃত শেরিং-এর মন্তব্য এই :

"Is it at all likely that the Aryan race existed in India for between one and two thousand years, that they attained to greatness and glory, and wonderful progress in civilization, equalling, if not surpassing, their contemporaries in other parts of Asia, and yet, that, during all this time, they were satisfied with only transitory symbols of greatness, and never conceived the ideal of having behind them durable monuments of their power, which should hand down their names to many generations? They must have heard of the vast structures erected in Egypt and of the splendid palaces, and stairs, and pillers, and other edifices, with which the Assyrian monarchs adorned their cities. They were not lacking in genius, or in the desire for knowledge, on the contrary, their mind investigated the highest subjects, and whatever was of interest to humanity in general they regarded as of importance to themselves."

৬। এসব বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা আছে বর্তমান লেখকের একটি প্রবন্ধে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'সুবর্ণলেখা' স্মারক গ্রন্থে, ১৯৭৪, 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতের শিল্পচিন্তা') এবং 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের একটি অধ্যায়ে ('স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা')।

৭। Rajendralal, 'The Antiquities of Orissa,' vol, II ch. I.

৮। মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর চিঠির অংশ :

"পাশ্চাত্যের অন্য সবকিছুর মধ্যে আমি রোমকে সর্বাধিক উপভোগ করেছি। পাম্পেই দেখার পরে তথাকথিত 'আধুনিক সভ্যতা'র বিষয়ে শ্রদ্ধা একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। বাষ্প ও বিদ্যুৎশক্তির কথা বাদ দিলে বাকি সবকিছুই তাদের ছিল—আর আধুনিকদের চেয়ে অনন্ত গুণ বেশি তাদের শিল্পবোধ এবং তাকে রূপায়িত করার ক্ষমতা।

"মিস লক-কে বলো, আমি যে তাঁকে বলেছিলাম—'মানবমূর্তির ভাস্কর্যসৃষ্টির ক্ষমতা গ্রীকদের তুল্য ভারতীয়দের মধ্যে বিকশিত হয়নি'—আমার সে ধারণা ভ্রান্ত। ফার্গুসন এবং অন্য বিশেষজ্ঞদের যেসব গ্রন্থ এখন পড়ছি তাদের মধ্যে দেখছি, উড়িষ্যায় (যেখানে আমার যাওয়া হয়নি) ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন মানবমূর্তি রয়েছে, সৌন্দর্য ও অবয়বসংস্থানের নৈপুণ্যে সেগুলি যে-কোনো গ্রীকমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। মৃত্যুর একটি বিশাল মূর্তি সেখানে আছে—লোলচর্ম প্রকাণ্ড নারী-কঙ্কাল—যার অবয়বের নিদারুণ বাস্তবতা ভীতিপ্রদ এবং অস্বস্তিকর। উক্ত গ্রন্থকার বলেছেন, কুলুঙ্গির একটি নারীমূর্তি তো একেবারে ভেনাস ডি মেডিচির তুল্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্যই মনে রেখ, মূর্তিদ্বেষী মুসলমানেরা প্রায় সবকিছু ধ্বংস করে ফেলেছে। তবু যা আছে তা সমগ্র ইউরোপের ভগ্নাবশেষ জুড়লে যা হয় তারও চেয়ে বেশি। আমি আট বছর ভারতে ঘুরেছি, তবু অনেক সেরা শিল্পসৃষ্টি দেখা হয়নি।

"মিস লক-কে বলো, ভারতের অরণ্যমধ্যে একটি বিধ্বস্ত মন্দির আছে, ফার্গুসন সেটিকে এবং গ্রীসের পার্থেননকে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে স্থাপত্যশিল্পের চরম শিখর মনে করেন—একটিতে ভাব-কল্পনার চরম প্রকাশ, অন্যটিতে কল্পনা এবং তার সঙ্গে জড়িত খুঁটিনাটি রূপের অভিব্যক্তি। [মন্তব্যের শেষোক্ত অংশ কি কোনারক সম্বন্ধে ?] পরবর্তী মুঘল সৌধাবলী ইত্যাদি ভারত-সারাসেন স্থাপত্য নিদর্শনগুলি প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কোনভাবে তুলনাতে দাঁড়াতে পারেনা।"

(The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII,pp.395-96)

৯। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'Ancient India B.C. 2000 to A.D. ৪০০' বইয়ে লিখেছেন :

"Architecture and painting are almost forgotten arts in India. The Hindus, even in their best days, could never equal the Greeks in these arts...Displaying much ingenuity and industry and even elegance and beauty, Hindu art lacks the higher aesthetic quality of the Greek Art, and an Phidias or a Praxiteles was impossible among the low castes of India who were alone allowed to engage in architecture and sculpture." (Quoted in Madras Mail, 7 Oct., 1893)

প্রবাসী পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩০৮ সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের শিল্প'-এর মধ্যে একই ধরনের কথা লেখা হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

রবিবর্মা থেকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল : ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

(বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমারস্বামী, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)

॥ ১ ॥

দেশীয় রীতির পক্ষে হ্যাভেল যখন ১৮৯৭ সালে কলকাতার আর্ট স্কুলে সংস্কারচেষ্টায় ব্রতী হন, তার বেশ কিছু বছর আগে এদেশে একজন উল্লেখযোগ্য তৈলচিত্রশিল্পীর অভ্যুদয় হয় যিনি দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সঙ্গে বিপুল জনপ্রিয়তাও অর্জন করেন, এমন-কি তাঁর সৃষ্টিকর্ম জাতীয়তার পরিপোষক বলেও ঘোষিত হয়েছিল—সেই শিল্পী হলেন রাজা রবিবর্মা। ১৮৪৮ সালে ত্রিবাঙ্কুরের অভিজাত বংশে এঁর জন্ম। বাল্যে সংস্কৃত শিক্ষা করেছেন ; রামায়ণ মহাভারতের ভাবে নিমগ্ন থাকতেন ; দেবদেবীর ছবি আঁকতেন। গোড়ায় জলরঙে ছবি আঁকতে শেখেন ; পরে ১৮৬৮ সালে ইংরাজ শিল্পী থিওডোর জানসেন-এর কাছে শেখেন অয়েল পেন্টিং পদ্ধতি। এই রীতিতেই তাঁর সাফল্যের সূচনা হয়। ১৮৭৩ সালে মাদ্রাজে শিল্প-প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি সুবর্ণপদক পায়, তাতেই প্রথম খ্যাতিলাভ। ১৮৭৬ সালে "শকুন্তলার পত্রলিখন" আঁকার পরে তাঁকে নিয়ে মাদ্রাজে উৎসাহের অবধি থাকেনা, কারণ "তৎকাল পর্যন্ত কোনো ভারতবর্ষীয় শিল্পী প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত নায়ক-নায়িকা বা ঘটনাবলীর তৈলচিত্র প্রস্তুত করেন নাই।" এর পরে তিনি আঁকতে থাকেন—হয় রাজা মহারাজা বা ইংরাজ রাজকর্মচারীদের প্রতিকৃতি, না-হয় দেশীয় পুরাণ-কাব্যের ছবি। এ সকলের জন্য প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ পান। ১৮৮৮ সালে বরোদার মহারাজা বরোদা-প্রাসাদের জন্য তাঁকে রামায়ণ মহাভারতের নির্বাচিত দৃশ্যের চিত্রাঙ্কনের ফরমাশ দেন। এর জন্য রবিবর্মা উত্তরভারত ভ্রমণ করেন যাতে প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্যাদি

থেকে সে যুগের হিন্দু রাজাদের পোশাক পরিচ্ছদের রূপ বুঝতে পারেন। কিন্তু গভীর নৈরাশ্যে দেখেন, "বহুশতাব্দীব্যাপী মুসলমান প্রাধান্যকালে তাঁর উদ্দেশ্য-সম্পৃক্ত খাঁটি হিন্দু যাহা কিছু ছিল সমুদয়ই উত্তর ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।" বরোদার জন্য তিনি দুই বৎসরে ১৪ খানি ছবি আঁকেন এবং ১৮৯০ সালের শেষদিকে তা বরোদায় প্রদর্শিত হয়। এর বিষয়ে সমকালীন প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সে-সময়ে রবিবর্মার অত্যন্ত অনুরাগী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীর অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩০৮ সংখ্যায় "রাজা রবিবর্মা" প্রবন্ধে লেখেন : "[প্রদর্শনী] দেখিবার জন্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সকল দিক হইতে দলে দলে লোকসমাগম হয়। কিছুদিন বরোদায় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ, ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যদ্বয় হইতে বিষয় নির্বাচন করিয়া এই সর্বপ্রথম কেম্বিসের উপর এরূপ জীবিতবৎ ও হৃদয়স্পর্শী তৈলচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এইসকল চিত্রের হাজার হাজার ফটোগ্রাফ বিক্রীত হইয়াছিল।" ভারতীয় শিল্পজগতে রবিবর্মার বিশেষ দান সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে বলা হয় : "তিনি তাঁর স্বজাতীয় লোকদিগের মনে শিল্পানুরাগ জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ...আজ হিমাচল হইতে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সর্বত্র গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্রকলা সাদরে গৃহীত হইতেছে এবং ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোকের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিতেছে।" রবিবর্মার ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রসঙ্গে রামানন্দের বক্তব্য : ভারতবর্ষে অনেক মহাকবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, স্থপতি ও সঙ্গীতবিশারদ জন্মালেও উপযুক্ত চিত্রকর জন্মান নি, সেই অভাব বহুলাংশে দূর করেছেন রবিবর্মা একক প্রতিভায়। "বস্তুত অধুনাতন যুগে চিত্রবিদ্যারূপ মহতী কলার এরূপ অবনতি ও দুর্গতি হইয়াছিল যে, ইহার পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত মন্থরভাবে সম্পাদিত হইত, যদি রবিবর্মা স্বকীয় প্রতিভাবলে ইহাকে সাধারণের সমক্ষে গৌরবান্বিত করিয়া না তুলিতেন। ভারতীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাস যদি কখনো লিখিত হয় তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আধুনিক যুগে ইহার জন্মদাতা বলিয়া পূজিত হইবেন।"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কায়স্থ সমাচার পত্রিকার এক প্রবন্ধে ("Ravi Varma the Indian Artist", **Kayastha Samachar,** December 1902) রবিবর্মা কিভাবে এই বহুভাষার দেশে চিত্রশিল্পের সর্বজনীন ভাষাকে ধর্মীয় ও পৌরাণিক চিত্রাবলীর অঙ্কনে ব্যবহার করে, নিজ প্রতিভায় তাকে সর্বত্রগ্রাহ্য করেছেন, এবং তার দ্বারা অসচেতনভাবে জাতিগঠনে সাহায্য করেছেন, তা বিশদ বলেন। ১৯০৭ সালে মডার্ন রিভিউ-এ জানুয়ারি থেকে জুন সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রবন্ধে একই কথা বলেন। রবিবর্মা যে, তাঁর চিত্রে বাস্তবতার সঞ্চার করে ভারতীয় পুরাতন শৈলীর ছবির অবাস্তবতার ত্রুটি দূর করেছিলেন, তাও তাঁর লেখাতে পাই।[১]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনার অনেক আগে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধনা' পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০ সংখ্যায় 'রবিবর্মা' প্রবন্ধে উক্ত শিল্পীর উপরে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এটিই বোধহয় বাংলায় রবিবর্মার উপর প্রথম আলোচনা।[২] বলেন্দ্রনাথ কলকাতার আর্ট স্টুডিওর পৌরাণিক চিত্রের কঠোর সমালোচনা করে, তার পাশে রবিবর্মার ছবির গুণগৌরব খ্যাপন করেন। রাস্কিন পদ্ধতিতে রবিবর্মার বিভিন্ন চিত্রের রসায়িত বর্ণনা করার পরে বলেন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "পৌরাণিক চিত্র এমন সুন্দরভাবে এদেশে ইতিপূর্বে কখনও অঙ্কিত হয় নাই। এবং খুঁটিনাটি ত্রুটি থাকিলেও রবিবর্মাই এদেশের প্রথম প্রতিভাশালী চিত্রকর।" এইসঙ্গে তিনি যথেষ্ট অবজ্ঞার সঙ্গে বলেছিলেন, কালীঘাটের পট দেখে যাদের রুচি গঠিত তারা রবিবর্মার ছবির রসগ্রহণ করতে পারবে না।

বলেন্দ্রনাথ স্বল্পায়ু, কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রদীপ পত্রিকায় আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬ সংখ্যায় রবিবর্মা সম্পর্কে তাঁর একটি রচনা বেরিয়েছিল যার প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ জানান, এই লেখাটি বলেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই লিখেছিলেন। রচনাটির সূচনায় বলেন্দ্রনাথ বলেন :

"পাঁচ বৎসর পূর্বে সাধনার পৃষ্ঠায় রবিবর্মার সহিত আমাদের যখন প্রথম পরিচয় সাধিত হয়, তখন কলিকাতার বাজারে তাঁহার চিত্রাবলীর আমদানী হয় নাই; এবং বোম্বাইপ্রবাসী-ভিন্ন সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট তাঁহার নাম পর্যন্তও অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং সে সময় নামতঃ তাঁহার গুণ গ্রহণ করিবার অবসর আমাদের সর্বসাধারণের ভাগ্যে জুটে নাই, এবং সাধনা-র সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদের কল্পনা বোধ করি তদানীন্তন আর্ট স্টুডিওকে লঙ্ঘন করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইবার অবসর পায় নাই।"

অল্প ব্যবধানে রবিবর্মার ছবি দেশে কোন্ দৃষ্টিবিপ্লব ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য :

"এক্ষণে এই কয় বৎসরের মধ্যে রবিবর্মার চিত্রাবলীতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। এমন-কি সুদূর পল্লীগ্রামের মেটে ঘরের দেওয়ালেও দাক্ষিণাত্যের রূপসীগণ এলোচুলে কুঞ্চিতকুন্তলে স্মিতহাস্যে মালানিবদ্ধ কবরীবেষ্টনে গোলাপী ও বাসন্তী রঙের শাটিকা ও বিচিত্ররঞ্জিত চোলিকায় মনোহারিণী মূর্তিতে শোভা পাইয়া থাকেন।"

"টেকনিকের ওস্তাদী" যদিও তাঁর মতো "অনিপুণ দর্শকের চোখে সহসা ধরাও দেয়না", তথাপি "স্বল্পজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিপথেও নিপতিত হয়" এমন কিছু ত্রুটি রবিবর্মার ছবিতে আছে—বলেন্দ্রনাথ বলেছিলেন। কিন্তু ঠিক কোন ত্রুটি তার উল্লেখ করেন নি। পৌরাণিক চিত্রাঙ্কনের জন্য খ্যাতিসম্পন্ন রবিবর্মার পৌরাণিক ছবিতে কালানৌচিত্য দোষের দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন : "রবিবর্মার চিত্রগুলি যে, সকল স্থলেই যথার্থ পৌরাণিক তাহা বলা যায়না—বরং আধুনিকেরই সেখানে কিছু প্রভাব দৃষ্ট হয়। বিরহিণী যেখানে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া একান্তমনে ধ্যান করিতেছেন, সেখানে তাঁহার পার্শ্বের আলিসাটি হয়ত নিতান্তই আধুনিক স্থাপত্যানুযায়ী কলসসজ্জিত।" তথাপি দাক্ষিণাত্যের রূপসীদের আদলে যেসব সুন্দরী নারীকে রবিবর্মা পৌরাণিকী করেছেন, তাদের সৌন্দর্যে মোহিত বলেন্দ্রনাথ বিশেষণ ও অলঙ্কারের রাশি তাঁর আলোচনায় ঢেলে দিয়েছেন। শেষ করেছেন এই বলে : "রবিবর্মার রূপসীগণের মুখে নির্বাপিত অতীতের অতীন্দ্রিয় রূপলাবণ্যের একটি করুণ মোহাবেশ যেন একান্ত সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে সেকাল একালের মধ্যে কোনোরূপ ব্যবধান চক্ষে পড়েনা। অথবা কর্মক্লিষ্ট একালের মাঝে সেকালের শান্তিটুকুই সমধিক উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়।"[৩]

॥২॥

পরিস্থিতি যখন এই, বাংলার চেয়ে অনেক বেশিগুণে দক্ষিণভারত ও পশ্চিমভারত যখন রবিবর্মার ধন্যধ্বনিতে মাতোয়ারা, ঠিক তখনি স্বামী বিবেকানন্দ রবিবর্মা সম্বন্ধে এক বিধ্বংসী মন্তব্য করেন, যার প্রতিধ্বনি অতঃপর শোনা যাবে নিবেদিতা-হ্যাভেল-কুমারস্বামী-অরবিন্দ প্রমুখের রচনায়। এখানেও বিবেকানন্দের অগ্রগামী চিন্তা।

স্বামীজী রবিবর্মার মূল ছবির সঙ্গে পরিচিত। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি একাধিক দেশীয় রাজ দরবারে অবশ্যই রবিবর্মার ছবি দেখেছেন। বরোদায় যে দেখেছেন তা নিজেই বরোদা

থেকে লিখেছিলেন জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসকে, ২৬ এপ্রিল ১৮৯২ তারিখের চিঠিতে :

"হ্যাঁ, এখানে অবশ্যই আমি লাইব্রেরি এবং রবিবর্মার চিত্র দেখেছি। এখানে এইগুলিই মোটমাট দেখার জিনিস।"

স্বামীজী, লাইব্রেরির সঙ্গে রবিবর্মার ছবিকেও 'দেখার জিনিস' বলেছেন। তার মানে নয় তিনি ওইসব ছবির গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। আমরা সেখি, এইকালে, যখন তিনি অপরিচিত এক তরুণ সন্ন্যাসী ছাড়া কিছু নন, তখনই পুনায় এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে থাকা কালে রবিবর্মার সমালোচনা করার মতো 'ঔদ্ধত্য' দেখিয়ে সকলকে চমকিত করেন।[৪]

পরবর্তীকালে স্বামীজী তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে রবিবর্মা সম্বন্ধে সেকালের পক্ষে নিম্নের দুঃসাহসিক কথাগুলি বলেছিলেন :

"বড় জোর ওদের [ইউরোপীয়দের] নকল করে এক-আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায় !! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভালো—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় !! বরং জয়পুরের সোনালি চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভালো।"[৫]

নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক উক্তি। তৎকালীন এদেশীয় শিল্পধারণার একেবারে বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বামীজী কথাগুলি বলেছিলেন। তাঁর কাছে পট-চিত্র ও রাজপুত-চিত্র এবং তাদের বর্ণরাগ, রবিবর্মার নকলনবিশির চেয়ে অনেক ভালো। আর যেখানে রবিবর্মার ছবি তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য, সেখানে তিনি যে তখনকার আর্ট স্কুলগুলির স্থূল ছবিতে ভাববিকাশের অভাব দেখে সমালোচনা করবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।[৬]

॥৩॥

স্বামীজীর ধারণাকে অঙ্গীকার করে নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই নতুন ধারার প্রবর্তক-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের রবিবর্মা সম্বন্ধে ধারণার কথা এখানে উত্থাপন করা যায়।

ঠাকুর পরিবারে রবিবর্মা সম্বন্ধে অনুরাগের মনোভাব ছিল। অন্যতম অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে রবিবর্মার ছবির প্রতিলিপি উপহার দেন, কারণ "তখন রবিবর্মার ছবিই ছিল কিনা ভারতীয় চিত্রের আদর্শ।" বলেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত রবিবর্মা-স্তুতির কথা উপরে বলেছি। রবিবর্মা ঠাকুরবাড়িতে এসেছেন, অবনীন্দ্রনাথের কিছু স্কেচ দেখেছেন, সে-সকল দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করলেও পরে অবনীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছেন, এসব কথা অবনীন্দ্রনাথ রবিবর্মার মৃত্যুর পরে প্রবাসীর পৌষ ১৩১১ সংখ্যায় "স্বর্গীয় রবিবর্মা" প্রবন্ধে বলেছেন। রবিবর্মার মৃত্যুর পরে লেখা শ্রদ্ধা-নিবন্ধ বলে অবনীন্দ্রনাথ ওখানে সৌজন্যসম্মত কিছু প্রশংসা করলেও, ওঁর সঙ্গে নিজের ভাবাদর্শগত পার্থক্যের কথা কিছু কম বলেন নি, বরং বলা যায়, পার্থক্যের কথাটাই প্রাধান্য পেয়েছিল। তথ্য হিসাবে রবিবর্মার বিপুল খ্যাতির কথা বলেছেন : "আজীবন তিনি শিল্পচর্চায় নিযুক্ত থাকিয়া দেশ-বিদেশে যশস্বী হইয়াছেন ; বিজয়লক্ষ্মী কখনো তাঁহার প্রতি বিমুখ হন নাই।" তাঁর আসল প্রশংসা ছিল কেবল রবিবর্মার চিত্রের বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে। তার রূপ এই :

"আমাদের পুরাণ ইতিহাস হইতে রবিবর্মা যত চিত্র লিখিয়াছেন, এত আর কোনো এদেশীয় চিত্রকর লিখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। দেশীয় সাহিত্যে বিলক্ষণ দখল এবং একটু

বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে এটুকু হয়না। রবিবর্মা যে একজন পাকা রসজ্ঞের মতো আমাদের কাব্যভাণ্ডারের যা-কিছু উত্তম বাছিয়া লইয়াছিলেন, একথা কেহই অস্বীকার করিবে না, এবং একথাও ঠিক যে, আজ রবিবর্মার সুনাম যেজন্য, দু' দশটা স্বর্ণপদক তার কারণ নয়, কিন্তু একমাত্র স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্মে আস্থাই তাহার কারণ হইতে পারে। চিত্রকরের স্বাদেশিকতা ও স্বধর্মে আস্থার অর্থ দেশীয় কাব্য সাহিত্য চর্চা করা, দেশীয় ভাবরসে মগ্ন থাকা, ও দেশীয় প্রণালীমতে পূর্বতন শিল্পাচার্যগণের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া দেশের শিল্পটাকে উন্নত করিতে চেষ্টা পাওয়া। রবিবর্মার চিত্রগুলিতে আমরা এই জাতীয়তার আভাস পাই এবং সেজন্য সেগুলি আমাদের কাছে এত আদরের সামগ্রী। নচেৎ বিলাতী প্রণালীমতো Shade, Light, Perspective, Grouping of figures, Human anatomy প্রভৃতি [...] কতকগুলি তৈলচিত্র লিখিয়া গেলে রবিবর্মা হুবহু কোনো ইংরাজীবাগীশ কিংবা বিলাতী গোরার মতো ক্রিকেটবাজের অপেক্ষা আমাদের কাছে যে অধিক সমাদর লাভ করিবেন, এরূপ তো বোধ হয়না।"

এদেশের অধিকাংশ মানুষের রবিবর্মা সম্বন্ধে খাতিরের বিশেষ যে-কারণ, তাকে নস্যাৎ করে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"রাজপুত্র কিংবা লাটসাহেবের চোখে কোনো ছবি সুন্দর ঠেকিলে চিত্রকরের ধনলাভের সম্ভাবনা, কিন্তু চিত্রখানির গৌরব যে কিছুমাত্র বাড়ে, এরূপ তো মনে হয়না।...ব্যক্তিগত ওইসব সৌভাগ্যসম্পদ যদি আমরা রবিবর্মার সারাজীবনের ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করি, তবে আমরা তাঁর জীবনের কিছুই জানিলাম না।"

তা হলে অবনীন্দ্রনাথের মতে রবিবর্মার মধ্যে পাবার রইল কী—ওই চিত্র-বিষয়ের 'জাতীয়তা' ছাড়া ? এবং রবিবর্মার জাতীয়তা যে, জাতীয় শিল্পসংস্কৃতির প্রাণধর্ম বুঝতে অপারগ ছিল, তা প্রায় অকরুণ ভাষায় তো অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন ! পাশ্চাত্য-অনুকারী অন্ধ নব্যতার বিষয়ে তাঁর এই ধিক্কার :

"নব্যতার এমনই মোহ যে, জগৎসুদ্ধ ভারতশিল্পের সৌন্দর্যে মুগ্ধ, কেবল আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে, ভারতের চিত্রকলা—যে perspective-এর কোনো ধার ধারেনা, shade, light-এর দিক দিয়াও যায়না—সে কেমন করিয়া চিত্র-নামের যোগ্য হয় ! রবিবর্মা যে এই নব্যতার হাত এড়াইয়াছিলেন, একথা বলা যায়না, বরং ইউরোপীয় চিত্রশিল্পের দিকে তাঁর একটু বিশেষ ঝোঁকই দেখা যায়।"

ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভারতীয় বিষয়ে ছবি আঁকবার সময়ে রবিবর্মা "আমাদের প্রাচীন সাজসজ্জা অলঙ্কারাদি দেখিবার জন্য ভারতের দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন"—এইটুকুর পরেই কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যা বললেন তাতে দেখা গেল, ভারতের প্রবহমান চিত্রধারার সঙ্গে ওঁর কোনোই মানসিক বা প্রকরণগত যোগ নেই। ভারত-চিত্রশিল্পের আসল নিদর্শন আছে, অবনীন্দ্রনাথের মতে, অজন্তায়। তার ধারা বহমান—জয়পুর ও কাশীর ভিত্তিচিত্রে এবং মসৃণ কাগজের ছবিতে, ওড়িশার জগন্নাথ-পটে, মাদ্রাজের ত্রিপতি-মেলায় আগত চিত্রপটে, বোম্বাইয়ে দশ অবতার খেলার তাসে, নেপালে চর্মফলকে লেখা বোধিসত্ত্ব-মূর্তিতে, বাংলায় কাপড়ে ও পুঁথি-পাটার ছবিতে। এই ধারা বহির্দেশে ছড়িয়েছে—পারস্য, কাবুল, তিব্বত, চীন, জাপানে। "রবিবর্মার শিল্প এই প্রধান ভারতশিল্প হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব সেটাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে আদর্শ শিল্প এবং আদর্শ শিল্পী কাহাকে বলে জানা থাকা আবশ্যক।"

আদর্শ শিল্পীর লক্ষণ, অবনীন্দ্রনাথের মতে :

"শিল্পীর পক্ষে হস্তের নিপুণতা যেমন, মনের ভাবগ্রাহিতা এবং মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তিও তেমনি আবশ্যক। ...হস্তের নিপুণতা মানুষের আয়ত্তাধীন, কিন্তু ভাবের স্ফূর্তি এবং জ্ঞানের উন্মেষ সুকৃতিবলে কদাচিৎ কোনো মানুষ লাভ করে।"

হস্তনিপুণতায় সম্পন্ন রবিবর্মা যে, ভাব ও জ্ঞানস্ফূর্তিতে সম্পন্ন কদাচিৎ-সম্ভব শিল্পী নন, তা অবনীন্দ্রনাথ যথেষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন :

"এটুকু অসংকোচে বলা চলে যে, রবিবর্মার প্রদর্শিত নূতন পথটা অনুসরণ এবং তাঁহার শিল্পটাকে আদর্শ করিয়া গ্রহণ করিবার পূর্বে আমরা একবার ভাবিয়া দেখিব আমাদের কী ছিল, এবং যাহা ছিল সেইটাকেই নবজীবন দান করা কিংবা সেটাকে উপেক্ষা করিয়া কিছু নূতন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। ...রবিবর্মার শিল্প জগতের চক্ষু আকর্ষণ করিয়াছে। অতএব আদর্শ শিল্পীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া এই শিল্পের গুণাগুণ বিচার করিলে তবে আমরা রবিবর্মার মহত্ত্ব এবং তাঁর শিল্পেরও যথার্থ সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। তাহা না করিয়া, স্বজাতিপ্রেমের দোহাই দিয়া, তাঁহাকে রাজমুকুটে ভূষিত করিয়া বসিলে আমরা আমাদের কর্তব্য হইতে বিচলিত হইব এবং সেই পরলোকগত রবিবর্মাকে যে বিশেষভাবে উপেক্ষা করিব, একথা বলাই বাহুল্য।"

অবনীন্দ্রনাথ যে স্বয়ং সেই উচিত কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে চাননি তা তাঁর চিত্র ও চিন্তাতে যথেষ্ট প্রমাণিত।

॥ ৪ ॥

হ্যাভেল, আমরা যতদূর দেখেছি, রবিবর্মার ছবির সমালোচনা করা অপেক্ষা তাদের উপেক্ষা করতেই চেয়েছেন। তাঁর গোটা দৃষ্টিভঙ্গিই রবিবর্মার দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী, তাই নাম করে সমালোচনার বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চাননি। শিল্পশিক্ষার সাংগঠনিক স্তরে তিনি মৌলিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন এবং কিছু সময়ের জন্য তাতে সফল হয়েছেন, যে ইতিহাস আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। ব্রিটিশ জাতি ভারত অধিকারের পরে শান্তি শৃঙ্খলা এনেছিল, এ কথায় সহজ বিশ্বাস তিনি ঘোষণা করেছেন, কিন্তু উক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার বিনিময়ে ভারতবাসী কল্পনার বাষ্পবিহীন অ্যাংলো-স্যাক্সন শিল্পরীতিকে পথ করে দিয়েছিল, বিষাদের সঙ্গে তাও লক্ষ্য করেছেন।[৭] ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার দুই স্থপতির একজন উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক-এর শিল্পবোধ এমন স্তরের ছিল যে, তিনি তাজমহল বেচে দিতে চেয়েছিলেন, কারণ ওই বাড়িটিতে অনেক মর্মর পাথর আছে, বেচলে বহুত টাকা কামানো যাবে। তবে এই মহান সংকল্প তিনি শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত করতে পারেন নি, যেহেতু নমুনা-নীলামে ভালো দর ওঠেনি। আর দ্বিতীয় স্থপতি মেকলের সংস্কৃতিবোধ এমন স্তরের ছিল যে, নিজের অল্প জ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ভারতীয় ও আরবী সাহিত্যের সমগ্র সম্পদ কোনো উত্তম ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের আলমারির একটি তাক ভরাতেও সমর্থ নয়। হ্যাভেল এইসব অরুচিকর সংবাদ তাঁর বইয়ে উপস্থিত করেছিলেন—ওইসব শিক্ষাভিমানীদের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষায় ভারতীয় শিল্পরুচির অবনতি দেখাবার জন্য।[৮] এই প্রকার শিক্ষায় 'রিয়ালিটি' সম্বন্ধে উদ্ভূত ধারণার প্রকৃতি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন, এবং নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অষ্টাদশ শতকের এক জাপানী লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত জাপানী লেখক বলেছেন : "বিদেশী ছবির দোষ হলো তা অতিমাত্রায় বাস্তবতায় ডুবে থাকে, তা এমনসব খুঁটিনাটি জিনিস হাজির করে

যেগুলি চাপা থাকলেই ভালো হতো। ...এই ধরনের শিল্প যেন নিছক শব্দগুচ্ছ ; অপরপক্ষে জাপানী ছবির হওয়া উচিত রূপ ও রঙের কবিতা।" হ্যাভেল এরই ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন, প্রকৃতি এবং বাস্তবতা বিষয়ে ভিন্ন ধরনের বোধই প্রাচ্যশিল্পের সঙ্গে রীতিবদ্ধ পাশ্চাত্য শিল্পের পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। ইউরোপীয়গণ এবং তাঁদের অনুগামী ভারতীয়গণ, প্রাচ্যশিল্পের আঙ্গিকের ত্রুটি ও তার মধ্যে চিন্তাশক্তির অভাব সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন, কিন্তু তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, ভিন্নপ্রকার মননগত পরিবেশ এবং পৃথক শিল্প-মেজাজের জন্যই ও-বস্তু ঘটেছে। রিয়ালিটি সম্বন্ধে উভয় জগতের ধারণাই যে পৃথক।[৯]

সুতরাং হ্যাভেল রবিবর্মার ছবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজনই মনে করেন নি। নিবেদিতা কিন্তু যা বলেছেন তার পরিমাণ অল্প হলেও ধারালো। **The Function of Art in Shaping Nationality** প্রবন্ধে রবিবর্মার নাম না করে, এমন কি তাঁর ছবির নাম না করেও, তিনি বহু প্রশংসিত 'শকুন্তলার পত্রলিখন' সম্বন্ধে বলেছিলেন : "সব দৃশ্যই যে, চিত্রের উপযুক্ত নয় এটা এখনকার ভারতবাসীর বিশেষ বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত, যেহেতু ফ্যাশানের প্রকোপে পড়ে রুচির বিপর্যয় ঘটেছে। যেদেশে মেয়েদের একটি বিশেষ ভঙ্গি অশালীন বিবেচিত, সেখানে এখন প্রায় ঘরে ঘরে একটি ছাপা ছবি দেখা যায় যাতে এক স্থূলাঙ্গী তরুণী নারী মেঝেয় সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পদ্মপাতায় চিঠি লিখছেন। তাহলে কি বাস্তবে যে-দৃশ্য রুচিকে পীড়ন করবে, তা সুন্দর হয়ে ওঠে কল্পনার ঠাঁই পেলে ?" হ্যাভেলের **Indian Sculpture and Painting** গ্রন্থের আলোচনাসূত্রেও নিবেদিতা রবিবর্মার কল্পনাহীন অনুকরণপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন।[১০] তাঁর কালের প্রচলিত ইউরোপীয় শিল্পপ্রত্যয় হলো—"বাস্তবের অনুকরণই সকল প্রকার ললিতকলার যথার্থ লক্ষ্য এবং শেষ লক্ষ্য"—তারই অনুসরণকারী রবিবর্মার দৃষ্টিভঙ্গির অসারত্ব দেখিয়েছেন হ্যাভেল—নিবেদিতা বলতে চেয়েছেন। অনুভূতিহীন আঙ্গিকজ্ঞান শিল্পীকে কোন্ অপসৃষ্টিতে নিয়ে যায় সে সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য দ্বিধাহীন :

"বিশ্বাস করুন [শিল্পী যদি হৃদয়-মাধ্যমে দর্শন না করেন] এবং তদনুযায়ী তাঁর সৃষ্টিতে কোনো তাৎপর্য বা আবেদন না থাকে, তা হলে ইংরাজি বিদ্যালয়ে শেখা আঙ্গিক-নৈপুণ্যের সম্বন্ধে যেসব উচ্চ ভাষা শোনা যায়, তা পৌঁছে দেয় মাংসহীন কঙ্কালে—যা অর্থহীনের চেয়ে অর্থহীন।[১১]

অনুভূতির ভাষায় যিনি শিল্পে কথা বলেছেন সেই অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে "মহান শিল্পীগোষ্ঠীর" অভ্যুদয় নিবেদিতা দেখেছিলেন—তাই রবিবর্মাকে সরিয়ে আবাহন করেছেন অবনীন্দ্রনাথকেই। তিনি রামানন্দকে প্রভাবিত করেছিলেন রবিবর্মাকে পরিহার করার জন্য, তা আগেই দেখেছি। কুমারস্বামী যখন তাঁর প্রবন্ধে রবিবর্মাকে নস্যাৎ করে অবনীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন বলা বাহুল্য, তিনি নিবেদিতার সাধুবাদ পেয়েছে। নিবেদিতা কুমারস্বামী রচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"ওঁর প্রবন্ধগুলি--বিশেষত রবিবর্মার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের তুলনায় অধ্যায়টি মহামূল্যবান।"[১২]

একথা স্বীকার্য, রবিবর্মা সম্বন্ধে কুমারস্বামীর আক্রমণ অনেক বেশি বিস্তারিত ও কঠিন। সেজন্য রবিবর্মার অনুরাগীদের কাছে তিনি বিশেষ রকম সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন।

সে তথ্য জানাবার আগে কুমারস্বামী আলোচ্য পর্বে রবিবর্মার কী-ধরনের সমালোচনা,

এবং নব্যবঙ্গীয় চিত্রকরদের কী-ধরনের প্রশংসা করেছেন, তা দেখে নেওয়া যায়। 'বেঙ্গল স্কুল' সম্বন্ধে পরবর্তীকালে তাঁর মনোভাব বদলে গিয়েছিল, তা বেঙ্গল স্কুলের নিন্দার আনন্দ যিনি ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন সেই মুলুকরাজ আনন্দ জানাতে ব্যস্ত হয়েছেন।[১৩] পাশ্চাত্ত্য শিল্পের অনুরাগী গ্রন্থকার অশোক মিত্র যে, রবিবর্মা-বিরোধী সমালোচনায় যথেষ্ট অসন্তোষবোধ করেছেন, তাও আমরা জানি।[১৪] ইদানীংকালে অনুরূপ ধারণার বহুতর প্রকাশ সম্বন্ধেও আমরা অবহিত, এবং একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, কুমারস্বামী মনে করেছিলেন—এই আন্দোলন তার সম্ভাবনার অনুরূপ ফলদান করতে পারেনি। কিন্তু আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করছি তখন কুমারস্বামী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অবনীন্দ্রনাথকে সমকালীন ভারতবর্ষের সেরা শিল্পী বলেছিলেন—তা করেছিলেন রবিবর্মার সঙ্গে তুলনা করেই। যদি 'বেঙ্গল স্কুলের' পরবর্তী বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর কিছু আশাভঙ্গ হয়ে থাকেও, রবিবর্মা সম্বন্ধে ধারণা বদলের কারণ ঘটেনি বলেই জানি।

মডার্ন রিভিউ পত্রিকার অগস্ট ১৯০৭ সংখ্যায় **The Present State of Indian Art** নামক প্রবন্ধে কুমারস্বামী নব শিল্প-আন্দোলনের পক্ষে এবং রবিবর্মা-ধারার বিপক্ষে জোরালো ভাষায় নিজের মত জানিয়েছিলেন। রবিবর্মা-ধারার অসারত্ব সম্বন্ধে সম্ভবত সেই প্রথম ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ। আর্ট স্কুলগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে কুমারস্বামী বলেছিলেন :

"বর্তমানের দিকে চোখ ফেরালে সহসা আমরা আর্ট স্কুল স্টাইলের মুখোমুখি হয়ে পড়ি। এইসব স্কুলের ছাত্ররা অনেক তেলরঙ আর জলরঙের ছবি করেছেন, তার কতক বেশ চাতুর্যযুক্ত, কিন্তু সেসব একই পর্যায়ের নিতান্ত সাধারণ স্তরের ইউরোপীয় ছবির সঙ্গে পার্থক্যহীন—পার্থক্য যদি কোথাও থাকে তবে তা আছে এইসব ছবির রেখার দুর্বলতায়। এখনকার ভারতীয় শিল্পের সামগ্রিক অধঃপতনের জন্য এইসব আর্ট স্কুলগুলি দায়ী কিনা, সে-কথা ওঠেই। তবে ওই দুর্গতির অবস্থা কিছুটা অতীতের। বর্তমানে লাহোর ও কলকাতার আর্ট স্কুলের প্রভাব ভালোই, কারণ সেখানকার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন। কলকাতায় অন্তত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। লাহোর ও কলকাতা উভয় স্কুলেই ভারতীয় আদর্শ ও রীতি ন্যায্য স্থান পেয়েছে।

"বোম্বাইয়ে কিন্তু উল্টো ব্যাপার। বোম্বাই স্কুল যেন লন্ডন শহরতলীর কোনো একটি ড্রইং স্কুলের হুবহু অনুবাদ। সেখানকার গোটা প্রভাবটাই পাশ্চাত্ত্যের, তার ফলে সেখানের ছাত্রদের সৃষ্টির মধ্যে স্পষ্টভাবে ভারতীয় ভাব সামান্য আছে বা একেবারেই নেই। জয়পুরেও একই অবস্থা। সেখানে সরকারী ইনডাসট্রিয়াল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ক্লাসে ইংলন্ডের প্রাকৃতিক ইতিহাস, ওয়াল চার্ট, এবং ড্রইং-বই থেকে ড্রইং করতে শেখানো হয়। সিংহলে ড্রইং শেখানো হয় একেবারে বাতিল-হওয়া দক্ষিণ কেনসিংটন-রীতির অনুসরণে।...ভারতে শিল্পানুভূতি যদি বেঁচে থাকে তাহলে তা আছে ওইসব প্রভাবের আক্রমণ সত্ত্বেও।"

অতঃপর রবিবর্মা প্রসঙ্গ :

"ওইসব স্কুল-স্টাইলের সর্বাধিক পরিচিত স্রষ্টা হলেন তৈলচিত্রকার রবিবর্মা। সারা ভারত তাঁর ছবির কথা জানে, সেগুলি বারে বারে নতুন করে ছাপা হয়, তাদের জনপ্রিয়তা এখনো বাড়ছে। ভারতীয় রুচির এই চেহারা হয়ত স্বাভাবিক, তবু দুঃখজনক। স্বাভাবিক এইজন্য যে, যে-পুরাতন ভারতীয় শিল্পের কথা আগে বলেছি তা যদিও সর্বদাই আন্তরিক ও

আলঙ্কারিক, আধ্যাত্মিক ও প্রশান্ত, তবু কখনো কখনো অতিরিক্ত রীতিনির্ভর, কঠিন ও ভঙ্গিপ্রধান, এবং তাতে আঙ্গিকের ত্রুটি আছে। সুতরাং অনুশীলনহীন জনসাধারণ যখন কোনো শিল্পীকে ওইসব রীতির বেড়া ভেঙে পরিচিত বিষয় নিয়ে বাস্তবতাযুক্ত ছবি আঁকতে দেখে, তখন তারা তাদের দুই হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাতেই পারে। ভারতীয় বিষয়বস্তু নির্বাচন করার জন্য এই পুরস্কার রবিবর্মা পেয়েছেন এবং তিনি কিছু অংশে যথার্থ জাতীয়তার ভাবোদ্রেক করতেও পেরেছেন। কিন্তু তিনি যদি বিশাল কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কোনো খাঁটি শিল্পী হতেন তাহলে তাঁর প্রভাব বহুগুণে বৃহৎ ও গভীর হত। বিরাট সুযোগ সম্ভাবনার ইঙ্গিতচিহ্ন তিনি, যাকে সম্পূর্ণ ফসকে যেতে না-দেওয়া হলেও মন্দভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, একথা বলতেই হবে। থিয়েটারি ধারণা, কল্পনার অভাব, ভারতীয় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু চিত্রণের কালে ভারতীয় ভাবানুভূতির অনুপস্থিতি—এইসব হলো রবিবর্মার মারাত্মক ত্রুটি। গভীর ভাবদ্যোতক মহাকাব্যিক বিষয়কে মর্যাদাহীনভাবে চিত্রিত করার চেয়ে দোষজনক আর-কিছু হতে পারেনা—আর, রবিবর্মার দেবতা ও বীরেরা নিতান্ত সাধারণ ছাঁচে তৈরি মানুষ-বই কিছু নয়, যারা এমনসব পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যাদের সম্মুখীন হবার যোগ্যতা তাদের নেই। ব্যক্তিগত বা জাতিগত একান্ত বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতিও আর একটি অক্ষমণীয় অপরাধ। রবিবর্মার ছবিগুলি এমন যে, সেগুলি যে-কোনো ইউরোপীয়ের পক্ষে ভারতীয় সাহিত্য পড়ে এবং ভারতীয় জীবনের অগভীর অনুশীলনমাত্র করে, এঁকে দেওয়া সম্ভব।"

কুমারস্বামী দুঃখ করে বলেছেন, ভারতীয় নবজাগরণ উপযুক্ত শিল্পীর আবির্ভাব না ঘটায় একাংশে দুর্বল থেকে গেছে। "ইউরোপের সেরা চিত্রকলা বাইজানটাইন-রীতিমূলতা ও রেনেসাঁসের বিজ্ঞানমুখিতার মধ্যবর্তীকালের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে কিন্তু সুবর্ণক্ষণ চলে গেছে কোনো বতিচেল্লীর আবির্ভাব ছাড়াই।" নিখুঁত আকার, বাস্তবতা ইত্যাদির প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁকের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য এবং ভাবাবেগের কণ্ঠরোধ ঘটেছে, তাই ওহেন দুর্ভাগ্য। তবু আঁধারে আলোক আছেই। অবনীন্দ্রনাথের দ্যুতিময় আবির্ভাব সম্বন্ধে অতঃপর কুমারস্বামী বলেছেন :

"কী হওয়া উচিত ছিল তার প্রমাণসাক্ষী অন্তত একজন আছেন—অবশ্যই তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বর্তমানে কলকাতা আর্ট স্কুলের অস্থায়ী অধ্যক্ষ। অবনীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বর্তমানে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত শিল্পী। ভারতীয়রা একবার যদি নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়, যদি তারা বোঝে যে, অপরের কাছে তাদের ধার করার কিছু নেই বরং দেবার আছে, তাহলে তারা পৃথিবীকে শিল্পে ও অন্য বিষয়ে কী দিতে পারে—অবনীন্দ্রনাথ তারই তাৎপর্যপূর্ণ স্মারকচিহ্ন।

"বিচিত্র কথা এই, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টি ইংলন্ডে ইংরেজ শিল্পীদের কাছে ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশি পরিচিত—সেদেশে তাঁর শিল্প সম্বন্ধে ভাবনাও অনেক বেশি। এ জিনিস সচরাচর ঘটেনা। যেসব ব্যক্তি নিজেদের শিল্পবুদ্ধি প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক তাঁদের এই ফাঁকে বলে নেওয়া যায়, তাঁরা যেন ইউরোপে অবনীন্দ্রনাথের সমাদর এবং ইউরোপীয় শিল্পীগণ কর্তৃক রবিবর্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপেক্ষার তাৎপর্য বুঝে নেন।

"অবনীন্দ্রনাথ যেসব সেরা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে মেঘদূত চিত্রাবলীকে অবশ্যই প্রথম সারিতে রাখতে হবে। ওদের মধ্যে উৎকৃষ্ট হলো নির্বাসিত যক্ষ এবং ঊর্ধ্বলোকের সিদ্ধগণ। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চিত্র—শাজাহানের অন্তিম শয্যা। ওইসব জলরঙের

সুন্দর ছবিগুলির কোমল প্রশান্তি, লাবণ্য এবং দুর্লভ ভারতীয়তা একেবারে অভিভূত করে দেয়। বিশ্বজনীন ভাবর ভারতীয় ভাবের নিখুঁত প্রকাশ ওগুলি। জাতির আত্মাকে তা উন্মোচন করেছে, স্থূলভাবে বা বাহ্যিকভাবে নয়। দেখবার চোখ, শোনবার কান যাঁদের রয়েছে, তাঁদের কাছে তা উন্মোচিত। একই সঙ্গে সেখানে আছে নীরবতা ও মাধুর্যের মিশ্রণ যা মহৎ আর্টের লক্ষণ। ভারতীয় জাতীয়তাভাবের যথার্থ অভিব্যক্তি এইসব সৃষ্টি, প্রাচীন ঐতিহ্যের নবপুষ্পিত রূপ—সে এমন পুষ্প যা কেবল অতীত সৌন্দর্যশোভার কথাই বলছে না, তা সেইসঙ্গে শক্তিপূর্ণ এবং প্রচুর কল্পসৃষ্টির বলিষ্ঠ সম্ভাবনাপূর্ণ।"

কুমারস্বামী একই প্রবন্ধের শেষ পর্বে (মডার্ন রিভিউ, নভেম্বর ১৯০৭) অবনীন্দ্রনাথের Three Forms of Arts (মডার্ন রিভিউ, জানুয়ারি ১৯০৭) প্রবন্ধ থেকে শিল্পী-রচিত এই কয়েক লাইন তুলেছিলেন :

"ভারতীয় জনগণের সুমহান ধর্মবিশ্বাস একদা তাদের অমানুষিক কাজ নিঃশব্দে সম্পাদন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, মস্ত পাহাড়কে সামান্য পাথরের টুকরোর মতো কেটে অপূর্ব রীতির অগণিত মন্দির নির্মাণের শক্তি দিয়েছিল, প্রেরণা দিয়েছিল বৃহৎ পর্বতগুহাকে পরম ঐশ্বর্যপূর্ণ চিত্ররাজিতে ভরিয়ে তুলতে, যা আজকের দিন পর্যন্ত অমরগৌরবের দীপজ্যোতি—জাতীয় প্রতিভা বিকাশের উদ্দীপক শক্তি। সেই বিরাট ধর্মবিশ্বাসের মৃত্যু এখনো আমাদের মধ্যে ঘটেনি। যে-জাতি একদিন সাঁচীর সমুচ্চ স্তূপগুলি নির্মাণ করেছে, অজন্তা গুহায় অপরূপ ছবিগুলি এঁকেছে—সে জাতি আকাশ থেকে পড়েনি কিংবা পাতাল থেকে ওঠেনি—তারা ভারতেই বাস করত এবং এখনো পর্যন্ত সেই পবিত্র ভূমিতেই বাস করছে।"

কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের কথাগুলিতে সায় দিয়ে লিখেছেন :

"কথাগুলি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত শিল্পীর। একই বিশ্বাসে উদ্দীপিত তাঁর নিজের সৃষ্টি।"

কুমারস্বামী আরও বলেছিলেন, "ভারত এখন এমন মুক্তিচেতনা ও ঐক্যবোধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তার অনুরূপ-কিছু পূর্বে অনুভূত হয়নি। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ভয়ের কিছু নেই—কারণ নবজীবনের সঙ্গে মহান আত্মবিকাশ-চেষ্টার অনিবার্য সম্পর্ক।"

'বেঙ্গল স্কুলের' প্রশংসা কুমারস্বামী অন্যত্রও করেছেন, যেমন, মডার্ন রিভিউ-এর সেপ্টেম্বর ১৯০৯ সংখ্যায় নন্দলাল বসুর চিত্রালোচনা কালে। সেখানে বলেছেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুসরণ করে ক্ষুদ্র একটি সৃষ্টিশীল শিল্পীগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে ; তার থেকে বোঝা যায়, "ভারতের সৃষ্টিশক্তি এখনো সজীব, এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিছক [রাজনৈতিক] অধিকারদাবি অপেক্ষা গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ।" তাঁর বক্তব্য, ওহেন বৃহত্তর মুক্তিচেতনা থাকলেই কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনযোগ্য হয়। "কোনো মানুষ যথার্থ জাতীয়তাবাদী হতে পারেনা যদি তার কাছে স্বদেশের সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত অর্থহীন বলে মনে হয়।" সে কারণে "বাংলার জাতীয় শিল্পীদলের শিক্ষাপ্রদ সৃষ্টিগুলির তাৎপর্য অনন্ত।....যথার্থ জাতিসংগঠক হলেন পৃথিবীর কবি, গায়ক, শিল্পীর দল।" কুমারস্বামী দেখে আশ্বস্ত যে, বাংলার জাতীয় শিল্পীরা তাঁদের প্রেরণার উৎসরূপে বর্তমানকে নয়—অতীত এবং ভবিষ্যৎকে গ্রহণ করেছেন। এটাই তাঁদের দৈবীপ্রতিভার প্রমাণস্বরূপ। "আদর্শায়িত অতীতের উপরেই আদর্শ ভবিষ্যৎ দাঁড়াতে
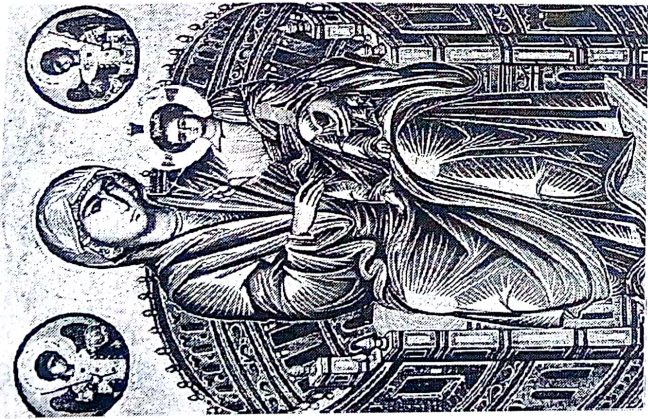
লিপ্পি-র 'অ্যানানসিয়েশন'।

বতিচেল্লী-র 'ম্যাডোনা অব দি ম্যাগনিফিসান্ট'।

বাইজানটাইন শিল্পধারায় আঁকা মেরী ও যীশু। ১৩শ শতাব্দী।

জিয়েত্তো-র 'ম্যাডোনা অ্যান্ড ডিভাইন চাইল্ড'।
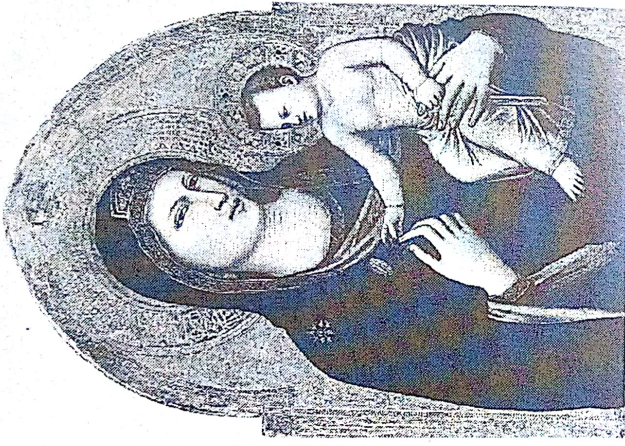
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'পরিত্রাতার মুখাকৃতি'। এ ছবি স্বামীজী দেখেছেন।

মিকেলাঞ্জেলোর 'আদম'। ভাটিকানে জিহোবা ও আদমের ছবির অংশ। এ ছবি স্বামীজী দেখেছেন।

বত্তিচেল্লীর 'ম্যাডোনা উইথ দি বুক'।

ফ্রা আঞ্জালিকোর 'ম্যাডোনা অব হিউমিলিটি'।

রাফায়েলের 'ম্যাডোনা ডেল গ্রান্ডুকা'।

রাফায়েলের 'ম্যাডোনা উইথ দি ইনফ্যান্ট ক্রাইস্ট অ্যান্ড ইনফ্যান্ট সেন্ট জন'।

রসেটির 'অ্যানানশিয়েশন'।

ভেরোনেজ-এর 'সেন্ট হেলেনাজ্ ভিশন অব দি ইনভেনশন অব দি ক্রশ'।

প্রাচীন শিল্পীর আঁকা রাম ও সীতার রাজ্যাভিষেক। নিবেদিতা ছবিটির উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।
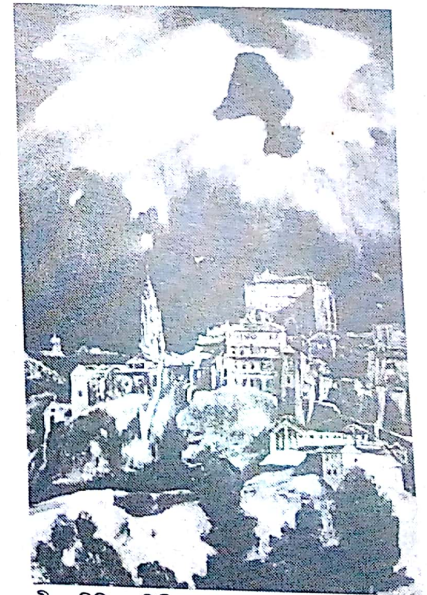
গ্রীক মিস্টিক শিল্পী এল গ্রেকো-র 'আত্মার নগরী টোলেডো'। গ্রন্থমধ্যে আলোচিত।
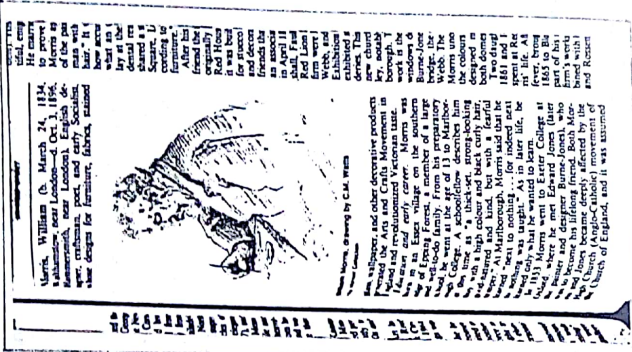
জন রাস্কিন। এঁর নান্দনিক বিষয়ক আলোচনা বহু শিল্প-সমালোচককে প্রভাবিত করেছে।

উইলিয়ম মরিস। এই কবি ও
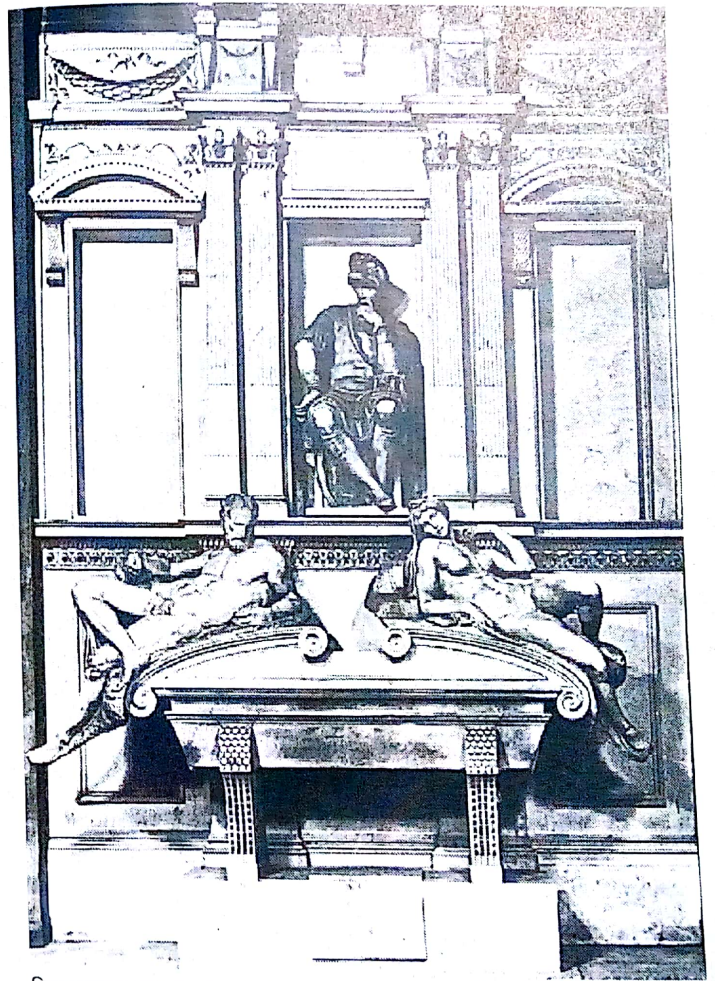
মিকেলাঞ্জেলোর 'The Tomb of the Lorenzo de' Medici'। এই শিল্পকার্যটি নিবেদিতার কাছে 'অসহ্য'।
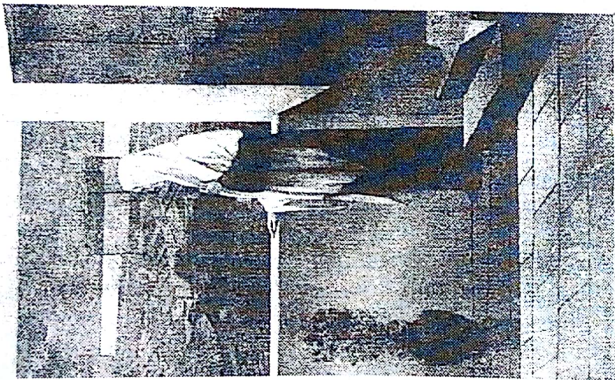
প্যুভি দ্য শ্যভান-এর 'St. Genevieve Watching Over Paris'। নিবেদিতার কাছে ছবিটি অতিপ্রিয় এবং নাগরিক শিল্পের পরম আদর্শ।

শ্যভান-এর আর একটি জেনেভিভ-চিত্র। প্যারিস প্যান্থিয়নের এই বিখ্যাত ম্যুরালের বিষয়—'দুঃখী প্যারিসবাসীর কাছে স্যাঁত জেনভিভ খাদ্য এনে দিচ্ছেন'।

Francois Rude-এর এই ছবির বিষয় : স্বেচ্ছাসৈনিকদের যুদ্ধযাত্রা 'লা মার্সাই' গাইতে গাইতে। রদ্যাঁ তাঁর প্রিয় এই ভাস্কর্যটিকে অনুরূপ সৃষ্টির কালে স্মরণে রেখেছেন। ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত লা মার্সাই। এই রক্তে দোলা-লাগা গানটি স্বামী বিবেকানন্দকে গেয়ে শুনিয়েছেন সমকালীন ফ্রান্সের সঙ্গীতরানী এমা কালভে।

সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ড অ্যাম্ফি থিয়েটারে শ্যাভান-এর আঁকা বিখ্যাত ম্যুরাল—'বিদ্যার পবিত্র অরণ্য'। নিবেদিতা কর্তৃক আলোচিত।
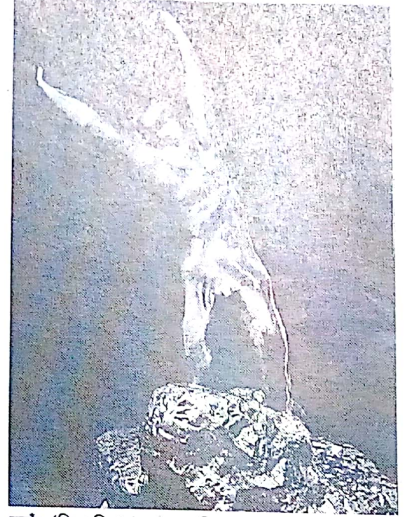
রদ্যাঁর 'দি প্রডিগাল'—এতে 'বিফলতা যন্ত্রণা ও নৈরাশ্য'। 'গেটস অব হেল'-এর অন্তর্গত।
১৯০০ প্যারিস বিশ্বমেলায় রদ্যাঁর বিশাল প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত ভাস্কর্য। স্বামীজী ও নিবেদিতা প্রদর্শনীটি বিশেষভাবে দেখেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে রদ্যাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়।

রদ্যাঁর 'এজ অব ব্রোঞ্জ'-এর অন্তর্গত 'স্পর্ধিত প্রাগৈতিহাসিক মানুষ'।
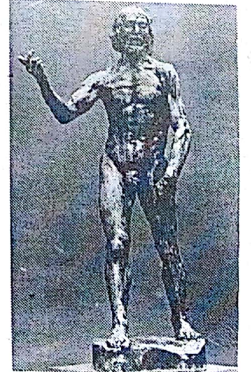
রদ্যাঁর 'প্রচাররত সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট'।

পারে। বীরযুগের বিষয়বস্তু, যা নৈর্ব্যক্তিক, যা সাময়িক আকর্ষণের জিনিস নয়, যা একই সঙ্গে সর্বজনীন ও নিখিল চৈতন্যজালে আবৃত—কেবল তাই হলো জাতীয় ও সর্বজনীন শিল্পের যথার্থ ভিত্তি।" নন্দলাল তাঁর "সতী" ছবিতে ওই "গৌরবময় বীরযুগকে" লাভ করেছেন, একথা বহু প্রশস্তির সঙ্গে কুমারস্বামী উক্ত রচনায় জানিয়েছেন।[১৫]

এ সব সত্ত্বেও বাংলার শিল্প-আন্দোলন সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি লাভ করেনি, কেননা, কুমারস্বামী দেখেছেন, ভাবকল্পনাময় চিত্রের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ঘটলেও মণ্ডনধর্মী শিল্পের রেখার জোর আসেনি বা কারুকৃতিতে তার বিস্তার ঘটেনি। এককথায়, এই শিল্প পটে আটকে আছে, জীবনচর্যার ক্ষেত্রে প্রসারিত নয়। কুমারস্বামী **The Function of Schools of Art in India; A Reply to Mr Cecil Burns** (মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারি ১৯১০) নামক প্রবন্ধের একাংশে সেকথা বলেছেন :

"কিন্তু যদি অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা এই শিল্প-জাগরণের ক্ষেত্রে বার্ন জোনস ইংরাজি শিল্পের ইতিহাসে যে-স্থান নিয়েছিলেন সেই স্থান অধিকার করে থাকেন, তাহলে প্রশ্ন করব—কোথায় আমাদের উইলিয়ম মরিস? হয়ত উইলিয়ম মরিসের অভ্যুদয়ের উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি। যখন তাঁর আবির্ভাব ঘটবে তখন তিনি ফলিত শিল্পের ক্ষেত্রে সকল শিল্প-বিদ্যালয়গুলি একত্রে যে-কাজ করতে পারে তারও বেশি কাজ একা সম্পন্ন করবেন। আর শিল্প-বিদ্যালয়গুলির কাজ হলো তাঁর মতো একজনের আগমনের পথ পরিষ্কার করে রাখা—কঠিন করা নয়।"

কুমারস্বামীর আশা বহুলাংশে পূরণ করেছিলেন নন্দলাল পরবর্তীকালে। অসামান্য যাঁর রেখার শক্তি সেই নন্দলাল তাঁর শান্তিনিকেতনের জীবনে অভিনয়মঞ্চসজ্জা, স্থাপত্যপরিকল্পনা, গৃহসৌষ্ঠব ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে-নবভাবনা এনেছিলেন, তা একদা শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে রুচির বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ, রবিবর্মার খুবই অনুরাগী ছিলেন এবং নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রসন্ন ছিলেন না, এমন একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা মাঝেমধ্যে লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলীর দেশবিদেশ-ব্যাপ্ত খ্যাতির পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রকার ধারণা গুরুত্বলাভ করবে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী মনে করেছিলেন? জীবনের শেষ প্রান্তে, ১১-১২-১৯৩৮ তারিখে, তিনি শান্তিনিকেতনে হ্যাভেল স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে-ভাষণ দেন, তার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কৃত অনুলিপি স্বয়ং পুনর্লিখন করেন, এবং প্রবাসীর মাঘ ১৩৪৫ সংখ্যায় তা বেরিয়েছিল। সেখানে হ্যাভেল সম্বন্ধে কী বিপুল শ্রদ্ধা এবং হ্যাভেল-বিরোধীদের সম্বন্ধে কী কঠিন মনোভাব! হ্যাভেলের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর প্রথম বয়সে যখন এদেশে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত শিল্পকলার নিদর্শনের মধ্যে সংযোগসূত্র সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিলনা, যখন ভারতীয় শিল্প-ইতিহাস শিক্ষাবিষয়ের বহির্ভূত, তখন হ্যাভেল তাঁর চেষ্টা ও রচনার দ্বারা এনেছিলেন বিপুল পরিবর্তন। হ্যাভেল-পূর্ব অবস্থা এই :

"ভারতের চিত্রকলা তখনকার কালের ইংরেজদের অবজ্ঞাভাজন ছিল। আমরা ছিলুম সেই ইস্কুলমাস্টারের ছাত্র, তাঁদের দৃষ্টি ছিল আমাদের দৃষ্টির নেতা, তার যা ফল তাই ফলেছিল। সেদিন ভারতীয় শিল্পবিদ্যা ছিল ভারতেরই উপেক্ষার দ্বারা তিরস্কৃত।...তখন

জুল বের্তঁ-র 'কৃষক তরুণী'—ফিরছে দিনান্তের সঞ্চয় নিয়ে। এমনই শক্তিশালী, প্রাণস্পর্শী এবং ছন্দোময় ভারতীয় কৃষক বা শ্রমিক নারীর চিত্রাঙ্কন বা ভাস্কর্য নিবেদিতা চেয়েছেন।

রদ্যাঁ-কৃত প্যুভি দ্য শ্যাভান-এর আবক্ষ মূর্তি।

বিদেশের যত সব নিকৃষ্ট ছবি বিনা বাধায় ধনীদের ধনগৌরবের সাক্ষী হয়ে তাঁদের প্রাসাদে অভ্যর্থনা পেত।"

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই ইউরোপের শিল্পকলার গৌরবমহিমা স্বীকার করেন। "কিন্তু সে গৌরব আসল জিনিসে, তার প্রেতচ্ছায়ায় নেই। আমরা জহুরীর দোকানে মোটা কাচের আড়ালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছাপানো মূল্যতালিকা হাতে নিয়ে ঢাকাঢুকির ভিতর থেকে যা আন্দাজ করে নিই—তাকে কিছু পেলুম বলে কল্পনা করা শোচনীয়। অশ্বত্থামা পিটুলিগোলা জল খেয়ে দুধ খেয়েছি বলে নৃত্য করেছিলেন, এ-বিবরণ পড়লে চোখে জল আসে।" যখন এদেশের মানুষ বিদেশী "নামজাদাদের নাম কীর্তন" করতে, তাদের নামাবলী "মুখস্থ বিদ্যার ভাণ্ডারে জমা রাখতে" উৎসাহী, তখন এলেন হ্যাভেল। সেই ভূমিকার মূল্য, রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতিতে এই প্রকার :

"তখনকার দিনের মডেল-নকল-করা শিল্পবিদ্যাভ্যাস মনে করলে আজ হাসি পায়, কিন্তু তখন গাম্ভীর্য ছিল অক্ষুণ্ণ। সেই চির-ছাত্রগিরির দুর্দিন আজও হয়ত চলত যদি হ্যাভেল এসে দৃষ্টি না ফিরিয়ে দিতেন। তিনি ফিরিয়ে দিলেন সেইদিকে—ভারতীয় রূপকলার যেখানে প্রাণপুরুষের আসন।"

হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে ছাত্ররূপে পেলেন—অবনীন্দ্রনাথ বিদেশী পথ ছেড়ে দেশী পথ ধরলেন। তার ফলভোগ তাঁকে করতে হলো :

"শিল্পের সেই নবপ্রভাতে চারিদিক থেকে ভারতীয় কলাভারতীকে কত অবজ্ঞা কত বিদ্রূপ। ...আমাদের দেশের যেসব ছাত্র শিল্পবিদ্যালয়ে মাথা নিচু করে অনুকৃতির কৃতিত্ব অর্জন করত তারা হায় হায় করে উঠেছিল। ভেবেছিল শিল্পের উচ্চ আদর্শের সম্মানভাজন হবার জন্য তারা যে অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত ইংরেজ গুরুর তা সহ্য হলো না, তিনি বুঝি দিশি পোটোর দলেই চিরদিনের জন্য তাদের লাঞ্ছিত করে রেখে দিতে চান। তাদের দোষ ছিলনা, কেননা সেদিন ভারতীয় চিত্রভারতীর আসন ছিল আবর্জনাস্তূপে। ঘরে পরে তীব্র বিরুদ্ধতার দিনে হ্যাভেল যে, সেদিন অবনের মত ছাত্র পেয়েছিলেন এ-রকম শুভযোগ দৈবাৎ ঘটে।"

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, হ্যাভেল-পূর্ব যুগে তিনিও ভারতীয় শিল্পকলার মহিমা অনুধাবনে দ্বিধান্বিত ছিলেন। সেই "আলো অন্ধকারে আবিল" সময়ে রবিবর্মার সমাদরে মন তাঁর গিয়েছিল। সেই মোহ এবং মুক্তির কথাগুলি এই :

"দেশে তখনো প্রভাতের বিলম্ব ছিল।...তার পূর্বে সীসের ফলকে খোদাই-করা ছবি দেখেছি পঞ্জিকায়, আর শিশুপাঠ বইয়ে নৃসিংহ-মূর্তি, আর ষণ্ডামার্কের চিত্র। এমন সময় দেখা দিল রবিবর্মার চিত্রাবলী। মন বিচলিত হয়েছিল সেকথা স্বীকার করি। তারা যে কত কৃত্রিম, তারা যে যাত্রার দলের পাত্রপাত্রীর এক শ্রেণীভুক্ত, সেকথা বোঝবার মন তখনো হয়নি। সেই লজ্জাকর অবস্থা থেকে একদিন যে জাগতে পেরেছি সেজন্যে হ্যাভেলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। সেই নৃসিংহ-মূর্তির মধ্যেও সত্য ছিল কিন্তু

রবিবর্মার ছবির মধ্যে ছিলনা, একথা বোঝাবার পথ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।"

॥৫॥

বাংলার কলাশিল্প আন্দোলন বাঁধানো সড়কে জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিল, রথ টেনেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাথায় ছাতা ধরে বন্দনা গেয়েছিলেন নিবেদিতা এবং হ্যাভেল ও কুমারস্বামী, পিছনে ঢাকঢোল বাজাচ্ছিলেন অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলীরা, জয়ধ্বনি দিচ্ছেলেন তাবৎ বঙ্গবাসী, তৎসহ সারা ভারতের অধিবাসীবৃন্দ, অভিনন্দনপত্র লিখে পাঠাচ্ছিলেন বিদেশী শিল্পরসিকেরা—এহেন একটা ধারণা ইদানীং গড়ে উঠেছে। বাস্তব ব্যাপারটি কিন্তু ঠিক এমনটি ছিলনা। রীতিমতো বন্ধুর পথেই যাত্রা, ইঁটপাটকেল প্রচুর খেতে হয়েছে, নিপুণ বিরোধী যোদ্ধাদের নিক্ষিপ্ত শরজালও ছিল।

বিদেশ-শরণ থেকে আর্ট স্কুলে দেশ-শরণ ব্যবস্থা হ্যাভেল যখন থেকে শুরু করেন, সংঘাত শুরু হয়ে যায় তখন থেকেই—সে কাহিনী কিছুটা বলে এসেছি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবিবর্মা থেকে পক্ষ বদল করে অবনীন্দ্রনাথের উপর অনুরাগ অর্পণ করলে তাঁর সঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দের সঙ্গে কোন্ সংঘর্ষ ঘটেছিল, তার উল্লেখও করেছি। রমাপ্রসাদ কিন্তু তাঁর প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনায় (অগ্রহায়ণ ১৩২০) অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে "বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে"—একথা স্বীকার করেছিলেন। তবে এই আন্দোলন সম্পর্কে "দেশীয় লোকের মধ্যে মতভেদ আছে", তা জানাতে প্রমথ চৌধুরীর এই মন্তব্য উৎকলন করেছিলেন : "যেদিন থেকে বাংলাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা শুরু হয়েছে এবং এই মতদ্বৈধ থেকে সাহিত্যসমাজে একটা দলাদলি সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে।" (বীরবল, 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' ভারতী, আশ্বিন ১৩২০)। কেবল অজ্ঞ মানুষেরা নন, রমাপ্রসাদ জানিয়েছেন যে, "যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী এবং দেশীয় রীতিনীতির একান্ত পক্ষপাতী, এমন অনেক লোকেও নব্যচিত্রকলাকে একরূপ ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন।" এই নামী পুরাতাত্ত্বিক তাঁর লেখায় নানা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রতিমা-লক্ষণ উদ্ধার করে "ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম" দিয়েছেন।

অনেক জ্ঞানী গুণী এই বিতর্কে অংশ নেন। নানা সাময়িক পত্রে এইকালে শিল্পকলা সম্বন্ধে প্রচুর চিন্তাপূর্ণ লেখা বেরিয়েছে। বাংলার সংস্কৃতি জগতের ধন্য ব্যক্তিরা, যেমন অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী তর্কবিতর্কে নেমে পড়েন। এমনই এক বিতর্কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

অবনীন্দ্রনাথ সেই সবে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, আর্ট স্কুলের অস্থায়ী অধ্যক্ষ তিনি, ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেন, কিন্তু এখনো তাঁকে ঘিরে আন্দোলন গড়ে ওঠেনি, তবে তা হবার মুখে—এই সময়ে তাঁর একটি বাংলা লেখার দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত ইংরেজি অনুবাদ বেরুল মডার্ন রিভিউ-এর জানুয়ারি ১৯০৭ সংখ্যায়—**Three Forms of Art**। এর মধ্যে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর সুদৃঢ় মত প্রকাশিত, এমনকি বলা চলে, সেই দৃঢ়তা একটু অধিক উচ্চারিত। নব ভাবপ্রেরণায় আন্দোলিত অবনীন্দ্রনাথের লেখায় বিরোধী মত সম্বন্ধে একদিকে ঈষৎ উত্তেজনা অন্যদিকে ভারতশিল্পের মর্মব্যাখ্যায় আনন্দরোমাঞ্চ।

লেখাটির গোড়ায় অবনীন্দ্রনাথ ভারত, গ্রীস ও জাপানের মৌল শিল্পবোধ দেখাতে কিছু বিশেষজ্ঞ-উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন। বলেছিলেন যে, শুক্রাচার্য-নির্ধারিত শিল্পনীতি অনুযায়ী শিল্পী তাঁর ধ্যানলব্ধ দর্শনের দ্বারা দেবমূর্তি নির্মাণ করবেন—তিনি কদাপি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট বস্তুরূপের উপর নির্ভর করবেন না। গ্রীক শিল্পকে যতখানি বস্তুমুখী ভাবা হয় তা ততখানি নয়, একথা তিনি লন্ডন রয়াল একাডেমির অধ্যাপক হেনরি উইকস্-এর উক্তিমতো দেখিয়েছিলেন। এমনকি ফিডিয়াসের সেরা দিনগুলিতেও প্রকৃতির ভাব-তাৎপর্য উপলব্ধি করে তবে তা রূপায়িত করা হতো—সজীব বা অজীব, যে-কোনো বস্তুর মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া হতো সেই বিশেষ প্রকৃতিদৃষ্টি। জাপানের শিল্পদৃষ্টিও কোনো দৃশ্যের হুবহু রূপাঙ্কন নয়, তার মৌল ছন্দকেই প্রকাশে সচেষ্ট। এই সকলের দ্বারা অবনীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন, উক্ত তিন শিল্পধারাই তার আদি প্রকৃতিতে একই পথের যাত্রী। প্রাচীন গ্রীক শিল্পীরা তাই তাঁদের আদর্শ মূর্তির অনুরূপ মডেল পেলেই তবে তাকে আকারিত করতেন। জাপানী শিল্পীরা উড্ডীন বলাকার আসল চেহারার পরিবর্তে তাদের গতির ছন্দ, আনন্দময় পাখার ঝাপট মনে যে-ভাব জাগায় তাকেই আঁকেন তুলির কয়েকটি আঁচড়ে। আর ভারতীয় শিল্পী অন্তর্দর্শনে প্রাপ্ত মূর্তিই রচনা করেছেন—সেজন্য চতুর্মুখ ব্রহ্মা বা চতুর্ভুজ বিষ্ণু আঁকতে কুণ্ঠিত নন। নিজ বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় ত্রিমূর্তির দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। ভারত-শিল্পের দেবতা যেন মহাদেব, ধ্যাননিমগ্ন, বহির্জগৎ সম্বন্ধে অসজ্ঞান। গ্রীক শিল্পে বিষ্ণুভাব, নিখুঁত সেখানে অবয়ব, শ্রী ও সৌন্দর্যের দ্বারা সেবিত। আর জাপানী শিল্পের মধ্যে আছে ব্রহ্মাভাব—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, যাঁর ইচ্ছাতে আবির্ভূত হয় ভালো মন্দ সকলই। জাপানী শিল্প স্বর্গ নরক সকলই সমদৃষ্টিতে দেখে রূপায়িত করে।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিল্প প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তিক্ত কঠিন। এখন সে শিল্পের উপাস্য হলো অমঙ্গল-দেবতা—লোভ। তাতে চলেছে কুবেরের অর্চনা। তা ব্যবসায়ীর বেচাকেনার সামগ্রী হয়ে রঙ-বেরঙের সাজে বাজারে বাহার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। পুণ্যক্ষয়ে মানুষ যেমন মর্ত্যে খসে পড়ে সেইভাবে গ্রীক শিল্প একালে ধূলায় নেমেছে, দাঁড়িয়েছে ধনীর দুয়ারে পসরা সাজিয়ে।

ভারতশিল্পের আলোচনাকালে অবনীন্দ্রনাথ তার তিন শ্রেষ্ঠ যুগের নির্দেশ করেছেন। প্রথম ব্রহ্মণ্যযুগ— শিল্পে তখন অতিপ্রাকৃতের প্রাধান্য—অর্ধমানব-অর্ধপশু নৃসিংহ, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, দশমুণ্ড রাবণ, দূর্বাবর্ণ রাম, নীলবর্ণ কৃষ্ণ। বৌদ্ধযুগে শিল্প মানবমুখী (এখানে ইতিহাসের ক্রম সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে—বৌদ্ধশিল্পকে ব্রহ্মণ্যশিল্পের পরবর্তী বলা যাবে কিনা সন্দেহ)—কিন্তু সে মানব পুরুষোত্তম বুদ্ধ, পূজা করা হলো যাঁর পাদপদ্ম। ভারতের শিল্পীরা ধনাকাঙ্ক্ষী হলে বুদ্ধের পরিবর্তে অশোকের মূর্তি গড়তেন। পরবর্তী মুঘল যুগের সূচনায় শিল্পীরা বাদশাহের ইচ্ছাদাস হয়ে পড়লেও যেভাবে তাঁরা বাদশাহ ও বেগমের ছবি এঁকেছেন সে সকলই বাস্তব রূপের উপরে গরিমার ব্যঞ্জনাকে উদ্ভাসিত করেছে। তারপরে শাজাহানের আমলে যখন শিল্পীরা পেলেন স্বাধীনতা তখন মৃত্যুর উপরে জীবনের জয়ের কাহিনী রচিত হলো যমুনার তীরে মর্মরপটে।

পাশ্চাত্ত্য শিল্পের দিকে পুনরায় চোখ ফিরিয়ে অবনীন্দ্রনাথ গ্রীসের পতনভূমিতে শক্তির স্পর্ধা নিয়ে আবির্ভূত রোম কিভাবে শিল্পকে স্থূলতায় ভরিয়েছিল, কিভাবে রেনেসাঁসের যুগে পুনশ্চ তাতে নেমেছিল স্বর্গের ছায়া, যা রাফায়েল ও মিকেলাঞ্জেলোতে পৌঁছে, তারপরে ফুরিয়ে গিয়েছিল, কিভাবে ক্রমে ছোটখাট রাজা ও সামন্তদের সেবক হয়ে শিল্পীরা অভ্যস্ত তুলিতে নকলনবিশির দাসত্বে নিযুক্ত ছিল—তার বর্ণনা করেছেন। আর আধুনিক ভারতীয়

শিল্পীরা তো তারই অনুকরণে ধাবিত!

অবনীন্দ্রনাথ আশা হারান নি। আর্ট স্কুলের ছাত্রদের উপরে ভরসা না থাকলেও (তাঁর এই প্রবন্ধের রচনাকাল পর্যন্ত তিনি ভরসার কারণ খুঁজে পাননি) বংশগতভাবে এদেশে যাঁরা শিল্পী তাঁদের ভিতর থেকে যথার্থ শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটবে এমন কল্পনা করেছেন, কারণ ওঁদের হাতে আছে পুরুষানুক্রমিক কর্মনৈপুণ্য এবং মনে আছে উচ্চচেতনা। "যদি কেউ শিল্পের অধ্যাত্মচেতনার রূপকে অনুভব করতে চান [অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন] তাহলে তিনি যেন আশ্বিন মাসে বাংলার কোনো একটি মন্দিরে উপস্থিত হন—যেখানে সন্ধ্যায় পবিত্র ধূপধুনা পুড়ছে, শাঁখ ঘণ্টা বাজছে, ধূপের ধোঁয়ার মধ্যে আরতির দীপ তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন পুরোহিত, সামনে জ্যোতির্ময়ী মহিমময়ী দুর্গামূর্তি। যদি কেউ সেই মূর্তির দিকে ভক্তির চোখে তাকান, তাহলে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের মোহমায়া দূর হয়ে যাবে দেবীকৃপায়—তিনি বুঝবেন, সৌন্দর্যের অধ্যাত্মচেতনার পরম রূপকে, যার প্রেরণায় ভারতীয় শিল্পী মাটিতে গড়েছেন অপরূপ দেবীমূর্তি।"

ভাবময় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, স্বভাবে তাঁর আত্মমগ্ন স্বপ্নালুতা, লেখাতে তা প্রকাশ পেতই। তেমন লেখায় যুক্তির দুর্বলতা থাকে, আবার থাকে দুর্লভ উদ্ভাস। অবনীন্দ্রনাথের কিছু কথা বিরোধী ধারণার মানুষের কাছে আক্রমণের সুযোগ এনে দিয়েছিল, বিশেষত তিনি যখন কেবল বস্তুধর্মী পাশ্চাত্ত্য শিল্পকে নস্যাৎ করেই থামেন নি, সেইসঙ্গে এমন-কিছু লিখেছিলেন যাতে 'পৌত্তলিকতার' স্বাদগন্ধ ফুটে বেরুচ্ছিল। অবনীন্দ্রনাথের পরিবার ব্রাহ্ম হননি সত্য, তবু মহর্ষি-পরিবারের আওতায় তো ছিলেন!

প্রতিবাদ করলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মডার্ন রিভিউ-এর জুন ১৯০৭ সংখ্যায়—**The Study of Pictorial Art in India** প্রবন্ধে। অবনীন্দ্রনাথের মোট কথাটা তাঁর কাছে এইভাবে প্রতিভাত হয়েছিল :

"বিশেষজ্ঞরা স্থির করে ফেলেছেন, ইউরোপীয় শিল্পে দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা ভারতীয়দের নেই। ইদানীং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন-সব কথা বলছেন, যার থেকে মনে হতে পারে, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ব্যাপারটা মন্দ, এবং দেবগণ, এমনকি ভূত-প্রেত-দানা-দত্যি উচ্চতর শিল্পপ্রেরণার উৎস, সেইসঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্প অশুভ প্রতিভার দান, তার প্রভাব কাটাতে হবে বাঙালী কুমোরদের মাটির মূর্তির দ্বারা—যেসব মূর্তি আবার দেখতে হবে বিশেষ পরিবেশে—যা রচিত হবে মন্ত্ররব, জয়ধ্বনি, ধূপ-দীপ ও শঙ্খনির্ঘোষের দ্বারা।"

উপেন্দ্রকিশোর জানালেন, "ভারতীয় শিল্পের আমি একান্ত অনুরাগী, তার হেনস্থা যারা করে তাদের সম্বন্ধে আমার কোনোই সহানুভূতি নেই", তবে— "আমি অবশ্য ভারতীয় শিল্পকে ইউরোপীয় শিল্পের সমকক্ষ মনে করিনা, এবং এ কথাও মনে করিনা যে ভারতীয় শিল্প আমাদের প্রতিভা বা মেজাজের অধিক উপযোগী।"

অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্যের নানা অংশের প্রতিবাদ তিনি করেছেন। আর্ট স্কুলের ছাত্ররা কেন উত্তম ছবি আঁকতে পারেনা, তার নানা কারণের উল্লেখের পরে, তারই মধ্যে ইউরোপীয় রীতির সার্থক শিল্পী হিসাবে বেরিয়ে-আসা যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শশী হেশ এবং রোহিণীকান্ত নাগের নাম করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিভিন্ন দেশের কথ্যভাষার মধ্যে ঐক্য না থাকলেও শিল্পভাষার মধ্যে ঐক্য আছে, নচেৎ ইউরোপীয় শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পের কদর করেন কিভাবে? তাঁর সমাধান : "ভারতীয় শিল্পীরা ইউরোপীদের মতো একই শিল্পভাষা ব্যবহার করে থাকেন, তবে ভারতীয়রা কথা বলেন শিশুর আধো-আধো ভাষায়, আর

ইউরোপীয়রা পূর্ণবয়স্ক মানুষের ভাষায়। শিশুর বুলি বড়ো মধুর, তবে শিশুকে তো বড়ো হয়ে বয়স্কের ভাষাতে কথা বলতে হবে !" ইউরোপীয়দের উচ্চতর শিল্পসংস্কৃতির কথা বলবার পরে—ভারতীয় মণ্ডনশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে ভারতশিল্প যে পাশ্চাত্ত্যশিল্প অপেক্ষা উন্নততর—একথা তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। তারপর মূল প্রশ্নে চলে গেছেন—গভীর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং তার নিবিড় রূপায়ণ ভিন্ন কি উচ্চশ্রেণীর চিত্রশিল্প সম্ভব ? স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে যেখানে "নিবিড় প্রকৃতিদর্শন" আছে, এবং তাঁর ড্রইং শক্তিশালী—সেখানে ওই সকলের উৎসস্বরূপ পাশ্চাত্ত্যশিল্পকে "অধঃপতিত" বলা কি অবনীন্দ্রনাথের উচিত ?—ইনি প্রশ্ন করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ-প্রশংসিত হিন্দু দেবগণ বাড়তি কিছু হাত বা মাথা সত্ত্বেও মানুষেরই আকার, একথা স্মরণ করাবার পরে বলেছেন : "প্রকৃতি-অনুশীলন সম্বন্ধে যদি কেউ বিবেকদংশন অনুভব করেন, তাঁর পক্ষে নিজেকে শালগ্রাম শিলার ধ্যান ও চিত্রণেই বেঁধে রাখা ভালো।"

উপেন্দ্রকিশোর আপত্তি করে আরও বলেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ কেবল হিন্দুর ভাবানুভূতির দিক দিয়ে বিষয়টির বিবেচনা করেছেন (হায় ! অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরস মূলে হিন্দু সংস্কৃতিকেন্দ্রিক নয়, তার আশ্রয় বহুলাংশে ইসলামী সংস্কৃতিতে—একথা স্বয়ং তিনিই বলেছেন !)। ভারতীয় শিল্পীদের জন্য দুর্গামূর্তির ধ্যান ও দেবীকৃপার উপর নির্ভরতার অবনীন্দ্রবিধানে তাই উপেন্দ্রকিশোর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শিল্পীর জীবনে অর্থের প্রয়োজনকে অবজ্ঞা করায় আহত হয়ে তিনি বলেছেন, ধড় ও প্রাণকে একত্র রাখতে ও-বস্তু চাই-ই। জানিয়েছেন, গ্রেট প্র্যাকিটেলেস পর্যন্ত দেবীমূর্তি নির্মাণের জন্য প্রদত্ত সোনা চুরি করেছিলেন। শিল্পী "জাতীয়তার বর্মে" আচ্ছাদিত থাকুন, অবনীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের প্রসঙ্গে ইনি বলেছেন, জাতীয়তা সম্বন্ধে মাত্র একটি ধারণা তো সম্ভব নয় :

"আমার [উপেন্দ্রকিশোরের] জাতীয়তা আমাদের জাতীয় জীবন ও ঐতিহ্যের মধ্যে যেসব মহান বস্তু আছে তাদের বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত প্রীতি ও গৌরবে পূর্ণ—সেইসঙ্গে তাতে আছে আমাদের ত্রুটি বিষয়ে আন্তরিক দুঃখবোধ এবং সেসব দূর করার জন্য উৎকণ্ঠা। এহেন জাতীয়তাই আমাকে ইউরোপীয় শিল্পের অনুশীলনে প্রণোদিত করেছে, যাতে তার দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতি ঘটে, সেইসঙ্গে ইউরোপীয় শিল্পের গুণাবলী সম্বন্ধে সচেতনতা জাগে।"

উপেন্দ্রকিশোরের প্রবন্ধের উত্তর দিলেন অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও সি গাঙ্গুলী) মডার্ন রিভিউ-এ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সংখ্যায়— **The Study of Indian Pictorial Art: A Rejoinder**। "উপেন্দ্রকিশোরের এই লেখাটি [অর্ধেন্দ্রকুমার বলেছেন] কয়েক বছর আগে আর্ট স্কুল থেকে ইউরোপীয় ছবিগুলি বিক্রয় করে দেবার সময়ে যে চীৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়েছিল, তার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।" অবনীন্দ্রনাথের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি উপেন্দ্রকিশোর ধরতে পারেন নি, এবং "আশঙ্কা হয়, মিঃ রায় এই পত্রিকায় সিস্টার নিবেদিতার লেখনী-নির্গত **On the Function of Art in Shaping Nationality** নামক অত্যন্ত ভাব-তাৎপর্যপূর্ণ রচনার বক্তব্য অনুধাবনে অসমর্থ। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিঃ রায় যেসব সমস্যা-ধন্ধে-বিমূঢ়, তাদের অনেকগুলির সমাধান ওই লেখায় খুঁজে পাবেন।"

ভারতীয়রা পাশ্চাত্ত্যশিল্প সত্যই আয়ত্ত করতে সমর্থ কিনা সেই প্রশ্নে অর্ধেন্দ্রকুমার বলেছেন, "পাশ্চাত্ত্যশিল্প তো কেবল কিছু শৈলীজ্ঞান নয়, তা আঙ্গিকের অতিরিক্ত কিছু, তা

জাতীয় মনোরূপের অভিব্যক্তি—ধর্ম বা সাহিত্যের মতোই। সকল উত্তম শিল্পই জনগণের সত্তার উচ্চারণ—সে ভাষা তার একেবারে নিজস্ব। তার অনুকরণ হয়ত কেউ করতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা কি আত্মার উদ্‌ঘাটন সম্ভব ?...কোনো ভাষাতাত্ত্বিক কি নিজের ভাষা ভিন্ন অন্যভাষায় সাহিত্যিক হতে পারেন ? ভেবে দেখুন—'দি লিঙ্গুইস্ট সারভে অব ইন্ডিয়া'র প্রণেতা (গ্রিয়ার্সন) বিদ্যাপতির মতো পদ লিখছেন !!" (রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবিও স্বকৃত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর প্রাণহীনতার কথা বলেছেন)। জাপানী শিল্পের বিশেষ প্রশংসা করেও জর্জ ক্লসেন তাঁর **Six Lectures on Painting**-এর মধ্যে বলেছেন, পাশ্চাত্ত্যের পক্ষে ও-বস্তুর চর্চা সম্ভব কিন্তু ওই ধাঁচে ছবি আঁকা সম্ভব নয়। ক্লসেনের এই বক্তব্য অর্ধেন্দ্রকুমারের মনঃপূত, এবং রাসকিনের এই কথাগুলিও : "গ্রীক শিল্প থেকে আমরা প্রথাগত নগ্নদেহ আঁকা বা খোদাই করা শিখব না—প্রাচীন গ্রীকরা কোন্ ঐকান্তিক নিষ্ঠা নিয়ে প্রকৃতির সম্মুখীন হতো, তাই আমাদের শিক্ষণীয়।" অর্ধেন্দ্রকুমার দেখেছেন, "মিঃ রায় শিল্পে জাতীয়তার উপরে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা উজাড় করে দিয়েছেন।" এক্ষেত্রে মিঃ রায়, হুইসলারের মতো, শিল্প আন্তর্জাতিকতাবাদী। হুইসলার মনে করেন, শিল্পে জাতীয় গোঁড়ামি ঢুকিয়ে দিলে তার প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় অভিব্যক্তির সামর্থ্য। এর খণ্ডনে অর্ধেন্দ্রকুমার ফরাসি সমালোচক আর্নেস্ট চেসন্যু-র কথা তুলে ধরেছেন, যাঁর বক্তব্য—উপজীব্য শিল্পবস্তুর সঙ্গে হাজার মানসিক সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে, যা তার নিজ চরিত্র, নিজ যুগ, নিজ জাতি ও নিজ প্রতিভা থেকে উদ্ভূত। শিল্পীর সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত, জাতিগত প্রতিভাই ব্যক্ত হয়—তার রূপ দেখা যায় লেখক হলে বিশেষ বাগ্‌বন্ধে, চিত্রকর হলে তুলির টানে, ভাস্কর হলে বাটালির আঘাতে। যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, শশী হেসের ছবি "শিল্পজগতে ঔপনিবেশিক সৃষ্টি"—আর প্রকৃতির বিশ্বস্ত অনুশীলন "তোতাপাখির বুলি" ছাড়া কিছু নয়—এই বিতৃষ্ণা জানাবার পরে অর্ধেন্দ্রকুমার প্রশ্ন করেছেন, বাইরের জগৎই বাস্তব, মনের জগৎ বাস্তব নয় ? মনোবাস্তবকে ফোটালে তা শিল্প হবেনা কেন ? ভাবের কি ফটোগ্রাফি সম্ভব ? তিনি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই দেখে : "মিঃ রায় 'একনিষ্ঠ হিন্দুদের' মোচড় দিয়ে কিছু সস্তা রসিকতা আদায় করবার চেষ্টা করেছেন, যেসব বেচারা হিন্দু বরাতক্রমে হিন্দুপুরাণের দত্যি-দানা, রাক্ষস-খোক্কসদের এবং বাঙালী কুমোরদের তৈরি করা মাটির মূর্তির পুজো করে।" তিনি এইসঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন : "আমরা জানিনা, হিন্দুশিল্পের ভূতপ্রেতদের আত্মা দুষ্টুমি করে মিঃ রায়কে পাশ্চাত্ত্য শিল্পমন্দিরে উপাসনাকালে বিরক্ত করেছে কিনা ?"

উপেন্দ্রকিশোর উত্তর দিলেন মডার্ন রিভিউ-এ নভেম্বর ১৯০৭ সংখ্যায়। সেই সংক্ষিপ্ত উত্তরে তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, একনিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ে তামাশা করার কোনো অভিপ্রায়ই তাঁর ছিলনা। আপত্তিকর অংশ কোথায় তা দেখিয়ে দিলে তিনি প্রত্যাহার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করতে প্রস্তুত। জাতীয়তা সম্বন্ধে তিনি "ঘৃণা ঢেলে দিয়েছেন", এর উত্তরে বললেন : "ইউরোপীয় শিল্পের ছাত্রও ভারতীয় শিল্পের ছাত্রের মতোই স্বাদেশিক হতে পারে। শিল্পে স্বাদেশিকতার গুরুত্ব যথাসম্ভব স্বীকার করেও দৃঢ়তার সঙ্গে বলব, স্বাদেশিকতাকে শিল্পচরিত্র নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি করা যায়না। নিজ অনুভূতি ও আদর্শই শিল্পীর সর্বাদি গ্রাহ্য বস্তু ; এর সঙ্গে অনেক সময়ে স্বাদেশিকতার কোনো যোগ থাকেনা, অথচ তা মহত্তম শৈল্পিক বিকাশের হেতু হতে পারে। তাছাড়া এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে, শিল্পীর আদর্শ তাঁর দেশের আদর্শ থেকে পৃথক। সেক্ষেত্রে শিল্পী যদি স্বীয়

আদর্শকে প্রতারণা করে দেশীয় আদর্শকে ধরতে যান তাহলে তিনি শিল্পীরূপে নিজ জন্মগত অধিকারকেই লঙ্ঘন করবেন।"

বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন, উপেন্দ্রকিশোরের বিখ্যাত পুত্র সুকুমার রায়ও। এখানেও তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ অর্ধেন্দ্রকুমারের। সাহিত্য পত্রিকার বৈশাখ ১৩১৭ সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের 'শাজাহানের স্বপ্ন' চিত্রের নিন্দাত্মক সমালোচনা বেরোয়। প্রবাসীর ১৩১৭ আষাঢ় সংখ্যায় 'ভারতীয় চিত্রকলা' প্রবন্ধে অর্ধেন্দ্রকুমার তার উত্তর দেন। এই উত্তরে তিনি শিল্পে স্বাদেশিকতার মূল্য সম্বন্ধে বেশ কিছু লেখেন (যে ধরনের কথা ইতিমধ্যেই তাঁর মডার্ন রিভিউ পত্রিকার লেখা থেকে পেয়ে গেছি)। তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে সুকুমার রায় প্রবাসী ১৩১৭ শ্রাবণ সংখ্যায় লেখেন 'ভারতীয় চিত্রশিল্প'। প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় তার উত্তর দেন অর্ধেন্দ্রকুমার। সুকুমার রায় পুনশ্চ তার উত্তর দেন প্রবাসীতে অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। এই বিতর্কের বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই, এবং উপেন্দ্রকিশোর-অর্ধেন্দ্রকুমার বিতর্কের বক্তব্যের অতিরিক্ত নতুন কথাও এখানে নেই। তবে সুকুমার রায়ের বিশেষ রচনাভঙ্গির দিকটি লক্ষ্য করার বিষয়। ১৯০৭ সালে প্রৌঢ় উপেন্দ্রকিশোরের রচনায় ছিল স্থৈর্য, অনুগ্র যুক্তিশীলতা। রামায়ণ-মহাভারতের ভাবরসে নিমগ্ন তিনি, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রয়োগবিজ্ঞানে দক্ষ। বাংলার নতুন শিল্প আন্দোলনের পুরোপুরি সমর্থক না হলেও, 'ইউ রায়'-এর ছাপাখানার হাফটোন পদ্ধতি ওই শিল্পীকুলের চিত্রমালাকে যথাসম্ভব বহুবর্ণে আত্মপ্রকাশের সুবিধা করে দিয়েছিল। তাঁর আঁকা ছবিগুলি অ্যানাটমিকে অগ্রাহ্য না করেও ভারতীয় ভাবধর্ম রক্ষা করেছে। নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ-এর অগস্ট ১৯১০ সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোরের 'সমুদ্রমন্থন' ছবির বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সমুদ্রমন্থনের বিখ্যাত পৌরাণিক ঘটনার চিত্রণে উপেন্দ্রকিশোর যেহেতু বাস্তবিকতা রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন তাই নিবেদিতা সেইদিক থেকে বিচার করে, ছবিতে মন্দার পাহাড়ের গায়ের মাঝখানে সর্পরজ্জু লাগানোর অনৌচিত্য, সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত ধূম ও অগ্নিকণা পর্বতগাত্রের মধ্যাংশের উপরে না ওঠার ত্রুটি, সর্পসমূহের ফণার এবং ফণাধরার ভঙ্গির আকৃতিগত অসামঞ্জস্য ইত্যাদির সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রশংসাই ছিল নিবেদিতার আলোচনার মূল সুর। শুরুতেই বলেছেন, হিন্দু পুরাণের সমুদ্রমন্থন এমন একটি বিষয় যাকে ছবিতে ধরা শিল্পীপ্রতিভার পক্ষে অসাধ্য বলেই মনে হয়। "অথচ এই ছবি দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের সে ধারণা ভুল। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বাল্যকাল থেকে ওই কাহিনীর রসে পুষ্ট জনৈক হিন্দু ওহেন জটিল ও বিষয়বহুল ব্যাপার সম্পর্কে নিজস্ব কল্পনার শক্তি রাখেন। অসুরদের যেরকম বৈচিত্র্য ও সকৌতুক মনোভাবে আঁকা হয়েছে, তা অতীব মনোরম—তেমনি মনোরম বামপার্শ্বস্থিত শিরোভূষিত দেবগণের সুকোমল রূপকথার ভাবাবহযুক্ত চিত্রণ।" নিবেদিতা আরও প্রশংসা করেছেন। শিল্পী যেভাবে একদিকে বিকটগঠন অসুরদের, অন্যদিকে মহিমসুন্দর দেবতাদের স্থাপন করেছেন, তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। "গোটা কল্পনাটির শক্তি এবং সাহস নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।"

উপেন্দ্রকিশোরের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতি মিলিয়ে আঁকা 'বাল্মীকির রামায়ণ-রচনা' বা 'বলরামের দেহত্যাগ' চিত্র পরিচিত এবং প্রশংসিত।

॥ ৬ ॥

'শিল্পে অত্যুক্তি'র সমজদার সুকুমার রায় পর্যন্ত যেখানে নব্যভারতশিল্পে চিত্রিত

নায়ক-নায়িকার হস্ত-পদের ক্ষীণ দীর্ঘতা এবং চক্ষের আবিষ্ট তন্দ্রাচ্ছন্নতার ওহেন সমালোচক, সেখানে ক্লাসিক সাহিত্য ও শিল্পের ওস্তাদ গুণগ্রাহী সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মনোভাব আলোচ্য শিল্প সম্বন্ধে কী হবে অনুমেয়—বিশেষত সেই শিল্পের উৎস যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, যেখানকার সৃষ্টি-বিষয়ে আক্রমণ করতে তিনি ন্যায়বুদ্ধিমতে বা ব্যবসায়বুদ্ধিমতে বদ্ধপরিকর। এখানে বিস্ময়ের কথা হলো, যেখানে জাতীয় মর্যাদা সম্পর্কে সমাজপতি অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, এবং তার রক্ষায় সতত যুদ্ধংদেহী—সেখানে তিনি শিল্পক্ষেত্রে বিশ্বজনীনতার পূজারী এবং কেবল আধুনিক ভারতশিল্প নয়, তিনি এমনকি পুরাতনী ভারতশিল্প সম্বন্ধেও উৎসাহহীন। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি, কোনো মানুষ সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত বিপজ্জনক। ভারতশিল্পের পক্ষে পরাক্রান্ত যোদ্ধা অর্ধেন্দ্রকুমারকে সমাজপতির হাতে অনেক মার খেতে হয়েছে ; তা হলেও তিনি জীবনপ্রান্তে পৌঁছে আত্মকথা বলতে গিয়ে ('ভারতের শিল্প ও আমার কথা') সমাজপতির পাণ্ডিত্য, কলমের জোর এবং শিল্পপ্রীতির প্রশংসা করেছেন, সেইসঙ্গে শিল্পবিষয়ে তাঁর অপ্রত্যাশিত দৃষ্টিভঙ্গির কথাও বলেছেন : "সাহিত্য-সম্পাদক সমাজপতি মহাশয়ের কাছে সৌন্দর্যসৃষ্টির আদর্শ ছিল একমুখী। তিনি ছিলেন সে-যুগের একজন উগ্র রক্ষণশীল প্রকৃতির বাঙালী হিন্দু। কিন্তু শিল্পকলার আদর্শ বিচারের সময় তিনি কোনো দেশ বা জাতিগত বিশিষ্টতা ও বিভিন্নতাকে স্বীকার করতেন না একেবারে। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন কসমোপলিটান বা বিশ্বজনীনতার সমর্থক।" দীনেশচন্দ্র সেন একটি লেখায় "কাব্যকলার অতিরঞ্জনের মতো কলাশিল্পের অতিরঞ্জনও শ্রীহারক নহে"—এমন লিখে ফেলেছিলেন। "দীনেশবাবুর এই ম্যানডেটকে" ঘৃণায় সরিয়ে দিয়ে সমাজপতি যা লিখেছিলেন, তার থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পুনশ্চ দেখা যায় :

"[তাহলে] কালীঘাটের পটও মহাচিত্র, কেননা তাহা দেশীয় চিরন্তন সংস্কার ও রুচির অভিব্যক্তি। আর র‍্যাফেলের ম্যাডোনা ? তা এদেশের চিরন্তন সংস্কার ও রুচির অভিব্যক্তি নহে, অতএব বাতিল ও না-মঞ্জুর। চিত্র ও সাহিত্য সত্যমূলক, সার্বভৌমিক। তাহা দেশকালের ক্রীতদাস হইতে পারেনা। অতিরঞ্জন সকল আর্টের কলঙ্ক। এসকল মৌলিক সত্যও দীনেশবাবুরা ভুলিয়া গিয়াছেন। কেননা, নতুন ধুয়া উঠিগাছে, ভারতবর্ষের আর্ট ভারতের নিজস্ব। অতএব অজন্তার ছবির নকল করো। [আর] যদি নূতনের উদ্ভাবন বা পৃথিবীর পরিপুষ্ট চিত্রশিল্পের অনুধ্যান করো, তাহা হইলে কালীঘাটের পট নষ্ট হইয়া যাইবে। বিবর্তে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়, কিন্তু ভারতে চিত্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকুক। গোঁড়ামির পরাকাষ্ঠা বটে।"[১৬]

উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায় কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলার অনুরাগী নন, পিতার মধ্যপন্থার পক্ষপাতীও তিনি নন—আর, পূজনীয় পিতৃদেবের বিরুদ্ধে কয়েক বৎসর আগে অর্ধেন্দ্রকুমারের সমালোচনাত্মক নানা মন্তব্য তাঁর স্বাদু না লাগতেও পারে। কৌতুকে ব্যঙ্গে তাঁর বিদিত দক্ষতা। তদুপরি বয়স তেইশ। সুতরাং অর্ধেন্দ্রকুমারের রচনা (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৭) তাঁকে কলম-অস্ত্র চালানোর সুযোগ করে দিয়েছিল। যথা—

"বোঝা গেল, ভারত-শিল্পক্ষেত্রে বাস্তবিকতার কোনো সমাদর নাই। মক্ষিকার মসীজীবিবৎ দৃষ্টবস্তুর অনুকরণ করিয়া যাওয়া ভারতীয় শিল্পের (শুধু ভারতীয় কেন কোনো শিল্পেরই) উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় চিত্রশিল্পী প্রাকৃত ব্যাপারের কোনো ধার ধারেন না। তিনি 'এনাটমি', 'পার্সপেকটিভ' প্রভৃতি গ্রীকশিল্পের 'ঠুলি' চোখে দিয়া শিল্পসাধনা করেন

না। চিত্রাঙ্কনকালে চিত্রের উপাখ্যানবস্তুর বাস্তবিক আকৃতি কিরূপ, তাহার বর্ণ লাল, নীল, কি সবুজ, এ-সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্রও মনোযোগ দেওয়া তিনি আবশ্যক বোধ করেন না। তিনি চিত্রবর্ণিত বিষয়ের চিন্তায় ধ্যানস্থ হইয়া মনশ্চক্ষে তাহার যেরূপ চেহারা দেখেন ঠিক তেমনটি করিয়া তাহাকে চিত্রিত করেন। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা তাঁহার কাছে যেরূপ বোধ হয়, অথবা তাহার যে লোকপ্রসিদ্ধ আকৃতি তাঁহার চর্মচক্ষে প্রতিভাত হয়, সে-সকল বাস্তব ব্যাপার—ফ্যাক্টস অব নেচার—সুতরাং সেগুলির সহিত তাঁহার কোনো সম্পর্ক নাই। মনোময় পুষ্পকরথে চড়িয়া কল্পনার মুক্ত আকাশে বিচরণ করাই তাঁহার বিশেষত্ব।...শিল্পক্ষেত্রে নেচারকে লইয়া টানাহ্যাঁচড়া করা বিজ্ঞানসর্বস্ব জড়বুদ্ধি-প্রধান পাশ্চাত্ত্য জগতেই সাজে ইত্যাদি।"

ভারতশিল্প-তাত্ত্বিকদের বক্তব্যের চমৎকার সামারি এবং ক্যারিকেচার। অবশ্য আসল কথাও কিছু ছিল, যেমন এই প্রশ্নগুলি—শিল্পক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ-অশ্রেষ্ঠ বিচারের প্রণালী কি ? কোনো বিশেষ সৌন্দর্য কি ভারতশিল্পের একচেটিয়া সামগ্রী ?

ভারতশিল্পের আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ আসতেই সুকুমার রায়ের কলম খরশান :

"শুনিতে পাই 'আধ্যাত্মিকতাই' ভারতশিল্পের প্রাণ ও তাহার শ্রেষ্ঠতার কারণ। এই তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা কিরূপ বস্তু ? চিত্রের নায়ক-নায়িকার চোখে-মুখে যদি একটু তন্দ্রার ভাব দেখা গেল, অথবা চারিদিকে কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া শিল্পী যদি তন্মধ্যে একটু আলোকের আভাস দিলেন, তবেই কি আধ্যাত্মিকতা চূড়ান্ত হইল ? তদুপরি যদি চিত্রে ভাবের অস্পষ্টতা লক্ষিত হয় এবং নায়ক বা নায়িকা যদি এনাটমি শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাঁহাদের অস্থিহীন অঙ্গভঙ্গির কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করিয়া বসেন তবে তো সোনায় সোহাগা।"

সুকুমার রায় চিত্রশিল্পে প্রয়োজনীয় অতিরঞ্জনের মূল্য স্বীকার করেছেন (প্রবাসীর ১৩২১, আশ্বিন সংখ্যায় তাঁর 'শিল্পে অত্যুক্তি' বলে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল তার মধ্যে তিনি 'ফিউচারিস্ট', 'কিউবিস্ট' ইত্যাদি চিত্রপদ্ধতির বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছিলেন, চিত্র-দৃষ্টান্তসহ), এবং এমনও শেষপর্যন্ত স্বীকার করেছেন—"হয়ত ভাবপ্রধান শিল্পের এরূপ একটা পুনরুত্থান বর্তমান সময়ে এদেশে বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকিবে ; প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বাড়াবাড়ির মাত্রাটাও একটু উৎকট হইয়া পড়া কিছু বিচিত্র নহে, কিন্তু"—তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"ব্যাধি অপেক্ষা চিকিৎসাটা যেন ভয়ঙ্কর হইয়া না ওঠে।" স্বমত ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ তিনি জানিয়েছেন, "চিত্র ও কাব্যের মধ্যে একটা মৌলিক প্রভেদ আছে", "চিত্রের ভাষা মূলত এবং স্বভাবত বিশ্বজনীন।" সুতরাং "গ্রীকশিল্প ও রোমীয় শিল্প ওই পথে গিয়াছে অতএব তোমার আমার ও-পথে গতি নাস্তি,...এই-যে ভারতশিল্প-রূপ কল্পতরু, আইস, আমরা ইহারই সুশীতল ছায়ায় বসিয়া বর্তমান ইউরোপীয় শিল্পকে মর্তমান কলা দেখাই"—না, সেইপ্রকার কদলী প্রদর্শনের আনন্দ থেকে সুকুমার রায় নিজেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন।

সুকুমার রায়ের দ্বিতীয় প্রতিবাদে (প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৭) অর্ধেন্দ্রকুমারের বিরুদ্ধে আরও শরক্ষেপ ছিল।

॥৭॥

সমাজপতির কথায় ফেরা থাক।

অজন্তার শিল্প পর্যন্ত যখন সমাজপতির বিশেষ পছন্দের বস্তু নয়, তখন মোলারামের চিত্র তাঁর শিরোপা পেতেই পারেনা—যতই সেই "অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ঘাড়োয়ালী

চিত্রশৈলীর শেষ ধারাবাহক মোলারামের কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চিত্রাবলীর খ্যাতি জগৎজোড়া" হোক। সুতরাং মোলারামের মানিনী রাধা চিত্রের (প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ সংখ্যায় প্রতিলিপি) ব্যাখ্যান সাহিত্য পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩১৭) এইপ্রকার : "মানিনী রাধা তাকিয়া ও গালবালিশ লইয়া মানে বসিয়াছেন। দূরে ভারতীয় প্রাচীন চিত্রপদ্ধতির ধিনিকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। রাধার গালে হাত। কৃষ্ণ স্বীয় চিবুকে বৃদ্ধাঙ্গুলি বিন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার আর এক হস্ত প্রসারিত। ইহা কি মানভিক্ষা ব্যক্ত করিতেছে ? বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বিন্যাসের উদ্দেশ্য একালে কদলী প্রদর্শন। মোলারামের মনে কি ছিল বলিতে পারিনা।" মোলারামের আর একটি ছবি 'প্রেমযাত্রা' সমাজপতির চোখে তো "ভারতীয় চিত্রকলার গঙ্গাযাত্রা।" (সাহিত্য, ভাদ্র ১৩১৭)। পুনশ্চ : "মোলারামের কালীয়দমন নামক চিত্র (প্রবাসীর ভাদ্র ১৩০৯ সংখ্যায় প্রতিলিপি) দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। ইহাও কি চিত্র ? ইহা কোন্ দেশের চিত্রকলা পদ্ধতির অনুগত ? জয়পুর অঞ্চলের প্রথায় কৃষ্ণের মস্তকের সম্মুখভাগ মুণ্ডিত হইয়াছে। কৃষ্ণ কালীয়দমন করিতেছেন, কি সুপারি গাছে উঠিতেছেন, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কৃষ্ণের মাথার উপরে নৈবেদ্যের মতো পাহাড়"। (সাহিত্য, কার্তিক ১৩০৯)।

সমাজপতির শিল্পরুচি খুবই অনিশ্চিত, আর তা স্বাভাবিক, যেহেতু তিনি বিশুদ্ধ শিল্পরুচির সঙ্গে অন্য রুচি ও অরুচি মিশিয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদনাকালে সাহিত্য পত্রিকায় বিপুলসংখ্যক চিত্র-প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে, এবং শিল্পালোচনা হয়েছে অজস্র সংখ্যায়। "১৩০৮ সাল থেকে [প্রতি] সংখ্যার শেষে 'চিত্রশালা' নামে একটি বিভাগ দেখা যায়। যে ছবিটি ছাপা হতো (অধিকাংশই বিলিতি), ছোট হরফে তার ভাবমূলক বর্ণনা 'চিত্রশালা' বিভাগে দেওয়া হতো। ...১৩১৮ সাল থেকে চিত্রের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়, মোট ৪২টি ছবি এ বছরে মুদ্রিত হয় ; পরের বছর (১৩১৯) তা বেড়ে হয় ৮২টি।"[১৭]

কলাশিল্পের উচ্চাঙ্গের আলোচনা যেমন এই পত্রিকায় হয়েছে (আলোচকদের মধ্যে ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ—এঁদের রচনা প্রত্নতাত্ত্বিক এবং তাত্ত্বিক), অপরদিকে নবীন শিল্পীদের অতীব স্থূল প্রকৃতির ছবি মুদ্রিত হয়েছে এবং তাদের উপর দীর্ঘ ব্যাখ্যানও করা হয়েছে (যেমন হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানা ছবি ও তাদের বিষয়ে মন্মথনাথ চক্রবর্তীর লেখা)। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র লেখা এক বিশেষ দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য, যা প্রাচীন ভারতশিল্পের মর্যাদা রক্ষায় সুদৃঢ় রচনা। এক্ষেত্রে তিনি হ্যাভেলের প্রতিবাদী পর্যন্ত। হ্যাভেল তাঁর 'আইডিয়াল অব ইন্ডিয়ান আর্ট' গ্রন্থে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, আর্যরা নানা কারণে চিত্রকলার বিকাশসাধনে তৎপর হননি ; পাছে অনার্যরা আর্যশিল্পকলার রহস্য জেনে ফেলে এই ভয়ে তার প্রকাশ্য চর্চা করেন নি ; অন্যদিকে পূজা-অর্চনা বা পড়াশোনায় ব্যাপৃত থাকার ফলে তাঁরা শিল্পবিষয়ে কিছুটা অনাগ্রহী হয়েও পড়েছিলেন। অক্ষয়কুমার হ্যাভেলের এই মতকে একেবারেই যুক্তিগ্রাহ্য মনে করেন নি, কারণ যেখানে আর্যদের মধ্যে যাগযজ্ঞ, উৎসব-আনন্দ, নৃত্য-গীত, সবই ছিল, সেখানে "কেবল কি চিত্রে, বা ভাস্কর্যে পরমতত্ত্ব অভিব্যক্ত করিবার সময়েই তাহারা মৌনব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল ?" (সাহিত্য, চৈত্র, ১৩১৮, 'ভারতীয় শিল্পাদর্শ')। অন্য একটি প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার, ওয়েস্টমেক্ট, বার্ডউড প্রমুখ ভারতশিল্পের বিষয়ে অনুদার লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে ভিনসেন্ট স্মিথের উদার রসগ্রাহী রচনার প্রশংসা করেছেন।[১৮]

সমাজপতি নিজেও চিত্রকলা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু তাঁর কলম খুলত ভূষণে নয়—দূষণে। কলমের দাঁতে তিনি নব্য ভারতশিল্পীদের ছবিগুলিকে আঁচড়ে ছিঁড়েছেন।

তেমন অজস্র মন্তব্যের দু'একটিকে নমুনারূপে হাজির করতে পারি।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল 'বুদ্ধ ও সুজাতা'। তার বিষয়ে সমাজপতির মন্তব্য (সাহিত্য, ভাদ্র ১৩১৬) :

"...সুজাতার পদ্মপাণিদ্বয় যেভাবে বুদ্ধের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, বুদ্ধদেব যদি তরুমূলে উপবেশন না করিয়া উচ্চ তরুশাখায় সমাসীন থাকিতেন, সেখানেও সুজাতার কর-বংশদণ্ডদ্বয় তাঁহার সম্মুখে পায়সপাত্র ধরিয়া দিতে পারিত। এমন দীর্ঘতর পাণি আকাশ হইতে চন্দ্র-সূর্যকেও অনায়াসে পাড়িয়া আনিতে পারে। 'স্বাভাবিকতার' শ্রাদ্ধই যদি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার।"

অবনীন্দ্রনাথের 'গণেশ-জননী' ছবিতে সমাজপতি দেখেছেন, "ঘাঘরা-পরা গণেশ-জননী শিশু গণেশকে তুলিয়া ধরিয়াছেন আর লাল টুকটুকে গণেশ শুঁড়ে গাছের ডাল জড়াইয়া ধরিয়া 'পালা' ভক্ষণ করিবার চেষ্টায় মশগুল।" দেখেশুনে তাঁর মনে হয়েছে, "চিত্রকর-গণেশ তুলিকা-শুণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া আমাদের প্রাচীন পৌরাণিকী কল্পনাগুলিকে পদদলিত করিতেছেন।" (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৯)।

অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাজরী চিত্র প্রসঙ্গে : "কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই ছবিখানি ! কোন্ ভাষায় বর্ণিব সেই তিন রূপসীর তিন রূপ ! কেমন করিয়া বুঝাইব তাহাদের ঢেউখেলানো দেহযষ্টির সেই আঁকা-বাঁকা ভাব, প্যাঁকাটি-বিনিন্দিত হাতের সেই ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গি, শুকনো পাকানো লতানু আঙুলের সেই উৎক্ষেপ বিক্ষেপ প্রক্ষেপ ! কোন্ ছন্দে বাখানিব এই তিন সুন্দরীর সৌন্দর্য !" (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩২৪)।

অবনীন্দ্রনাথের 'পুষ্পরাধা' ছবির প্রসঙ্গে : "প্রবাসীতে কেবল কালীর স্তূপ দেখিতেছি। ঘোর অন্ধকারে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের যে আভাস পাইতেছি তাহা পুরুষোত্তমের ভূত হইতে পারে, পুরুষোত্তম নহে।" (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩২০)।

অবনীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে প্রবাসীতে বা ভারতীতে যেহেতু নন্দলালের ছবিই অধিক প্রশংসার সঙ্গে ছাপা হয়েছে, তাই সমাজপতির দণ্ড তাঁর উপরেই বেশি পড়েছে। যেমন নন্দলালের কৈকেয়ী চিত্র প্রসঙ্গে।

"...একখানি অপরূপ চিত্র—আষাঢ়ে কল্পনার উদ্ভট উদ্‌গার। মন্থরা দেখিয়াই নয়ন মন্থর হইয়া গেল, সমগ্র সৌন্দর্য ভোগ করিবার জন্য দৃষ্টি চিত্রকরের কল্পনালোকে কুচ্ করিতে পারিল না। যত পারো গালি দাও, সত্য বলিতে ছড়িব না। এ চিত্র—কল্পনার অপমান, অত্যন্ত জঘন্য।" (সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৬)।

নন্দলালের 'মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য' ছবি নিয়ে বিতর্ক জমে উঠেছিল, যা ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্যন্ত এগিয়েছে। সাহিত্য পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩১৬) এই সূত্রে লেখা হয় :

"মহাদেব তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন অথবা হাড়গিলের মতো এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অমোঘ নিয়মে মহাদেবের আলতামাখা পদতল একটু দীর্ঘ বলিয়াই মনে হয়। আর লতানে অঙ্গুলি—চম্পক নয়, যেন লাউডগাগুলি, ত্রিশূল-দণ্ডে জড়াইয়া আছে। মহাদেবের শ্মশ্রু নাই, গুম্ফ নাই। ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অনুরোধে চিত্রকর বসুজা নরসুন্দর হইয়া মহাদেবের সেই মান্ধাতার আমলের দাড়িগোঁফ কামাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে মাথার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ মুণ্ডন করিয়া দেন নাই।"

এহেন সমালোচনা অসহ্য হয়ে উঠেছিল অর্ধেন্দুকুমারের। তিনি 'শ্রী' ছদ্মনামে প্রবাসীতে

(আশ্বিন ১৩১৬) 'মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডন' নাম দিয়ে কিছু পালটা খোঁচা দিয়েছিলেন : সমাজপতির সমালোচনা "সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয়, কিন্তু কুৎসা জল্পনা ;" তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে হাড়গিলা বলেছেন : "ভদ্রসন্তানকে ইতর ভাষায় গালি দিয়াছেন ;" তাঁর "গালিবর্ষণপটুতা দেশবিখ্যাত"— অর্ধেন্দুকুমার লিখেছেন। সেখানেও না থেমে তিনি ভারত-শিল্পালোচনায় সমাজপতির "অনধিকারচর্চা" দেখাতে তীক্ষ্ণভাষায় প্রশ্ন করেছেন, প্রধান পুরাণ উপপুরাণ কাব্য সাহিত্য, কোথায় মহাদেবের শ্মশ্রু আছে উনি দেখিয়ে দিন ? ব্যঙ্গ করেছেন এই বলে ; "রূপমালা স্তবমালা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ ও শিল্পশাস্ত্র, যেগুলি বিশেষ করিয়া শিল্পীগণের জন্য রচিত, তাহার কোথাও মহাদেবের দাড়ি বাহিয়া গঙ্গা নামিতেছেন কিংবা গিরিসুতা সেই বিকট দাড়ির উকুন বাছিতেছেন, এরূপ বর্ণনা আছে বলিয়া মনে তো পড়েনা !" মহাদেব নীলকণ্ঠ—এখন "পিঙ্গল দাড়ির অন্তরালে মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়া কেমন শোভা ধরিয়াছেন," তার বর্ণনাও পুরাণাদি থেকে যোগাড় ক'রে দেবার সুমিষ্ট অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এখানেই শেষ নয়, প্রবাসী-সম্পাদক রসান দিয়ে এই মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলেন : "যাঁহারা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের এই চিত্রখানির উৎকর্ষ বুঝিতে চান, তাঁহারা সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউ-এ ভগিনী নিবেদিতা ও ডাক্তার কুমারস্বামীর তৎসম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ করুন। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাদের ইংরাজি বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া original হইতেই হইবে।"

আর যায় কোথা ! নিন্দার একমাত্র অধিকারে হস্তক্ষেপ !! সমাজপতির রে রে লেখা বেরুল অগ্রহায়ণ ১৩১৬, সাহিত্যে। তার গোটা চেহারা হাজির করা দরকার নেই। অংশত তাঁর মন্তব্য : "ভারতশিল্প ও দেবমূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার কেবল ঠাকুরবাড়ির পটুয়া, পরিকর ও মুরুব্বিদিগকে ও তাঁহাদের বাহন প্রবাসীকে কোন্ কর্নওয়ালিস দলিল লিখিয়া দশশালা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারিনা। কিন্তু দেখিতেছি, সে অধিকার চিরস্থায়ী স্বত্বে পরিণত হইয়াছে।" "মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল ও রাস্কিনের অবতারদের" "নির্লজ্জ স্তাবকতার" উপরে যথাবিহিত নিন্দাবর্ষণের পরে তিনি প্রবাসী-সম্পাদককে নিয়ে পড়েছেন, যাঁর এমন স্পর্ধা যে, সমাজপতিকে নিবেদিতা, কুমারস্বামীর কাছে শিল্প-পাঠ নিতে অনুরোধ করেছেন, এমনকি সমাজপতির ইংরেজবিদ্যা সম্বন্ধে কটাক্ষ পর্যন্ত করেছেন ? প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে সমাজপতি লিখলেন : "অর্থাৎ যাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির রসগ্রহণে অক্ষম তাঁহারা ইংরাজি জানেন না। আর যাঁহারা ভগিনী নিবেদিতা ও কুমারস্বামীর মতগুলি নির্বিচারে শিরোধার্য করিতে না-পারেন, তাঁহারা মূর্খ ! ছাত্রজীবনে এরূপ বিদ্যার 'গুমোর' শোভা পাইতে পারে—এখন পরব্রহ্মের দিকে যার পা তাঁহার পক্ষে খাটে না। ...চক্ষু দুইটি কেবল বুজিবার জন্য নহে, দেখিবার জন্য। নিজেও দেখিতে শিখুন। কেবল কুমারস্বামী, নিবেদিতা প্রভৃতি পরের চক্ষু দিয়া জগতে, অন্তত আমাদের হিন্দুজগতে, শনির দৃষ্টি দিবেন না। ...স্বীকার করিতেছি, আমরা ইংরেজি জানি না, গৌরাংবাণীতে মূর্খ এবং নিবেদিতা ও কুমারস্বামীকেও গুরু মানিনা ; কিন্তু যাহা জানি, অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাকে তাহা নিবেদন করিলাম।"[১১]

সমাজপতির আক্রোশের অংশ বাদ দিলে, শিল্প-আন্দোলনের প্রথম পর্বের অনেক ছবিতেই যে দেহগঠনকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা মাত্রা ছাড়িয়েছিল, তা স্বীকার্য, আর ওই কাজ পাশ্চাত্যশিল্পী এল গ্রেকো-তুল্য প্রতীকী অবয়বভঙ্গের স্তরেও ওঠেনি। সমাজপতি প্রয়োজনমতো প্রশংসার ফোঁটা বর্ষণও করেছেন (নন্দলাল তাঁর 'জগাই মাধাই' ছবির ক্ষেত্রে

তেমন-কিছু লাভ করেছেন), এবং তিনি সঙ্গত সমালোচনার সুযোগ পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-অঙ্কিত 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' ছবির সূত্রে। ছবি নয়, ছবির বিষয়বস্তুই প্রধানত আক্রমণের কারণ। সুরেন্দ্রনাথ প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে এমনকি নন্দলাল অপেক্ষাও প্রাচীন শিল্পের রসগ্রহণে অধিক সমর্থ বিবেচনা করেছেন। কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষয়রোগে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে। তার আগেই তাঁর অনেক ছবি বেরিয়ে গেছে প্রবাসী, ভারতী ও মডার্ন রিভিউ-এ ; নিবেদিতার **Myths Of the Hindus and Buddhist** বইয়ের জন্যও ছবি এঁকেছেন। ইনি অষ্টাদশ যবন-অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় এবং বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের বিনাযুদ্ধে গোপনে পলায়নের প্রচলিত কাহিনীতে বিশ্বাস করে উক্ত ছবিটি এঁকেছিলেন, এবং তা মডার্ন রিভিউ-এ বেরিয়েছে। একই কাগজের জানুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় **The Flight of Lakshman Sen** নাম দিয়ে এক রচনায় নানা ঐতিহাসিক তথ্যযোগে দেখালেন, উক্ত পলায়নকাহিনীর তথ্যভিত্তি কত দুর্বল—তদনুযায়ী তিনি আপত্তি করলেন ছবিটি আঁকার ঔচিত্য বিষয়ে। একই বিষয়ে অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ বেরিয়েছে পৌষ ১৩১৫ বঙ্গদর্শন এবং মাঘ ১৩১৫ প্রবাসীতে। অপরপক্ষে সুরেন গাঙ্গুলীর ছবিকে তারিফ করার মতো লেখকের অভাব হয়নি। সে-কাজ করেছিলেন কুমারস্বামী (মডার্ন রিভিউ, মার্চ ১৯০৯)। তাঁর যুক্তি, ঐতিহাসিক সত্যাসত্যের বিচারকে ছবির রসসত্যের বিচারের ক্ষেত্রে টেনে আনা উচিত নয়। অবনীন্দ্রনাথও একই যুক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার যেমন লক্ষ্মণসেনের কলঙ্কভঞ্জন করতে চেয়েছেন, তেমনি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ চেয়েছেন শিষ্য-শিল্পীর কলঙ্কভঞ্জন করতে—প্রবাসীর বৈশাখ ১৩১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কলঙ্কভঞ্জন' শীর্ষক পত্রে এবং বঙ্গদর্শনের বৈশাখ ১৩১৬ সংখ্যায় 'নামকরণ রহস্য' প্রবন্ধে। অবনীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন, ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে দায় নেই শিল্পীর, তিনি কটু থেকে মধু, হীনতা থেকে মিষ্টতা বার করতে পারেন ইত্যাদি।

শিল্পীদের পক্ষে উপস্থাপিত এইসব যুক্তির মধ্যে মস্ত ফাঁক থেকে গিয়েছিলই। যদি কেউ ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন তিনি অবশ্যই বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্বন্ধে চিত্র-দর্শকের পূর্বলব্ধ ধারণার সাহায্য চান—নচেৎ ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনার উল্লেখের প্রয়োজনই হয়না। সুরেন্দ্রনাথ আলোচ্য ছবিটির সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের নাম যুক্ত না-করে তো স্বচ্ছন্দে বললেই পারতেন একটি বৃদ্ধের পলায়ন। ইতিহাসের সাহায্য নেব অথচ ইতিহাসের সত্য মানব না—এই দুই দিকের ফল কুড়োবার নীতি সমুচিত নয়—বিশেষত যদি চিত্রবিষয়ের ঘটনাগত কোনো গৌরব না থাকে, বরং তা লজ্জাজনক কাপুরুষতার নির্ঘোষিক হয়। অক্ষয়কুমারে এই আপত্তি তাই সঙ্গত : "একজন সুনিপুণ চিত্রকর…একখানি চিত্রপট রচনা করিয়া লক্ষ্মণসেনের পলায়নকলঙ্ক চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।" এক্ষেত্রে সমাজপতি সুযোগ পেয়েছিলেন। সাহিত্য পত্রিকার বৈশাখ ১৩১৬ সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধের ধারালো সমালোচনা করে লেখেন :

"অবনীন্দ্রনাথ ভুলিয়া গিয়াছেন, [লক্ষ্মণসেনের পলায়নের] এই কল্পিত হীনতার সহিত জাতীয়তার সংস্রব আছে। যাহা সত্য নহে, জগতে তাহার স্থান নাই। কাব্যে বা চিত্রে মিথ্যা জাতীয়-কলঙ্ক লইয়া যে-প্রতিভা 'কটু হইতে মধু, ও হীনতা হইতে মিষ্টতা' বাহির করে, ভদ্রলোকে দূর হইতে তাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন।…সাত শত বৎসরের জুতার স্মৃতি বাংলার নানা সত্য ঘটনায় মুদ্রিত আছে ; নব্য চিত্র-প্রতিভার পক্ষে জাতীয়-কলঙ্ককাহিনীই যদি মৃতসঞ্জীবনী হয়, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় তাহাই আঁকিতে থাকুন ; সেজন্য

আর নতুন কলঙ্কের সৃষ্টি করিবেন না ; মিথ্যাকে সত্যের আবরণ দিয়া স্বজাতির মনে বেদনা দিবেন না ; দো-আঁশলা ভাব ও ভাষার চটকে কুরুচি ও মিথ্যাকল্পনার ওকালতি করিয়া বাঙালীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবেন না।"[২০]

লক্ষ্য করার বিষয়, নব্য ভারতশিল্প আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যাঁরা শিল্পে আন্তর্জাতিকতার পক্ষসমর্থন করে পাশ্চাত্যশিল্পের প্রতি বিশেষ আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন, এবং অবনীন্দ্রপন্থীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন, সেই উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার রায়, কিংবা সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রবিবর্মার ছবি সম্বন্ধে উৎসাহ দেখান নি। ব্যাপারটা আপাতত কিছু বিস্ময়কর। এর কারণ এইমাত্র হতে পারে, পাশ্চাত্য শৈলীতে দক্ষতা সত্ত্বেও রবিবর্মার ছবির মধ্যে ওঁরা চিত্ররস খুঁজে পাননি। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার গল্পকার, নক্সাশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্য পত্রিকার নিয়মিত লেখক ; হ্যাভেলের 'আইডিয়ালস্ অব ইন্ডিয়ান আর্ট' বইয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে আইডিয়ালিস্টিক ও রিয়ালিস্টিক এই দুই ধারার অস্তিত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিল্পেই আছে—এই কথা বলে অযথা বিতর্কের ইতি ঘটাতে চেয়েছিলেন সাহিত্য পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সংখ্যার এক প্রবন্ধে—'ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি।' তিনি স্বীকার করেছেন, "আমি নিজে অবনীন্দ্র ঠাকুরের ছবির পক্ষপাতী ; কিন্তু বিপক্ষদলের দাপট দেখিয়া বরাবর চুপ করিয়া আছি।" তবু নব্যরীতির ছবি দেখে তাঁর অভাবী বাসনা, "শ্রীকৃষ্ণের ও মহাদেবের মুখের ভাব একটু যেন পুরুষের মতো হয়, [সমুদ্রমন্থনের] অসুরগণের…বর্ণটা আরও কালো এবং ভঙ্গিটা আরও বিকট করিয়া দিই। ঘোড়াগুলোকে আরও দুটি দানা খাওয়াইতে ইচ্ছা করে।" নব্যরীতির চিত্র-চরিত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার হেতুও তিনি জানিয়েছেন : "রবিবর্মার কাঠখোট্টা স্ত্রীলোক দেখিয়া ভয় হয়! মনে হয় যে তাহারা নূতন চিত্রকলার শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবকে টিপিয়া নিমেষের মধ্যে নিকাশ করিতে পারে। মহারাষ্ট্রীয় কল্পনা সবল ও প্রবল। [রবিবর্মা কিন্তু কেরালার লোক] বাংলার কল্পনা কৃশ ও কোমল। রবিবর্মার ধাঙড়ের মতো বিশ্বামিত্র, ঠাকুর-মহাশয়ের কচ ও দেবযানীকে একদম গিলিতে পারে, এবং রবিবর্মার ময়ূর অবলীলাক্রমে সসর্প মহাদেবকে তাণ্ডবনৃত্যের সময় মুখে লইয়া সরস্বতী দেবীর কুঞ্জে রাখিতে পারে।"[২১]

॥৮॥

রবিবর্মা-বিরোধী সমালোচনাকে খণ্ডন করার বিশেষ চেষ্টা বাংলার পত্র-পত্রিকায় আলোচ্যকালে হয়েছে এমন দেখিনি। একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ এসেছিল 'রবিবর্মার জনৈক ছাত্রে'র কাছ থেকে। সেই দীর্ঘ লেখাটি বেরোয় মডার্ন রিভিউ-এর অগস্ট ১৯১০ সংখ্যায়— **The Indian Fine Art Critics.,** by 'A Student of Mr Ravi Varma, the Famous Indian Artist'। নিবেদিতা ও কুমারস্বামীর রবিবর্মা-বিরোধী বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে ইনি বলেছেন : "এইসব ভারতীয় শিল্প-সমালোচকদের রুচি অল্পবিস্তর আবেগ ও গোঁড়ামি-চালিত।…ওঁরা ম্লান ছবি, বিকট মূর্তি দেখলে ভাবের ঘোরে মূর্ছা যান—পুরনো রীতিতে আঁকা বা খোদাই করা হয়েছে, এই ভিন্ন যাদের অন্য গুণ নেই। অপরপক্ষে ওঁরা রবিবর্মার সুন্দর ছবিগুলিতে 'কল্পনার অভাব', 'ভারতীয় ভাবের ন্যূনতা', 'থিয়েটারি ধারণা' ইত্যাদি দেখে ফেলেন।" সমস্তরের বা উচ্চস্তরের মানুষ ভিন্ন কেউ অপরের সমাদর করতে পারেনা—রাসকিনের এই উক্তি ইনি নিজ প্রয়োজনে উদ্ধৃত করেছেন। নিবেদিতা সম্বন্ধে মন্তব্যের কালে ইনি অবশ্য কিছুটা সম্ভ্রমরক্ষা করেছিলেন।

রবিবর্মার 'শকুন্তলার পত্রলিখন' ছবিকে লক্ষ্য করে নিবেদিতা লিখেছেন, আগেই দেখেছি যে, ফ্যাশান সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জনরুচিতে এমন বিপর্যয় ঘটিয়েছে যে, এদেশে মেয়েদের একটি বিশেষ ভঙ্গি অশালীন বলে বিবেচিত হলেও এই দেশের ঘরে-ঘরে এমন একটি ছবি ঝুলতে দেখা যায় যাতে একটি মোটা মহিলা মেঝেয় সটান লম্বা শুয়ে পদ্মপাতায় চিঠি লিখছে। রবিবর্মার উক্ত ছাত্র কালিদাসের কাব্যের প্রচুর শ্লোক তুলে দেখাতে চেয়েছেন, মেয়েদের পক্ষে ওভাবে শোওয়া মোটেই রুচিহীন নয়। তাঁর দুঃখ, "সিস্টার নিবেদিতার মাপের একজন বুদ্ধিমতী ও চিত্তাকর্ষক লেখিকা চিত্রদৃশ্য ও চিত্রকরের মনোভাব সম্বন্ধে এমন সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পোষণ করলেন কিভাবে !" রবিবর্মার 'অর্জুন ও সুভদ্রা' ছবি সম্বন্ধেও নিবেদিতার ভুল ধারণা দূর করতে ইনি সচেষ্ট ছিলেন।

কুমারস্বামী সম্বন্ধে মন্তব্য করার কালে এই লেখক কিন্তু সম্ভ্রমরক্ষার কোনো চেষ্টাই করেন নি, কারণ কুমারস্বামী শিক্ষায় ও বৃত্তিতে 'জিওলজিস্ট'। কুমারস্বামী ভালো ছবি বলতে কাগজের উপরে দুর্বল হাতে আঁচড়-কাটা নরনারীর আকৃতি বোঝেন, যাদের দেখলে এই লেখক হাসি চাপতে পারেন না। এহেন কুমারস্বামী রবিবর্মার ছবিতে কল্পনাশক্তির অভাব, থিয়েটারি পরিকল্পনার প্রাদুর্ভাব এবং ভারতীয় ভাবচেতনার অনুপস্থিতির সমালোচনা করবেন, আর তাকে সহ্য করতে হবে ? "তবে আমরা একজন জিওলজিস্টের কাছে এর থেকে বেশি-কিছু আশা করতে পারিনা। তিনি যে অসাড় ও পাথুরে জিনিস পছন্দ করবেন, তা ধরেই নেওয়া যায়।"

'থিয়েটারী কল্পনা' কথাটা উক্ত অনুরাগী ছাত্রকে বিশেষ বেজেছিল বলে বারে বারে কথাটার কাটান দিতে চেষ্টা করেছেন। রবিবর্মার 'দময়ন্তী ও হংস' ছবিতে কতখানি কল্পনার খেলা, তাতে প্রেম-ঝটিকার কোন্ নিদারুণ প্রবাহ, তা উনি সবিস্তারে বুঝিয়েছেন। "ধরা যাক ওই ছবি [অবনীন্দ্রনাথের] 'নির্বাসিত যক্ষের' স্টাইলে আঁকা হলো—দুর্ভিক্ষ বা মড়কের কথা স্মরণ করায় এমন রোগা-দুব্‌লা চেহারা যাদের তারা এসে গেল—যেমন বোকা-বুদ্ধু-মুখ মাদ্রাজের ট্রামলাইনের ধারে দাঁড়ানো কোনো কোনো লোকের মধ্যে দেখা যায়"—সেই কাণ্ড ঘটলে কি বীভৎস ব্যাপার হতো তা মনে করে উনি শিউরে উঠেছেন। "অপরপক্ষে নিষ্ঠাভরে রবিবর্মার ছবির চর্চা করলে বুঝতে পারা যাবে, মানবিক অনুভূতিকে রূপায়িত করার শক্তিতে তিনি সকল ভারতীয় শিল্পীকে ছাপিয়ে গেছেন।...আধ্যাত্মিক ধ্যানকে যদি খাঁটি শিল্পের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হয় তাহলে রবিবর্মা তুলি-হাতে-ব্যক্তিদের মধ্যে অদ্বিতীয়।" রবিবর্মার ছবিতে পাশ্চাত্ত্য অনুকৃতি প্রসঙ্গে এঁর বক্তব্য, পুরনো সকল ভারতীয় ছবিই—কাংড়া, দিল্লী বা অজন্তা—নির্ঘাত বিদেশ-প্রভাবিত। তাছাড়া রবিবর্মা তো শুধু পাশ্চাত্ত্য টেকনিক নিয়েছেন—আর টেকনিক ব্যাপারটা তো ভাষায় ক্ষেত্রে লিপির মতো। ইংরাজি, জার্মান বা ফরাসি লিপিতে সংস্কৃত শ্লোক লিখলে তা কি ওইসব ভাষার রচনা হয়ে যায় ?—ইনি প্রশ্ন করেছেন। ছবিতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে এঁর ব্যঙ্গ : আমাদের অতি পূর্বপুরুষেরা পাতায় অঙ্গ ঢাকতেন—জাতিবৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে কি ভারতীয়দের কোমরে পাতা ঝোলাতে হবে ? ইনি সাফ জানিয়েছেন : "ডঃ কুমারস্বামী এবং মিঃ হ্যাভেলের ব্যবস্থাপত্রের সাহায্যে বই বানানো যায়, শিল্পী নয়।"

॥ ৭ ॥

এইকালের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যাবে শিল্পবিষয়ে প্রচুর সংখ্যায় লেখা বেরিয়েছে এবং সমর্থ লেখকেরা তাতে অংশ নিয়েছিলেন। বোঝা যায়, কলাশিল্পভাবনাকে

জাতীয় উত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত চিন্তা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। বিদেশীদের চোখেও তা ধরা পড়েছে, সমসাময়িক পত্রিকাদিতে তাঁদের মন্তব্যে তা প্রমাণিত। ভারতীয় উদ্বোধনের সঙ্গে যিনি নিজের ত্যাগময় জীবনকে যুক্ত করেছিলেন সেই সি এফ এণ্ডরুজের কিছু মন্তব্য দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। মডার্ন রিভিউ-এর নভেম্বর ১৯০৮ সংখ্যায় বেরিয়েছিল তাঁর **National Literature and Art** প্রবন্ধ। এণ্ডরুজ তখন সবে তাঁর পাদরী ভূমিকা ছাড়ছেন, সেইসময় এটি লিখেছেন। তখনো তাঁর বাইরের মানুষের চোখ সজাগ, অথচ ভারতপ্রীতির সূচনা হয়েছে—সেজন্য লেখাটি এইকালকে বুঝবার পক্ষে সহায়ক। "এই প্রশ্নটি বিবেচনা করার আছে : ভারতে সবিশেষ শক্তি ও জেদের সঙ্গে যে-জাতীয়-আন্দোলন জেগে উঠেছে, [এণ্ডরুজ লিখেছেন], তা কি এখনো পর্যন্ত মহৎ সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টি করতে পেরেছে ? ভারতবর্ষ বস্তুতপক্ষে কি আনন্দময় আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে, কাব্য ও শিল্পের জগতে, নবশক্তির উন্মোচনের ব্যাপারে প্রাণোদিত ?" জাতীয় আন্দোলনের সূচনা বেশিদিনের নয়, তাই সুস্পষ্ট উত্তর এখানে পাওয়া যাবেনা—এ কথার পরে এণ্ডরুজ যোগ করে দিয়েছেন— "কিন্তু যাঁরা বাংলার শিল্প, সঙ্গীত এবং সাহিত্যের অসাধারণ ইতিহাসকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুশীলন করেছেন,...তাঁরা অবশ্যই দেখেছেন, সেখানে জাগরণ শ্রেণীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা হয়ে উঠেছে সর্বসাধারণের।" বাংলার কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্প—"চরিত্রে অদ্ভুতভাবে ভারতীয়"। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। লাহোরের মাননীয় বিচারপতি পি সি চ্যাটার্জির সম্মানে আহূত দিল্লীর এক বাঙালী সমাবেশে, যেখানে কলেজ-অধ্যাপক, আইনজীবী, ডাক্তারদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে উপবিষ্ট নগণ্য কেরাণী এবং ভৃত্যরা—এণ্ডরুজ দেখে অবাক যে—সেখানে পূর্বেকার 'ইংরাজি-জ্বরগ্রস্ত' বাঙালীরা বাংলায় গান করছে, কবিতা পড়ছে। "নতুন বাংলা—জাতীয় আন্দোলনের বাংলা, রেনেসাঁসের বাংলা।" কী বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে, সে সম্বন্ধে এণ্ডরুজ বলতে চেয়েছেন :

> **"আর পাশ্চাত্ত্যের নিছক চতুর নকলনবিশি নয়। তার পরিবর্তে অবনীন্দ্রের সুকুমার লাবণ্যকোমল প্রাচ্য চিত্রশিল্প—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ও সঙ্গীত—রেনেসাঁসের বাংলার অনেক বিখ্যাত স্রষ্টার মধ্যে এই দু'জনের নামই করলাম। বাংলাভাষা জানিনা বলে বাংলা সাহিত্যের বিচার করতে আমি সমর্থ নই, কিন্তু চিত্রশিল্পের নমুনা কিছু কিছু দেখেছি, এবং গান শুনেছি—তাই স্বাদেশিকতার ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার হয়েছে, এই যে জাগরণ ঘটছে তা মোটেই কৃত্রিম নয়, জনসম্পর্কহীন উৎসাহীদের তাগিদের নড়াচড়া নয়—এ হলো খাঁটি উত্থান, যাকে জনসাধারণ বুঝতে পারে এবং সহস্রমুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"[২২]**

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ "Should the time come for the history of the progress of art in India be written, his [Ravi Varma's] name will stand first as tho father of mordern Indian art. [Ramananda Chatterjee, Kayastha Samachar, Dec. 1902]

২ বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে বাংলায় শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা সম্বন্ধে প্রদীপ পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬ সংখ্যায় সম্পাদকীয় রচনায় (সম্পাদক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) লেখা হয় :

"'চিত্র ও কাব্যে' আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা আছে—ললিতকলার আলোচনা। ভারতবর্ষ হইতে অনেক দিনই

ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যার তিরোধান হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমোঘ নিয়মবলে ঐ সকল বিষয়ে আমাদের রসাস্বাদনশক্তিও লোপ পাইয়াছে। আজকাল আবার রবিবর্মা, ক্ষাত্রে প্রভৃতির শিল্পচাতুর্যে এই দীন দেশের পূর্বগৌরব জাগ্রত হইবার সূচনা দেখিতেছি। এই পুস্তকে ['চিত্র ও কাব্য'] ও অন্যত্র বলেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতাবলে তাঁহাদের নবীন প্রতিভার যথোচিত সমাদর করিয়াছেন।"

৩ শিল্পের বরণীয় আদর্শ সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথ স্থিরনিশ্চিত হতে পারেন নি। তিনি যখন রবিবর্মার শেষ প্রশস্তি করেছেন, তার আগেই 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার মধ্যে মুঘল চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে এবং বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে ভারতশিল্পের প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন। বাংলার শিল্প-সমালোচনার আদিপর্বে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। আশ্চর্যের বিষয়, ওহেন লেখার পরেও রবিবর্মার চিত্রের স্তুতি করতে তাঁর বাধেনি।

৪ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর **Swami Vivekananda—Patriot-Prophet** বইয়ে বলেছেন—এই ঘটনার কথা তিনি বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের মুখে শুনেছেন। বৈকুণ্ঠনাথ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' বইয়ে (বাংলা ১৩৪৩ সাল) এই ঘটনার কথা যেভাবে বলেছেন তাতে মনে হয়, স্বামীজী স্বয়ং শিল্পীকেই তাঁর ত্রুটির কথা বলেছিলেন। এর দ্বারা অবশ্য পুনার ঘটনাটি বাতিল হয়ে যায়না।

৫ বাণী ও রচনা, ৬—২১৫।

৬ ঐ, ৯—১৮৯।

৭ "The unimaginative Anglo-Saxon succeeded the imaginative Mogul in the sovereignty of India, and the people, distracted by the long years of anarchy, accepted the change gladly." [E.B. Havell, Indian Sculpture and Painting, 2nd ed. p. 243.]

৮ E.B. Havell, Ibid, p. 234.

৯ Ibid, pp. 234-35.

১০ Modern Review, Oct., 1909

১১ NCW, III, p. 18.

১২ Ibid, V, p. 304.

১৩ কুমারস্বামীর Introduction to Indian Art বইটির পরবর্তী এক সংস্করণ মুলুকরাজ আনন্দ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। তাতে সংযোজিত এক অধ্যায়ে মুলুকরাজ বেঙ্গল স্কুলকে প্রচুর নিন্দামন্দ করেছেন, এবং উক্ত আন্দোলন সম্বন্ধে কুমারস্বামীর পরবর্তী হতাশার কথা জানিয়েছেন।

১৪ শ্রীঅশোক মিত্র, 'The Force Behind The Modern Movement' প্রবন্ধ, Lalit Kala Contemporary, January 1962.

১৫ কুমারস্বামী লিখেছেন :

"Mr Nanda Lal Bose, more perhaps than any other Indian painter, has reached the heroic level in his glorious 'Sati'. The work is in itself a sole, sufficient answer to all the blind and grovelling criticism that has been levelled at that great ideal."

সতী প্রথা যে বীভৎস তা কুমারস্বামী জানতেন। কিন্তু ব্যক্তিসম্পর্কের মূল্যের জন্য আত্মদান কিভাবে আদর্শায়িত আত্মোৎসর্গে পৌঁছায়, তার বীররসই নন্দলালের ছবিতে রয়েছে, কুমারস্বামী বলতে চেয়েছেন :

"No figure in the world's art could be more selfless, more wrapped in the unit of personal devotion, more terribly sweet-perfect than this young serene Bengali girl." [Modern Review, Sep. 1909]

১৬ অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা', পৃ ১৭৯-৮০

১৭ ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় ও রচনাপঞ্জী', (১৩৮০), পৃ ১৫-১৬

১৮ ঐ, পৃ ৮৮-৮৯

১৯ পঞ্চানন মণ্ডল, 'ভারতশিল্পী নন্দলাল', প্রথম খণ্ড (১৯৮২), পৃ ৩৩৮-৪৩।

২০ সাহিত্য পত্রিকা যদিও আমি পুরো সন্ধান করেছি, তবু এই পত্রিকার কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি উপস্থিত করেছি অর্ধেন্দ্রকুমারের গ্রন্থ থেকে।

২১ ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড পৃ ২৬৭।

২২ C.F. Andrews, National Value of Art, (Modern Review, November 1908)

(এক্ষেত্রে শিল্পবোধ সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছি নন্দলালের স্মৃতিকথা থেকে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চিত্রকলার চর্চা তিনি করেছেন, রাফায়েল, মিকেলাঞ্জেলো, লেওনার্দো দা ভিঞ্চিকে বাদ দিলে, তাঁর মতে, (রেমব্রান্টসহ) অন্য শিল্পীদের ছবি জীবন্ত হলেও, বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। ক্রমে টেকনিকের উন্নতি হলেও আইডিয়ার দীনতা আসতে লাগল, ছবি হয়ে উঠল জড়বস্তু। তার তুলনায় প্রি-র‍্যাফেলাইট যুগের ছবি উৎকৃষ্ট, কেননা সে সকলের মধ্যে আইডিয়া ও কাজ, দুইই উচ্চাঙ্গের, ইত্যাদি। এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের পোর্ট্রেটও করেছেন। (পঞ্চানন মণ্ডল, 'ভারতশিল্পী নন্দলাল', ২য়, পৃ ১৪৯)

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিল্প-আন্দোলনের সমর্থনে অরবিন্দ

আলোচ্যকালে চরমপন্থী রাজনীতিতে এবং ধর্মে নিবিষ্ট অরবিন্দ প্রবলভাবে নব্য ভারতশিল্পের পক্ষ সমর্থন করেছেন—পরবর্তীকালেও তার থেকে বিরত থাকেন নি। বুদ্ধিদীপ্ত জোরালো ভাষায় ভারতীয় শিল্পকলার প্রাণসত্য যেভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন তাতে দেখা যায়, ওইসব লেখায় বিবেকানন্দের শিল্পকলা বিষয়ক কিছু উক্তির উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণমূলক সমর্থন মিলেছে। এক্ষেত্রে নিবেদিতা ও অরবিন্দ সহমর্মী এবং সহযোদ্ধা।

অরবিন্দ প্রভাবাধীন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় শিল্প-আন্দোলন সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তবে সেগুলি ঠিক কার রচনা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন' অরবিন্দর দ্বারা প্রায় শেষপর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। পত্রিকাটি আরম্ভ হয় ৫ আষাঢ় ১৩১৬। এর দ্বিতীয় সংখ্যায় **The Awakening Soul of India** রচনায় অরবিন্দ অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার উল্লেখ করেন। তৃতীয় সংখ্যায় **Two Pictures** রচনায় প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত চিত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়, সেইসঙ্গে ভারতীয় কলাশিল্প সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনাও থাকে। পনেরো সংখ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত রামায়ণের উপর আলোচনা ছিল—**Indian Art and an Old Classic**—যার মধ্যে রবিবর্মার ছবির কঠোর নিন্দা করা হয়েছিল। সতেরো সংখ্যার রচনা **Revival of Indian Art—The Main Difference**। বিশ থেকে পঁচিশ সংখ্যায় ধারাবাহিক আলোচনা— **The National Value of Art**। তেইশ সংখ্যায়—**Indian Art and Industry—Mr. Havell's View**।

অরবিন্দ গোপনে কলকাতা ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী প্রস্থান করবার পর পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য নিবেদিতা কিছুদিন কর্মযোগিন চালিয়েছিলেন। সেইকালে শিল্পের উপরে অনেকগুলি লেখা (পুনর্মুদ্রণসহ) কর্মযোগিন-এ বেরিয়েছে। তার থেকে বোঝা যায়—নিবেদিতা স্বাধীনভাবে পত্রিকা চালালে শিল্প তাতে কতখানি স্থান জুড়ে থাকত। তাঁর সম্পাদনাকালে বত্রিশ সংখ্যায় বেরিয়েছিল—**Vedantic Art;** সেইসঙ্গে মডার্ন রিভিউ

থেকে সংকলিত হয় কুমারস্বামীর—**The Function of Schools of Art in India**। চৌত্রিশ সংখ্যায় ফার্গুসনের রচনা থেকে সংকলন—**Indian Architectural Art**। ছত্রিশ সংখ্যায়—**Mr. Havell on Indian Art**। আটত্রিশ সংখ্যায়—**Dr. Coomaraswamy on Mr. Havell's Paper on Indian Art**, এবং **Mr. W. Rothenstain on the Singnificance of Indian Art**।

যে-তালিকা দিলাম তা সম্পূর্ণ নয় ; সবকটি সংখ্যা দেখার সুযোগও হয়নি ; এবং কর্মযোগিন-এ প্রকাশিত হয়েছে এমন সকল সংশ্লিষ্ট রচনার উল্লেখও করিনি।

এইকালের বিভিন্ন রচনায় ব্যক্ত অরবিন্দর অভিমতের প্রসঙ্গে আসার আগে বলে নেওয়া দরকার—শিল্পবিষয়ে তাঁর ধারণায় পরিবর্তনও ঘটেছে। ১৮৯৪ সালে, ভারতে কিছুপূর্বে-প্রত্যাগত অরবিন্দ, রাজনৈতিক চিন্তায় উগ্র জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠলেও, যেহেতু ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ঘটেনি তাই 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকার ২৭ অগস্ট ১৮৯৪ সংখ্যায় **Our Hope in the Future** রচনায় লিখতে পেরেছিলেন— "চিত্র ভাস্কর্য প্রভৃতিতে হিন্দুশিল্পীর কল্পনা উচ্চশ্রেণীর নয়", বরং "তাঁদের পছন্দসই রীতিতে দেখা যায় অমিতাচারীর ঘোলাটে দৃষ্টি ও বিকৃত রুচির চিহ্ন।"

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ' গ্রন্থে অরবিন্দর এহেন মনোভাবের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রথমত গ্রীক রসানুভূতিতে অরবিন্দর মন পুষ্ট হয়েছিল, আর গ্রীসের কাছে যা-কিছু না-গ্রীক তাই কুৎসিত ; দ্বিতীয়ত, ওইকালে ইউরোপে হিন্দুশিল্পের সমাদর আরম্ভ হয়নি, অথচ অরবিন্দ তখন ইউরোপকেই জেনেছেন। অরবিন্দর এইকালের ধারণায় "বাঙালীর পক্ষে চিত্রশিল্পটাই ধাতসই বস্তু নয়!" তিনি পাশ্চাত্ত্যপন্থী শিল্পী শশিকুমার হেশের বিশেষ প্রশংসাও করেছেন।[১]

উপরি-কথিত মত অরবিন্দ ত্যাগ করেছিলেন। প্রাচ্যশিল্পের মহিমা, বাঙালীর সহজাত শিল্প-প্রবণতা প্রভৃতির কথা পরে বহুমুখে বলেছেন। গিরিজাশঙ্কর তাঁর গ্রন্থে একাধিকবার জানিয়েছেন, এই মতপরিবর্তনের মূলে খুব সম্ভব নিবেদিতার প্রভাব ছিল। ১৯০২-এর আগেই অরবিন্দ নিবেদিতার **Kali the Mother** পড়েছেন। নিবেদিতা ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে বরোদায় হাজির হয়ে স্টেশন থেকে শহরে আসবার পথে কলেজের বাড়ি ও উচ্চ গম্বুজ দেখে বলেছিলেন—"কী কদাকার স্তূপ", আর তার নিকটের ধর্মশালা "আঃ কী সুন্দর"—তখন তাঁর অভ্যর্থনায় উপস্থিত কাশীরাও-এর মনে হয়েছিল, মহিলার মাথা খারাপ—এই সংবাদ স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তীকালে দিয়েছেন। তিনি নিজেও নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা জানাতে স্টেশনে গিয়েছিলেন।

নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে অরবিন্দের নবজাগ্রত শ্রদ্ধা কর্মযোগিন-এর উল্লিখিত দ্বিতীয় সংখ্যায় **The Awakening Soul of India** লেখাতেই দেখা যায়। জাতীয় ভাবধারা কিভাবে বাংলায় ছড়িয়েছে তার দৃষ্টান্তরূপে অরবিন্দ নব্য চিত্রকলার কথা আনেন, যার মধ্য দিয়ে মুঘল যুগের পরে প্রথম জাতীয় কলাশিল্পে নবধারার সূচনা হয়েছে—অবনীন্দ্রনাথ যার প্রবর্তক ও আচার্য। গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পাদর্শের তুলনার কালে তিনি বিবেকানন্দের অনুরূপ কথাই বলেছেন : "গ্রীকদের দেহাবয়ব সম্বন্ধীয় বোধ আমাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর, আর তাদের অপেক্ষা আমাদের আত্মিক রূপ ও বর্ণের বোধ উচ্চতর।" ভারতের পক্ষে শিল্পের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হবে বস্তুর দ্বারা আত্মার প্রকাশ, এবং ভারতীয় জাতিসমূহের

মধ্যে বাঙালীরাই এই কাজে অধিক সমর্থ, যেহেতু রূপের প্রতি তাদের আকর্ষণ অন্যান্যদের তুলনায় অধিক। বৈদান্তিক ভাব বাঙালীর আছে, অধিকন্তু আছে 'সুকুমারতা, লাবণ্য ও শক্তির' বিপুল ঐশ্বর্য। কিন্তু পুরাতন ভারতীয় চিত্রশিল্পের যে-স্বল্পপরিমাণ নমুনা পাওয়া গেছে তার মধ্যে ওইসব গুণের আদর্শ-নমুনা যথেষ্ট মেলেনি বলে বাঙালী শিল্পীদের এই ক্ষেত্রে অন্য একটি প্রাচ্যদেশের কাছে হাত পাততে হয়েছে—জাপান।[১] অরবিন্দ কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের রচনায় জাপানী প্রভাব পছন্দ করেন নি। জাপানী শিল্পের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য : "গভীরতম আত্মাকে বস্তুরূপে প্রকাশ্যের রহস্য জাপানের জানা নেই—সে উদ্দেশ্যও তার নয়। অপরপক্ষে বাংলার প্রাণচেতনায় যেমন আছে সুকুমারতা, লাবণ্য ও শক্তি, তদুপরি আছে গীতিকাব্যের রহস্যপ্রবণতা ; আছে প্রাঞ্জলতা ও নির্দিষ্টতার প্রতি অনুরাগও। সাহিত্যের মতো বাংলার শিল্পেও ওইসব লক্ষণের আত্মপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে—পরিচ্ছন্ন রেখা ও রূপাকৃতিকে অভিভূত ক'রে আত্মপ্রকাশ করছে সৌন্দর্যের জন্য আকৃতি, অপরিচিত মধুরতা ও আধ্যাত্মিকতা।"

The National Value of Art নামক দীর্ঘ রচনায় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পের প্রাণধর্ম নিয়ে গভীর মননশীল আলোচনা করেছেন। ভারতশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি আধ্যাত্মিকতায়, "যে-আধ্যাত্মিকতা আনুষ্ঠানিক ধর্ম অপেক্ষা বৃহত্তর—যার অর্চনাতে শিল্প সেরা অভিব্যক্তি লাভ করে।" নব শিল্প-আন্দোলনের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

"ভারতে যথার্থ জাতীয়-শিল্পের পুনরুত্থান ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত ব্যাপার। এই ধারার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি অন্য দেশের সেরা সৃষ্টির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা রাখে। এই পরিস্থিতিতে, ইংরেজি রীতির শিল্পবিদ্যালয়গুলির স্থূল বহিরঙ্গ শিক্ষা এবং পাশ্চাত্ত্যের ইতর রুচির ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য যে এখনো আমাদের মধ্যে বর্তমান আছে, তাকে ক্ষমাহীন অপরাধ বলেই মনে করতে হয়।"

'ধর্ম' পত্রিকায় (১৩১৬) অরবিন্দ 'ভারতীয় চিত্রবিদ্যা' নামক বাংলা প্রবন্ধে লিখেছেন, যেহেতু পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে ভারতীয় চিত্রকলা "জঘন্য সৌন্দর্যহীন", তাই :

"আমরাও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া চোখে য়ুরোপীয় চশমা পরিয়া ভারতীয় চিত্র ও স্থাপত্য দর্শনে নাক সিঁটকাইয়া নিজ মার্জিত বুদ্ধি ও নির্দোষ রুচির পরিচয় দিতাম। আমাদের ধনীদের গৃহ গ্রীক প্রতিমা ও ইংরাজি ছবির Caste-এ বা নির্জীব অনুকরণে ভরিয়া গেল ; সাধারণ লোকের বাড়ির দেওয়াল জঘন্য তৈলচিত্রে শোভিত হইতে লাগিল। যে-ভারতজাতির রুচি ও শিল্পচাতুর্য জগতে অপ্রতিম ছিল···সেই জাতির চোখ অন্ধ, বুদ্ধি ভাবগ্রহণে অক্ষম, রুচি ইতালীয় কুলি-মজুরের অধম হইল। রাজা রবিবর্মা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলিয়া খ্যাত হইতে পারিলেন।"

এই অবস্থার পরিবর্তনে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের চেষ্টা সম্বন্ধে অরবিন্দ বলেছেন :

"সম্প্রতি কয়েকজন রসজ্ঞ ব্যক্তির উদ্যমে ভারতবাসীর চোখ খুলিতেছে, নিজের ক্ষমতা, নিজের ঐশ্বর্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত কয়েকজন যুবক লুপ্ত ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে আবার নূতন যুগের সূচনা হইতেছে।"

অরবিন্দ প্রসঙ্গক্রমে "পুরাতন বুদ্ধমূর্তির অতুলনীয় শান্তভাব, আমাদের পুরাতন দুর্গামূর্তিতে অপার্থিব শক্তির প্রকাশের" কথা বলেছিলেন। ভারতীয় চিত্রে বাস্তবতা ও পারস্পেকটিভ-এর অভাব প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "সামর্থ্যের অভাবের" জন্য অমন করা হয়

তা নয়,

"ভারতীয় চিত্রকরগণ ইচ্ছা করিয়া, বাহ্য আকৃতি বদলাইয়া আন্তরিক সত্য প্রকাশ করিবার উপযোগী করিলেন।...পাশ্চাত্ত্য বাহিরের মিথ্যা অনুভব লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা ছায়ার ভক্ত; প্রাচ্য ভিতরের সত্য অনুসন্ধান করে, আমরা নিত্যের ভক্ত। পাশ্চাত্ত্য শরীরের উপাসক, আমরা আত্মার উপাসক।"[৩]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রামায়ণে রবিবর্মার অনেকগুলি ছবি ছিল। তার সমালোচনা অরবিন্দ করেন কর্মযোগিন-এ **Indian Art and Old Classic** রচনায়। কলমের নখরে তিনি ছিন্নভিন্ন করেছেন রবিবর্মার ছবিকে :

"বইটির পাতা ওল্টাবার কালে রবিবর্মার অজস্র ছবির প্রতিলিপি দেখে আমরা চমকিত। এই ছবিগুলি অল্পদিন আগে ভারতীয়দের বাড়িতে খুবই দেখা যেত—এখনো তারা বেদনাদায়কভাবে সর্বত্র বিরাজিত। সবিস্ময়ে ভাবছি, আর কতদিন এই স্থূল ব্যর্থতাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকব, অথচ আমাদের অন্তরস্থ সৌন্দর্যবোধ বিতৃষ্ণায় ঘুলিয়ে উঠবে না? রবিবর্মার 'গঙ্গাবতরণ' এবং তারও চেয়ে অভব্য 'ইন্দুমতীর মৃত্যু' ছবির অজ-চিত্র, কিংবা আরও আত্মহীন তুচ্ছ 'অহল্যা' চিত্র—এই সকলের অপেক্ষা অমার্জিত, নিতান্ত পার্থিব, অভারতীয়, নিছক দৃষ্টিসুখের জন্য রচিত কোনো সৃষ্টি সম্ভব? ওই সকলের কোনো-কোনোটি পরিকল্পনার স্থূলতায় এবং অভিব্যক্তির অসামর্থ্যে একেবারে হাস্যকর।...রবিবর্মা শিল্পক্ষেত্রে সেই অন্ধকারযুগের প্রতিনিধি যখন আমরা বিদেশীয় শিক্ষা ও আদর্শের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে সবকিছু করেছি দাসবৎ জঘন্যভাবে। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, ওই পর্বের প্রতিনিধির [অর্থাৎ রবিবর্মার] কোনো প্রতিভা ছিলনা—তা যদি থাকত তাহলে তিনি আমাদের রুচির ক্ষেত্রে যে-ক্ষতি করেছেন তার চেয়ে অনন্তগুণে অধিক স্থায়ী ক্ষতি করতে পারতেন।"

শিল্প বিষয়ে আলোচনা শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তী সময়েও করেছেন। 'আর্য' পত্রিকায় ১৯১৮-এর অগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সংখ্যায় **The Renaissance in India** নামক রচনায় 'নবজাগরণের' 'চমকপ্রদ' দৃষ্টান্ত হিসাবে নব্য ভারতশিল্পের 'মূলগত ও মৌলিক সৃষ্টির' উল্লেখ করেছিলেন। এর কিছু পূর্বে ছিল রবিবর্মার "স্থূল" ভূমিকা, যা "বন্ধ্যাত্বে পর্যবসিত হতে বাধ্য ছিল, এমনই তার উদ্ভট অনুর্বর অযোগ্যতা।" এই রচনাতেই শ্রীঅরবিন্দ চমকপ্রদ উক্তিটি করেছেন :

"বাঙালী চিত্রশিল্পীদের সৃষ্টির তাৎপর্য অপরিসীম। তা এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা বা রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।"

এমন উক্তির কারণ, শ্রীঅরবিন্দর এইকালের মতে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের বহিরঙ্গ আকর্ষণ দূর করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু শিল্প জন্ম নিয়েছে ইনট্যুশন্-এর প্রেরণায় এবং জাতীয় সংস্কারের ভিত্তিতে।

শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত রচনা **The Significance of Indian Art,** আর্য পত্রিকায় ১৯১৮-২১-এর মধ্যে বেরিয়েছে। উইলিয়ম আর্চারের ভারতীয় সংস্কৃতিবিরোধী বক্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন। পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টির বিরল সমন্বয় এই রচনায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পের নানা দিক সম্বন্ধে আলোকিত মন্তব্য এই লেখায় আছে। যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পভাবনার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা লক্ষ্য করবেন, স্বামীজীর ঝলকিত বিক্ষিপ্ত

নানা উক্তির কী-প্রকার ভিত্তি-সমন্বিত যুক্তিগ্রাহ্য সমর্থন সম্ভব। গ্রীকরা বহিরঙ্গ প্রকৃতির রূপকার তাহলেও তারা বহিঃপ্রকৃতির মধ্য দিয়েই অসীমের সন্ধানী, এবং নিজ প্রয়াসের ক্ষেত্রে চরম সফল—স্বামীজীর এই মতের অনুরূপ কথাও শ্রীঅরবিন্দ এই রচনায় বলেছেন। ভারতীয় মূর্তির আধ্যাত্মিক ভাবের সমাদরকারী জনৈক সমালোচক গ্রীক মূর্তি সম্বন্ধে বলেছেন—তা কেবল পরিশ্রুত ইন্দ্রিয়চেতনা ও কামময় আনন্দ জাগায়। এই কথায় আপত্তি জানিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : "গ্রীক ভাস্কর্যের প্রাণরহস্যের মধ্যে কিছুটা প্রবেশ ক'রে আমি দেখতে পাচ্ছি, ওর বিষয়ে সমালোচকের কথাগুলি ঠিক নয়। সমালোচক...গ্রীক শিল্পের আসল তাৎপর্য ধরতে পারেন নি।...গ্রীক মূর্তিতে দেহ-ব্যাপারটির উপর নিশ্চয় জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে দেহ তাকে এমন এক কল্পনাগর্ভ প্রেরণা দিয়েছে যা এক ধরনের দিব্য-সৌন্দর্যের শক্তি প্রকাশ করতে চায়, যার থেকে আমরা নিছক **ইন্দ্রিয়ধর্মী শিল্পানন্দের চেয়ে অনেক বেশি-কিছু লাভ করি।"**

শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেছেন, মূল হেলেনিক আত্মায় তিনি যেমন ডুব দিতে পেরেছিলেন, সেইভাবে যদি রেনেসাঁসের মানসিকতার মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারতেন তাহলে হয়ত তাঁর পক্ষে অধিক উদার ও সর্বজনীন রসানুভূতি লাভ করা সম্ভব হতো। বলাবাহুল্য, এ হলো বিদগ্ধ মানুষের সুসভ্য আত্মসংকোচ। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণধর্মের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে গ্রথিত শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দের মতোই রেনেসাঁসের অনেক দেবদেবীর ছবিতে পেশীবাহুল্য এবং আত্মক্ষীণতা দেখেছেন। টিনটোরেটোর 'আদম ও ইভ', 'ড্রাগন সংহাররত সেন্ট জর্জ', 'ভেনিসীয় সিনেটারদের কাছে খ্রীস্টের আবির্ভাব' ইত্যাদি ছবি তাঁর মনে 'অসার শূন্যতার' সৃষ্টি করেছে। বহিরঙ্গ কল্পনার শক্তি, রঙের ও বিন্যাসের গরিমা, নাটকীয়তার চমক ইত্যাদি নানা বাহাদুরী সেখানে আছে, কিন্তু রূপের উৎকর্ষের তুল্য অন্তর্নিহিত ভাবের গভীরতা কোথায়? "ওই পেশল আদমের এবং ইন্দ্রিয়ালু ইভের সৌন্দর্য আমার মনে মানবজাতির পিতা-মাতার ভাব এনে দেয়না। ওই ড্রাগন দেখে মনে হয়—বিকট অমঙ্গলের শিল্পসমৃদ্ধ রূপের পরিবর্তে মৃত্যুশঙ্কায় অস্থির কর্কশ এক জন্তু। খ্রীস্ট তাঁর বিপুল আয়তন এবং সদয় দার্শনিকের ভঙ্গিদ্বারা আমার রসচেতনাকে পীড়িত করেনই—অন্তত যে-খ্রীস্টকে আমি জানি, উনি তা নন।" কাজেই উক্ত "ইতালীয় শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর" দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তৃপ্তি পেয়েছেন "[আর্চার সাহেব-কথিত] কোনো 'বর্বর' ভারতীয় চিত্র বা মূর্তিতে, কোনো এক প্রশান্ত অতলস্পর্শী বুদ্ধমূর্তিতে, ব্রোঞ্জের শিবমূর্তিতে, কিংবা অসুরদলনী অষ্টাদশভুজা [?] দুর্গা মূর্তিতে।" আর তিনি এই "নৈরাশ্যজনক নির্বুদ্ধিতাযুক্ত" কথা শুনে চমৎকৃত যে, রবিবর্মা ও অবনীন্দ্রনাথের স্টাইল ভিন্নপ্রকার কিন্তু তাঁদের শক্তি ও প্রতিভা নাকি সমপরিমাণ!!" [Sri Aurobindo, **The Significance of Indian Art,** (1964), pp. 64, 68]

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ "শশীকুমার হেস" নামে শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখা প্রদীপ পত্রিকায় মাঘ ১৩০৬ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। তার মধ্যে শশিকুমার কী-রকম দুঃসাহসের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যে গিয়ে শিল্পশিক্ষা করেন, তাতে সফল হয়ে বিদেশীয় প্রশংসা অর্জন করেন, তা যত্নের সঙ্গে বলা হয়েছিল।

শশিকুমারের পোরট্রেট ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইনা, তবে রবিবর্মার রীতিতে আঁকা তাঁর 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' ছবি (প্রদীপ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৭-০৮) দেখে চমৎকৃত হয়েছি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী চিত্রপরিচয়ে বলেছেন, "কর্ণের

মুখশ্রীতে মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা সুন্দররূপে পরিস্ফুট", সেই "দীর্ঘকায় মহাবাহু সিংহগ্রীব তীক্ষ্ণলোচন' পুত্রকে "অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ" ক'রে কুন্তী-জননীর "নেত্র শীতল, মুখ উৎফুল্ল এবং হৃদয় স্নেহরসে আপ্লুত।"

দুঃখের বিষয়, ছবিটির প্রতিলিপি থেকে আমরা যা দেখতে পাই তা হলো : কর্ণ সূর্যের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে আছেন ; তাঁর স্বাস্থ্য সঙ্গত কারণেই ভালো ; বাহুর মাংসপেশী প্রাকৃতিকতার শর্ত বজায় রেখে পুষ্ট ও স্পষ্ট। কাপড় মালকোঁচা-বাঁধা ; গায়ের চাদর একদিকে হাতের তলা দিয়ে কাঁধে উঠেছে। পিছনে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন এক স্থূলাঙ্গিনী বিধবা মহিলা, দেখে মনে হয় সঙ্গতিসম্পন্না, নিজ সম্পত্তির দায়দায়িত্ব সামলাবার মতো কর্ত্রী-ভাবাপন্ন, হতে পারেন ভারিক্কী লেডি সুপারিনটেনডেন্ট বা লেডি ডাক্তার (পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট' দ্রষ্টব্য)।

এই ছবি না-দেখলে বোঝা যাবেনা, অবনীন্দ্রনাথ কোন্ বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন।

২ ভারতীয় চিত্রশিল্পের নমুনার অভাবকে অনেকে তার গুণের অভাব মনে করেন। ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনায় ভারতীয় চিত্রশিল্প নিম্নমানের, তা বিশেষ এককালে কিছুটা উন্নত হলেও পরে সুদীর্ঘ অধঃপতনের কবলে পড়েছে, অজন্তার পরে হাজার বছরের উপর ভারতে চিত্রশিল্পের অন্ধকার যুগ, যা কিছুটা আলোকের মুখ দেখেছে মুঘল-প্রভাবিত শিল্পধারায়, ইত্যাদি বলা হয়। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনায় চিত্রশিল্পের নিম্নমান এবং তার ঐতিহ্যধারায় ছেদ-তত্ত্বকে একেবারেই মানেন নি। চিত্রশিল্পের নমুনার অভাবের বিশেষ কারণ তার সহজ বিনাশশীলতা। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি বলেছেন, "শোনা যায়, অজন্তার ২৯টি গুহার সব কয়টি একদা ফ্রেস্‌কোর দ্বারা সজ্জিত ছিল ; মাত্র ৪০ বছর আগেও ১৬টি গুহায় মূল ছবির কিছুটা রূপ দেখা যেত ; কিন্তু এখন (১৯২০ সালে) মাত্র ৬টি গুহা প্রাচীন শিল্পমহিমার সাক্ষ্য দিচ্ছে, আর সেগুলিও দ্রুত ক্ষয়ের মুখে, মূল ছবির প্রাণোত্তপ্ত রূপ, সৌন্দর্য এবং বর্ণগরিমা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।" নানা তথ্য-যুক্তির দ্বারা তিনি দেখাতে চেয়েছেন, ভারতে চিত্রশিল্পের সূচনা বুদ্ধ-পূর্বকালে, দু'হাজার বছরের উপর সেই ধারা বহমান, অল্পবিস্তর উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে রাজপুত শিল্প পর্যন্ত তা পৌঁছেছে। নিজ বক্তব্যের পক্ষে তিনি ভারতের অজন্তা, বাগ ও অন্যান্য গুহায় প্রাপ্ত শিল্পনমুনা, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য এবং শিল্পশাস্ত্র, তিব্বত প্রভৃতি দেশের শিল্পনমুনা এবং সেখানে প্রাপ্ত গ্রন্থাদির ব্যবহার করেছেন।

৩ শ্রীঅরবিন্দ, 'ধর্ম ও জাতীয়তা' (১৩৬৪ সং), পৃ. ১০১-০৩।

ষোড়শ অধ্যায়

নিবেদিতা ও নন্দলাল

(রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসিগণ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং লেডি হ্যারিংহ্যাম)

॥ ১ ॥

সব স্বপ্ন সিদ্ধ হয়না—নিবেদিতারও হয়নি। অনেক স্বপ্নই সিদ্ধ হয়—নিবেদিতারও হয়েছিল—শিল্পক্ষেত্রে। সেই স্বপ্নসিদ্ধির সূচনাংশে ছিল অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও নেতৃত্ব, আর বৃহৎ অংশে নন্দলালের ক্রমবিবর্তিত প্রতিভা ও আচার্যত্ব।

ভারতশিল্প আন্দোলনে সব জড়িয়ে সৃষ্টিক্ষেত্রে নন্দলালেরই শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে। তাঁর দীর্ঘ ৬০ বৎসরের শিল্পীজীবন যখন মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হলো তখন নিবেদিতা মরধামে থাকলে সেই মহান স্রষ্টা ও আচার্যের দিকে তাকিয়ে বলতে পারতেন— যথার্থ শিল্পী হবার জন্য যে-চিত্তসত্তার আমি চেয়েছিলাম— দেশের প্রতি ভালবাসা— দেশবাসীর প্রতি ভালবাসা— ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা বিশ্বাস— ভারতের জন্য অদম্য ভাবাবেগ— ভূমি! ভূমি!— ভূমিজাত সকল কিছুই—হাঁ, সে সকলই সম্মিলিত দেখলাম তোমার জীবনে।

নন্দলাল ভারতবর্ষকে পেয়েছিলেন। রামায়ণ মহাভারত পুরাণের ভারতবর্ষ—ইতিহাসের ভারতবর্ষ—জনজীবনের ভারতবর্ষ—মহান ধ্যানে স্তব্ধ ভারতবর্ষ—প্রাণাবেগে চলিষ্ণু ভারতবর্ষ—আত্মমগ্ন ভারতবর্ষ—বিশ্বতোমুখ ভারতবর্ষ।

শিব, বুদ্ধ এবং বিবেকানন্দ—নন্দলালের।

স্মরণীয় চিত্রটি দেখে নিতে পারি নন্দলালের জবানী থেকে :

"আর একদিনের কথা। বোসপাড়া লেনে উঁহার [নিবেদিতার] বাড়িতে আমি ও আমার সহাধ্যায়ী সুরেন গাঙ্গুলী দেখা করতে গেছি। উঁহার বাড়ির উপরতলায় বসবার ঘরে আমরা দুজনে গেলাম। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। টেবিলের পাশে একটি লম্বা সোফার উপর পা ঝুলিয়ে বসলাম। তিনি এসে আমাদের দেখে বললেন—না, নীচে নেমে পা মুড়ে আসন

হয়ে বসো। ইহাতে আমাদের মনে বড়ো আঘাত লাগল, [তাই] মনে বড়ো অভিমান হলো। মেমসাহেব তো, নেটিভ বলে আমাদের নীচে নেমে বসতে বললেন। আমরা তাঁর আদেশমতো নীচে পা-মুড়ে বসার পরে তিনি আমাদের সামনে ওই সোফাটিতে বসে একদৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগলেন। আর বললেন, You are all Buddhas. তখন আমাদের সব অভিমান চলে গেল ও তাঁর আইডিয়াটা ধরতে পারলাম। আর ওই ব্রোঞ্জের মূর্তি দেখিয়ে বললেন, এটি কার মূর্তি ? আমরা বুদ্ধমূর্তি বলায় বললেন, না, উহা স্বামীজীর মূর্তি। আর বললেন—আমায় ওইরূপভাবে বসা স্বামীজীর একটি মূর্তি এঁকে দাও—পিছনে হিমালয় ও সামনে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। আমি ওইরূপ ছবি এঁকে দিয়েছিলাম। [১]

নন্দলাল বিবেকানন্দের শিল্পাদর্শ উপস্থিত করেছিলেন এই বলে :

"শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর আইডিয়াল শিল্পের backbone-এর মতো, যার অভাবে শিল্প নিস্তেজ ও প্রাণহীন হয়। স্বামীজীর ছিল জ্ঞানের পথে চলে aesthetics পথের সাধন ও পূর্ণতা।"

শিল্পীকে কেবল ভাবপথে নয় জ্ঞানপথেও চলতে হয়, সে-বিষয়ে স্বামীজী তাঁর শিল্পীবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। তখনকার আর্টস্কুলের শিল্পীরা কৃষ্ণার্জুনকে প্যাগোডা-রথে বসিয়ে কুরুক্ষেত্রের ছবি আঁকতেন—তা দেখে স্বামীজীর বিরক্তির সীমা ছিলনা। পুরাতনকালের ছবি আঁকতে হলে সেই যুগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন, ইতিহাস পড়তে হবে, যেতে হবে মিউজিয়ামে, কেননা "Truth represent করা চাই।" "মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো" ছেলেরা আর্ট শিখতে যাচ্ছে, তারা কী-করে সত্য চিত্র আঁকবে ? এই বলে স্বামীজী কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কিভাবে আঁকা উচিত তা ব্যাখ্যা করেছিলেন :

"শ্রীকৃষ্ণ——সমস্ত গীতাটা personified.। যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে—তিনি তাঁকে গীতা বলছেন— তখন তার central idea-টি তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।... [তিনি এমনভাবে] সজোরে ঘোড়াদুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো প্রায় হাঁটু-গাড়া গোছ, আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় অ্যাকশন খেলছে। তাঁর সখা ভুবনবিখ্যাত বীর ; দু'পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের উপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ ঘোড়ার রাশ টেনে, চাবুক-হাতে সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতো মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থিরগম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন।...তাঁর সমস্ত শরীরে intense action—আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত। [২]

এই বর্ণনা যখন পড়েছি, আর নন্দলালের পার্থসারথি কৃষ্ণের নানা ছবি দেখেছি—তখনই মনে হয়েছে, নন্দলালই কেবল স্বামীজীর কল্পনাকে যথাসম্ভব রূপায়িত করতে পেরেছেন। তিনি যে সচেতনভাবে স্বামীজীর ভাবনাকে ছবিগুলিতে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য থেকে পাই। এইসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের প্রেরণার কথাও এসেছে।

নন্দলাল রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন :

"আমি মহাভারতের উপর অনেক ছবি করেছি।...নিজেকে ধন্য বলে বোধ হয় যখন ভাবি, এই মহাভারতের ছবির জন্য যখন বিশেষভাবে ভাবছি তখন আমায় সেইসব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি পড়িয়ে বুঝিয়েছিলেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তান পূজ্যপাদ শরৎমহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) নিজে। বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে (অর্থাৎ সারদামাতার বাড়িতে) উঠলে শরৎমহারাজ নিজে গীতা পড়ে আমায় তার ভাব বোঝাতেন।...কুরুক্ষেত্রের বিষয় নিয়ে অনেক ছবি করেছি। তার মধ্যে পার্থসারথির ছবিও করেছি নানানভাবে। কিন্তু এই পার্থসারথির (কুরুক্ষেত্রে) ছবি আঁকার সময়ে স্বামীজীর [স্বামী বিবেকানন্দের] ওই বিষয়ে ভাবনা আমাকে অদ্ভুতভাবে সাহায্য করেছে। [নন্দলাল একটু আগে উদ্ধৃত স্বামীজীর এই প্রসঙ্গের কথাগুলি স্মরণ করেছেন]...এই ভাবকে ছবি করার চেষ্টা করেছি। মহাভারতের মতো রামায়ণের বিষয় নিয়ে যে-সিরিজের ছবি দ্যাখো, তারও উৎসাহ পেয়েছি বেলুড়মঠে রামায়ণ পাঠের মধ্য দিয়ে।"[৩]

শুধু কৃষ্ণ নন, মহাদেব এবং হিমালয় চিত্রেও বিবেকানন্দের প্রেরণা। হিন্দুরা মূর্তিপূজা করে কেন—এই প্রশ্নের সম্মুখীন বিবেকানন্দ একদিন (জুন ১৮৯৮) কাশ্মীর উপত্যকায় দাঁড়িয়ে তুষারশৃঙ্গগুলির দিকে তাকিয়ে "প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'এই পর্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর সেই প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া—একই কথা নয় কি'?"[৪] আলমোড়ায় থাকাকালে এর আগেই একদিন (মে ১৮৯৮) উষাকালে আলোকরঞ্জিত চিরতুষাররাশির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "ওই যে উর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি— উহাই শিব, আর তাঁহার উপর যে-আলোকসম্পাত হইয়াছে—তাহাই জগজ্জননী।"[৫]

ওই কথাগুলি পুনরুচ্চারণ করে নন্দলাল রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যা বলেছেন তার প্রতিবেদন এই :

"ওই মায়াবতীকে দেখেছি—দেখেছি পর-পর স্তরে-স্তরে বিস্তারিত বিরাট হিমালয়ের সে চূড়া—কি সুন্দর, একেবারে অদ্ভুত। তুমি কি গেছ সেখানে ? 'না' বলতে বললেন, তাহলে বুঝতে পারবে না। আমায় [রামানন্দকে] এঁকে দেখালেন পর-পর চূড়া কিভাবে গেছে। বললেন, মায়াবতী থেকে দেখা হিমালয়ের অনুভবে একটা ছবি এঁকেছি। সে ছবি উদ্বোধন পত্রিকায় 'যোগমূর্তি গিরীশ' নামে বের হয়েছিল।"[৬]

নন্দলাল যখন ভারতীয় আদিবাসীদের তুলে আনছেন রেখায় রঙে, যখন গ্রামের জনজীবনচিত্র আঁকছেন হরিপুরা পোস্টারে, তখন তাঁর উপরে নানা প্রভাবের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রভাবের কথাও মনে উঠবে, বিশেষত নন্দলালের বহুপঠিত, স্বামীজীর আশা ও আশ্বাসময় দিব্যবাণীতুল্য উক্তি—"বেরুক নতুন ভারত চাষার কুটীর ভেদ করে" ইত্যাদি। বিবেকানন্দের ভাবনা-কল্পনার আরও নানা চিত্ররূপায়ণ কিভাবে নন্দলালের তুলিতে হয়েছে, তাও বলে যাওয়া যায়।[৭]

কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে বিবেকানন্দ নন—রামকৃষ্ণই নন্দলালের পরম পুরুষ। স্বামীজীর

শিল্পাদর্শের কথা বলার পরে নন্দলাল যোগ করেছেন :

"...আর ঠাকুরের [শ্রীরামকৃষ্ণের] ছিল aesthetics পথে চলে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। দুজনারই [রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের] ছিল aesthetics ও জ্ঞানের পূর্ণতা। কেবল পথ চলার precess ভিন্ন রকম। আমার মনে হয়, ঠাকুরের অনুভবের পথ শিল্পীদের বেশি উপযোগী। শিল্পীরা সব সময়েই ওই পথে চলেন। রূপের উপাসক সাকারবাদী, জ্ঞানের উপাসক নিরাকারবাদী। (শিল্পীদের মায়া নিয়েই কারবার)।"

নন্দলাল উভয় পথের সামঞ্জস্যের কথাও বলেছেন :

"তবে অনুভবের পথে চলে, জ্ঞান না থাকলে, শিল্পীর পতন হওয়ার সম্ভাবনা। আবার জ্ঞানীর পক্ষে অনুভব ও রসের সাধনে [সাধনকে ?] পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। তবে প্রফেটদের আলাদা কথা। তাঁদের সবই দুর্জ্ঞেয়।"[৮]

বিবেকানন্দের জ্ঞানের অদ্বৈত অপেক্ষা রামকৃষ্ণের রূপের অদ্বৈতের প্রতিই নন্দলালের আকর্ষণ। 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়', বিবেকানন্দের এই বাণী নন্দলালের মনে জাগরূক থাকলেও মন টেনেছিল রামকৃষ্ণের সহজ গভীর সুরের এই কথাগুলি : "চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তারপর ভাবলুম, চক্ষু বুজলে ঈশ্বর আছেন আর চক্ষু খুললে কি ঈশ্বর নাই। চক্ষু খুলেও দেখছি, ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, চন্দ্রসূর্য মধ্যে—জলে স্থলে সর্বভূতে—তিনি আছেন।"

একই ছন্দে নন্দলালের কথা :

"হিন্দুঘরে জন্মে, হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি। এককালে বিশেষ ক'রে দেবদেবীর ছবিই এঁকেছি। এখন কিন্তু দেবতার ছবি যেমন আঁকি, সাধারণ জীবনের ছবিও এঁকে থাকি ; উভয়েতেই সমান আনন্দ পেতে যত্ন করি।...প্রত্যেকটিকে একই সত্তার বিভিন্ন ছন্দ ও বিগ্রহ হিসাবে দেখি।... পূর্বে দেবত্ব দেবতার রূপেই দেখতাম, এখন দেখতে যত্ন করি—মানুষে, গাছে, পাহাড়ে।"[৯]

রামকৃষ্ণের যার সিদ্ধি, নন্দলালে তারই রূপের সাধনা।

নন্দলাল রামকৃষ্ণকে কেবল রামকৃষ্ণের মধ্যে কিংবা বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে পাননি—তাঁকে পেয়েছেন রামকৃষ্ণমণ্ডলীর আরো অনেকের মধ্য দিয়ে। তাঁদের মধ্যে আছেন রামকৃষ্ণের অতিপ্রিয় শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যাঁর কাছে তরুণ নন্দলাল একদা 'রাধিকা' ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন। ছবি দেখে তিনি বলেছিলেন, "রাধিকা তো উন্মাদিনী, সে ভাব তো কই ফোটেনি এতে।" সতর্ক করেন এই বলে—মাথা ঠিক না রেখে ঠাকুর-দেবতার ছবি আঁকা মারাত্মক। নন্দলালের প্রেরণাদাতাদের মধ্যে আছেন অন্য এক শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ, অবর্ণনীয় যাঁর স্নেহ ভালবাসা। নন্দলাল উপস্থিত হয়েছেন স্বামী অভেদানন্দের কাছে। স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে তো তাঁর ঘনিষ্ঠতাই ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মুখে নানা জীবন্ত বর্ণনা শুনে নন্দলাল বুঝেছেন, কিভাবে শিল্পীকে চিত্র-বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে

হয়। আর শিল্প বিষয়ে তাঁর ব্যাপক গভীর শিক্ষা বিবেকানন্দ-ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে।

আর্টস্কুলে পড়ার সময়ে, এবং তার পরে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে যুক্ত থাকার কালে, ৫-৬ বৎসর নন্দলাল তাঁর সতীর্থ শৈলেন্দ্রনাথ দে-র সঙ্গে নিয়মিত মহেন্দ্রনাথের কাছে গেছেন, তাঁর মুখে শিল্পতত্ত্বের গভীর কথা শুনেছেন। মহেন্দ্রনাথের কাছে যাবার আগে নন্দলাল বা শৈলেন্দ্রনাথ শিল্পশাস্ত্রের কোনো বই পড়েন নি। "পরে তাঁরা যখন শিল্পের উপর বই দেখলেন, বা শিল্প আর রসশাস্ত্রের বিষয়ে নানা আলোচনার বই পড়লেন, তখন বুঝতে পারলেন, তাঁরা শিল্পচেতনার মূল কথাগুলো [মহেন্দ্রনাথের মুখ থেকে শুনে] প্রায় সবই আগে জেনে ফেলেছেন।" শিল্প সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথের বই Dissertation on Painting—যার বিষয়ে নন্দলাল বলেছেন, "এইরূপ শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা খুব কমই হয়েছে। ইহাতে খুব গভীর চিন্তাপূর্ণ লেখা আছে। ভারতবর্ষে শিল্পবিষয়ে এরূপ গ্রন্থ বিরল।" অবনীন্দ্রনাথ সেই বইটির 'গ্রন্থপরিচয়' লেখেন। নিছক প্রত্নতত্ত্বের দ্বারা শিল্পের প্রাণরহস্য ধরা পড়েনা, রস এবং তার প্রয়োগ-প্রাণালীর মধ্যেই রয়েছে শিল্পের মূল কথা—এহেন মন্তব্যের পরে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"আমার বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আমার পরম স্নেহাস্পদ শিল্পী শ্রীমান নন্দলাল বসু ও শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ দে—এঁরা তিনজনে মিলিত হয়ে বহুদিন ধরে শিল্প সম্বন্ধে যেসব আলোচনা ও গবেষণা করেছেন—গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই পুস্তকে সেই সমস্ত চিন্তা ও তর্ক-বিতর্ক একত্র ক'রে আমাদের ও বিদেশের শিল্প-শিক্ষার্থীগণকে অর্পণ করেছেন। গ্রন্থকার বহুদিন ধরে সারা পৃথিবী পর্যটন, নানা দেশের শিল্প-সভ্যতা ইত্যাদির প্রাচীন ও আধুনিক হালচাল লক্ষ্য ক'রে, এবং স্বয়ং নিজের সাধনবলে শিল্প সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন লাভ করেছেন, সুতরাং এই পুস্তক সর্বজনে সর্বদেশে আদর পাবে।"

১৯৫৬ সালে মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে নন্দলালের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। উভয়ের মধ্যে নিয়মিত পত্র-বিনিময় হয়েছে। সব সময়েই নন্দলাল মহেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁর মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন, ছবি অবশ্যই সিনসিয়ার হওয়া চাই কিন্তু তাতেই শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব আসবে না। "আর্টিস্ট যা-তা বিষয় নিয়ে ছবি করতে পারে ; কিন্তু শিল্পীর মন উঁচু পর্দায় বাঁধা থাকলে তবেই সে ছবি উত্তীর্ণ হবে।"[১০]

বরেন্দ্রনাথকে নন্দলাল চিঠিতে লিখেছেন :

"পুণ্যদর্শন [মহেন্দ্রনাথ] ও শ্রদ্ধেয় ভূপেনবাবু [ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামীজীর ছোট ভাই] এবং অপরাপর ঠাকুরের ভক্তদের কাছে যা শুনেছি, সেই উপদেশগুলি হজম করার চেষ্টা করছি মাত্র এবং শিল্পকাজে তাহার প্রয়োগ করবার আজীবন চেষ্টা করেছি, তথাপি তাহা শেষ হয় নাই। ঠাকুরের বহু ভক্ত ও মনীষী শিল্পীদের সঙ্গে শিল্পবিষয়ে আমার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পুণ্যদর্শনের মতো নিজে শিল্পী না হয়েও শিল্পের গভীর ও গূঢ় মর্ম বুঝেন, এমন লোক দেখি নাই। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করলে শিল্পবিষয়ে জ্ঞান খুলে যায়, আর অনেক মৌলিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।"

একই জনকে ১৮-৫-৫৪ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন : 'তিনি [মহেন্দ্রনাথ] শিল্পবিষয়ে

যা বলেছেন তা সকল যুগের ও সকল দেশের শিল্পীদের সত্যবাণী ও মর্মের কথা জানিবে। আমার জানিত যেসব মনীষী শিল্পীদের কথা জেনেছি, ও সারাজীবন ধরে শিল্পচর্চা ক'রে যা বুঝেছি, ও আমার গুরু শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আশীর্বাদে শিল্পবিষয়ে যা বুঝেছি, তাহাতে আমার ঐরূপ ধারণা হয়েছে।"

নন্দলাল গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ কিন্তু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে নিরত নন ; এ-বিষয়ে হয়ত তাঁর মনে কিছুটা গ্লানি ছিল। তাঁর হয়ে এই প্রসঙ্গ বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী উত্থাপন করেছিলেন মহেন্দ্রনাথের কাছে। মহেন্দ্রনাথ নন্দলালকে বলেন, "আর কিছু করতে হবেনা। ...অযাচিতভাবে পেয়েছ, অযাচিতভাবে দান কর। শক্তি প্রসারণ কর।" তিনি জোর দিয়ে বলেন, নন্দলাল যেন সচেতন হন এই বিষয়ে যে, মহাশক্তির ভেতরেই [তুমি] রয়েছ, বুঝতে পারছ না ?—যেমন জলের ভেতর মাছ থাকে।" নন্দলালকে স্বতন্ত্রভাবে জপধ্যান করতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। কেন—তার উত্তরে যে-কথা বলেছেন তা চিরদিনের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছে ধর্ম কোন্ সৎ-স্বরূপে শিল্পীর জীবনে বর্তমান থাকতে পারে :

"তোমরা [শিল্পীরা] দুটো করতে যাও কেন ? একটাই তো জিনিস। কেউ মালা নিয়ে জপ-ধ্যান করে, কেউ তুলি নিয়ে জপ-ধ্যান করে। দুইই এক।"[১১]

রামকৃষ্ণ সংঘের আরও নানা সন্ন্যাসীর সঙ্গে নন্দলালের ঘনিষ্ঠতার সংবাদ তাঁর জীবনকথায় পাই (যেমন ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী আত্মবোধানন্দ)। মিশনের সন্ন্যাসীদের প্রতি নন্দলালের ভক্তিভালবাসার কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন বলে ওঁরা শান্তিনিকেতনে এলে তত্ত্বাবধানের ভার তিনি নন্দলালের উপরই দিতেন।

রামকৃষ্ণ-সংঘের সেবা নন্দলাল যথাসম্ভব করেছেন। মিশন-প্রকাশিত নানা বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন ; বেলুড় ও কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, বাগবাজারে মাতৃমন্দির ও নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও রূপসজ্জায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কাজে শিষ্য-শিল্পীদের পাঠিয়েছেন, যেমন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত।[১২]

কিন্তু এহো বাহ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবী অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁর অন্তর্লোকে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন কথা তিনি ছোট খাতায় টুকে রেখেছিলেন, সেটি তাঁর সঙ্গে থাকত, সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ-সারদার ছবিও। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার ভাগ্য তাঁর হয়নি— কিন্তু সারদাদেবীকে দেখেছেন। "শ্রীমাকে চোখে দেখেছি। [নন্দলাল বলেছেন] আমার দেহে মনে কোনো পাপ থাকলে স্খালন হয়ে গেছে।" তাঁর পত্নী সুধীরাদেবীর ভাগ্যের কথাও নন্দলাল বলতেন— কেননা সারদাদেবীর দর্শন তিনিও পেয়েছিলেন। সুধীরাদেবী স্বয়ং সে-বিষয়ে বলেছেন, "প্রণাম করে উঠতেই শ্রীমা আমার মাথায় জপের মালাটা ঠেকিয়ে দিলেন। আর মালাটা মাথায় ঠেকাতেই আমার সারা গায়ে কেমন যেন শক লাগল।" শ্রীরামকৃষ্ণকে বারবার স্বপ্নে দেখেছেন নন্দলাল। স্বপ্নে তাঁকে কখনো কুকুর কখনো কেউটে সাপ যখন কামড়াতে এসেছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণের নাম স্মরণে সেসব ভয় দূর হয়ে গেছে। "পরমহংসের সম্বন্ধে যত স্বপ্ন দেখেছি—অতি সত্য হয়েছে সেসব স্বপ্ন আমার জীবনে"—নন্দলাল বলেছেন। কুলধর্মে বৈষ্ণব তিনি—রামকৃষ্ণ তাঁকে অবারিত করে দিয়েছিলেন সর্ব মতে ও পথে : "পরমহংসদেব আলাদা তো কিছু বলতেন না। মনের গড়ন

অনুযায়ী সবই সত্য ; যার যা বিশ্বাস ; ওগুলো ধাপমাত্র। কত-যে বিভিন্ন মতের সমন্বয় হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণে !"—একথাও বলেছেন।[১৩]

কিভাবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্ব দেহে-মনে জড়িয়ে রাখতে চাইতেন তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। কামারপুকুর দর্শনের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের কুটীরসংলগ্ন স্থানের মাটি এনেছেন উনি নন্দলালের জন্য। "তাঁর হাতে সেটি তুলে দিতেই অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই মাটি মাথায় ঠেকিয়ে তা প্রসাদের মতো মুখে ফেলে দিলেন। আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি। ...বললেন, কোথায় রাখব ? সারা শরীরেই মাখা হয়ে যাক।" নন্দলাল নিবিড় সুরে বলেছেন, "জ্ঞানীদের জন্য অনেক আছে, আমাদের জন্য তিনিই ভরসা।" **"শ্রীশ্রীঠাকুর, মা-ই, আমাদের সম্বল হয়ে থাকুন।"[১৪]**

এই রামকৃষ্ণ নন্দলালের কাছে 'রূপপতি' হয়েও ধরা দিয়েছেন। রামকৃষ্ণের আঁকা ছবি, গড়া মূর্তি , হাতের লেখা— এই সকলের নৈপুণ্যের কথা তিনি বারবার বলতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ "সহজ শিল্পী এবং শিল্পের সমঝদার।" "শুধু idealist নন, রসিক শিল্পী ও কারিগরও ছিলেন। তিনি আঙ্গিকের বিষয়ও বেশ জানতেন।" "ঠাকুর প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। একবার স্বামীজীর observation-এ চাতকপাখি ও চামচিকের মধ্যে তফাত সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তিনি রূপপতি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁর হৃদয়ের সব ভাবই রূপে পরিণত হতো।" নন্দলাল শিহরিত হয়েছেন এই চিন্তায়—"তাঁহার প্রথম সমাধি হয়েছিল বর্ষার কাজল-কালো মেঘের কোলে সাদা বকের পাঁতি দেখে।"[১৫] নন্দলালের বড় ইচ্ছা ছিল, বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে রামকৃষ্ণ-জীবনের ফ্রেস্কো করবেন। তার জন্য অনেক স্কেচও করেছেন। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ ইত্যাদি কারণে সেই ইচ্ছা সফল হয়নি—সেজন্য তাঁর দুঃখও ছিল।[১৬]

এবং নন্দলাল রামকৃষ্ণে এমনই নিবিষ্ট যে, ১০-১-১৯৫৯ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন, "শিল্পীর হৃদয়ে ভগবানের ভক্তি থাকলে চিত্র ভালো আঁকতে পারে।"

আর সই করেছেন—

"শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের নন্দলাল বসু।"[১৭]

॥২॥

সুতরাং নন্দলালের রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভক্তিকে নিছক ব্যক্তিগত জীবনের ধর্মীয় ব্যাপার বলে সরিয়ে রাখা যাবেনা। নন্দলালের অখণ্ড মন—যদিও প্রকাশের ক্ষেত্রে তা ব্যাপক ও বিচিত্র। তাঁর জীবনের সত্য-সূর্য বহু কিরণে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সে সূর্য রামকৃষ্ণই।

এই রামকৃষ্ণ-ভুবনে নন্দলালের প্রবেশ ঘটেছিল নিবেদিতার মধ্য দিয়েই।[১৮] ওঁদের প্রথম পরিচয় হয় আর্ট স্কুলে।[১৯] সেই সময়ে নিবেদিতা নন্দলালের কিছু ছবি দেখেন এবং তাঁর প্রতিভা চিনতে পারেন। নন্দলাল ২৫-৮-৫৪ তারিখের চিঠিতে বলেছেন, নিবেদিতা তাঁর তিনটি ছবি দেখে মন্তব্য করেন :

"একটি ছবি হলো—কৃষ্ণ সত্যভামার পায়ে ধরে তাঁর মানভঞ্জন করছেন। এই ছবি দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে [সিস্টার] বললেন, এরূপ ছবি আর এঁকোনা। পুরুষ হয়ে স্ত্রীলোকের পায়ে ধরে মানভঞ্জন করা বড়ো লজ্জার ব্যাপার।

"দ্বিতীয়টি হলো—মা কালীর ছবি। উনি তো দেখে খুশি হলেন। আর বললেন,

এ-মূর্তি ঠিক আঁকা হয়নি। এত কাপড় জড়িয়েছ কেন ? কালী যে দিগ্‌বসনা, নির্ভীক, প্রলয়ঙ্করী। তিনি স্বামীজীর লেখা একটি কবিতা কালী বিষয়ে [Kali the Mother] পড়তে বললেন।

"তৃতীয়টি হলো, দশরথ রামচন্দ্রের বনগমন-বিয়োগে দুঃখে ও শোকে দেহত্যাগ করছেন, আর কৌশল্যা তাঁর পায়ের কাছে একটি হাতপাখা নিয়ে বসে আছেন। ছবিটি তাঁর পছন্দ হলো, আর ছবিটি চেয়ে নিলেন। কেবল হেসে বললেন, কৌশল্যা রাজার রানী, তাঁর হাতে মূল্যবান হাতীর দাঁতের পাখাই শোভা পায়, তালপাতার পাখা মানায় না। মিউজিয়ামে গিয়ে হাতীর দাঁতের পাখা দেখে এসো। তবে ছবিটিতে শান্ত নির্জন পরিবেশ আছে। ঠিক শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের পরিবেশের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাই আমার বড়ো ভালো লাগছে।"[১০]

তাছাড়া 'জগাই মাধাই' ছবি দেখেও প্রশংসা করেছেন। এবং এঁদের ছবি যে নন্দলাল গিরিশচন্দ্র ঘোষের আদলে এঁকেছেন তা শুনে হেসেছেন। (দশরথের মৃত্যুশয্যা এবং জগাই মাধাই ছবি সম্বন্ধে নিবেদিতার লিখিত আলোচনার প্রসঙ্গে পরে আসব)। নন্দলালের 'ষষ্ঠীপূজা' ছবি সম্বন্ধে নিবেদিতার মন্তব্য জানা গেছে নন্দলালের জবানী থেকে। নিবেদিতাকে দেখানো তাঁর শেষ ছবি সম্ভবত ষষ্ঠীপূজাই।

"আমি ছবি নিয়ে গেলুম। [নন্দলাল বলেছেন] ; সিস্টার ছিলেন বোধহয় পূজার ঘরে। বেরিয়ে এসে সামান্য দু'একটা প্রশ্নের পরে ছবিখানি দেখলেন। দেখেই সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার বিয়ে হয়েছে ?' আমি বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। গৌরী আর বিশু তখন হয়েছে। কোলে ছেলে, আর মেয়েটির হাত ধরে তাদের মা গাঁয়ের ষষ্ঠীতলায় গেছেন পূজা দিতে। গৌরী আর বিশুর আদল ছিল ছবিতে—খোকা আর খুকির অবয়বে। ছবির পরিবেশটি দেখে খুব প্রশংসা করলেন সিস্টার। সেই শেষ দেখা আমার সিস্টারের সঙ্গে।"[২১]

নন্দলাল নামক মহাশিল্পীর অমরতার প্রথম ঘোষণা নিবেদিতাই করেছেন। জানিনা, কোন্ শিল্পী তাঁর সৃষ্টিজীবনের আদি প্রহরে ও-হেন চিরায়ত রচনার আশীর্বাদ লাভ করেছেন ? সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে নন্দলালেরই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ছবির আলোচনা নিবেদিতা করেছেন—মোট দশটি ছবির। আরও একটি-দুটি ছবির উল্লেখও তিনি করেছেন। এর থেকে তাঁর শিল্পী-প্রতিভা চিনে নেবার ক্ষমতা বোঝা যায়।

ক্রমবিকশিত নন্দলাল নিবেদিতাকে উত্তরোত্তর অধিক উল্লসিত করেছেন। তবু আরও-আরও প্রত্যাশায় নিবেদিতা অধীর ও অতৃপ্ত ছিলেন। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর উদ্যোগে প্রদর্শনী হয়। নিবেদিতা মডার্ন রিভিউ-এর এপ্রিল ১৯১০ সংখ্যায় তার বিষয়ে বেশ বড় আলোচনা করেন। নন্দলাল সম্বন্ধে সেখানে তিনি বলেন :

"দেশবাসীর কাছে নন্দলালের কাজের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই—তাঁরা তাঁর প্রতিটি নতুন কীর্তির জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে গর্বিত। তাঁর সর্বশেষ দুটি কাজ—'অগ্নি' ও 'অহল্যা' এই প্রদর্শনীতে আছে—সেই সঙ্গে শিল্পীর নানা শৈলীর প্রতিটির নমুনাও। প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর অসাধারণ রীতিনৈপুণ্যের বিষয়ে আমাদের আস্থা দৃঢ়তর হয়। এই শিল্পীর

মধ্যে কিন্তু আমরা আরও বৃহৎ, আরও পৌরুষসম্পন্ন, অধিকতর সমন্বয়ী প্রয়োগশিল্প দেখতে চাই। 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' এবং 'দময়ন্তীর স্বয়ম্বর' ছবিতে সেই ধরনের প্রয়াস আছে—তাদের মধ্যে কিন্তু মধ্যে তাঁর ক্ষুদ্রতর কাজগুলির অনুপম মোহিনীশক্তি অনুপস্থিত। সর্বপ্রকার গুণাবলীকে সমন্বিত দেখব তাঁর কোনো মহান মাস্টারপিসের মধ্যে—এই আমাদের প্রত্যাশা।"

'সতী' ছবি এঁকে নন্দলাল অবিলম্বে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেন—বৈদেশিক স্বীকৃতি পান। অনিচ্ছার সতীর চেয়ে বীভৎস কিছু সম্ভব নয়। কিন্তু নন্দলালের 'সতী' হলেন প্রেম ও নিষ্ঠার জন্য প্রশান্ত আত্মোৎসর্গের প্রতিমা—নিবেদিতার শ্রদ্ধা ও আবেগ সে জন্যই।

রাজপুত নারীদের জহরব্রতের মধ্যে এমনই আদর্শায়িত আত্মদানের স্মরণে নিবেদিতা ভাবাপ্লুত হয়েছেন। স্বদেশীযুগে পুরুষ-শহীদদের অমেয় বীর্যের মূল সন্ধানে নিবেদিতা ভারতীয় নারীদের জ্বলন্ত উৎসর্গের পটভূমিকা দেখেছেন। "বাংলা হলো আদর্শের জন্য অতিমানবিক উৎসর্গের দেশ। এক বৎসরে ৭৫০ সতীর দেশ। এদেশে অসম্ভব বলে কিছু নেই"—নিবেদিতা ২৫ নভেম্বর ১৯০৯ তারিখের এক চিঠিতে লিখেছেন। তিনি সতীর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভেদ করেন নি।

নন্দলালের অসামান্য ছবিটি তার প্রতীক-প্রকৃতির জন্য অধিকন্তু কখনো সীতা, কখনো শিবের সতীরূপে প্রতিভাত। কুমারস্বামী এই ছবিতে—"কম্রমধুর এক বাঙালী তরুণী-বধূ তাঁর লোকান্তরিত পতির সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষায় চিতাগ্নিতে প্রশান্ত মনে আত্মবিসর্জন দিচ্ছেন"—এই আপাতদৃষ্ট রূপ অপেক্ষা গভীরতর আধ্যাত্মিক মিলনের তাৎপর্য অনুভব করতে চেয়েছেন। এই সতী তাঁর কাছে স্বয়ং শক্তি—এবং তাঁর স্বামী স্বয়ং শিব। অর্থাৎ সতী হলেন শিবের সতী।. এই সঙ্গে তিনি সতীর একনিষ্ঠ প্রেমের বিশ্বজনীন রূপ দেখাতে গিয়ে অনেক বিদেশী কাব্যাংশ উদ্ধৃত করেছেন, (এক মহান গথিক রাজা বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নিহত হলে তাঁর চিতার সামনে এই আর্তনাদ : ''How then when the flames flare upwards may I be left behind?''); ভারতীয় কবি সরোজিনী নাইডুর কবিতাংশও তিনি তুলেছেন, (''Life of my life, Death's bitter sword/Hath severed us like a broken word:/Rent us in twain who are but one/Shall the flesh survive when the soul is gone?'')[২২]

নন্দলাল ছবি এঁকে সতীপ্রথাকে মহিমান্বিত করছেন, এই সমালোচনার উত্তর দেবার চেষ্টা ছিল কুমারস্বামীর লেখার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথও যখন একদা (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১৩০৯) মৃত্যুপরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাংলার 'সতী' নারীদের প্রশস্তি করেছিলেন, তখন তাঁর সে রচনা বিশুদ্ধ আদর্শে যতই শোধিত থাক, তাতে কবিগুরুর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে মনে করে, নানা যুক্তিতে রবিচ্ছায়া অপনোদনের চেষ্টা করতে হয়েছে একালের সমালোচককে।[২৩]

নন্দলালের সতী ছবি বিষয়ে লেখার সময়ে সতীর আত্মোৎসর্গের মহিমা জ্ঞাপনে নিবেদিতা কোনোপ্রকার কুণ্ঠা রাখেন নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একতারে বাঁধা ছিল তাঁর মন। তাছাড়া তাঁর নিজের মধ্যেই এক সতী জাগ্রত ছিলেন, যাঁর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, "আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই-যে তপস্যা দেখিলাম।" এবং শিল্পীরা নিবেদিতার আদলে সতী-ছবি এঁকেছেন।

নন্দলালের ছবিতে আদর্শায়িত সতীকে অসাধারণ রূপের ভাষায় অঙ্কিত দেখে

নিবেদিতার মনে "নারীমহিমা সম্বন্ধে ভারতীয় ভাব-প্রত্যয়-এর" কথা জেগেছিল : "অন্য দেশগুলি বিরাট উদ্দেশ্য—যথা, ধর্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা, জ্ঞানার্জনের অধিকার—ইত্যাদির জন্য যা করেছে, এদেশে তা সহস্রগুণ অধিক সহজভাবে করা হয়েছে গৃহজীবনের মধুরতা ও কোমলতাকে কেন্দ্র করে।" পাশ্চাত্যদেশ হলে এই ধরনের ছবিতে দেখা যেত "এক রূপবতী নারীকে, পূর্ণ দৈর্ঘ্যে সমুন্নত, দর্শকদের সম্মুখীন তিনি—সৌন্দর্য ও বিজয়ের মিলিত গরিমায়।" কিন্তু ভারতীয় শিল্পী নন্দলালের ছবিতে কী দেখা গেছে সে-বিষয়ে নিবেদিতার অনবদ্য বর্ণনার কিছু অংশ :

"এখানে দেখছি এক নারীকে, সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই, নববধূবেশে সজ্জিতা, মহাবিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণের উপরে নিবদ্ধ সমস্ত মনটি তাঁর, অথচ নিজ গৌরব সম্বন্ধে মনে বিন্দুমাত্র সচেতনতা নেই। বিশুদ্ধ সত্ত্বের এক বিগ্রহ।...অগ্নিশিখা লক্‌লক্‌ করে উঠছে। উর্ধ্বশিখার সিংহাসনের উপরে নতজানু তিনি—অথচ নির্ভয়। প্রার্থনারত। বিদায়ের চাপা কান্না নেই—তাঁর নয়নপথে নেই কিছু—কি অগ্নিশিখা, কিংবা পিছনে পড়ে-থাকা প্রিয় জনগণ—না, কিছু নেই, শুধু—যাঁর সঙ্গে অচিরে পুনর্মিলিত হবেন তাঁরই পবিত্র মূর্তি। শান্ত মন—নিমজ্জিত শান্তির তরঙ্গে। এসেছে বিচ্ছেদের ভাবনাহীন মিলনের মহামুহূর্ত।"

নন্দলালের 'কৈকেয়ী' চিত্রের আলোচনায় নিবেদিতা লেডি ম্যাকবেথের সঙ্গে কৈকেয়ীর তুলনা করে এই চরিত্রের উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। "কৈকেয়ীকে এখানে সেইসকল নায়িকার ধারাবর্তী দেখানো হয়েছে যাদের অন্যতম লেডি ম্যাকবেথ"—নন্দলালের ছবি থেকে এমন একটি বোধ জাগে। আবার পার্থক্যও অনুভূত হয়েছে নিবেদিতার মনে :

"কিন্তু এই ভারতীয় চরিত্রটির মধ্যে যে-ধরনের সুকুমারতা ও স্পর্শকাতরতার রূপ দেখি তা দেখতে পাইনা 'ভয়ানক স্কটিস পত্নীর' মধ্যে। কৈকেয়ী আরও জটিল ও মানবিক। স্বভাবে তিনি যতখানি পুরুষ, তার চেয়ে অনেক বেশি নারী। লেডি ম্যাকবেথের মধ্যে শক্তি এমন প্রচণ্ড যে, তাঁর স্বামীকে প্রায়ই নারী-ভূমিকা নিতে হয়েছে। কৈকেয়ী অপরপক্ষে আমাদের মধ্যে করুণার মনোভাব জাগ্রত করেন, কেননা আমরা অনুভব করি যে, যদিও তিনি অন্তর্নিহিত সৎ-স্বরূপ থেকে, উর্ধ্বতর সত্তা থেকে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু সর্বনাশের বিষপাত্র যখন পূর্ণ হবে তখন তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন স্ব-সত্তায়।"

'দময়ন্তীর স্বয়ংবর" চিত্রের আলোচনায় ভারতীয় নারীচরিত্রের অন্য এক ভাবমূর্তিকে নিবেদিতা তুলে ধরলেন। "মহাভারতের সকল নায়িকার মধ্যে দময়ন্তীর মতো শক্তিময়ী, সজীব, খোদাই-করা ভাস্কর্যতুল্য, অথচ জটিল নারীচরিত্র নেই—একমাত্র ব্যতিক্রম গান্ধারী। এই ধরনের চরিত্রকে আদিপর্বের আর্য-নারীত্বের প্রতিনিধি বলা যায়।" নিবেদিতার বিবেচনায় "সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধিতে দময়ন্তী শেক্সপীয়ারের নারীচরিত্রের মতোই।" দময়ন্তী-কাহিনী সম্বন্ধে নিবেদিতার গভীর সম্ভ্রম ও আকর্ষণ—কিন্তু তিনি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন যে, "ইউরোপীয় মানসিকতা দময়ন্তীকে যে-রকম বরেণ্য চরিত্র বলে গ্রহণ করে, ভারতে তা করা হয়না।" তাঁর বিস্ময়ের কারণ, "দময়ন্তীর কাহিনী ভারতের বীরযুগের সুন্দরতম পুষ্পের একটি। না—ভারতীয় বা ইউরোপীয় সাহিত্যের কোথায়-বা এর তুল্য চরিত্র পাব ?" নিবেদিতা নন্দলালের ছবিটির "কোমলতা ও মোহন মধুরতার"

প্রশংসা করলেও এতে বর্ণোজ্জ্বলতার অভাব লক্ষ্য করেছেন। ছবিটি তাঁর কাছে প্রায় একরঙা বলে মনে হয়েছে, যা অভিপ্রেত নয়। তাছাড়া আরও এক আপত্তি করেছেন : "আমরা মনে করিনা যে, বীরযুগে পুরুষরা ফুল-হাতে গদীয়ান হয়ে বসত। [ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে]। রাজাদের ক্ষেত্রে আরও খাঁটি খেলার জিনিস—তরবারি।"

নন্দলালের 'অহল্যা' চিত্রের আলোচনার সূচনায় নিবেদিতা বলেছেন, "এই ছবিটি...গুণী শিল্পীর সেরা সৃষ্টির একটি।" কিন্তু তিনি এই সমালোচনাও করেছেন—রাম ও লক্ষ্মণের চিত্রে "সৌন্দর্য এবং সুমার্জিত সুকুমারতা এমনই যে, তাঁরা প্রায় মেয়েলি হয়ে দাঁড়িয়েছেন।" তাঁর এই বক্তব্য সমালোচিত হয়েছে।[২৪] নিবেদিতার দৃষ্টিতে ছবির ওই ত্রুটি দূর হয়ে গেছে অহল্যার চিত্র রূপায়ণে। "ব্যক্তিত্বের সহজ রূপ এবং তপস্যালব্ধ কৃশকঠিন মর্যাদার দ্বারা অহল্যা এই চিত্রের অন্য চরিত্রগুলির [রাম, লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র] তুলনায় শক্তিশালী রূপাঙ্কন হিসাবে গণ্য হবে।" তাঁর মোট সিদ্ধান্ত এই : "ছবিটি যে-ধরনের প্রভাব মনে এঁকে যায় তা যে-কোনো যুগের যে-কোনো অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ শিল্পীর পক্ষে মস্ত কীর্তি বলে গণ্য হবে।"

নন্দলালের 'জগাই মাধাই' ছবি বিস্ময়কর। জগাই মাধাই সম্বন্ধে সচরাচর যেকথা ভাবা হয় এখানে তাঁদের সেইরকম পাষণ্ড বর্বর চেহারায় দেখিনা। ছবিটির খুঁটিনাটি বর্ণনা নিবেদিতা দিয়েছেন—জগাই মাধাইয়ের পানপাত্র, আহারের আয়োজন, হুঁকো ইত্যাদি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, লোকদুটির চেহারায় রূঢ় পাশবিকতা নেই, বরং আছে উচ্চবংশের ছোঁয়া। তাঁরা ক্রূর কঠিন নন, চতুর নন, অপরাধী প্রকৃতির নন—তাঁরা খেয়ালী, মজাদার স্ফূর্তির ভাবে আছেন ; রূপোলি পানীয়ের দিকে তাকিয়ে বসে ডগমগ—মদ খেয়ে নয়, মদ্যপানের কল্পনাতেই মাতোয়ারা। নন্দলালের ছবিতে সত্যই জগাই মাধাইয়ের এমন চেহারাই ফুটেছে। আর তার থেকে নিবেদিতা চলে গেছেন পাপীর রূপান্তর কাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের ভাবনায়। ধর্মীয় কাহিনীগুলিতে পাপীর সাধুতে রূপান্তরের যেসব অলৌকিক নাটকীয় বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলিকে ওই আকারে সত্য বলে মানতে নিবেদিতা রাজি নন। "যদি মেরী মার্গডালেন তাঁর আবাস-পথে সহসা খ্রীস্টের ছায়ায় ঢেকে যান তাহলে বুঝতে হবে তাঁর জীবনে সর্বদাই আদর্শ-সন্ধানের অন্তঃস্রোত বহমান ছিল।" জগাই মাধাইকে নিবেদিতা দেখেছেন নবদ্বীপ অঞ্চলের শান্তিনাশী হুল্লোড়বাজ চরিত্র-রূপে। তাঁরা চড়া ধরনের বাস্তব তামাশার কারবারী, বেআইনি হইচই আর মারদাঙ্গায় মেতে থাকতেন, কিন্তু ভিতরে তাঁদের শুভবুদ্ধি ছিলই। নির্ভীকতাই তাঁদের দৃঢ়তার মূলে, নির্বুদ্ধিতা থেকে এসেছিল নিষ্ঠুরতা। তাঁদের হৃদয়ে জমছিল দাহ্য পদার্থ—উদার ভালবাসায় জ্বলে ওঠার জন্য। তাঁরা সত্যই জ্বলে উঠেছিলেন যেদিন ঈশ্বরমদে মাতোয়ারা একটি মানুষ ওঁদের হাতের মারে রক্তঝরা ললাট নিয়ে এগিয়ে এসে ওঁদের জড়িয়ে ধরেন। জগাই মাধাই সেই প্রথম বুঝেছিলেন, কোথায় আছে সর্বোচ্চ আনন্দের উন্মাদনা এতদিন যার সন্ধান করেছে তাঁদের বেপরোয়া বেহিসাবী জীবন। নবদ্বীপের দুই বজ্জাত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বৈষ্ণব-পুরাণের শিশু-হৃদয় ঋষি।

নন্দলালের ছবিটিকে সামনে রেখে নিবেদিতা ওইসব কথা লিখেছেন। লোকপ্রসিদ্ধ দুই চরিত্র সম্বন্ধে পূর্বাগত ধারণায় মাত্রাভেদ ঘটিয়ে নন্দলাল শিল্পের শক্তি প্রমাণ করেছেন—এবং সেই নবমাত্রা স্বীকৃত হয়েছে নিবেদিতার গভীর রচনায়।

ছবিটির অঙ্কননৈপুণ্যের উচ্চ প্রশংসাও নিবেদিতা করেছেন। ছবিটি দাঁড়িয়ে আছে বিশুদ্ধ রেখারূপের শক্তিতে—যেন এতে রঙ-তুলির ছোঁয়া প্রায় নেই। "এই শিল্পীর এবং এঁদের শিল্পীগোষ্ঠীর আঙ্গিকগত বিজয়ের এক নিদর্শন পাওয়া গেল এখানে। এই ধরনের ক্ষুদ্র কিন্তু নিখুঁত একটি কাজের জন্য যে-পরিমাণ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে তা সাধারণের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। শরীর-সম্বন্ধী সুদৃঢ় রেখা, সহস্র-সহস্র আঁচড়ের দ্বারা অঙ্কিত কেশ, পাগড়ির সুস্পষ্ট ও সমন্বিত ছাঁদ, পরিকল্পনার সংগঠন ও আলোছায়া-বিন্যাসক জলরঙের কাজ—এ সকল বহু কালব্যয়ের ও অপরিসীম নৈপুণ্যের স্মারক। সব জড়িয়ে অপরূপ।"

'দশরথের অন্তিমশয্যা' চিত্রে কিভাবে শিল্পী সবিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে শোক-করুণার ভাবকে ফুটিয়েছেন, তার বর্ণনা নিবেদিতা বেশি করে দিয়েছেন। মুদ্রিত প্রতিলিপিতে যে, মূল ছবির রস অনুপস্থিত, তাও বলেছেন। স্বামীর মৃত্যুশয্যার পাশে উপবিষ্ট কৌশল্যার সংযত শোকমহিমা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য : "এখানে শোকের অশালীন উচ্ছ্বাস নেই। সবকিছু শান্ত, নিঃশব্দ, নিয়ন্ত্রিত। জলরঙের কাজ। মূল ছবিটি হাতে নিলে তার বিষয়ে মৃদু চাপা-স্বরে কথা বলা ছাড়া উপায় থাকেনা। চিত্রণে এমনই গাঢ়তা যে, মন ভাবনিবিড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।"

আর নিবেদিতা আত্মহারা হয়ে গেছেন 'শিবের তাণ্ডবনৃত্য' চিত্রের আলোচনায়। চিত্রটির আঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা তিনি পরিহার করেছেন, যেহেতু বিষয়ের মহিমাই ছিল তাঁর রচনা-লক্ষ্য। তবে চিত্র-রূপ প্রেরণাদায়ী না-হলে তিনি বিষয়-রূপের আলোচনায় যেতেনই না। —"এই ধরনের ভারতীয় চিত্রের সম্মুখীন হলে যা ঘটে এখানেও তাই ঘটল—আমরা সেই সৃষ্টির সাক্ষাৎ পেলাম যা এমনই মনস্তাত্ত্বিক, এমনই ধ্যাননিমগ্ন এবং এমনই ভাবগাঢ় যে, সমালোচনার ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায়—শিল্পী স্বয়ং যে-ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কেবল তারই পূর্ণ রূপদানে নিবিষ্ট—আমরা সেই ভাবের তরঙ্গে ভেসে যাই।" শিল্পীর অনুরূপ ভাবের মধ্যে সমালোচক নিমগ্ন হওয়ার ফলে আমরা শিবের মহাবিশ্বরূপের উপরে কিছু শক্তিশালী পঙ্‌ক্তি লাভ করেছি। আমরা জেনেছি,

"মহাদেবের কল্পনা মানবমনের এমন এক অসাধারণ কীর্তির স্মারক, অন্য ক্ষেত্রে যার সমতুল হল নিউটনের প্রিন্সিপিয়া। বিশুদ্ধ ভাবাবেগের গাঢ়তা, দুঃসাহসী দার্শনিকতা, অনন্তের মধ্যে সরাসরি প্রবেশের এমন শক্তিরূপ এইপ্রকার হিন্দু পুরাণকাহিনীতে মেলে—সারা বিশ্বের সাহিত্যে তার সমতুল কিছু মিলবে না।"

এর পরে নিবেদিতা যা লিখেছেন তেমন রচনাংশ নিজ সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত দেখলে যে-কোনো শিল্পীই গৌরববোধ করবেন।

"নটরাজের নৃত্য—সে হলো গতিময় সমাধি।...সে নৃত্যের তালে গুঁড়িয়ে যায় স্বর্গভবনের স্তম্ভ ও খিলান, লকলক করে জ্বলতে থাকে ত্রিশূল, আগুন ধরে যায় বিশ্বভুবনে—তারই মধ্যে নৃত্য করেন অমর স্বাপ্নিক, ঈশ্বরচৈতন্যে মাতোয়ারা হয়ে—অন্তর্গত ছন্দই শুধু তাঁর বন্ধন। সে ছন্দ টান দেয় নিজের মধ্যে বিশ্বভুবনকে, তার হৃৎস্পন্দনের

তালে-তালে ঘূর্ণিত হয় দিনরাত্রি।"[২৫]

স্বতঃই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের—"প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, হে নটরাজ...।"

॥৩॥

নিবেদিতা নন্দলালের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্রে নিমিত্তকারণ হয়েছিলেন। প্রাচীন চিত্রশিল্পের সর্বোত্তম নিদর্শন অজন্তায় পাওয়া গেছে। ভারতশিল্পের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে অজন্তার বিপুল প্রভাব। নন্দলালের শিল্পজীবনে অজন্তার গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে আমাদের সামনে এই তথ্যটুকু রয়েছে—নন্দলালের দ্বিধার শিকড় নিবেদিতা সজোরে উপড়ে তাঁকে ঠেলে না দিলে নন্দলাল অজন্তায় যেতেন না। নন্দলাল স্বয়ং সেকথা শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তকে ৩০-৬-১৯৪৪ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন :

"হ্যারিঙ্গহম বৃদ্ধা English মহিলা artist, ও বড় Orient art copyist, অজন্তা copy করতে আসেন খুব সম্ভব England-এর Oriental Art Society হতে। তাঁহার কয়েকজন সহকারী copyist দরকার হয়। উহা তিনি সিস্টার নিবেদিতার through দিয়ে অবনবাবুকে জ্ঞাত করেন। অবনবাবু উহা আমায় ও অসিতকে জানান। কিন্তু তখন আমরা বড় কুনো ছিলাম, তাই ইতস্তত করছিলাম। এই শুনে নিবেদিতা আমায় ডেকে পাঠান এবং উহা যে আমাদের Indian artist-দের পক্ষে বিশেষ দরকার ও ভবিষ্যতে আমাদের শিল্পী হিসাবে উন্নত হবার কাজে লাগবে বুঝাইয়া দেন, এবং ঐ সুযোগ ছাড়তে নিষেধ করেন, এবং শেষে জোর করেই টিকিট ইত্যাদি ও ব্যবস্থা করে ঠেলে পাঠিয়ে দেন। বিশেষ করে, অবনবাবুর কথা এড়ানো চলে, তাঁর [নিবেদিতার] কথা ঠেলা বড় কঠিন ছিল, ভীষণ তেজী মেয়ে ছি[লেন]।"[২৬]

নিবেদিতার এই ভূমিকা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের মুক্ত স্বীকৃতি :

"**ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়ো।** বাগবাজারের ছোট ঘরটিতে তিনি থাকতেন, আমরা মাঝে মাঝে যেতুম সেখানে। নন্দলালদের কত ভালবাসতেন, কত উৎসাহ দিতেন। **অজন্তায় তো তিনিই পাঠালেন নন্দলালকে।** একদিন আমায় নিবেদিতা বললেন, 'অজন্তায় মিসেস হেরিংহাম এসেছে। তুমিও তোমার ছাত্রদের পাঠিয়ে দাও, তার কাজে সাহায্য করবে। দু'পক্ষেরই উপকার হবে। আমি চিঠি লিখে সব ঠিক করে দিচ্ছি।' বললুম, 'আচ্ছা।' নিবেদিতা তখন মিসেস হেরিংহামকে চিঠি লিখে দিলেন। উত্তরে মিসেস হেরিংহাম জানালেন, বোম্বে থেকে তিনি আর্টিস্ট পেয়েছেন তাঁর কাজে সাহায্য করবার। এরা সব [নন্দলালরা] নতুন আর্টিস্ট, জানেন না কাউকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নিবেদিতা ছেড়ে দেবার মেয়ে নন। বুঝেছিলেন এতে ক'রে নন্দলালদের উপকার হবে। যে ক'রে হোক পাঠাবেনই তাদের। আবার তাঁকে চিঠি লিখলেন। আমায় বললেন, 'খরচপত্তর সব দিয়ে এদের পাঠিয়ে দাও অজন্তায়। এ-রকম সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলবে না।' নিবেদিতা যখন বুঝেছেন এতে নন্দলালের ভালো হবে, আমিও তাই মেনে নিয়ে সমস্ত খরচপত্তর দিয়ে নন্দলালদের ক'জনকে পাঠিয়ে

দিলুম অজন্তায়। পাঠিয়ে দিয়ে তখন আমার ভাবনা। কী জানি, পরের ছেলে, পাহাড়ে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলুম, যদি কিছু হয়। মনে আর শান্তি পাইনে। গেলুম আবার নিবেদিতার কাছে। বললুম, 'সেখানে ওদের খাওয়া দাওয়াই-বা কী হচ্ছে, রান্নার লোক নেই সঙ্গে, ছেলেমানুষ সব।' নিবেদিতা বললেন, 'আচ্ছা, আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।' বলে গণেন-মহারাজকে ডাকিয়ে আনলেন। ডাল চাল তেল নুন ময়দা ঘি আর একজন রাঁধুনি সঙ্গে দিয়ে বিলিব্যবস্থা করে, গণেনকে পাঠিয়ে দিলেন নন্দলালদের কাছে। তবে নিশ্চিন্ত হই। নিবেদিতা নইলে নন্দলালদের যাওয়া হত না অজন্তার।"

এই রচনার শেষাংশটি কিন্তু যেখানে গণেন-মহারাজকে পাঠাবার প্রসঙ্গ আছে, তথ্যগতভাবে ঠিক নয়—স্বয়ং নন্দলাল তা জানিয়েছেন।[২৭]

অজন্তার আবিষ্কার হয় ১৮১৯ সালে। তার ছবির প্রথম কপি করেন মেজর রবার্ট গিল বহু বৎসর ধরে। সেসব কপি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় কপির কাজ হয় বম্বে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ গ্রিফিথস্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১৮৭৫ সালে, বম্বে স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা। তারও অনেকগুলি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। যা থাকে তা গ্রিফিথস্ সাহেব প্রকাশ করেন দু' খণ্ডে (১৮৯৬-৯৭)—The Paintings in the Buddhist Cave Temples of Ajanta. গ্রিফিথস্-এর কাছে অজন্তার শিল্পীরা যেন "দেবশিল্পী—ছবি তো নয় যেন ইন্দ্রজাল।" কিন্তু তাঁর বইয়ের রঙিন ছবিগুলি ভালো হয়নি। তৃতীয় কপির ব্যবস্থা করেন পূর্বোক্ত মিসেস হেরিংহাম (ডাঃ উইলমট হেরিংহামের পত্নী)। ইনি স্বয়ং শিল্পী। অজন্তার আগে ইনি মিশর ও ইতালিতে প্রাচ্য ছবির কপি করেছিলেন বৃটিশ মিউজিয়ামের জন্য। "খুব ভালো কপিস্ট ছিলেন তিনি, [নন্দলাল বলেছেন], রোগা লিকলিকে বুড়ি মেমসাহেব।" ১৯০৯ এবং ১৯১০ সালের শেষে দু'বার উনি ছবি নকলের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমবার ওঁর সঙ্গে বিলেত থেকে মিস ডেভিস নামে এক মহিলা শিল্পী এসেছিলেন। তা ছাড়া হায়দরাবাদ থেকে এসেছিলেন শিল্পী ফজলুদ্দীন কাজী ও সৈয়দ আহমাদ। নন্দলাল প্রথমবার যান অসিতকুমারের সঙ্গে, দ্বিতীয়বার যাননি। প্রথমবার কিছু পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও বেঙ্কটাপ্পা। অসিতকুমার ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত দ্বিতীয়বারও গিয়েছেন, হায়দরাবাদের শিল্পী-দুজনও ছিলেন, এবং মিসেস হেরিংহাম বিলেত থেকে সঙ্গে ক'রে আনেন মিসি লারচার ও মিস লিউককে। মিসেস হেরিংহাম তাঁর অজন্তা বই ১৯১৫ সালে বের করেন, **Ajanta Frescoes**। নন্দলালরা অজন্তায় গিয়েছিলেন 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর পক্ষ থেকে, মূল ব্যয়ভার বহন করেন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জগদীশচন্দ্রও আংশিক ভার গ্রহণ করেছিলেন।[২৮]

জাতীয়তা, স্বাদেশিকতার সঙ্গে শিল্পের যোগ নিবেদিতা চেয়েছেন, কিন্তু কদাপি চাননি শিল্পীরা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ুন। নন্দলালদের অজন্তা থাকাকালে একটি অতীব চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছিল, তার থেকেই কথাটি প্রমাণিত। স্বদেশীযুগে বিপ্লবীর টীকা কিভাবে বাঙালী তরুণদের ললাটলিখন হয়ে গিয়েছিল এখানে তাও দেখা যায়।

ঘটনা এই, নন্দলালের জবানীতে :

"শেষের দিকে একবার একটা ঘটনা ঘটল। গণেনদার সঙ্গে সিগারেট থাকত।

দেবব্রতর [দেবব্রত বসু, অরবিন্দর সহযোগী বিপ্লবী ; দেবব্রত প্রসঙ্গ আছে 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' বইয়ের ষষ্ঠ খণ্ডে ; পৃ. ১১২-২০। ইনি পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ] সাগরেদ তিনিও ছিলেন একজন এনার্কিস্ট। সিগারেট আনাতেন কলকাতা থেকে। সেই টিনে আসত 'ধর্ম' কাগজ আর 'যুগান্তর'। টেররিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর, অরবিন্দর পার্টি। অরবিন্দর, দেবব্রতর লেখা থাকত 'ধর্ম' কাগজে।

"একদিন শুনলুম, বম্বের গভর্নর আসবেন কেভ দেখতে। ...খান্দেশ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এল কেভ দেখতে। ...ম্যাজিস্ট্রেট তো এল। আমাদিগকে লক্ষ্য ক'রে হেরিংহামকে বললে, 'ওরা সব এনার্কিস্ট পার্টির লোক। ওদের সরিয়ে দিতে হবে।' তখন নাসিক মার্ডার-কেস হয়ে গেছে কিনা। সুতরাং যে-কজন ইয়ংম্যান আছে ফ্রম ক্যালকাটা, তাদের সরাতেই হবে গভর্নর আসার আগেই। হেরিংহাম বললেন আমাদের—'তোমাদের সাসপেক্ট করছে। সরিয়ে দিতে হবে তোমাদের। দূরে পাহাড়ে টেন্ট ফেলবে যতক্ষণ থাকবেন গভর্নর'।"

বাঙালী শিল্পীরা এই কথা শুনে আপত্তি করেছিলেন, তাতে মিসেস হেরিংহাম কড়া অর্ডার দিয়ে তাঁদের সরাবার ব্যবস্থা করেন। উনিও সঙ্গে যান। তারপর যাত্রাকালের ঘটনা :

"জিনিসপত্তর আমাদের তোলা হলো একখানা গরুর গাড়িতে। সেগুলোকে চাদর জড়িয়ে কফিনের মতো ক'রে নিলুম। তারপর 'হরিবোল' আর স্বদেশী 'বন্দেমাতরম্' স্লোগান ছাড়তে-ছাড়তে রওনা হলুম আমরা। আর সেদিন তখন, হবি তো হ, গুড়ুম ক'রে এক বন্দুকের আওয়াজ। হৈচৈ পড়ে গেল—কে ফায়ার করলে, আমরা কিনা ? শেষে জানা গেল, পুলিসের বন্দুকে মিস্‌ফায়ার হয়েছে অ্যাকসিডেন্টালি। কিন্তু ব্যাপারটা ওঁদের শেষপর্যন্ত বিশ্বাস হয়নি।"

পাহাড়ের গায়ে শিল্পীদের তাঁবু কড়া সেপাই-পাহারায় রাখা হয়েছিল। গভর্নর কিন্তু ভয়ে আসেন নি। তিন মাস পরে ফিরে আসার সময়ে শিল্পীদের বেগ পেতে হয়েছিল। গণেনের সিগারেট টিন থেকে 'ধর্ম' ও 'যুগান্তর' কাগজ পাওয়া যায়। এঁদের হায়দরাবাদে ডাকবাংলোয় পুলিসের নজরবন্দীতে রাখা হয়। মিসেস হেরিংহাম সঙ্গে ছিলেন। পুলিসের আচরণে তাঁর ক্রোধের অন্ত ছিলনা। তারপর হায়দরাবাদ থেকে যখন ফিরছেন তখনও পিছনে পুলিসের ফেউ। হায়দরাবাদের এক স্টেশনে উডরফ-সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি আগেই এঁদের পক্ষে টেলিগ্রাম করেছিলেন, তবু এঁরা পুরো অব্যাহতি পাননি। কলকাতার ফেরার পরে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃপক্ষকে জানান, তিনি ওঁদের জামিন।[২৯]

নন্দলাল বলেন নি, এমন একটি সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের কথা অসিতকুমার হালদারের লেখায় পাই :

"হঠাৎ একদিন শোনা গেল, আসছেন বম্বের লাট অজন্তা দেখতে। সেই উপলক্ষে অজন্তা গুহাবলীর সামনে খসে-পড়া বড়ো-বড়ো পাথরের টুকরোগুলো ডিনামাইট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হলো—তার সঙ্গে গুহাশৈলীর কত-যে নক্সাকারী ছবি ও মূর্তি ধ্বংস হলো তার দিকে কারুর লক্ষ্য দেখলুম না। লেডি-সাহেবা [Mrs Herringham] খুব বিরক্ত হলেন তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে। তারপর আমাদের তাঁবুরক্ষক পুলিসের কাছে শোনা গেল, বাংলাদেশাগত শিল্পীদের লাটসাহেবের আসার কালে ফরদাপুর ক্যাম্প থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে নজরবন্দী ক'রে রাখতে [আদেশ হয়েছে]। সেই সময়ে পুনায় [নাসিকে] একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের উপর কোনো রাজদ্রোহী গুলি চালিয়েছিলেন। তখন একটা আতঙ্ক ইংরেজমহলে হয়েছিল—বিশেষভাবে বাঙালী ও মহারাষ্ট্রদের উপর। এই

প্রকার সরকারি হুকুমের কথা শুনে রেগে গিয়ে লেডি-সাহেবা আমাদের বললেন : 'বিলাত হতো তো দেখে নিতুম—পার্লিয়ামেন্টে প্রশ্ন তুলতুম তোমাদের উপর এইপ্রকার অন্যায় ব্যবহারের জন্য।...পরে জানা গেল, লাটসাহেব আসবেন না অজন্তায়। এলেন তাঁর পরিবর্তে একজন ইংরাজ কমিশনার লেডি হেরিংহামের তাঁবুতে। লেডি-সাহেবা ক্রোধে উন্মত্ত—তাঁর সঙ্গে শেক্‌হ্যান্ড পর্যন্ত করলেন না।"[৩০]

অসিতকুমার মিসেস হেরিংহামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সঙ্গে লিখছেন : "লেডি-সাহেবার তখন ৭২ বৎসর বয়স [?], ঘাড় মাথা কাঁপে, তথাপি তাঁর অদম্য কর্মানুরাগ ও উৎসাহ আমাদের খুবই অনুপ্রেরণা দিত। যে-ছবিগুলি সকাল থেকে উদয়-অস্ত গুহায় বসে তিনি আঁকতেন—গ্যাস-বাতি জ্বেলে আহারের পর রাত্রে দুটো পর্যন্ত বসে-বসে [সেসব] চান্‌কে তুলতেন।"[৩১]

তিনি অন্যত্র লিখেছেন : "সেই সুদূর দাক্ষিণাত্যে আত্ম-বন্ধুহীন স্থানে স্নেহশীলা ইংরাজ-মহিলা Mrs Herringham আমাদের সকলকে যেরূপ যত্ন ও স্নেহসিঞ্চিত করেছিলেন তা আমরা এ-জীবনে কখনও ভুলব না।"[৩২]

নিবেদিতার বেশ কয়েকটি চিঠিতে অজন্তা ও হেরিংহাম প্রসঙ্গ আছে—সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর অজন্তা ভ্রমণের কথাও। অজন্তা তাঁকে অভিভূত করেছিল, সেকথা যেমন পাই, তেমনি বাঙালী শিল্পীদের জড়িয়ে যে-রাজনৈতিক কাণ্ড বেধেছিল তার বিষয়েও জানতে পারি। তিনি মুগ্ধ ছিলেন মিসেস হেরিংহামের অসাধারণ শিল্পপ্রীতি ও অসামান্য পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখে, এবং রীতিমতো অস্বস্তিতে ছিলেন রাজনীতির সীমারেখার ভিতরে তাঁর ভ্রান্ত পদক্ষেপের সম্ভাবনাতেও। নিবেদিতার প্রাসঙ্গিক পত্রাংশগুলি পর পর উপস্থিত করছি।

মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউডকে, লন্ডন থেকে, ৯ মার্চ, ১৯০৮ :

"মিসেস হেরিংহাম অতি চমৎকার, এবং ড্যানবেনীরা এমন নিখুঁত স্বভাবের যে, আমি কেবল শ্রীরামকৃষ্ণ ও গ্রীষ্মের কাশ্মীরের [যে-গ্রীষ্মে তাঁরা স্বামীজীর সান্নিধ্যে কাশ্মীরে ছিলেন] কথাই বললাম।"

হ্যাভেলকে, ভারতগামী জাহাজ থেকে, ৬ জুলাই ১৯০৯ :

"মনে হয়, আপনি জানেন যে, মিসেস হেরিংহাম আগামী শীতকালে ভারতে আবার আসতে চান—স্কেচ করার অভিযানে। সম্ভব হলে আমাদের কেউ-কেউ তাঁর সঙ্গে সেখানে জুটে গিয়ে বড় দল তৈরি ক'রে ফেলবে। চর্চা করার পক্ষে অজন্তার ছবিগুলি অপূর্ব সুযোগের বস্তু।"

এস কে র‍্যাটক্লিফকে, দার্জিলিঙ থেকে, ২০ অক্টোবর, ১৯০৯ :

"দার্জিলিঙ-এ পৌঁছেছি—এসেই খবর পেয়েছি, মিসেস হেরিংহাম ভারতে এসে গেছেন—এবং তিনি চান আজই বারাণসীতে তাঁর সঙ্গে মিলিত হই। খুবই খারাপ লাগছে—আমি যেতে পারছি না।"

মিস ম্যাকলাউডকে, কলকাতা থেকে (?), ৯ অক্টোবর, ১৯০৯ :

"আশা করছি, অজন্তার মিসেস হেরিংহামের সঙ্গে মিলিত হতে পারব।"

মিস ম্যাকলাউডকে, কলকাতা থেকে, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯০৯ :

"পরের সপ্তাহে অজন্তায় মিসেস হেরিংহামের সঙ্গে মিলিত হবার আশা রাখি—ফেরার আগে ইলোরা দেখে নেবারও বাসনা। তাহলে ইতিহাসের মহাভোজ। মাসখানেকের মধ্যে সেক্ষেত্রে বছরখানেক ধরে লেখার মতো যথেষ্ট উপাদান জোগাড় হয়ে যাবে।"

মিসেস উইলসনকে, কলকাতা থেকে, ৬ জানুয়ারি, ১৯০৯ :

"তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, ক্রীসমাস ইভ-এর দিন (২৪ ডিসেম্বর) সারারাত্রি অজন্তার দিকে যে-চওড়া রাস্তাটি গিয়েছে, তার উপর আমরা হৈ-হৈ ক'রে ঘুরে রেড়িয়েছি, এবং যখন অপরূপ চাঁদ ঘণ্টাখানেক হলো ডুবে গেছে ও উষার আলো ফুটেছে—মিসেস হেরিংহামের তুষারশুভ্র তাঁবুর কাছে পৌঁছে তাঁকে 'মেরী ক্রীসমাস' জানিয়েছি। তারপর তিনটি মহানন্দের দিন—শিল্পের—ইতিহাসের—গ্রন্থের—এবং—গুহার!"

র‍্যাটক্লিফ দম্পতিকে, কলকাতা থেকে (?), ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০ :

"মিসেস হেরিংহাম ফিরে যাওয়া মাত্র তুমি [অর্থাৎ মিঃ র‍্যাটক্লিফ] অতি-অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করবে—যাতে ক'রে তাঁর কাছ থেকে বাংলার সন্ত্রাসের মনোরম কাহিনীটি শুনে নিতে পারো। নন্দলাল বসু এবং আর একজন শিল্পী তাঁর সঙ্গে অজন্তা থেকে যখন ফিরছিলেন তখন তাঁদের জোর ক'রে আটক রাখা হয়। উড্‌রফ ও ব্লান্টের টেলিগ্রাম পাবার পরেই তবে তাঁদের ফেরার জন্য যাত্রা করতে দেওয়া হয়। এমন করার কোনো কারণ দেখানো হয়নি—তবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এটা এমন-কিছু ব্যাপার নয়। আসল মজা ক্লার্ক-এর পরিকল্পিত অজন্তা-দর্শন নিয়ে। বাঙালী শিল্পীদের [অজন্তা থেকে] সরিয়ে পাঁচ মাইল দূরে ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল—ক্যাম্প ঘিরে সশস্ত্র সিপাহীদের পাহারা! এমনই বিপজ্জনক কাণ্ডকারখানা যখন—ক্লার্ক নিজে তো গুহা-দর্শনের প্রয়াসী হতে পারেন না—তখন চার বীরপুঙ্গব (কালেক্টরের প্রাইভেট সেক্রেটারি, বোম্বাইয়ের পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট, জলগাঁওয়ের কালেক্টর বা কমিশনার সিমকক্স, এবং আর এক ব্যক্তি) অস্ত্রধারী সৈনিকদের সুদৃঢ় ব্যূহের মধ্যে থেকে গুহাদর্শনের দুঃসাহসিক অভিযানে জীবন সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত করলেন—এবং তাঁরা গিয়েছিলেন! তারপর—হে ঈশ্বর! যখন উক্ত মহাশয়গণ নিরাপদে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট এবং বাইরে নিখুঁত নিরাপত্তা—ঠিক তখনই ছুটে গেল বন্দুকের গুলি! তৎক্ষণাৎ সিমকক্সের গর্জন—'লা-ই-ন্ মা-রো-ও—ওঃ! সা-ম-নে তা-কাও!' ইত্যাদি ইত্যাদি। আতঙ্কে থরহরি কর্তারা প্রত্যেকটি সিপাইকে দারুণভাবে নেড়েচেড়ে দেখলেন। দেখা গেল যে, তীব্র উত্তেজনা এবং আসন্ন প্রলয় সম্বন্ধে সর্বজনীন ধারণার ফলে, একটি লোকের বন্দুকের গুলি হঠাৎ ছুটে গেছে! ধন্য সেই ব্যক্তি। পরিস্থিতির শিরোপা তারই প্রাপ্য।

"আরও একটি কাণ্ডের কথা এখনো বলা হয়নি। গুহার মধ্যে কী-বস্তু পাওয়া গেছে জানো—শুনলে বিশ্বাস করবে? এক টুকরো কাগজ—বাংলায় ছাপা! সেটিকে সযত্নে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সতর্কভাবে পরীক্ষা করবার জন্য।...

"যাহোক, ঘটনাটি নিয়ে এমন বেদম হাসি হেসেছি যে, শেষে চোখে জল গড়িয়েছে। তবে ঘটনার শিকার যেসব মানুষ তারা অবশ্যই ব্যাপারটিকে অতখানি আমোদজনক মনে

করেনি। সৌভাগ্যের বিষয়, জ্যাকসনের [এ এম টি জ্যাকসন, নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট, ২১ ডিসেম্বর ১৯০৯ অনন্ত লক্ষ্মণ কানহারের হাতে খুন হন] হত্যাকাণ্ডের জন্য বাঙালীদের দায়ী করা যাবেনা।

"হ্যাঁ—দুঃখজনক সংবাদ সব, তাতে সন্দেহ নেই। ওই ধরনের কিছু ঘটলেই ছোটখাট হয়রানির সংখ্যা বেড়েই যায়। তুমি আমাকে 'কভারের মধ্য দিয়ে' এজেন্ট-মারফত চিঠি পাঠাতে পারো, তা জানোই।...

"জীবনে এই একবার ভেবে খুশি যে, আমি গণ্ডগোলটির মধ্যে ছিলাম না। মিসেস হেরিংহামের ইংরেজ বন্ধুরা চলে যাবার পরেই তাঁকে সাহায্য করার জন্য আমার অজন্তায় যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি যাতে না যাই সেজন্য আমার এখানকার বন্ধুরা কিছুটা বাধা সৃষ্টি করেছিলেন—তাতে ভিতরে-ভিতরে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলামও। কিন্তু উঃ, যদি ওই চারটি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো এবং তাদের কাছ থেকে রূঢ় ব্যবহার পেতে হতো !!"

র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে, কলকাতা থেকে, ৩ মার্চ ১৯১০ :

"যেসব ছেলেরা মিসেস হেরিংহামের সঙ্গে গিয়েছিল এবং বাঙালী বলে যাদের হায়দরাবাদে [যা তখন দেশীয় রাজ্য] আটকে রাখা হয়েছিল যাতে তারা বৃটিশ ভারতে প্রবেশ করতে না পারে—তাদের ছাড়ান দেওয়া হয়েছে এবং তারা গত শুক্রবার বিকালে ফিরে এসেছে।

"মিসেস হেরিংহামের বয়স ৫৭—তিনি মইয়ে চড়ে দিনের পর দিন যে-কোনো সাধারণ শ্রমিকের মতো কঠোর পরিশ্রমের কাজ ক'রে যাচ্ছেন—এই দৃশ্য ছেলেগুলির কাছে এক নতুন আদর্শের, আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস। অপূর্ব নারী তিনি—তাঁর যেন শরীর নেই, শুধু আছে মন—এক অপরূপ মন।"

হ্যাভেলকে, কলকাতা থেকে, ৩ মার্চ ১৯১০ :

"অজন্তা থেকে গণেন ব্রহ্মচারী কিছু ফটো তুলেছে, সেগুলি মনে হয় টেগোররা আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু মিসেস হেরিংহাম তাঁর তরফে করা স্কেচগুলি স্বত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়মত—তিনি নিজে প্রকাশ করার আগে তাদের ব্যবহার করা যাবেনা। তিনি ফেরার পরে আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে নেবেন। তবে মনে হয়, ফটোগুলিতেই আপনার কাজ চলে যাবে।"

র‍্যাটক্লিফ-দম্পতিকে, কলকাতা থেকে, ১০ মার্চ, ১৯১০ :

"মিসেস হেরিংহাম সোমবার বসুদের বাড়িতে এসেছিলেন, গতকাল বুধবার ইংলন্ড যাত্রা করেছেন। মঙ্গলবার অজন্তা থেকে আঁকা ছবিগুলি নানা ঘরে টাঙানো ছিল। শিল্পকে নমস্কার জানানোর গোটা দিনটি। এই চিঠি পাবার পরে তুমি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।...কয়েকটি বিষয়ে তাঁর মন বিরক্তিতে ভরে আছে—তাকে প্রকাশ করার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি নিতান্ত ব্যাকুল। আশা করি, তুমি তাঁকে ওই বিষয়ে চুপ ক'রে থাকতে এবং শিল্পকাজে নিযুক্ত থাকতে বলবে। শেষোক্ত ব্যাপারেই তিনি বিরাট-কিছু করতে সমর্থ—যার থেকে উচ্চাঙ্গের কিছু অপরে করতে সমর্থ নয়। অপর পক্ষে রাজনীতির ব্যাপারে মিসেস হেরিংহাম এমনই সহজে-বিচলিত-হওয়া স্বভাবের যে, (শিল্পীরা যা হয়েই থাকেন) তিনি মুখ খুললে দু'পক্ষই আঘাত পাবে।...অনেকগুলি মূল ধারণার

ক্ষেত্রে তিনি পুরো মেয়েলি। তাই ঈশ্বরের দোহাই, শিল্প ছাড়া অন্য বিষয়ে যেন তাঁর ঠোঁট বন্ধ থাকে। তবে শিল্পের বিষয়ে—অসামান্য।"[৩৩]

হ্যাভেলকে, কলকাতা থেকে, ৭ এপ্রিল ১৯১০ :

"এই চিঠি পাবার আগেই আপনার সঙ্গে মিসেস হেরিংহামের দেখা হয়ে গেছে। তাঁর কাছ থেকে নিশ্চয় জেনেছেন যে, তিনি নিজে প্রকাশ করার আগে পর্যন্ত [অজন্তার] প্রতিলিপিগুলির স্বত্বসংরক্ষণে কতখানি উৎকণ্ঠিত। তবে তাঁর অভিযানকালে বহুসংখ্যক ফটো তোলা হয়েছে যাদের বিষয়ে মনে হয় কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। [গণেন্দ্রনাথ ফটোগুলি তোলেন]। অবশ্য এসব কথা তিনিই আপনাকে বলবেন।

"খুবই আশা করি, তিনি রাজনৈতিক বিষয়ের কোনো উল্লেখ করবেন না। তা করলে রাজনৈতিকভাবে কারও লাভবান হবার সামান্যতম সম্ভাবনা সেই, উল্টোদিকে শিল্পক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবহানি ঘটবে। তাঁর ছাত্রদের উপরে চাপানো কিছু অসুবিধাজনক ঘটনায় তিনি ক্রুদ্ধ। কিন্তু বিভিন্ন দলের মধ্যে যেসব নীতি ও ভাবধারা ভেদরেখা তৈরি করে [অর্থাৎ রাজনৈতিক দল ও শিল্প-দলের মধ্যে] সেসব সম্বন্ধে তাঁর কোনো সঠিক অন্তর্দৃষ্টি নেই। তাই তিনি যদি মুখ খোলেন তাহলে যেখানে সাহায্য করা তাঁর অভিপ্রায় সেখানে ক্ষতি করে বসবেন। যদি দরকার মনে করেন, আমার নাম না-ক'রে তাঁকে বন্ধুভাবে এইসব কথা বুঝিয়ে বলবেন—হয়ত তাঁকে আপনি প্রভাবিত করতে পারবেন।"

এস কে র‍্যাটক্লিফকে, কলকাতা থেকে, ৬ জুলাই ১৯১০ :

"মিসেস হেরিংহাম শিল্পবিষয়ে বুদ্ধি ধরেন—কিন্তু অন্য ব্যাপারে একেবারে মেয়েলিপনায় ভরা—মন ও মতে অস্থির, অস্বাভাবিক রকম অস্থির—তাই বলতে চাইছি।"

শিল্পের দুর্গম পথে বিজয়ী অভিযাত্রী মিসেস হেরিংহাম রাজনীতির গহন জটিল পথে দিকভ্রান্ত পথিক, একথা বুঝে নিবেদিতা রীতিমতো অস্বস্তিতে ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, অরবিন্দ-দলের গণেন্দ্রনাথ অজন্তায় (যাঁকে শিল্পীদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিবেদিতা রেখে এসেছিলেন) কিছুটা গণ্ডগোল পাকিয়েছেন—বিশেষত 'ধর্ম' ইত্যাদি কাগজ আনানোর দ্বারা। জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে তিনি অজন্তায় গিয়েছিলেন—এক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রও বিপদে পড়তে পারেন—তাতে তাঁর বিজ্ঞানচর্চা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানকে সরকারী দংশন থেকে বাঁচাবার একান্ত চেষ্টার কথা নিবেদিতার বহু চিঠিতে আছে। সর্বোপরি ব্যাহত হবে শিল্পের অগ্রযাত্রা। নন্দলালের মধ্যে যে-মহাপ্রতিভার সূচনা তিনি দেখেছেন, কোনোভাবে তার ক্ষতি ঘটুক, তিনি চাননি। জাতীয় জাগরণের সঙ্গে শিল্প-জাগরণের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের বিষয়ে সুনিশ্চিত বোধের জন্য তিনি সযত্নে শিল্পীদের আড়াল ক'রে রাখতে চেয়েছেন রাজনীতির আবর্ত থেকে। এ-বিষয়ে অসিতকুমারের সাক্ষ্য এই :

"আমাদের উপদেশচ্ছলে [নিবেদিতা] বারবার সাবধান করতেন—আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দিই। তখন চলছিল পার্টিশন হওয়ার পর প্রবল স্বদেশী আন্দোলন—দেশের তরুণের দল ক্ষিপ্ত বিদ্রোহিত। বোমা পিস্তল ইংরাজদের বিরুদ্ধে চলছে—ধরা পড়ছে—ফাঁসি যাচ্ছে ছেলেরা। আমাদের হাতে দেশের অভিলুপ্ত আর্টের

নবজাগরণ নির্ভর করছে—সেটাও দেশের জাগৃতির ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড়ো কাজ—সেই কথাই ভগ্নী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।"[৩৪]

রাজনীতিতে স্বয়ং চরমপন্থী নিবেদিতা যে, জীবনকে রাজনীতিসর্বস্ব মনে করেন নি, একথা বেশি বলার প্রয়োজন নেই। তাঁর মনের সঙ্গে, চরমপন্থায় অনাগ্রহী রবীন্দ্রনাথের মন একতারে বাঁধা ছিল—জাতীয় জীবনে শিল্পের গুরুমূল্যের তাৎপর্য অনুধাবনে। রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারের 'বাগগুহা ও রামগড়' বইয়ের ভূমিকায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "যে-জাতি কলাবিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয়নি সে-জাতি মহাপ্রাণ-জাতি নয়।" "স্বাদেশিকতার অভিমানে উন্মত্ত" দেশবাসীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "এক টুকরো কাগজে একটুখানি ছোট ছবি যদি সত্য ক'রে আঁকতে পারি, তার দ্বারা নিত্যকালের কাছে দেশের যে-পরিচয় প্রকাশ পাবে তা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে খবরের কাগজের বড়ো-বড়ো ধ্বজা আস্ফালন ক'রে হবে না।" অজন্তার বিষয়ে তাঁর সশ্রদ্ধ নিবেদন : "অজন্তার সময়কার রাষ্ট্রীয় ঐশ্বর্যের একটি খুদকুঁড়োও আজ ভারতের ভাগ্যে বাকি নেই, কিন্তু অজন্তা ভিত্তিচিত্রে তখনকার ভারত যে-লিপিখানি লিখে গেছে সেই লিপি যুগ হতে যুগান্তরে আপন বাণীকে প্রচার ক'রে চলেছে।"

নন্দলালদের কাছে অজন্তা কী হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার কথা অসিতকুমারের রচনা থেকে দেখে নেওয়া যায় :

"আমাদের পক্ষে অজন্তা শৈলীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় পাওয়ার সুযোগ হওয়ায় আমাদের দেশী আর্টকে বোঝার জন্য তৃতীয় নয়ন খুলে গিয়েছিল। মানস-পরিকল্পিত অথচ প্যাটার্নের মতো কনভেনশনাল না ক'রে, জীবনের সকল রসভাবকে পরিবেশিত করার শক্তি অজন্তার চিত্রকলার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম। যেমন কালিদাসের মহাকাব্য তেমনি অজন্তার চিত্রকলা। এদের নিকটে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে আর দৃষ্টি ফেরাতে ইচ্ছা হয়নি।"[৩৫]

নিবেদিতা কী দেখেছিলেন অজন্তায়, তা তিনি প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ব মেশানো সুবিহিত দীর্ঘ রচনায় প্রকাশ করেছেন—'দি এনসেন্ট অ্যাবী অব অজন্তা' (মডার্ন রিভিউ, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, মে, জুন, জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর)। অজন্তা দর্শনের পরে তাঁর বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের কিছু তরঙ্গরেখা তাঁর চিঠিতে ছড়িয়ে আছে—আগেই অল্পবিস্তর দেখেছি। র‍্যাটক্লিফকে লেখা ৩১ মার্চ ১৯১০ তারিখের চিঠিতে আরও দেখি :

"অজন্তার বিষয়ে তোমাকে আমি কিছু বলিনি তার কারণ মনে হয়নি যে, তুমি ও-সম্পর্কে কিছু জানতে চাও। আমি দুঃখিত। পরম সুন্দর তা—সুপ্রাচীন সংঘারাম-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—পার্বত্য নদীর উপরে ঝুঁকে-থাকা গিরিখাঁজের উপরে তৈরি। নীল-ধূসর পাথরে নির্মিত সার-সার খিলান ও সমদূরবর্তী স্তম্ভশ্রেণী। প্রথম দেখে তাই মনে হয়েছিল—হিউয়েন সঙ-এরও নিশ্চয়ই তাই। ঘনিষ্ঠতর পর্যবেক্ষণে বোঝা যায়, এটি ধারাবাহিকভাবে বৌদ্ধধর্মী—ইলোরা যেমন যুগসন্ধির সৃষ্টি, এটি তা নয়। সুতরাং এ হলো এক বিচিত্র প্রাচীন ও বিস্ময়জনক অক্সফোর্ড-চরিত্রের। একে ভালবেসে ফেলেছি। তারপর এ হলো শিল্প-ইতিহাসের নিদর্শনসমৃদ্ধ। এই বিষয়ে মিসেস হেরিংহামের বোধ অসামান্য—তাই এক্ষেত্রে ওঁর শরণই শ্রেয়। কিন্তু একটা কথা বলব, যে-মহান কালপর্ব

সম্বন্ধে ওঁর আকর্ষণ, তার আগেই ওখানে প্রাচীনতর ভবনগুলিতে পুরাতন ফ্রা আঞ্জেলিকো ধরনের শিল্পীগোষ্ঠীর রচনা ছিল, যা অতীব সুন্দর ও মর্মস্পর্শী। সমস্ত জিনিসটি যেন ভারতের সান মারকো কনভেন্ট। মিসেস হেরিংহাম হয়ত অজন্তা সম্বন্ধে একটি নতুন সচিত্র বই বার করবেন। তাতে এই ঐতিহাসিক অংশ দেওয়ার পরিকল্পনা যদি থাকে, এবং যদি তিনি আমাকে তা লিখতে বলেন, তাহলে আমি খুবই আনন্দিত হব।" (পূর্বোক্ত অজন্তা বিষয়ক রচনায় নিবেদিতা সে-কাজ করেছেন)।

হ্যাভেলকে ৩ মার্চ ১৯১০ লিখেছিলেন :

"আপনাকে অজন্তা নিতেই হবে। ও-বস্তু ভারতীয় ইতিহাসে কল্পনাতীত বৃহৎ ব্যাপার। ৬০০-১০০০ খ্রীস্টাব্দের হিন্দু-ভাস্কর্য অনন্যসাধারণ। অমন সুকুমার লালিত্য ও সৌন্দর্য—বিশেষত শরীরসংস্থানে—দেখাই যায়না। একথা অবশ্য ইলোরা ও এলিফ্যান্টা সম্বন্ধেই অধিক প্রযোজ্য। ওদের সঙ্গে অজন্তার ভাস্কর্য তুলনীয় নয়। কিন্তু অজন্তার গুহামধ্যে চিত্রাবলী—বিশেষত তরুণ বুদ্ধ ও যশোধরার চিত্র—অপূর্ব।"

॥ ৪ ॥

নিবেদিতার কাছ থেকে নন্দলাল অনেক কিছু পেয়েছেন—তাঁকে দিয়েছেন কী? ভারতবর্ষের জন্য যিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করেছিলেন সেই নিবেদিতা—নন্দলালের কাছে পেয়েছেন শিল্পীর জীবনব্যাপী ভারতশিল্প সাধনার সম্পদ। সেই বিপুল সৃষ্টির মহৈশ্বর্যই তো নিবেদিতাকে নন্দলালের শ্রেষ্ঠ দান! তবু সুনির্দিষ্ট দানের কথাও আসে। আগেই দেখেছি, স্বামী বিবেকানন্দের ছবি এবং অন্য দু'একটি ছবি নন্দলাল নিবেদিতাকে দিয়েছেন। তিনি নিবেদিতার **Myths and Legends** বইয়ের জন্য (বইটির বরাত দেয় হ্যারাপ কোম্পানী) অনেকগুলি ছবি এঁকেছেন—'গরুড়', 'একলব্য', 'অস্ত্রপরীক্ষা', 'জতুগৃহদাহ', 'কিরাত-অর্জুন', 'যুধিষ্ঠির', 'জন্মাষ্টমী', 'উমার তপস্যা', 'শিবের বিষপান' এবং 'যম ও নচিকেতা'। এই তালিকা থেকে দেখা যায়, নন্দলালের সেরা পৌরাণিক ও মহাকাব্যিক বিষয়ের অনেকগুলি ছবি এই সূত্রেই আঁকা হয়েছে। এইসব ছবির আকার ও বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে তথ্য দিয়েছেন ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল; তার মধ্যে দেখা যায়, বইটিতে যম ও নচিকেতা ছবিটির ক্ষেত্রে ভুল চিত্রনাম দেওয়া হয়েছে, এবং চিত্রকরের নামও (সুরেন্দ্রনাথ কর) ভুল।[৩৬] এছাড়া, নিবেদিতার মরণোত্তর গ্রন্থ 'ফুটফলস্ অফ ইন্ডিয়ান হিস্টরি'-তে নন্দলালের 'বুদ্ধ ও মেষশিশু' ছবিটি আছে।

জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছায় নন্দলাল নিবেদিতার রিলিফ মূর্তির কাজেও হাত দিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর উক্তি :

"সিস্টার নিবেদিতার রিলিফের একটি মূর্তি আছে বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে। তার ডিজাইন আমার করা। বোম্বের কারমারকার করেন ওই রিলিফের কাজ আমার ডিজাইন থেকে দেখে। শ্বেতপাথরের উপর লো-রিলিফের কাজ।"[৩৭]

ছবির মতো নন্দলালের একটি বর্ণনা :

"আমরা অজন্তায় পৌঁছবার পর, সিস্টার, ডক্টর বোস, লেডি বোস ও গণেন-মহারাজ

সকলে একদিন গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সিস্টার টাঙ্গা থেকে নামবার সময় 'দুর্গা দুর্গা' বলে নামছেন। তাঁর পরনে সাদা সিল্কের আলখাল্লা, চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, মুখ দীপ্ত ও আনন্দে উদ্‌ভাসিত। অবনবাবু উঁহাকে দেখে আমাদের বলেছিলেন, যেন তপস্বিনী উমাকে দেখলাম।"[৩৮]

নন্দলালও উমাকেই দেখেছেন নিবেদিতার চেহারায়। ভারতের পৌরাণিক কবিকল্পনার দীপারতি যে-প্রতিমার সামনে, সেই উমার ছবি আঁকার সময়ে একালের শ্রেষ্ঠ ভারতশিল্পীর সামনে নিবেদিতার উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল, একথা স্বয়ং নন্দলালই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন :

"স্ফটিক আর রুদ্রাক্ষের মালা পরে থাকতেন সিস্টার সাদা সিল্কের ক্লোকের ওপর। ধপধপে বরফের মতো সাদা চেহারা। অপূর্ব সুন্দরী।...আমার 'সতী' বা 'উমার তপস্যা' ছবির খানিকটা আদল তাঁর চেহারায় ছিল বৈকি।"[৩৯]

এর পরে নন্দলালের নিম্নে উৎকলিত কথাগুলি আর বিস্ময়কর মনে হয়না :

"তাঁর মুখে ছিল বিরল লাবণ্যকোমল জ্যোতি। তার থেকে যেন পবিত্রতা ও শক্তি বিচ্ছুরিত হতো। যে-কেউ একবার সে মুখ দেখেছে সারা জীবনে কখনো ভুলবে না। তাঁর কাছ থেকে যে-অনুপ্রেরণা পেয়েছি সে-বিষয়ে বলে শেষ করতে পারব না। তাঁর মৃত্যু—সে যেন দিশারী দেবদূতীর অন্তর্ধান।"[৪০]

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে শান্তিনিকেতন থেকে ২৫-৮-৫৪ তারিখে লেখা নন্দলালের চিঠি। 'শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দলাল', পৃ· ২৬।

যতদূর জানা যায়, স্বামীজীর একটি ছবিই নন্দলাল এঁকেছেন : ১৯০৭ সালে আঁকা সেই ছবিটির মূল্য ধার্য ছিল ২৫ টাকা (ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, ১ম, পৃ· ৭১)। ছবিটি আঁকার পরে নিবেদিতা কী বলেছিলেন তা ডঃ মণ্ডল নন্দলালের মুখে শুনে লিখেছেন :

"স্বামীজীর ছবি করেছিলেন নন্দলাল। গায়ে ছিল কাপড় জড়ানো। সিস্টার দেখে বললেন— 'এ হয়নি। এত কাপড় জড়িয়েছে কেন স্বামীজীর গায়ে? তিনি এত কাপড় জড়াতেন না। তোমাদের দেশের ক্লাইমেটে বেশি কাপড় জড়ানো যায়না। বুদ্ধের দ্যাখো, ওঁর গায়ে কি কাপড় জড়ানো আছে? স্বামীজী ছিলেন বুদ্ধের মতো'।" [ওই, পৃ· ১৫০]।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ("নন্দলালের জীবনে রামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল", দেশ বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৯, নন্দলাল জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা) পাচ্ছি, নন্দলাল বলেছেন, তিনি স্বামীজীর আর একটি ছবি এঁকেছিলেন, সেটি নিবেদিতা স্কুলে দিয়েছিলেন। এই সংবাদ অন্য সূত্রে সমর্থিত দেখিনি।

২ বাণী ও রচনা, ৯ম, পৃ· ৪১৪-১৫।

৩ বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে লেখা এক পত্রে নন্দলাল বর্ণনা করেছেন, স্বামী সারদানন্দ স্বামী ১৯০৫ সালে উদ্বোধনে বসে তাঁকে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্ক এবং গীতার মূল ভাব বুঝিয়েছিলেন। (বরেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত গ্রন্থ ৪৮-৪৯)। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলও এই বিষয়ে নন্দলালের স্মৃতিকথা উপস্থিত করেছেন। ('ভারতশিল্পী নন্দলাল', ১ম, পৃ· ৯৬-৯৭)।

পার্থসারথির মুখের আদল নন্দলাল পেয়েছিলেন মাদ্রাজের পার্থসারথি মন্দিরের পার্থসারথি মূর্তি থেকে। "অন্ধকার গম্ভীরায় পার্থসারথির চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্তি অতি মনোহর।" স্বামী বিবেকানন্দ এক চিঠিতে (২০ আগস্ট ১৮৯৩) আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছিলেন : "যাও এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীনদরিদ্রের সখা ছিলেন, যিনি গুহক-চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া, এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন...তাঁহার নিকট গিয়া মহাবলি প্রদান করো, জীবনবলি—তাহাদের জন্য...যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালোবাসেন—সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য।"

স্বামীজীর এই উক্তির মধ্যে শিল্পপ্রসঙ্গ নেই, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই মধ্যরাত্রির মতো গম্ভীর পার্থসারথি মূর্তি দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই ভয়ানক কৃষ্ণই, তিনি অনুভব করেছেন, আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন— বৃন্দাবনের প্রেমময় কৃষ্ণ

নন।

৪ নিবেদিতা, 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে', (১৩৫৮ সং), পৃ· ৭০।

৫ 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে', পৃ· ২৯।

৬ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ· ৭২।

নন্দলালের আঁকা 'হিমালয়ের শিব' ছবির ক্যাপশনে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিতার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। সেই মন্তব্য, নন্দলাল বলেছেন, তাঁর ছবি দেখেই নিবেদিতা করেছিলেন : "আর্যরা ভারতের প্রেমে অভিভূত হয়ে হিন্দু হয়ে গেলেন। তুষারমৌলি পর্বতরাজি সম্বন্ধে কী ভাবলেন তাঁরা? ওই যে পৃথিবীর ঊর্ধ্বে মৌন উন্নত, দারুণ শৈত্যে ও দূরত্বে অতি ভয়ঙ্কর, তথাপি অবর্ণনীয় সুন্দর—কী ওঁরা? মহান সন্ন্যাসীর মতো ভস্মাবরণে ধ্যাননিমগ্ন শুদ্ধ নিঃসঙ্গ— ওঁরা— হাঁ, ওঁরা যেন স্বয়ং শিব— দেবাদিদেব মহাদেব।"

৭ রবিবর্মার নকলনবিসির চেয়ে কালীঘাটের পটও আছে ভালো— স্বামী বিবেকানন্দের এই মনোভাবের কথা আগে জেনেছি। বিবেকানন্দের ভাবনাকে অসামান্য ঐশ্বর্যভূষিত করে প্রকাশ করেছেন যামিনী রায় তাঁর অজস্র পটধর্মী ছবিতে। (তিনি সচেতনভাবে বিবেকানন্দের অনুগামী, এ কথা অবশ্য বলছি না)। যামিনী রায়ের ছবিতে সরল ছন্দের দৃঢ় রেখা, উজ্জ্বল বর্ণ, নিজস্ব রীতির উদ্ভাবন এবং প্রায়শই আত্মানুকরণ—সব জড়িয়ে বলা যায় সেসব সুশিক্ষিত পট। এখানে স্মর্তব্য, নন্দলালও পট এঁকেছেন, তাতে সাধারণ জীবনের ছোঁয়া বেশি, যদিও শেষপর্যন্ত ছবির পটরূপকে তিনি রচনায় প্রাধান্য দেননি। যৌবনকালে নন্দলালের পট-অঙ্কন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী এই : গাঁয়ের সাধারণ মানুষের কাছে শিল্পকে পৌঁছে দেবার জন্য নামমাত্র দামে পট এঁকে বিক্রি করবার চেষ্টা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের কানে সেকথা পৌঁছলে তিনি একদিন নন্দলালকে ডাকিয়ে বেশি দামে তাঁর সব পট কিনে নেন, তাতে নন্দলাল ভাবেন, ওই কাজ গুরু পছন্দ করছেন না, ফলে সেখানে তাঁর পট আঁকার ইতি। নন্দলাল নিজে এই ঘটনার যে-বিবরণ দিয়েছেন, তাতে কিন্তু উক্ত তথ্য বাহ্যত মোটামুটি এক থাকলেও তাৎপর্যে মাত্রাভেদ ঘটেছে। অবনীন্দ্রনাথের কাছে আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ করে নন্দলাল তাঁর গ্রামের বাড়ি হাওড়া জেলার রাজগঞ্জ-বাণীপুরে যান ; সেখানে কয়েকমাস থাকাকালে কালীঘাটের পটের রীতিতে চোখে দেখা জিনিসের ছবি আঁকতে থাকেন। একটা মুদির দোকানে দড়ির পাকে ১০-১২ খানা ছবি ঝুলিয়ে রাখতেন, এক আনা/দুই আনার মতো দাম। জুটমিলের লোকেরা কাজ শেষে ফেরার সময়ে সেসব ছবি কিনে নিয়ে যেত। তখন তাঁর মনোভাব, "শুধু দেব-দেবতা না এঁকে চতুর্দিকে যা দেখছি তা হতে সাবজেক্ট নিয়ে ওই পট আঁকব।" তারপর একদিন অবনীন্দ্রনাথের কাছে ওই ধরনের ছবির তাড়া নিয়ে হাজির হলে তিনি "বড় খুশি" হয়ে প্রত্যেকটি আট আনা দামে কিনে নেন। ছবিগুলির শিল্পরূপ দেখে অবনীন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়েছিলেন।

ঘটনাটি অন্যত্র যেভাবে বিবৃত হয়েছে তাতে মনে হতে পারে, অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের আঁকা জনজীবনের ছবি পছন্দ করেন নি বলে সব ছবি কিনে নিয়ে নন্দলালের মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। নন্দলাল নিজে সেকথা একেবারে স্বীকার করেন নি। অবনীন্দ্রনাথকে নন্দলাল নিজের পটগুলি দেখাবার আগেই উনি নন্দলালকে নিজে থেকে বলেছেন, "নন্দলাল, একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে, কালীঘাটের পট আঁকতে শুরু ক'রে দাও। প্রথমে নীতিকথা হতে, কারণ শুধু দেব-দেবতা আর চলবে না, লোকে ও-ছবি নেবেনা।" নন্দলাল নিজেও পটগুলি এঁকে যত খুশি হবেন ভেবেছিলেন ততখানি খুশি হতে পারেন নি : "এঁকে মনটা কেন জানিনা ছটফট করছে, যেন কী অন্যায় হচ্ছে।" তবে অবনীন্দ্রনাথের মনোভাবের একাংশ সম্বন্ধেও তাঁর ক্ষুণ্ণ অভিযোগ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ কেবল পটগুলির শিল্পগুণেই নজর দিয়েছিলেন— পট আঁকার উদ্দেশ্যকে কোনোই গুরুত্ব দেননি। অথচ নন্দলাল (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা-ভাবপুষ্ট নন্দলাল) শিল্পের মূলে মহৎ উদ্দেশ্যভাবনা থাকবে, এটা ধরেই নিয়েছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য, সাময়িকভাবে তিনি একদা 'সাবজেক্ট' হিসাবে ঠাকুর-দেবতা ও জনজীবন এক পর্যায়ভুক্ত এমন মনে করলেও পরে তাঁর সে ধারণা বদলে গিয়েছিল। পরিণত বয়সে তিনি বলেছেন, "দেব-দেবতার আইডিয়া যে-মন হতে হয় [সে মন], সে ধারণা অসাধারণ, এবং যাবতীয় সাবজেক্ট ওই রঙে রাঙানো দরকার হবে।" তাই নন্দলাল তাঁর দেবতাকে আগে মনোলোকে লাভ করে তবে ঘাসের মধ্যে শিব দেখেছেন।

নন্দলালের মন থেকে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তাদের জীবনছবি রঙের ভাষায় হাজির করার ইচ্ছা পূর্বোক্ত ঘটনার পরেও দূর হয়নি। শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের কাছে শুনেছি, তিনি তাঁর শৈশবে, পূর্বোক্ত ঘটনার ৪-৫ বছরে পরে ১৯১৮ সাল নাগাদ পৌষমেলার সময় দেখেছেন, নন্দলাল গ্রামের মানুষের জীবনছবি এঁকে খুব সস্তায় বিক্রির জন্য দোকানে ঝুলিয়ে রাখতেন, যাতে ওইসব মানুষ সানন্দে দ্যাখে— তাদের দৈনন্দিন জীবন কেমন রূপ ধরেছে পটুয়ার তুলিতে। সেসব ছবি তারা কিনে নিয়ে বাড়িতে টাঙিয়ে রাখুক, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এখানেও নন্দলালের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। কারণ কলকাতার বাবুরা মেলায় এসে অবিলম্বে কাড়াকাড়ি ক'রে সেসব ছবি কিনে নিতেন (ছবির প্রতি ভালবাসায়, নাকি বড় আর্টিস্টের ছবি সস্তায় মেরে দেবার স্ফূর্তিতে?)। ছবি কেনার কাড়াকাড়িতে হেরে-যাওয়া গাঁয়ের মানুষগুলি তাদের ঘরকন্নার চেহারার প্রতি বাবুমশায়দের লোভের ভালবাসা দেখে কতখানি বিমোহিত হয়েছিল, সে কথা সংবৃতবাক সাগরবাবু আমাকে বলেন নি। [নন্দলাল শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তকে ৩০-৬-১৯৪৪ সালে যে-পত্র লেখেন তার থেকেই পটচর্চা সম্বন্ধে নন্দলালের নিজস্ব বক্তব্য পেয়েছি। 'শিল্পগুরু নন্দলাল', পৃ· ১২৭-২৯]

কিন্তু ইচ্ছা দুর্মর। যা ছিল নন্দলালের মনের মাঝারে ইচ্ছা হয়ে, তা জন্ম নিয়েছিল বহু সৃষ্টি-সন্তান রূপে হরিপুরা পোস্টারে। বিবেকানন্দের কাঙ্ক্ষিত 'কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত' দেশপ্রেমিক রূপে আবির্ভূত গান্ধীর ডাকে নন্দলাল হরিপুরা

পোস্টার এঁকেছিলেন।

৮ বরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৮।

৯ নন্দলাল বসু, 'শিল্পকথা', বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ (১৩৫১), পৃ. ১৭।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় নন্দলালের রসচৈতন্যের ক্রমব্যাপ্ত রূপের প্রসঙ্গে চমৎকার করে বলেছেন : "নন্দলাল যে প্রথম যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যসম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন, একথা আর গবেষণার বিষয় নয়। এই প্রভাবের কারণে নন্দলাল ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার অবদান জীবনে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। সত্য বলে যা তিনি জেনেছিলেন তারই প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি নন্দলালের রচিত দেবদেবী বা পৌরাণিক বিষয়-আশ্রিত চিত্রে। যে অতিমানবীয় শক্তিকে প্রতীকের আশ্রয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন নন্দলাল, সেই শক্তির ক্রিয়া তিনি যাবতীয় পদার্থের মধ্যে উপলব্ধি করার সাধনা গ্রহণ করেন, তাঁর পরবর্তীকালের রচনা এই সাধনারই প্রকাশ।"

প্রাণ-সংহত প্রতীক থেকে প্রাণ-ব্যাপ্ত প্রকৃতিতে নন্দলালের প্রবেশ ঘটেছিল বিশেষভাবে শান্তিনিকেতনে আসার পরেই, এ কথা বিনোদবিহারী বলেছেন। শান্তিনিকেতনের উদার প্রকৃতি, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য, এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেছিল সত্য, সেইসঙ্গে স্বীকার্য, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নন্দলাল মননে আরও পরিণত হয়েছিলেন, ভাবসাধনাতেও, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বেদান্তকে শিল্পে ব্যবহারিক রূপ দেবার উন্মাদনা তিনি বোধ করেছিলেন। এক গ্রীষ্মসন্ধ্যায় নন্দলাল তাঁর জনৈক ছাত্রকে যা বলেছিলেন বিনোদবিহারী তা উদ্ধৃত করেছেন : "আমরা দেখছি প্রকৃতি নিস্তব্ধ ও স্থির, কিন্তু এইসব গাছ মাটি সবই জীবন্ত। গাছ বেড়ে চলেছে মাটি থেকে, ঘাস গজিয়ে উঠছে, মরে যাচ্ছে, কিছুই প্রাণহীন নয়—সবই জ্যান্ত। যখন এই প্রকৃতিকে জীবন্ত করে দেখতে পারবে তখনই তোমার শিল্পসাধনা সার্থক।" [বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, "নন্দলাল', বিশ্বভারতী পত্রিকা, নন্দলাল বসু সংখ্যা, ১৩৭৩, পৃ. ২২]

১০ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮২-৮৯।

১১ বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০, ১৭, ৪৬।

মহেন্দ্রনাথ সম্পর্কে নন্দলালের গভীর ভক্তির পরিচয় পাই "মহেন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও মনীষা" গ্রন্থে (সম্পাদক সুনীলবিহারী ঘোষ) প্রকাশিত নন্দলালের অনেকগুলি সচিত্র পত্রে। শান্তিনিকেতন থেকে ১৩.১০.১৯৪১ তারিখে নন্দলাল লিখেছেন : "তাঁহার কথা তো শুধু শুনি নাই, তাহা যেন মনে জড়িয়ে গেছে। যা করি আজ তাঁর কথামতো করি, যা ভুল হয় সেটা আমার বলে মনে হয়। তাঁহার কথায় নূতন জীবন পেয়েছি তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিন আঃ [আশীর্বাদ] করেছিলেন, 'তোমার জ্ঞান হবে'। ওই কথায় আমার ধ্রুব বিশ্বাস আছে। সে তো হবে, তবে মনটা বড়ো অস্থির হয়ে পড়ে, মাঝে মাঝে ঠাকুরকে স্মরণ করে কিছু ঠাণ্ডা থাকে।" বরোদার কীর্তিমন্দিরে ২৬'×৪' মাপের কুরুক্ষেত্রের ফ্রেস্কো করেন নন্দলাল। "ওই কুরুক্ষেত্রের ছবি [নন্দলাল ২২.৩.১৯৪৭ লিখেছেন] পূজনীয় মহিমবাবুর কুরুক্ষেত্রের বইটি হতে inspiration পাওয়ায় হয়েছে।" মহেন্দ্রনাথ নন্দলালকে 'শিল্পদীপঙ্কর' উপাধি দেন। সেই কথা জেনে নন্দলাল লিখেছেন (২৪.১২.১৯৫৪) : **"পূজনীয় মহিমবাবুর পত্রে শিল্প-দীপঙ্কর নামে আমার উপাধি ভূষিত, কাল খবর পেয়েছি। সব উপাধি যা পেয়েছি [তাদের তুলনায়] ইহাতে আমি সবচেয়ে বেশি গৌরবান্বিত হয়েছি। ইহা একজন মহাপুরুষের দান এবং যথার্থ একটি শিল্প-সমঝদারের দান। তাঁকে বলিবে, তাঁর এই দান আমি মাথা পেতে নিলাম। পূজনীয় মহিমবাবুকে নিবেদন করবে, যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ভক্তি ও ভালবাসা হয়।"**

১২ রামানন্দ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৬৭-৬৯।

১৩ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯২-৯৬।

১৪ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৭৫-৭৬।।

১৫ বরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪০-৪৩।

১৬ **An Album of Nandalal Bose,** (Santiniketan Asramik Sangha, Calcutta, 1956,) p. 26.

১৭ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৮০।

১৮ **An Album of Nandalal Bose.** p. 10.

১৯ 'ভারতশিল্পী নন্দলাল', ১ম, পৃ. ১৪৯।

২০ বরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ. ২৫-২৬।

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল কিন্তু নন্দলালের কাছ থেকে শোনা যে তথ্য দিয়েছেন তদনুযায়ী 'দশরথ ও কৌশল্যা'র ছবি নিবেদিতা দেখেন তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৯)।

২১ পঞ্চানন মণ্ডল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫১।

২২ Coomaraswamy, **The Paintings of Nanda Lal Bose,** Modern Review, September 1909.

২৩ বঙ্গদর্শনে পূর্বোক্ত 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।" ১৯০২ সালের মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ, বাংলার পিতামহরা মৃত্যুকে উপেক্ষা করার দৃষ্টান্ত সন্তানদের জন্য রেখে যাননি। অননুকরণীয় তাঁর ভাষা : "তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সঙ্গতি রাখিয়া গিয়াছেন, শুধু মৃত্যুর সঙ্গতি রাখিয়া যান নাই।" সেই 'দুর্ভাগ্য' ও 'দীনতা' থেকে এদেশকে কিছু অংশে রক্ষা করেছেন 'সতী' নারীরা, যাঁদের কেউ-কেউ যে "লোকলজ্জাতে প্রাণবিসর্জন" দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, তবু তাও বরণীয়, কারণ "সাহসের ন্যায় লজ্জাও লোককে বল

দেয়।" কিন্তু তাঁদের প্রাণবিসর্জনের মূলে কেবল লোকলজ্জাই ছিলনা। "প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল—লজ্জায় হউক, প্রেমে হউক, ধর্মোৎসাহে হউক, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন, একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে", রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। "একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মতো বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল"—সেই বিরল বীরত্ব বাংলার নারীরা দেখিয়েছেন, পুরুষেরা নন (রবীন্দ্রনাথের উক্ত রচনাকাল পর্যন্ত), তাই রবীন্দ্রনাথের নিবেদন : "বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি।...হে আর্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জানো নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব-দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ।...বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতি দ্বারা পূত হইয়াছে।...আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে-ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে।"

এইসব কথা লেখার সময়ে সংস্কারপন্থী পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় ভাবেন নি যে, সরল বা বক্র কোনো মনেই এমন দুশ্চিন্তা জাগতে পারে—তিনি সতীপ্রথার সমর্থক। অথচ তা জেগেছে। সুতরাং "রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : সমাজচিন্তা" নামক গ্রন্থের সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বলেছেন, কবিগুরু সম্বন্ধে ওই ধরনের মনোভাব এবং মন্তব্য "অযথার্থ এবং অগভীর দৃষ্টির পরিচায়ক।" রবীন্দ্রনাথ যে কেবল সতীদের "সাহস ও মনোবলের" সম্বন্ধেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন, অমানবিক সতীপ্রথা সম্বন্ধে নয়, তা 'মহামায়া' গল্পের লেখক সম্বন্ধে বলার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি। "বাংলার বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাসীদের" অকাতর প্রাণবলির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবপন্থাকে সমর্থন করেন নি, একথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে "খানিকটা ভাবের ঘোরে" ছিলেন এবং সকল সতী যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন নি—অন্ধ সংস্কার, আত্মীয়দের বলপ্রয়োগ কিংবা মাদক দ্রব্যের সেবনও যে সতীকে প্রণোদিত করত—এই "একটি বড় সত্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে"—সেকথা অগত্যা না-জানিয়ে পারেন নি। (উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৯৬)।

২৪ ইংরেজিনবিশ বাগ্মী অধ্যাপক এবং স্বদেশী যুগের নেতা জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জে এল ব্যানার্জি) নিবেদিতার সমালোচনার শেষের অংশটি পছন্দ করেন নি। নিবেদিতার লেখার অত্যন্ত গুণমুগ্ধ তিনি, নিবেদিতার শিল্পালোচনাকে তিনি সবসেরা বলতে দ্বিধা করেন নি। "These notices [by N.] are usually so just, they are written with such warm sympathy, such penetrative insight, and such charm of expression, that you will pardon me if I **characterise them as the most delightful and valuable feature of the Modern Review."** এই কারণে তিনি নন্দলালের অহল্যা-ছবির নিবেদিতাকৃত সমালোচনায় আশাহত। রাম, লক্ষণ এবং বিশ্বমিত্রের আকারের কোমলতায় নিবেদিতা দোষ ধরেছেন। জিতেন্দ্রলালের বক্তব্য : শিল্পী তো তাই করতে চেয়েছিলেন, নিবেদিতা শিল্পীর উদ্দেশ্য ধরতে না-পেরে ভ্রান্তিতে পড়েছেন। রামলক্ষণাদির ছবিতে পুরুষালী ভাব নেই, সত্যিই তা নেই, কারণ রামের শক্তি নয়, করুণা ও মাধুর্য ফোটানো ছিল শিল্পীর অভিপ্রায়। নিবেদিতা পুরুষকে যে-কোনো অবস্থায় পুরুষরূপে দেখতে চেয়েছেন : এক্ষেত্রে তিনি রামচরিত্র বুঝতে পারেন নি। রাম ভগবান, তিনি শত্রুর কাছে ভয়ঙ্কর, কিন্তু পরিত্রাণকালে পরম কারুণিক। রামের পাদস্পর্শে অহল্যা উদ্ধারকে জিতেন্দ্রলাল খ্রীস্ট-পুরাণোচিত মিরাকল্‌ধর্মী কাণ্ড বলতে চাননি। খ্রীস্ট যেখানে সচেতনভাবে মিরাকল্ প্রয়োগ করেছেন, রামের ক্ষেত্রে তা হয়ে গেছে অসচেতনভাবে। এখানে রামচন্দ্র ঈশ্বর নন, মানুষ—তিনি নিজেও অহল্যা-উত্থান দেখে বিস্ময়াপ্লুত। অমন যে, প্রচণ্ডতেজা বিশ্বামিত্র—তাঁরও স্নিগ্ধ অর্ধমুদ্রিত স্বপ্নময় নয়ন, অধরে সুধাহাস্য, কেননা তাঁর দীর্ঘ প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে এতদিনে। পাপে পাষাণভূত নারী পুনর্জন্ম নিয়ে তাঁর সামনে জেগে উঠেছে—সেদিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছিলেন, তাহলে সত্যই আঁধার জগতে হলো প্রভুর আলোকিত পদক্ষেপ।। (মডার্ন রিভিউ, জুন ১৯১০)।

সুন্দর ব্যাখ্যা, নতুন মাত্রা পেয়েছি, কিন্তু নিবেদিতার সমালোচনা অগ্রাহ্য করাও শক্ত, কারণ ধনুর্ধরের হাতের ধনু তো ভালবাসায় কোমল হয়না এবং চোয়াল ঝুলে পড়েনা প্রেমে। তাছাড়া রামচন্দ্রকে জিতেন্দ্রলাল কখনো ঈশ্বর কখনো মানুষ করেছেন প্রয়োজনমতো। প্রশ্ন করা যায়, রামচন্দ্র অহল্যা উদ্ধারের আগেই বেশ কয়েকটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে নানা উচ্চ স্তুতিলাভ করেছেন—সেক্ষেত্রে তাঁকে সম্পূর্ণ অসচেতন রাখা সম্ভব কি? জগৎসংসারে দেখা যায়, অবতারেরা একটু তাড়াতাড়ি পরিপক্ব হয়ে ওঠেন।

এখানে আরও স্মর্তব্য, মনের গঠন এবং শিক্ষা, দুইই রচনাকে প্রভাবিত করে। নিবেদিতা স্বয়ং বীরযুগের নারী, এবং বীরোত্তমকে পেয়েছিলেন গুরুরূপে। নন্দলাল লিখেছেন : "সিস্টার নিবেদিতা শিল্পবিষয়ে যা আলোচনা করতেন, তাহার ideal তিনি স্বামীজীর কাছ থেকে নিঃসন্দেহে পেয়েছিলেন।...স্বামীজীর ব্যক্তিগত একটি নিজস্ব পুরুষজনোচিত bold ideal ছিল, যা সিস্টার নিবেদিতা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সিস্টারের মুখে কথা শুনে মনে হতো, স্বামীজীর বীরভাবাপন্ন এবং নির্ভীক কথা শুনছি।" (বরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৪)।

২৫ মডার্ন রিভিউ-এর বিভিন্ন সংখ্যায় উল্লিখিত চিত্রালোচনাগুলি বেরিয়েছিল : সতী (এপ্রিল ১৯০৮), কৈকেয়ী (মে ১৯০৮), বিক্রমাদিত্য ও বেতাল (জুন ১৯০৮) দময়ন্তীর স্বয়ম্বর (মার্চ ১৯১০), শিবের তাণ্ডবনৃত্য (অক্টোবর ১৯০৭), দশরথের অন্তিমশয্যা (অক্টোবর ১৯০৭), অহল্যা (মে ১৯১০), জগাই মাধাই (নভেম্বর ১৯১০),

(সেপ্টেম্বর ১৯১০)। এগুলি নিবেদিতার কমপ্লিট ওয়ার্কস-এর তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

২৬ কানাই সামন্ত, 'শিল্পীগুরু নন্দলাল', পৃ. ১২৬। একই ধরনের বিবরণ আছে 'An Album of Nondalal Bose'-এ, পৃ. ১৩।

২৭ কানাই সামন্তকে পূর্বোক্ত পত্রে নন্দলাল লিখেছেন, অবনীন্দ্রনাথের একাধিক লেখা থেকে মনে হয়, গণেন-মহারাজকে নন্দলালদের রাঁধুনি করে যেন অজন্তায় পাঠানো হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের উপরে উদ্ধৃত রচনাংশে ঠিক সেই কথাটি নেই, তবে প্রায় তা একই দাঁড়িয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ হয়ত অন্যত্র সেকথা লিখেছিলেন, যাদের সন্ধান পাইনি। "অবনবাবু প্রায় ভুলে যান এবং কয়েকবার লিখেছেনও [নন্দলাল বলেছেন] গণেন-মহারাজকে আমাদের রাঁধুনি করে, এবং আমাদের কাজ করবার জন্য পাঠান। ওঁকে অবনবাবু পাঠান নাই, বা অবনবাবু নিযুক্ত করেন নাই। উনি নিজে ও সিস্টার নিবেদিতার অনুরোধে থাকিয়া যান। (পরে তিনি ঐখান হতে আমাদের শিল্পীদের আজীবন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যান)। আমরা তিন মাস ছিলাম, উনিও আমাদের সঙ্গেই থাকিয়া যান। এই ভুল লিখার জন্য—অর্থাৎ উনি আমাদের রেঁধে খাওয়ানোর জন্য থাকেন নাই [অথচ সেরূপই লেখায়] গণেন-মহারাজ বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, যদিও কখনও প্রতিবাদ করেন নাই। বিশেষ করে ঐ বিষয় তুমি নিজেই ঠিক করবে এবং রাণী চন্দকে বলে শোধরাইয়া লইবে। নচেৎ আমি উহার বিশেষ প্রতিবাদ করব।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২৭]।

অবনীন্দ্রনাথের লেখায় এই বিষয়ে অল্প ভুল অন্যত্রও আছে। নিবেদিতা গণেন-মহারাজকে "পাঠিয়ে দেননি", সঙ্গে নিয়ে অজন্তায় গিয়েছিলেন। সে-বিষয়ে নন্দলাল বলেছেন :

"অজন্তা গিয়ে প্রথমে ১০/১৫ দিন পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছিল, এবং ফিরিয়া আসব ঠিক করছিলাম। এমন সময়ে একদিন দেখি, একটা গরুর গাড়ি করে ডঃ জে সি বোস, নিবেদিতা, লেডি বোস, গণেন-মহারাজ, একটি বাবুর্চি ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হলেন, আমাদের দেখে বড় খুশি হলেন। ক্রমশ আমরা গণেন-মহারাজ মারফত চলে আসবার প্রস্তাব করলাম, তাতে তিনি [নিবেদিতা] বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন এবং কী করলে আমরা থাকি তার চিন্তা করতে লাগলেন। পরে ঠিক হলো, গণেন-মহারাজকে আমাদের গার্জেন হিসাবে রেখে আসবেন এবং উহার বাবুর্চিকেও আমাদের জন্য রেখে আসবেন।" [পৃ. ১২৬-২৭]।

নন্দলাল নিজের গুরুকে চিনতেন, ফলে তথ্যের ব্যাপারে অল্পস্বল্প হেরফের কেন হয় তাও বুঝেছেন। "অবনীবাবু তথ্যের লোক না, বরং রসিক লোক। উনি রসের পরিবেশনে ওস্তাদ।" [পৃ. ১২৫]।

২৮ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫৩-৫৪, ১৫৮, ১৬৭, ১৭১। অসিতকুমার হালদার, 'অজন্তা' গ্রন্থের 'পূর্বাভাস', এবং 'সাবেকী কথা' ('সমকালীন' পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২)।

২৯ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৭২-৭৫।

৩০ বাঙালী শিল্পীদের তাঁবু সাময়িকভাবে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সরকারি নির্দেশের বিরুদ্ধে মিসেস হেরিংহামের প্রচণ্ড রাগের কথা নন্দলালের স্মৃতিকথায় নেই, বরং উল্টোদিকে দেখি, তিনি কড়াভাবে শিল্পীদের অন্যত্র যেতে বলেছেন। আপাতভাবে অসিতকুমারের বিবরণের সঙ্গে পার্থক্য ঘটলেও সামঞ্জস্য হয় এইভাবে—মিসেস হেরিংহাম যদিও সরকারি আদেশে রুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তিনি সেইসময়ের জন্য শিল্পীদের সরে যেতেই হবে বুঝতে পেরে, শিল্পীদের আপত্তিকে কড়াভাবে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতার দেওয়া বিবরণের মধ্যে অসিতকুমারের বিবরণের সমর্থনই দেখতে পাব।

৩১ অসিতকুমার, 'সাবেকী কথা', 'সমকালীন' পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২।

৩২ অসিতকুমার, 'অজন্তা' (গ্রন্থ), 'পূর্বাভাস'।

৩৩ নিবেদিতা-সংগ্রহে নিবেদিতাকে লেখা র‍্যাটক্লিফের ৮ এপ্রিল ১৯১০ তারিখের একটি চিঠি আছে। তার থেকে দেখা যায়, অজন্তার সাহেবী কাণ্ডকারখানা ইংলণ্ডে মিসেস হেরিংহাম প্রকাশ করলে যতখানি ক্ষতি হবে বলে নিবেদিতা মনে করেছিলেন, র‍্যাটক্লিফ তা করেন নি। তবে তিনি বুঝেছিলেন, পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থিত নিবেদিতার নির্দেশ পালনই শ্রেয়। তাঁর চিঠির একাংশ :

"I was much impressed with the urgency of your appeal in reference to **Mrs Herringham's** story that I took the first opportunity of seeing her. I was there last Sunday evening, saw some of her copies and heard the whole thing which she read me from her diary. My feeling was, and to some extent still is, that no great harm would be done if she were to persist in her first intention of making the facts known to some people connected with the India Office, but in view of what you said I gave my decided opinion against the course. The reason upon which I laid most emphasis to her was that if any action were taken it would inevitably ruin her own enterprise for next could weather. I convinced her that in this direction at all events, nothing but mischief could come of any disclosures with reference to the police. I came away quite satisfied that she will not do anything in the matter at all events without consulting me further. Her account of the work and of her assistants was exceedingly interesting." **[Letters of Sister Nivedita, Vol. II, p. 1176]**

আকর্ষক সংবাদ হলো, পুলিশী উৎপাতের কথা মিসেস হেরিংহাম ইংলণ্ডে ফাঁস করুন, নিবেদিতা যখন তা একেবারেই চাইছেন না, ঠিক সেই সময়েই তিনি চিঠির পর চিঠি র‍্যাটক্লিফকে পাঠাচ্ছেন বাংলার উত্তপ্ত রাজনৈতিক অবস্থার সংবাদ দিয়ে—ইংলণ্ডের কাগজে প্রকাশের জন্য। তাদের মধ্যে বহু বৈপ্লবিক সংবাদ ছিল।

৩৪ অসিতকুমার, 'সাবেকী কথা', সমকালীন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২।

৩৫ অসিতকুমার, 'সাবেকী কথা', সমকালীন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২।

৩৬ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৩৪।

৩৭ নন্দলাল বসু, 'শিল্পরসিক জগদীশচন্দ্র', বিশ্বভারতীপত্রিকা, ১৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৮৮০ শক।

৩৮ ধরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে নন্দলালের ২৫.৮.৫৪ তারিখের পত্র। ধরেন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭।

৩৯ নন্দলাল কর্তৃক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলকে ২৬.২.১৯৬৫ তারিখে কথিত। ডাঃ মণ্ডলের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৭-৪৮

৪০ Album of Nandalal Bose, p. 10.

সপ্তদশ অধ্যায়

আরও কয়েকজন শিল্পী ও সমালোচক

(সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুখলতা রাও, অসিতকুমার হালদার, স্কাত্রে, প্রিয়নাথ সিংহ, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ)

॥ ১ ॥

নিবেদিতার স্নেহ, শ্রদ্ধা ও পৃষ্ঠপোষকতা নন্দলাল ছাড়া অন্য শিল্পীরাও পেয়েছেন। তাঁদের সকলের বক্তব্য অবশ্য সংগৃহীত হয়নি। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আর্ট স্কুলে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর তরফে যে-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, নিবেদিতা তার বিষয়ে মডার্ন রিভিউ-এ এপ্রিল ১৯১০ সংখ্যায় অনেকখানি লিখেছিলেন, তার উল্লেখ আগেই করেছি। প্রদর্শনীতে কাংড়া, দিল্লী, বেনারস, ও লখনৌ শৈলীর ছবির সংগ্রহ ছিল—তেমনি নবীন ভারতশিল্পীদের রচনাও। নিবেদিতা ওই লেখায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিভাবে পুরাতন ও নূতন ধারার মধ্যে সংযোগ ঘটেছে। পুরাতন ধারার ছবি সম্বন্ধে বুদ্ধিদীপ্ত কিছু মন্তব্য তাতে পাই। আধুনিক কালের যামিনীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদী' ছবির প্রশংসা করেছেন, যে ছবিতে সাদা রঙেরই নানা মাত্রা দেখা গেছে। বেঙ্কটাপ্পার 'মহাশ্বেতার বীণাবাদন', 'বৃক্ষতলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালানোয় রত নারী' এবং প্রিয়নাথ সিংহের 'চৈতন্য' যে, নূতন ও পুরাতনের ব্যবধান লুপ্ত করেছে—সেকথা বলেছেন। আর বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন প্রয়াত তরুণ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবিগুলির (১৬টি টাঙানো হয়েছিল)। ছবি হিসাবে তাঁর 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' মাস্টারপিস। তাছাড়া 'নহুষের রথ', 'কার্তিকেয়', 'বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন' ছবিতেও আছে শক্তিশালী করণকৌশল। ওঁর উল্লেখযোগ্য অন্য ছবির মধ্যে পড়ে 'মহাভারত রচনা', 'অম্বরীষের চক্র', 'ডমরু'। গভীর দুঃখের সঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন :

"প্রস্ফুটিত-প্রতিভার এই শিল্পী অকালে চলে গেলেন—কী ভয়ানক ক্ষতি হলো বাংলার !"

পুরনো ধারার শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদ ও হাকিম মহম্মদ খানের ছবির শক্তির ও কিছু সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছিল। নন্দলালের ছবির বিষয়ে উল্লেখ স্বতঃই ছিল, এবং অবনীন্দ্রনাথেরও। সেইসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অসাধারণ ইমপ্রেসনিস্ট স্কেচগুলিরও।"[১] নতুন ও পুরাতন রীতির উৎকৃষ্ট ছবির প্রদর্শনীর দ্বারা ভারতীয় শিল্পের অব্যাহত রূপের সম্মুখীন হতে পেরে আনন্দিত নিবেদিতা এই আশায় উদ্দীপিত হয়েছেন যে, ঐতিহাসিক, স্বাদেশিক এবং বীরোচিতভাবে পূর্ণ সুমহান ভারতীয় ম্যুরাল চিত্রের সৃষ্টিকাল তাহলে দূরবর্তী নয়।

নিবেদিতা কেবলই নব্য ভারতশিল্পীদের পিঠ চাপড়ে গেছেন এবং ছবিতে অ্যানাটমির ইতি করতে উৎসাহ দিয়েছেন—এহেন ধারণা যদি কোথাও জেগে থাকে, তার খণ্ডন পাওয়া যাবে নিবেদিতাকৃত কয়েকটি চিত্র-সমালোচনায়। সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'অভিমন্যু' সম্বন্ধে তো তাঁর মন্তব্য রীতিমতো কঠোর। (মডার্ন রিভিউ, অগস্ট ১৯১১)। আলোচনার গোড়ায় মহাভারতীয় অভিমন্যুর যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল নির্ভয় বীর্যের রূপ বর্ণনার পরে তিনি চিত্র-রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রুটির কথা সবিশেষ বলেছেন। তরুণ যোদ্ধার মুখ পুরুযোচিত কঠিন সত্য, কিন্তু কোমরের নীচেকার শরীর একেবারে মেয়েলি। "বোঝা যায়, এ-বস্তু হয়েছে শিল্পী জীবন পর্যবেক্ষণ করেন নি বলে।" ভারতে যেখানে মানবশরীর দেখার বিশেষ সুযোগ আছে সেখানে এমন হওয়া দুঃখজনক। তাই বলে নিবেদিতা শবব্যবচ্ছেদ-ঘরের কঙ্কাল হাড় বা নগ্ন মূর্তি-মডেল পর্যবেক্ষণের কথা বলছেন না, যে-দুই বস্তু "আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের জঘন্যতম ত্রুটির কারণ।" নিবেদিতা বলেছেন—ভারতবর্ষের চলমান জীবনছবি যদি শিল্পী লক্ষ্য করতেন তাহলে তিনি আকার ও ছন্দের উপরে দখল আনতে পারতেন, তাঁকে ইউরোপীয় রীতিতে মডেলকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছবি আঁকতে হতো না—এবং তিনি অভিমন্যুর মতো চরিত্রের ছবি আঁকতে মেয়ে-মডেল নিতেন না। পোশাক অলঙ্কার সবকিছুই ওখানে নারীজনোচিত। ছবিতে না-আছে দারুণ কঠিন পুরুষালি শক্তির রূপ, না-আছে মৃত্যুসংগ্রামের ঘূর্ণিধূলি ও রক্ততরঙ্গের স্পন্দন। তরুণ যোদ্ধাটি যেন দরবারে হাজিরা দেবার সাজে সেজেছেন, মাথার চুলে লাগানো অলঙ্কারটি পর্যন্ত স্থানভ্রষ্ট হয়নি।

নিবেদিতার এই হলো শেষ ছবি ধরে আলোচনা। কী কঠিন! সমরেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে-দু'এক লাইন বলেছেন, তা নেহাতই সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে মনে হয়। কেননা তার পরেই সতর্ক ক'রে বলেছেন, বৃহৎ চরিত্রকে তাঁদের জীবনের সংকটক্ষণে দেখাতে হলে আদর্শের বোধ চাই, সেইসঙ্গে চাই তার রূপাঙ্কনে দৃঢ় মননশীলতা।

সুখলতা রাওয়ের 'শ্রীমতী' ছবির বিষয়ে আলোচনার বড়ো অংশ অবশ্য বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিকতা প্রশ্নে নিয়োজিত। স্পষ্টই বোঝা যায়, সুখলতা রাও প্রায় একযুগ আগে রচিত রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'পূজারিণী' কবিতার বিষয় অবলম্বনেই ছবিটি এঁকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাহিনীটি নেন 'অবদানশতক' থেকে। নিবেদিতা সেখানে বর্ণিত কাহিনীর অনৈতিহাসিকতার কথা তুলেছেন। (নিবেদিতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে এখানে যে-কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন—সুরেন গাঙ্গুলীর 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' ছবিকে মাস্টারপিস বলবার সময়ে নিবেদিতা ঐতিহাসিক সত্যতার প্রশ্ন আনেন নি কেন ?)। নিবেদিতা জানিয়েছেন A Century of Buddhist Legends নামক পুরাতন নেপালী বইয়ে 'শ্রীমতী' কাহিনী

আছে। সে কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনা এবং অবদানশতকের ঘটনাও, অজাতশত্রুর রাজ্যকালে ঘটতে পারেনা, কারণ বুদ্ধদেবের স্মারকযুক্ত স্তূপ নির্মাণ ও পূজা তাঁর কালে চলিত হয়নি। সেই স্তূপের মর্যাদারক্ষায় আত্মবলিদান যদি ঘটে থাকে তা অনেক পরের ব্যাপার, যেমন তা ঘটতে পারে শশাঙ্কের রাজত্বকালে। তবে ঘটনাটি অনবদ্য, আদর্শের জন্য সানন্দে আত্মবলিদান—তা না-থাকলে ইতিহাসের ভাণ্ডার রত্নহীন হয়ে যেত। "শ্রীমতীর কাহিনীতে পাই—কিভাবে ভারতীয় নারী—তন্ময় পূজারিণী—শুনেছেন মৃত্যুর আহ্বান—মৃত্যুদ্বারের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন পরম লোকে।" সুখলতা রাওয়ের ছবিতে দেখা যায়, শ্রীমতী স্তূপের নীচে পাদমূলে নতজানু, হাতে সমর্পণের প্রদীপ, স্তূপের নীচে পূজা-পুষ্প। ফুলগুলি যদি মেঝের উপর ছড়ানো থাকত ভালো হতো, কারণ, নিবেদিতার মতে, পুষ্পপাত্রটি বেনারসের আধুনিক সস্তা ধরনের থালা। স্তূপটির সামান্য অংশ ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এতেও তিনি অখুশি, কারণ তার দ্বারা পূজ্য নন, পূজারিণীই গুরুত্ব পেয়েছেন। "কিন্তু ছবিটিতে রয়েছে গভীর শান্তি এবং বিস্তারের ব্যঞ্জনা। মৃত্যুদূত এগিয়ে আসছে ক্রমে। সে এসে দেখবে পরমানন্দে আপ্লুত এক তন্ময় সত্তাকে। না, মৃত্যুর পদধ্বনি শ্রীমতীর শ্রবণ স্পর্শ করবে না।"

॥ ২ ॥

ইতিমধ্যে নন্দলালের সতীর্থ-শিল্পী অসিতকুমার হালদারের (১৮৯০-১৯৬৪) প্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে। এঁর পিতা রাঁচি-নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রীর কন্যা। "অঙ্কের চেয়ে অঙ্কনের দিকে" বালকের আসক্তি দেখে এঁকে মাত্র ১৫ বছর বয়সে সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ১৯০৫-১০ সময়ে ইনি প্রধানত অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রশিল্প শিখেছেন। ইংরেজ-ভাস্কর লেওনার্ড জেনিংস-এর কাছে কিছুটা ভাস্কর্যের পাঠও নিয়েছেন। ১৯১১-১৫ এবং ১৯১৯-২৩ সময়ে শান্তিনিকেতন কলাভবনের গোড়াপত্তনে অংশ নেন; ১৯২০-২৩ সময়ে বিশ্বভারতী কলাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ। ১৯১৬-১৭-তে নন্দলাল ও মুকুল দে-র সঙ্গে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'-য় শিল্পশিক্ষক। ১৯১৮-১৯-এর কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষ। ১৯০৯-১০ এবং ১৯১০-১১-তে অজন্তায় এঁর কাজের কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯১৪-তে স্যার জন মার্শালের আহ্বানে মধ্যভারতের রামগড় পর্বতের যোগীমারা গুহায় প্রাচীন চিত্রের (খ্রীস্ট-পূর্ব ৩০০) প্রতিলিপি করেন, (সঙ্গে ছিলেন সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত); একই দপ্তরের (গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ) নির্দেশে ১৯২১-এর গোড়ায় করেন বাগগুহার চিত্র-প্রতিলিপি (এবার সঙ্গে নন্দলাল)। ১৯২৪-এ জয়পুর রাজকীয় শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ১৯২৫-৪৫-এ লখনৌ সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। (তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ)। ১৯৩৪-এ 'রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস'-এ ফেলো। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান পেয়েছেন।[২]

অসিতকুমার কৃতী শিল্পী—এই তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয়। কিন্তু নিজের সৃষ্টিশালার মধ্যে আবদ্ধ আত্মসমাহিত, 'বিশ্ববিহীন বিজনে' অবস্থিত শিল্পী বলতে যা বোঝায়, তা তিনি ছিলেন না। ব্যাপকার্থে তিনি শিল্পী বা জীবনশিল্পী। তিনি যেমন ছবি আঁকতেন, তেমনি ভাস্কর্যও করতেন, বিশেষত রিলিফ। অভিনয় করতেন—মঞ্চসজ্জা, কুশীলবসজ্জার দায় নিতেন। নাট্যকাব্য লিখেছেন, কবিতাও। লিখেছেন শিল্পভুবনের ভ্রমণকাহিনীও—অজন্তা,

বাগগুহা ও রামগড় সম্বন্ধে। 'আর্ট অ্যান্ড ট্রাডিশন' গ্রন্থের লেখক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—'রবিতীর্থ' গ্রন্থে নানা তথ্যসহ সে বিবরণ কিছুটা আছে। লিখেছেন অজস্র প্রবন্ধ। অসিতকুমারের শিল্প এবং ব্যক্তিচরিত্রের ভালো পরিচয় দিয়েছেন অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী তাঁর 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' গ্রন্থে (পৃ. ১৯৫-৯৯)।

অসিতকুমারের জীবনকথা স্মরণ করলেই দেখা যাবে, শিল্প তাঁর স্নায়ু-শিরা, রক্ত-মাংসের সঙ্গে জড়িত। শিল্পকে 'অর্জন' করেছেন—কঠিন তপস্যায়। এক কথায় শিল্পক্ষেত্রে তিনি পরিব্রাজক-সাধক। অজন্তা, যোগীমারা, বাগগুহার দুর্গম পথে তাঁর যাত্রা—কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনা করে সেখানে অর্জনের সাধনা। একই উদ্দেশ্যে ইংলন্ডেও গেছেন—সেখানে অবশ্য হতাশ হয়েছেন—রুচি ও সংস্কৃতির অলঙ্ঘ্য দূরত্ব দেখে।

ব্যাপক এবং গভীরাশ্রয়ী এক শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে আত্মলাভ ক'রে, অসিতকুমার স্বতঃই একটি বৃহৎ আন্দোলনের মহৎ শরিক হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এই আন্দোলনকে এখন কোমরে বেড়ি পরিয়ে পরিচায়িত করা হচ্ছে—'বেঙ্গল স্কুল' নামে। অসিতকুমার তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মাসিক 'সমকালীন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ সংখ্যায় 'সাবেকী কথা' রচনায় তিনি বলেছেন :

"...আবার ভারতবর্ষে ভারতীয় আর্টের (কেবলমাত্র Bengal School-এর নয়) ধারা নবীনভাবে এল। এক কথায় ভারতের নিজস্ব কলার নবীনতার দিকেই তখন আমরা চললুম—ফরাসি শিল্পী পিকাসোর গড়া নবীনতার জন্য অপেক্ষা না করেই। সেইজন্য আমাদের খুঁজতে হতো দেশী শিল্পীদের—অর্থাৎ পটুয়াদের। জগন্নাথের পট, পটুয়াদের পট প্রভৃতি সংগ্রহ করাই ছিল আমাদের কাজ। ক্ষিতীন, সুরেন, নন্দলাল এবং শৈলেনের সঙ্গে আমি প্রায় যেতাম কালীঘাটের পটুয়া পাড়ায়। ...এখনকার পটবিলাসী নব-নকুলে পটুয়ারা মনে করেন যে, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা পটের বিষয় কিছুই জানতেন না, তাঁদের কারবার ছিল কেবল মোগল, কাংড়া এবং অজন্তার আর্ট নিয়ে। মৎপ্রণীত অজন্তা পুস্তকে বাংলা ১৩২০ সালে [ইং ১৯১৩] অজন্তার রেখাভঙ্গির সঙ্গে বাংলা পটের রেখাভঙ্গির তুলনা করে লিখেছিলাম। তাছাড়া ৩৫ বৎসর পূর্বে প্রবাসীতে আমি পটের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আমরা প্রাদেশিকতা রক্ষার দ্বারা যদি দেশের আর্টের রেনেসাঁ আনার চেষ্টা করতাম তাহলে বাংলা পটেরই নকলে কেবল ছবি এঁকে যেতাম। **আমরা Bengal School করতে চাইনি—আমরা চেয়েছি সমগ্র ভারতবর্ষে কৃষ্টির ধারাকে নতুন রূপ দিয়ে নবভাবে দেখাতে, নিজেদের শক্তিমতো।** তাই আমাদের যেতে হতো যাদুঘরে, এবং পুরনো curio dealers-দের দোকানে। সেখানে তাদের সংগ্রহের মধ্যে দেখতাম প্রাচীন তিব্বতী কাপড়ের উপর আঁকা চিত্রকলা এবং তামা পিতলের তিব্বতী ও নেপালী নানাপ্রকার দেবদেবীর মূর্তি। ..."

অসিতকুমারের তিনটি ছবির বিষয়ে নিবেদিতার নাতিদীর্ঘ লেখা পাই। এঁর একটি ছোট কাজ—'বীণা'—তার "রেখা, রঙ এবং বিন্যাসের অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের" কথা নিবেদিতা বলেছেন। (মর্ডান রিভিউ, নভেম্বর ১৯১০)। ছবির পটভূমিকায় শরতের আমেজ, আকাশে ঘন নীলের রূপ। দেখা যাচ্ছে গৃহছাত, সন্ধ্যায় অথবা প্রত্যূষে তাতে প্রশান্ত বিস্তার ও নির্জনতার দ্যোতনা। সে সকলই শিল্পী-চিত্রিত নারীর স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবমগ্নতার উপযুক্ত অনুষঙ্গ। "তিনি বীণার তারে হৃদয়ের গান তুলতে চাইছেন—তার মৃদু মধুর সুর যেন কান ছুঁয়ে যায়।" "রত্নতুল্য ছবিটি" দেখে নিবেদিতার মনে হয়েছে, এটি যেন গ্রন্থচিত্রণের জন্য

কৃত, তাই ছবির নীচে একটি চিঠি বা একটি সনেট লিখে দিলে সুন্দর হয়। নিবেদিতার কেবল আপত্তি ছবিতে ফার্সী ঢঙে বাংলা অক্ষর লেখায়। বাংলা লিপি কি ফার্সী লিপির চেয়ে কম সুন্দর ?—তিনি প্রশ্ন করেছেন। ওই সস্তা ভাবালুতার সমালোচনা করে নিবেদিতা বলেছেন, খাঁটি ফার্সী-লিপিকর কিন্তু ওই নকলী বস্তু দেখলে মোটেই খুশি হবেন না। তবে এ হলো সামান্য ত্রুটি, নচেৎ "ছবিটি অসামান্য সুন্দর। এই কাজের জন্য শিল্পী অভিনন্দনযোগ্য।"

ওরিয়েন্টাল সোসাইটির পূর্বোক্ত চিত্রপ্রদর্শনী বিষয়ক লেখায় নিবেদিতা অসিতকুমারের 'সীতা' সম্বন্ধে বলেছেন, ওই বিষয়টি নিয়ে আঁকা ছবির ক্ষেত্রে এই হলো সবচেয়ে সফল প্রয়াস। "ইউরোপে ম্যাডোনা যেমন, ভারতীয় শিল্পে সীতারও তেমনি মুখ্য স্থান হওয়ার কথা। কিন্তু সীতা সম্বন্ধে এমনই ভাববাহুল্য যে, বাঙালী শিল্পীরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে আঁকতে চাননা—অথচ সেই আত্মবিশ্বাস বিনা সার্থক সৃষ্টিও সম্ভব নয়।"

অসিতকুমারের 'মোয়াজ্জিম', নিবেদিতার মতে, "বর্ণবিন্যাসের দিক থেকে অতি সুন্দর।" পোশাক ও গম্বুজের উপরে উষার শুভ্র আলোকপাত মনোহারী, কিন্তু মোয়াজ্জিমের পোশাকের বাহুল্য এবং 'তিনি যেন ছবি তোলবার জন্য প্রস্তুত'—এই ভঙ্গি নিবেদিতার ভালো লাগেনি। "ঘুমন্ত পৃথিবীকে জেগে ওঠার জন্য ডাক দিয়ে বলা হচ্ছে, তুমি শোনাও এই গান, 'নিদ্রা নয়—এখন প্রার্থনা'—এই ভাবটি ছবিতে পাওয়া যায় না।"

অসিতকুমার একাধিক স্থানে নিবেদিতার কাছে ঋণস্বীকার করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। তার মধ্যে নিবেদিতার ব্যক্তিমহিমা এবং শিল্প-প্রেরণাদাত্রীর প্রসঙ্গ আছে। "শ্রদ্ধেয় ভগ্নী নিবেদিতা আমাদের ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতাদের মধ্যে।...শৈলেন [সতীর্থ শিল্পী শৈলেন্দ্রনাথ দে, পরে জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ] আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজারে গণেন ব্রহ্মচারীকে নিয়ে যেতাম।"

নিবেদিতা কেবল ছবিতে সৌন্দর্য নয়, জীবনেরও সৌন্দর্য চাইতেন। পারিপার্শ্বিকের অপরিচ্ছন্নতা তাঁর অসহ্য লাগত। "তাঁর বাড়িতে একটি গরীব মেয়েদের স্কুল ছিল। সব জিনিসপত্র খুব তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে থাকত। মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে এইভাবে পরিচ্ছন্নতাও শিক্ষা দিতেন।"

একদিনের অভিজ্ঞতার কথা অসিতকুমার বলেছেন,

"সেদিন গিয়ে দেখি, নিবেদিতা স্বয়ং ঝুড়ি-ঝাঁটা-হাতে পাড়ার কয়েকটি মহিলা এবং ছাত্রীদের নিয়ে পাড়ার রাস্তা সংস্কার করছেন। বাড়ির দরজার সামনে ফেলা প্রত্যেক বাড়ির আবর্জনা সরিয়ে সরকারী ডাস্টবিনে ফেলছেন, এবং প্রত্যেক গৃহের গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষদের অনুরোধ করছেন যাতে ভবিষ্যতে নিজেদের সামনে না ফেলেন, ডাস্টবিনে ফেলেন। তারপর যতবার আমরা বাগবাজারে তাঁর বাড়ি গেছি পাড়ার পথঘাট অপরিচ্ছন্ন দেখিনি।"

নিবেদিতাকে একেবারে গোড়ার দিকে কিভাবে শিল্পনির্দেশক হিসাবে পেয়েছিলেন, সে-বিষয়ে অসিতকুমারের রচনা :

"আমি তখনও কেবলমাত্র অল্পদিন কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছি। বাবা মা কলকাতায় এসেছেন এবং মাতামহীর বাড়িতে (৪৪ নং বেনেপুকুরে) আছেন। শান্তমূর্তি ভগ্নী নিবেদিতা এসেছেন আমার দিদিমার নিকট। সেজমাসী (স্বয়ংপ্রভা দেবী) আমাকে ডাকলেন তাঁকে আমার আঁকা ছবি দেখাতে। আমি তখন সবে রাম রাবণ আঁকা ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণ আঁকা ধরেছি। কৃষ্ণের কালীয়দমন, রুক্মিণীহরণ, তাছাড়া বহু বৈষ্ণব সাহিত্যের

বিষয় যা বামুনদিদি আর মার নিকট শুনেছি—রঙে বা পেনসিলে আঁকতাম। নিবেদিতা ছবিগুলি দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং স্মিতহাস্যে আমাকে বললেন, 'তুমি এখন বালক, শ্রীকৃষ্ণের বিষয় কী বোঝ ? বড়ো হলে তবে শ্রীকৃষ্ণ এঁকো।' আমি অবশ্য তখন তাঁর সেই কথার মর্ম কিছুই বুঝিনি। আমি নিজের মনে ছবি এঁকেই চলেছিলাম। পরে আরও বড়ো হয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে বুঝলাম যে, কেন ভগ্নী নিবেদিতা ওরূপ কথা আমাকে বলেছিলেন।"

অজন্তায় থাকাকালীন অসিতকুমারের নিবেদিতা-স্মৃতির অংশ :

"তিনি [নিবেদিতা] অজন্তায় থাকার কালে একদিন একটি হনুমানজির মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আমার খুব ইচ্ছা, এই গ্রাম্যদেবতার মন্দিরটিকে অবলম্বন করে একটি Myths and Legends of the Hindus বই লিখব। তুমি আর নন্দলাল তার জন্য ছবি আঁকবে।' আমাকে বললেন লিরিক্যাল বিষয় আঁকতে এবং নন্দকে ক্ল্যাসিক্যাল। আমার ছবিতে তিনি লিরিক-ধর্ম পেতেন এবং নন্দলালের ছবিতে ক্ল্যাসিক্যাল ভাব। বলতেন, গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথের আমরা দুই শিষ্য দুইপ্রকার গুণে গুণান্বিত। দুর্ভাগ্যবশত ভগ্নী নিবেদিতার Myths and Legends বইখানি লেখা শেষ হবার পূর্বে অকালে দেহান্ত হলো। পরবর্তীকালে কুমারস্বামী বইখানি লিখে [অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশ লিখে] প্রকাশ করলেন বটে কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত চিত্রকলার বিষয় কিছুই হলো না। [Myths বইয়ে বাংলার শিল্পীদের অনেক ছবি আছে। অসিতকুমার সম্ভবত বলতে চেয়েছেন, তিনি নিবেদিতার মুখে যে-ধরনের পরিকল্পনা শুনেছিলেন তদনুযায়ী চিত্ররচনা হয়নি।] আমি পূজনীয় নিবেদিতাকে [তিনি] জীবিত থাকার কালে গ্রাম্য হনুমানের মন্দিরের যে-ছবিখানি এঁকে দিয়েছিলাম সেইটি এবং ধ্রুবের তপস্যা ছবি দুখানি ছাড়া অন্য কোনো লিরিক্যাল ছবি এঁকে দিতে পারিনি। আমরা তখন কয়েকজন জাতীয় শিল্পকলার পুনরুদ্ধারের জন্য যে-কাজ করেছি তাতে ভগ্নী নিবেদিতার উৎসাহ যে-বল দিয়েছে তা লিখে বোঝানো অসাধ্য।"

"আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তাঁর মতো মাতৃস্থানীয়া দেবীকে দর্শন করেছি এবং তাঁর স্নেহশীতল বাণী ক্রমাগত লাভ করেছি। এখন যখন কখনও-কখনও সতীর্থ সুহৃদ শৈলেন, ক্ষিতীশ [ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ?] বা নন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন আমরা তাঁর কথা স্মরণ ক'রে থাকি।"[৩]

কৃষ্ণলীলা আঁকার জন্য মনের পরিণতির প্রয়োজন সম্বন্ধে নিবেদিতা অসিতকুমারের মতো নন্দলালকেও সচেতন করতে চেয়েছিলেন, সে-বিষয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার (বৈষ্ণব ভাবরসের সেরা শিল্পী বলে যিনি স্বীকৃত) সাক্ষ্য দিয়েছেন :

"একবার তিনি [নন্দলাল] রাধাকৃষ্ণের ছবি আঁকছেন, পিছনে এসে দাঁড়ালেন ভগিনী নিবেদিতা। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন বৃন্দাবনের সেই অপরূপ প্রেমিকযুগলকে। কিন্তু কই, তাঁদের নয়নে স্বর্গীয় সুষমা তো নেই, দ্যুলোকের দিব্যজ্যোতিতে দীপ্ত হয়নি তো সুঠাম শ্যামবরতনু! নিবেদিতা শুধালেন, 'কার ছবি আঁকছ আর্টিস্ট ?' 'রাধাশ্যামের'—নন্দলাল বললেন। 'তা তো নীলাভ অঙ্গলাবণ্য দেখেই বুঝেছি। কিন্তু এতে যে যৌবনসুলভ আত্মোচ্ছ্বাস তোমার, আর্টিস্ট। পঞ্চাশ অতিক্রম না করে রাধাকৃষ্ণের লীলা আর এঁকোনা, বুঝলে ?' নন্দলাল সে উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছেন।"[৪]

॥ ৩ ॥

শিল্পীর প্রতিভার উন্মেষে ও তাঁদের প্রয়োজন পূরণে নিবেদিতার সদা-প্রস্তুত স্নেহ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রয়াসের ইতিহাস বড়ো অংশে অগোচর থেকে গেছে। বিখ্যাত শিল্পীদের জীবনকথা বা স্মৃতিকথায় যদি-বা সে-ধরনের সংবাদ কিছু পাই, অপেক্ষাকৃত অখ্যাতদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই মেলে না। যে দু'একটি পেয়েছি, তার মধ্যে শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য সম্বন্ধে আগ্রহের কথা স্মরণ করা যায়। ভারতের চিত্রশিল্প অপেক্ষা ভাস্কর্য সম্বন্ধে নিবেদিতার আগ্রহ কম তো নয়ই, বরং বেশি। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে জাগরণের লক্ষণ তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু অনুরূপ-কিছু ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে দেখেন নি, সে অভাববোধ ছিলই। বাংলার চিত্রশিল্পীদের দ্বারা আন্দোলন সৃষ্ট হবার আগেই তিনি শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মর সরস্বতী মূর্তি সম্বন্ধে কতখানি সাগ্রহ সমাদর দেখিয়েছিলেন, (দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা তাঁর ৭.১০.১৯০৪ তারিখের চিঠিতে), তা আগেই 'নিবেদিতা-অবনীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে বলে এসেছি। ভাস্কর্য সম্বন্ধে অনুরূপ আগ্রহের পরিচয় আছে গোপালকৃষ্ণ গোখেলকে লেখা ১৬ এপ্রিল ১৯০৫ তারিখের চিঠিতে। এখানে নিবেদিতার পৃষ্ঠপোষকতা পরবর্তীকালে খ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ভাস্কর ম্হাত্রে (Mhtre) সম্বন্ধে। নিবেদিতার চিঠি থেকে মনে হয়, সরকারী বা বেসরকারী কোনো তরফে কিছু ভাস্কর্যকাজ করাবার পরিকল্পনা ছিল এবং সে-ব্যাপারে গোখলের হাতও ছিল। গোখলেকে তিনি ম্হাত্রের চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়ে লেখেন, ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাঁর গভীর সহানুভূতি আছে। এইসঙ্গে ভারতীয় প্রতিভা সম্বন্ধে পূর্বপোষিত হীন ধারণা সম্বন্ধে নিবেদিতার প্রতিবাদও ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ-আঁকা চিঠিটির অংশ এই :

"আমার ধারণা, আপনি যে-ধরনের ইউরোপীয় শিল্পী সংগ্রহ করতে পারবেন তাঁদের যে-কারো মতোই শিল্পবস্তু ব্যবহারের সামর্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য এই শিল্পীর আছে। তদুপরি এঁর আছে প্রবল সৃষ্টিশীল প্রতিভা, যা খুব কম ইউরোপীয়ের আয়ত্তাধীন।

"বর্তমানে ভারত যে-অবস্থায় রয়েছে তাতে তার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, তার নিজের শিল্পীরা অপর দেশের শিল্পীদের অপেক্ষা আরও ভালো কাজ করতে পারে। ইতালিতে যদি বিশেষ এক যুগে এই ধরনের মনোভাব থাকত তাহলে কোনো মিকেলাঞ্জেলোর আবির্ভাবই হতো না।।"

॥ ৪ ॥

শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে সাহায্য করতেও নিবেদিতা আগ্রহী ছিলেন। এঁর বিষয়ে নিবেদিতার সম্ভ্রম ও বিরক্তি দুইই ছিল। সম্ভ্রমের কারণ, ইনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষে দেখেছেন, 'গুরুদাস বর্মন' এই ছদ্মনামে তাঁর জীবনীও লিখেছেন, ইনি স্বামীজীর বাল্যবন্ধু ও শিষ্য, স্বামীজীর বিষয়ে এঁর একাধিক স্মৃতিকথা আছে, খুবই ঘনিষ্ঠ হার্দ্য ভঙ্গিতে লেখা। স্বতঃই নিবেদিতার শ্রদ্ধা ইনি পাবেন। কিন্তু এঁর মধ্যে নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে এমন মাত্রাতিরিক্ত ধারণা ছিল যে, নিবেদিতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এঁর পুত্র তারানাথ সিংহের সৌজন্যে এঁর আঁকা শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রের একটি বহুবর্ণ চিত্র আমরা 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের গ্রন্থমুখে প্রকাশ করতে পেরেছি।

প্রিয়নাথ সিংহ ১৯০৮-এর গোড়ায় মাসখানেক ধরে নন্দলালের সঙ্গে উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে শিল্পনিদর্শন দেখেন, সে-অভিজ্ঞতা নন্দলালের পরবর্তী চিত্রসৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই ভ্রমণের মনোরম বিবরণ আছে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের 'ভারতশিল্পী

নন্দলাল' বইয়ের প্রথম খণ্ডে। প্রিয়নাথ সম্বন্ধে নন্দলাল বলেছেন, তিনি "রোগামতো দেখতে, টিকলো নাক, রঙ ফর্সাই বলা চলে। বিলিতি অয়েল পেন্টিং করতেন। স্বামীজীর আর ঠাকুরের বহু পোর্ট্রেট করেছেন তিনি। পোর্ট্রেট করে বাজারে ছেড়ে বিক্রি করতেন।...তিনি অনেক গাইড করতেন আমাকে—এটা করো, ওটা করো, বলে। প্রিয়বাবুই নিয়ে গিয়েছিলেন...গিরিশবাবু আর রাখাল-মহারাজের সঙ্গে আলাপ করাবার জন্য।...আমার দিশি পদ্ধতিতে করা ছবি দেখে প্রিয়বাবুরও ইচ্ছে হলো, ওইরকম আঁকবে। দিশি পদ্ধতিতে অনেক ছবিও এঁকেছিলেন আমার দেখাদেখি। প্রিয়বাবুর বিখ্যাত ছবি 'যম ও নচিকেতা', ছাপা হয়েছিল প্রবাসীতে।...শেষের দিকে তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে এলো। আগে ভালোই ছিল। পোর্ট্রেট করেই দিন-গুজরান করতে লাগলেন।"

নন্দলালের বর্ণনায় এক জায়গায় প্রিয়নাথের ব্যক্তিচরিত্র সুন্দর ফুটেছে। মুঙ্গের-খড়্গপুরের দক্ষিণে গাংটায় উঁচু পাহাড়ের উপরে গুহার ভিতরে আছে শিবমন্দির। সেখানে অনেকগুলি শালগ্রাম-শিলা ছিল। প্রিয়নাথ তার একটা চট্‌ ক'রে পকেটে পুরে নেন। "পকেটে পুরে হাসতে-হাসতে বললেন, 'নাও একটা।...ভালো বেদামীক পাথর।' স্বামীজীর ভক্ত প্রিয়বাবু ও-সব সংস্কার মানতেন না কিছু।" নন্দলালের সংস্কারে কিন্তু কাজটা বেধেছিল। নন্দলাল আরও জানিয়েছেন, প্রিয়নাথ "ভালো গান গাইতেন, বিশেষত শ্যামাসঙ্গীত, সেইসঙ্গে সেতারেও হাত ছিল চমৎকার।"

এই ভূমিকার পরে প্রিয়নাথ সিংহ সংক্রান্ত নিবেদিতার চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায় :

মিস ম্যাকলাউডকে, ৩১ জানুয়ারি ১৯০৬ :

"একটা বিষয়ে তোমার বিশেষ সাহায্য দরকার। স্বামীজীর পোর্ট্রেট আঁকেন এমন একজন এখানে আছেন। মানুষটি সর্বস্বান্ত, বা প্রায় তাই। আমি তাঁকে বলেছি, যদি তিনি ওই পোর্ট্রেট আঁকার কাজ করে যান—তা করার দিব্যপ্রতিভা তাঁর আছে—তা হলে কার্যত তার বিনিময়ে অর্থলাভের বিষয়ে গ্যারান্টি দিতে পারি। তা জেনে দু'মাস খেটে তিনি তিনটি পোর্ট্রেট তৈরি করেছেন—একটি বড়ো আকারের, দেড়ফুটের মতো ; আর একটি এক ফুট, যেটিকে ক্রিস্টিনের আরও পছন্দ, যদিও আমার নয় ; তৃতীয়টি খুব ছোট, একটুকরো কার্ডবোর্ডে আঁকা—কিন্তু একেবারে রত্ন। ওদের জন্য ৫ পাউন্ড অগ্রিম দিয়েছিলাম।...এগুলি নিজেদের মধ্যে কি তুমি বিক্রি করবার চেষ্টা করবে ? আমি চেষ্টা করছি যাতে উনি ছোট আকারের ছবি করেন, সহজে যার বাজার পাওয়া যাবে, এবং কাজটা চালু থাকবে, যথা পাতলা missal কাগজে [প্রার্থনা পুস্তক জাতীয় বই যাতে ছাপা হয়] স্বামীজীর বাণী-অলঙ্করণ কিংবা বুদ্ধ-বাণীর অলঙ্করণ ইত্যাদি। কিন্তু পুরাতনী শিল্পীদের ভাবে পূর্ণ এই শিল্পী কেবল স্বামীজীর মুখাকৃতিতেই মশগুল।...তুমি কি কিছু ছবি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমেরিকায় বিক্রির চেষ্টা করবে ? একটা বাজে ব্যাপার হলো, এঁরা ইউরোপের সেরা জিনিসের হারে নিজেদের জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করেন। এই মানুষটির ধারণা, ওঁর বড়ো ছবিটিরও দাম হবে ২০০ টাকা মানে ১৩ পাউন্ড, আর ছোটটির দাম আরও বেশি। আমি নিজে দরদামের সম্বন্ধে কিছু জানিনা, কিন্তু তাঁকে বলেছি, ও-রকম দাম পাবেন না, এমন কি আগামী বহুদিনের মধ্যে। আর সত্যি কথা বলতে কি, তিনি টাকার জন্য কাজও করেন না। কিন্তু ওঁর স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে, মাসে ৬০-৭০ টাকা যে দরকার। তুমি যদি কেনসিংটন হাই স্ট্রীটের কাছে কোনো এক জায়গায় চেমিস্টন গার্ডেনস-এ অবস্থিত হায়ার থট সেন্টারে গিয়ে আমাকে মিসাল কাগজ বিক্রি করার জন্য তাঁদের অনুরোধ করো, তাহলে

খুবই খুশি হবো। ওঁরা আমাকে খুবই চেনেন, ভারতকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবেনই। ...মানুষটি [প্রিয়নাথ] যে-কাজ করছেন তাতে আমার কত আনন্দ তুমি ভাবতেই পারবে না।"

মিস ম্যাকলাউডকে, ১৫ মার্চ ১৯০৬ :

"ছোট ছবিটির জন্য ১৩ পাউন্ড দেবার কথা মোটেই বলিনি। আমি কেবল তোমাকে বিশেষভাবে বলেছিলাম যে, তিনটি ছবির জন্য অগ্রিম দিয়েছি ৫ পাউন্ড (পাঠানোর খরচ ইত্যাদি নিয়ে প্রায় ৬ পাউন্ড)। আরও বলেছিলাম, এখানকার লোকজনের মধ্যে নিজেদের কাজের অর্থমূল্য সম্বন্ধে খুবই ফাঁপানো ধারণা আছে—যা বিশেষ অসুবিধাজনক ; এও ভেবেছিলাম, ছবিটি পেয়ে তুমি খুব আনন্দিত হবে। ওটিকে আমার তো অসাধারণ মনে হয়। ...মেঝের উপর বিছিয়ে পুরনো রীতিতে এটি আঁকা হয়েছে—শিল্পী বুদ্ধরীতিতে বসে এঁকেছেন। তিনি স্বামীজীকে ৬ বছর বয়স থেকে চেনেন—এবং তাঁকে জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন।"

ঈ বী হ্যাভেলকে, ৬ জুলাই ১৯০৯ :

"আপনার দেখার জন্য ছোট্ট ভারতীয় ম্যাডোনা পাঠিয়েছিলাম। তার সম্বন্ধে আপনি যে-রকম সাদর মনোভাব দেখিয়েছেন সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ। ...প্রিয়নাথ সিংহ নামক এক কেতামাফিক শিক্ষাহীন ব্যক্তির আঁকা ওটি। তিনি অবশ্য নব আন্দোলনের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও চালিত। কিন্তু তাঁর পর্বতপ্রমাণ অহঙ্কার। আমাকে বলতেই হচ্ছে, তাঁর বিষয়ে সব আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম—তাই এই স্কেচটি আমাকে অবাক করে দেয়।"

প্রিয়নাথ সিংহকে, ৪ এপ্রিল ১৯০৯ :

"ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরিতে আমি একটি ছোট সুন্দর পাণ্ডুলিপি দেখেছি ভেলাম-এর [লেখবার বা বই বাঁধাবার বাছুরের চামড়াবিশেষ] উপর দেবনাগরী অক্ষরে লেখা। দু'পাশে উপর থেকে নীচে সোনালি প্রান্তরেখার মধ্যে সবুজ, হালকা-লাল, ও নীল রঙের লতা-পাতা আঁকা—আর তাতে এখানে-ওখানে ছোট-ছোট ছবি। পাণ্ডুলিপিটি চওড়ায় সাড়ে তিন ইঞ্চি, ঠাসা লেখা, লম্বা ৩৬ কি ৪২ ইঞ্চির মতো। গোটা জিনিসটি সরু গোল কাঠে জড়ানো।

"আপনি এই ধরনের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন না কেন? লেখার কাজ অপরকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন। আপনার স্ত্রী বা তাঁর বোন কিছু অভ্যাসেই তা করতে পারবেন। আঁকার কাজ আপনি করবেন। ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক, কিংবা গীতার একটি অধ্যায়, কিংবা নারী-বিষয়ে স্বামীজীর কিছু অসাধারণ বাংলা রচনা—এমন বিষয়ে তো আপনি কাজ করতেই পারেন, করবেন না কেন? অবশ্যই চেষ্টা করুন। যদি আপনি লেখা ও ছবিসুদ্ধ কিছু কার্ড তৈরি করে ফেলতে পারেন তাহলে বড়দিনের আগে ইউরোপে ও আমেরিকায় সেসব বিক্রির চেষ্টা করব।"

প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে হ্যাভেলের পত্রব্যবহার ছিল। হ্যাভেল ১৯.৩.১৯০০ তারিখে ইংলন্ড থেকে প্রিয়নাথকে লেখা এক চিঠিতে ভারতীয় মায়াবাদ শিল্পক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতা নষ্ট করে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রশ্নটি সেকালে বহুল আলোচিত।[৬]

॥ ৫ ॥

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় চিত্রশিল্পী এবং লেখক—উভয় ভূমিকাতেই বাংলায় পরিচিত। একদিকে আছে তাঁর শক্তিদেবী ও ধর্মাশ্রিত অন্য বিষয়ের শক্তিশালী ছবিগুলি, অন্যদিকে বিচিত্র যাযাবর জীবনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কাহিনীগুলি, যাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হলো একাধিক খণ্ডের 'তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ' বইটি, যাতে পাই সুনিপুণ কিছু রেখাচিত্র। 'হিমালয়-পারে কৈলাস ও মানস সরোবর' বইটির কথাও মনে পড়বে। প্রমোদকুমার কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র, ওরিয়েন্টাল সোসাইটির ছাত্র, প্রথমদিকে তৈলচিত্রের অনুরাগী, পরে নব্যভারতীয় শিল্পধারার। এঁর স্টাইলে আছে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের মুদ্রণ। অন্ধ্র কলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। নন্দলালের সঙ্গে এঁর সতীর্থ এবং শিষ্য, উভয় সম্পর্ক।

নিবেদিতা প্রসঙ্গে প্রমোদকুমারের কিছু কথা :

"আমাদের তখন আর্ট স্কুলে চতুর্থ বছর। শিক্ষকরা সব চলে গিয়েছেন স্কুল-ছুটির পর। অবশ্য আমি, নন্দলাল, অসিত, ক্ষিতীন, শৈলেন প্রভৃতি কয়েকজন দেরী করেই যাব ঠিক করে, নিবেদিতাকে ধরে আলাপ-আলোচনায় মেতেছিলাম। নিবেদিতা আমাদের ভালবাসতেন, তাই মাঝে-মাঝে আসতেন। ...শিল্পী যারা তারা নিবেদিতার প্রাণের লোক। ...এখন, শৈলেন একখানা বুদ্ধদেবের ছবি এঁকেছে। তাঁকে দেখিয়ে মতামত জানতে আগ্রহ করেই অপেক্ষা করছে। ছবিখানি তাঁর (নিবেদিতা) হাতেই রয়েছে। **বললেন, 'বুদ্ধের মুখ এঁকেছ, নাকটা চাইনিজদের মতো খাঁদা করেছ কেন? তিনি একজন ভারতের রাজপুত্র। ভারতীয়রা কি চাইনিজদের মতো খাঁদা নাক নিয়ে জন্মায়? তোমরা ওই চাইনিজ-জাপানিজ স্টাইল অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেবে কেন? তাছাড়া ভারতীয়ের মূর্তি সৌন্দর্যের দিক দিয়ে পৃথিবীর কোনো দেশের, এমন-কি রোমান, গ্রীকদের চেয়ে কম ছিল কি?'**

"তাঁর কথায় অন্তরে যেন আলো জ্বলে উঠল। সে এক অপূর্ব উন্মাদনা। মোটকথা, সেদিনের আলোচনায় তিনি সৌন্দর্য [সম্বন্ধে], ভারতের মূর্তি [সম্বন্ধে], মহাভারতের সময়ে, তারপর বৌদ্ধযুগে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যদের সময়েও, কী সুন্দররূপে [প্রস্তুত হতো] নরনারী-মূর্তি, যা সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা বললেও বেশি বলা হয় না—সে-বিষয়ে বলে গেলেন।"[৭]

সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থপূর্ণ মন্তব্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে **Asia in one,** এই কথাটা নিবেদিতা ততক্ষণেই ভাবতে রাজি যতক্ষণ দেখেন ভারতের সংস্কৃতির জালে বাঁধা আছে এশিয়ার অপর দেশগুলি। তাই ভারতের দূরবিস্তৃত শিকড় সন্ধানে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ, কিন্তু ভারতে তিনি বিদেশী আলোকলতার চাষ চাননি। চীনা বা জাপানী শিল্পের অন্ধ অনুকরণ, বিশেষত দেহগঠনের ক্ষেত্রে, তাঁর কতখানি অপছন্দের বস্তু ছিল, প্রমোদকুমারের স্মৃতিকথা থেকে দেখা যায়।

॥ ৬ ॥

ভারতশিল্পের পক্ষে সমর্থ সংগ্রামী অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৭৪), ও. সি. গাঙ্গুলি নামেই যিনি অধিক পরিচিত—শিল্পী ছিলেন, যদিও বড় শিল্পী নন। কিন্তু অসীম তাঁর শিল্পোৎসাহ এবং অদম্য যোদ্ধৃমনোভাব। শিল্প-আন্দোলনের সূচনা থেকেই তার পক্ষে লড়াই করে গেছেন। একদিকে বিরোধী বক্তব্য খণ্ডনে সচেষ্ট, অন্যদিকে শিল্পতত্ত্বের

পরিশ্রমী ব্যাখ্যাতা—প্রবন্ধে ও গ্রন্থে। অনেকগুলি গ্রন্থের লেখক ইনি (**Rag-O-Ragini** দুই খণ্ডে ; **Modern Indian Artists** দুই খণ্ডে ; **Masterpieces of Rajput Painting; Little Books on Asiatic Art** ৪ খণ্ডে)—সবচেয়ে বিখ্যাত বই **South Indian Bronzes**। বইগুলি দেশ বিদেশের সুধীজনের সমাদর পেয়েছে। নানা বিদ্বৎসংস্থার সদস্য ছিলেন, শিল্পবক্তৃতার জন্য বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, 'রূপম' নামক প্রথমশ্রেণীর একটি শিল্প-পত্রিকা প্রায় ১২ বছর চালিয়েছেন, বৃত্তিতে এটর্নী, সেই কর্মজীবন সাঙ্গ করার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী শিল্পবক্তা। এঁর লেখায় নিবেদিতা বা কুমারস্বামীর তুল্য গভীরতা বা নিপুণতা ছিলনা, কিংবা হ্যাভেলতুল্য চিন্তাদৃঢ় চিন্তাঋদ্ধ সিদ্ধান্ত। এইসব অভাব তিনি বহুলাংশে পূরণ করেছেন তথ্যসংগ্রহ ও উদ্দীপ্ত পরিশ্রম দ্বারা। ভারতশিল্পের দুর্গরক্ষায় পঞ্চাশ বৎসরের বেশি সময়ের এই বীরযোদ্ধার ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়।

সুতরাং ভারতশিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে অর্ধেন্দ্রকুমারের উক্তি বা সাক্ষ্যের মূল্য সবিশেষ। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও তা ঘনিষ্ঠ হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা আলোচনাসভায় মিলিত হয়েছেন, নিবেদিতার বক্তৃতা অর্ধেন্দ্রকুমার শুনেছেন, কিন্তু নিবেদিতা ওঁকে হয় অনুগত শ্রোতারূপে পাননি অথবা অল্প বয়সেই ওঁর মধ্যে অধিক পরিপক্কতার ভঙ্গি দেখে অখুশি হয়েছেন। চিত্রপ্রদর্শনীতে অর্ধেন্দ্রকুমারের একটি ছবি সম্বন্ধে তিনি এমন নির্মম সমালোচনা করেছেন যার অনুরূপ-কিছু তাঁর লেখায় দেখা যায়না। যথা—

"ইউ [ও] সি গাঙ্গুলীর ছবিগুলির সম্বন্ধে এই গুরুতর সমালোচনা করতে হয়—তাদের কোনোটিকেই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দেখা যায়না। বুদ্ধির কসরতকে আদর্শ করে তোলার মতো মহা অপরাধের জন্যই এ-জিনিস হয়েছে, যা বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতির কারণ। শিল্পীকে একটা পরামর্শ আমরা দেব—একটা পুরো বছর আর কিছু না করে কেবল বর্ণবিন্যাস নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করুন। এই প্রকার আত্মশাসনের পরে তিনি দেখবেন—তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা অতি অপূর্ব রূপ ধরেছে—আর সেক্ষেত্রে তিনি আমাদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারবেন না।"[৮]

এমন একটা ধাক্কা সামলানো সহজ নয়—যদি-না সমালোচিত মানুষটি নিবেদিতার উপদেশকে বহুমান দেন এবং এক বছর ধরে নিষ্ঠাভরে তা পালন ক'রে এমন ফল পান যার দ্বারা উপনীত হন অকৃতার্থতা থেকে কৃতার্থতার দ্বারে। কী হয়েছিল আমরা জানিনা, কিন্তু অর্ধেন্দ্রকুমার এর পরে যে-প্রকার অকুণ্ঠে নিবেদিতার ভূমিকার গুরুত্বের কথা বলেছেন, যে-প্রকার অবাধ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তা তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের উদারতারই পরিচায়ক। এবং, এই পর্বের সঙ্গে শিল্পী ও সমালোচক হিসাবে নিবিড়ভাবে যুক্ত মানুষের সাক্ষ্য হিসাবে তাঁর সে লেখার মূল্যও যথেষ্ট।

অর্ধেন্দ্রকুমার তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে ('ভারতের শিল্প ও আমার কথা') নানা স্থানে ধারাবাহিক কাহিনীসূত্রে নিবেদিতার প্রসঙ্গ এনেছেন। তার মধ্যে ওকাকুরার 'আইডিয়ালস অব দি ইস্ট' বইয়ের ক্ষেত্রে, বা রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় নৌবাণিজ্য বিষয়ক বই এবং "ভারত-ইতিহাসের অজানা সব অধ্যায় আবিষ্কারের ক্ষেত্রে", নিবেদিতার প্রভাবের কথা আছে। (প্রসঙ্গত জানানো যায়, রাধাকুমুদের প্রাচীন ভারতের নৌ-যাত্রা ও বাণিজ্য বিষয়ক বইয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন স্কেচ নন্দলাল করেছেন)। নন্দলাল নিবেদিতার Myths বইয়ের জন্য যে-সব ছবি এঁকেছিলেন, তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে অর্ধেন্দ্রকুমার বলেছেন :

"এই সিরিজের বুদ্ধদেবের জীবনকথা অবলম্বন করে [নন্দলাল] যে-ছবিগুলি এঁকেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর শিল্পপ্রতিভা, ভারতীয় আদর্শ ও চিন্তাধারার নিখুঁত ও অনবদ্য রূপ হয়েছিল প্রতিফলিত। এই চিত্রসৃষ্টির পরে তাঁর খ্যাতি আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে।" (ঐ, পৃ. ১৯০)।

নিবেদিতার গুরুত্ব সম্বন্ধে একই গ্রন্থে অন্যত্র লেখা হয়েছে :

"একজন ভারত-বন্ধু এই শিল্প আন্দোলনকে এমন সহায়তা উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন, যাঁর কথা বাদ দিয়ে এর বাস্তবিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায়না। ইনি হলেন বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা।...ভারতবর্ষের ইতিহাস পুরাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে তিনি আমাদের ইতিহাস, ধর্মসাহিত্য ও শিল্পকলার মর্মকথা করেছিলেন অনুশীলন। **তিনি ছিলেন বাংলাদেশে জাতীয়তার উদ্বোধনে জ্বলন্ত শিখাস্বরূপ।** জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃত পথ ও পন্থার তিনি ছিলেন অন্যতম দিশারী। তিনি তখনকার নবীন ভারতকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে করেছিলেন সুপরিচালিত। তাঁরই নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি 'শিপিং ইন এনসেন্ট ইন্ডিয়া' বইখানি লিখতে হয়েছিলেন প্রবৃত্ত। ভগিনী নিবেদিতাকে আমি প্রথম দেখি অবনীবাবুর দক্ষিণের বারান্দায়। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় এবং ভারতের কলাশিল্প সম্বন্ধে তাঁর ভাবধারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করবার সুযোগও এসেছিল। **ক্রমশ তাঁর সব লেখা পড়ে তাঁর চিন্তাধারার প্রভাবে আমি ভারতীয় কলাবিদ্যার মর্ম অনুসন্ধানে প্রেরণা পেয়েছিলাম। তাঁর লিখিত 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্', 'ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ', 'কালী দি মাদার', 'ফুটফলস্ অব ইন্ডিয়ান হিস্টরি' ইত্যাদি বই আমাকে একটি নূতন জগতের সন্ধান দিয়েছিল।** ...অবনীবাবুর বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতা ও স্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ-সাহেব একসঙ্গে এলে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা চলত খুব জোরালো ভাবে। এই আলোচনার মধ্যে সর্বদাই নিবেদিতার একটি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যেত। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর প্রতিও ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। তাঁর চেষ্টা ব্যতীত নন্দলাল, অসিতকুমার প্রভৃতির অজন্তায় গিয়ে লেডি হেরিংহামের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ হতো না কখনই। মডার্ন রিভিউ-এ বাংলার নতুন শিল্প-আন্দোলনের পুরোধা শিল্পীকুলের যে-সকল ছবি প্রকাশিত হতো, সেই সম্বন্ধে চমৎকার ও সুনিপুণ টীকাসহ ব্যাখ্যা লিখে দিতেন ভগিনী নিবেদিতা। এই বিষয়ে রামানন্দবাবু তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন প্রচুর সহায়তা।...অবনবাবুর 'সাজাহানের মৃত্যু', 'তাজের স্বপ্ন', 'ভারতমাতা', 'বন্দিনী সীতা' প্রভৃতি ছবি সম্বন্ধে নিবেদিতার ব্যাখ্যা ও মন্তব্য অতি অপূর্ব।" [ঐ, পৃ. ১৬৮-৬৯]

অন্যত্র একটি ইংরেজি প্রবন্ধে অর্ধেন্দ্রকুমার "ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মরহস্যের উন্মোচনে নিবেদিতার "দৈবী প্রতিভার" কথা বলেছেন।"[৯]

নিবেদিতা-কুমারস্বামীর **Myths of the Hindus and Buddhists** বইয়ের আলোচনাসূত্রে অর্ধেন্দ্রকুমার নিবেদিতার ভূমিকার উৎকৃষ্ট মূল্যায়ন করেছেন মডার্ন রিভিউ পত্রিকার মার্চ ১৯১৫ সংখ্যায় :

"ইউরোপীয় পাঠকদের কাছে হিন্দু-জীবন, আদর্শ ও সংস্কৃতির উপস্থাপনার ব্যাপারে পরলোকগত সিস্টার নিবেদিতার অমূল্য দান। পারস্য বা আরবের ক্ষেত্রে বার্টন বা

আর্মেনিয়াস ভামবেরী, কিংবা জাপানের ক্ষেত্রে লাফকাডিও হার্ন যা করেছেন, ভারতের আত্মরূপের উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিবেদিতার ভূমিকা সেসব কাজকে ছাপিয়ে গেছে। ...**বর্তমান বাংলার এমন কোনো কার্যাবলী নেই—সাহিত্য, শিল্প, প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা—যা নিবেদিতার লেখার দ্বারা কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাবিত হয়নি।**"

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার বিশেষ পরিচয়ের বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-সম্বন্ধে তেমন তথ্য আমাদের হাতে নেই। গগনেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শক্তিশালী শিল্পী, কিউবিজম্-রীতির (অনেকে যাকে সাদাকালো, ছবি বলতে চান) ছবির ক্ষেত্রে তিনি এদেশে পথিকৃৎ। কার্টুনের এক সেরা শিল্পী। তাঁর নিসর্গচিত্র অনবদ্য এবং অবিস্মরণীয় তাঁর চৈতন্যচিত্র। 'দুর্গাপ্রতিমা বিজয়া'র ছবি ভোলার নয়। মহান আভিজাত্যে আত্মসংবৃত এই শিল্পী স্বভাবধর্মে অগোচর/ থাকতে চাইতেন বলেই হয়ত কিছুটা অনালোচিত থেকে গেছেন।

২ অসিতকুমারের জীবনতথ্যগুলি পেয়েছি শ্রীগৌতম হালদারের কাছ থেকে। শিল্পীর বিষয়ে পূর্বে প্রদত্ত আরও কিছু তথ্য তিনিই দিয়েছেন।

৩ অসিতকুমার, 'সাবেকী কথা', সমকালীন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ এবং কার্তিক ১৩৬২।

Myths বইয়ে হনুমানজির মন্দির অবলম্বন করে নিবেদিতার লেখার পরিকল্পনার কথা অসিতকুমার বলেছেন। নিবেদিতা, প্রাণী প্রকৃতি মাতৃশক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রাচীন লোকগাথার উৎস সন্ধান করছিলেন—তারই উপস্থাপনা করবেন উক্ত গ্রন্থে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এ বিষয়ে তিনি অক্সফোর্ডের খ্রীস্ট-ধর্মতাত্ত্বিক ডঃ টি কে চেইনীকে ২৩.৫.১৯৯১ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন :

"I have been working lately, over something like an analysis of the sources of Hindu Mythology—and behind the Aryan Vedas. I find the Animal Epos, and the Planetary Epos, and the sacred Tree and the Divine Mother, all early and perfectly detachable religious motifs." [**Letters of Sister Nivedita**, Vol. II, pp. 1202-03.]

৪ ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, 'নন্দলাল বসু', বিশ্বভারতী পত্রিকা, নন্দলাল বসু, সংখ্যা, ১৩৭৩, পৃ. ২১।

৫ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৮-২০।

৬ প্রিয়নাথ সিংহকে লেখা হ্যাভেলের ১৯ মার্চ ১৯০৩ তারিখের চিঠি :

7 St. Edmund's Terrace
Regent's Park N. W.
19.03.09

My dear Sir,

I am very much obliged for your second very interesting letter and for your kind offer to send me Swami Vivekananda's book **'My Master'** which I shall be very pleased indeed to have.

I did not mean to suggest in my book that either the doctrine of **Maya** or **Yoga** philosophy were in themselves necessarily destructive to the creative faculties. What I meant was that such doctrines might be interpreted (either rightly or wrongly) in a sense inimical to artistic creations and they might lead, and probably did lead, to the exaltation of the Yoga of Asceticism above the Yoga of Citizenship to an extent which acted injuriously upon artistic efforts. That is only a suggestion of me of the causes of the decaying of Indian arts apart from Western influences.

I am dealing more in detail with the various points of your very suggestive and interesting letters in my weekly letter to the "Hindu" of **Madras**, which I shall be very glad to send you later on if you do not see "The Hindu" at Calcutta.

Again thanking you for your very kind appreciation of my book.

I am [...] Sir,
Yours very faithfully,
E. B. Havell

To Babu
Priya Nath Sinha.

৭ **"ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ", শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুনীলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১ম খণ্ড,**

পৃ. ৯৮।

৮ Nivedita, **The Exhibition of the Indian Society of Oriental Art**, Modern Review, April 1910.

৯ অর্ধেন্দ্রকুমারের মতে, ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিপ্রেরণা ভারতবাসীর মধ্যে জাগ্রত করেছিলেন তিনজন বিদেশী—তাঁরা হলেন নিবেদিতা, আর্থার অ্যাভ্‌লন (স্যার জে জি উড্‌রফ্), এবং জেমস কাজিনস্। অর্ধেন্দ্রকুমার উল্লিখিত প্রবন্ধে বলেছেন, এই তিনজনের মধ্যে নিবেদিতার ভূমিকা "অনন্যসাধারণ এবং ব্যাখ্যাতীত।" নিবেদিতার ভালবাসা সকলপ্রকার জাতিগত সংস্কার ছিন্ন করে তাঁকে একেবারে এদেশের মানুষ করে তুলেছিল, এমন যে, এদেশের তথাকথিত কুসংস্কারও তাঁর সংস্কার হয়ে উঠেছিল, যাদের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছেন প্রদীপ্ত মনীষায়। নিবেদিতার সর্বাঙ্গীণ দানের কথা অর্ধেন্দ্রকুমার বলেছেন। আমি কিছু অংশ তুলছি :

"It was a God-given faculty which enabled her to unlock the mystery of Indian culture...She set down her own reactions to Indian culture and civilization in her great book **The Web of Indian Life**. This book full of brilliant expositions have provided Indians with new spectacles thorough which to look at our own culture in the new meanings and significances. Taking her place as a missionary in the Order of Ramakrishna-Vivekananda (she was the spiritual child of Swami Vivekananda) she carried out their teachings in all depths of life. Her part in the development of Indian Nationalism is very great but has not been adequately recognised. She was the first to admire the new masterpieces of Indian painting produced by Abanindranath Tagore and Nandalal Bose...It was she who induced Mrs Herrigham of the India Society. She took Nandalal Bose to copy the world famous frescoes of the Ajanta Caves and helped the great Artist to recover his great spiritual heritage. She inspired the work of the Dawn Society and its workers Satis Chandra Mukerjee, Benoy Kumar Sircar and Dr Radha Kumud Mukerjee. She guided Benoy Kumar Sircar to the social history of India. She also inspired Dr Radha Kumud Mukerjee to survey the ancient Indian maritime activity of Indian shippers."

রচনার শেষের দিকে অর্ধেন্দ্রকুমার দুঃখ জানিয়ে বলেছেন, নিবেদিতার সব আশা পূরণ হয়নি। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লোকান্তরিত মহান সত্তা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন, যেমন করেছিলেন সীতা। সেইভাবে নিবেদিতা কি আবার ভারতে পুনর্জন্ম নেবেন না? (এখানেও তাহলে নিবেদিতা সম্বন্ধে চিন্তায় এসে গেলেন সীতা।)। ['ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ', ১ম, পৃ. ৩৩-৩৪।]

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোট সিদ্ধান্ত

নিবেদিতা কী করেছিলেন শিল্প আন্দোলনের ক্ষেত্রে, সে কথাগুলি গুছিয়ে আনলে এই দাঁড়ায় :

১. ভারতীয় কলাশিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে ঠিক ধারণা যখন ভারতের শিক্ষিত মহলে প্রায় নেই তখন স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় তাকে লাভ ক'রে, তার প্রচারে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। [স্বামীজীর কাছ থেকে শিল্প বিষয়ে প্রাপ্ত ভাবপ্রত্যয়গুলি কী, তা প্রথম অধ্যায়ে বলে এসেছি।]

২. এক্ষেত্রে নিবেদিতা—হ্যাভেল, কুমারস্বামী, অরবিন্দ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রভাবিত করেছেন।

৩. নিবেদিতা তাঁর শিল্প-বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত লেখকদের রচনাকে আবার বিস্তৃত বিশ্লেষণের দ্বারা শিক্ষিত-সাধারণের গোচর করতে চেয়েছেন। যথা, তাঁর সাহায্যে প্রস্তুত ওকাকুরার গ্রন্থ-মধ্যে তিনি স্বয়ং যেসব বস্তু সেখানে প্রবেশ করিয়েছেন, সে সকলের বিষয়ে ওই গ্রন্থের ভূমিকায় আবার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হ্যাভেলের প্রথম বৃহৎ গ্রন্থের উপর তিনবার আলোচনা করেছেন ; কুমারস্বামীর বইয়ের উপরও একই সংখ্যক আলোচনা। অরবিন্দর প্রস্থানের পরে 'কর্মযোগিন' পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরিয়েছেন শিল্পের প্রসঙ্গে।

৪. শিল্প-আন্দোলনের মুখ্য প্রচারকর্তা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে নব্যভারত-শিল্পের পক্ষপাতী করেছেন ; সে বিষয়ে লিখিত স্বীকারোক্তি আছে রামানন্দর।

৫. স্বয়ং অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিভাময়ী লেখিকা : **The Web of Indian life, Studies from an Eastern Home, Footfalls of Indian History, Myths of the Hindus and Buddhists** প্রভৃতি গ্রন্থে (যাদের বড় অংশ ধারাবাহিকভাবে পত্র-পত্রিকায় বেরিয়ে ব্যাপক প্রচারলাভ করেছিল) ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভাব ও রূপের অনবদ্য ব্যাখ্যার দ্বারা ওই সংস্কৃতি-আশ্রিত শিল্পের রসাস্বাদনের উপযুক্ত পটভূমিকা রচনা করেছিলেন। ওই সঙ্গে ছিল তাঁর সরাসরি শিল্পগত রচনাগুলি। কিছু ভাবাত্মক বিদেশী শিল্পের ব্যাখ্যাত্মক পরিচয়ের দ্বারা দেখিয়ে দেন—পাশ্চাত্যশিল্প সর্বত্র নিছক শরীরচর্চায় নিবিষ্ট নয়, আদর্শায়িত চিত্রও সেখানে যথেষ্ট। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেই ধরনের পাশ্চাত্য শিল্প সম্বন্ধে যাদের মধ্যে জনজীবনকে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে নাগরিক চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয়দের পক্ষে তা অনুকরণযোগ্য।

৬. অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার-সহ অনেক শিল্পীর তিনি প্রেরণাদাত্রী। নন্দলালদের বাস্তব সাহায্যও করেছেন।

৭. এইসব শিল্পীরা সবচেয়ে সাহায্য পেয়েছেন তাঁর চিত্রালোচনার দ্বারা। মডার্ন রিভিউ, প্রবাসী, ইন্ডিয়ান রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর এই চিত্রালোচনাগুলি এখনো দীপ্তি ও গভীরতায় অসামান্য। সহজেই অনুমান করা যায়, তখনকার তরুণ শিল্পীরা ওই সকল রচনার দ্বারা কতখানি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মনস্বী লেখক ওইসব রচনাকে মডার্ন রিভিউ-এর সম্পদ মনে করেছেন। অন্য অনেকেরই একই মত।

স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মন্তব্য দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করব :

"পাশ্চাত্ত্য আদর্শ বর্জন করিয়া প্রাচ্য আদর্শে নূতন চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির জন্মদাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।...ভগিনী নিবেদিতা এই চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিকে সূতিকাগার হইতে বাহির করিয়া তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইহার সুদীর্ঘ শৈশবকালে এই নবজাত শিশুকে যেরূপ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহে লালনপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই বিদেশিনী মহিমময়ী মহিলার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে যদি বাঙালী জাতি করজোড়ে দণ্ডায়মান না হয়, তবে তাহার ললাটে অকৃতজ্ঞতার কলঙ্কস্পর্শ হইবে।"[১]

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

১ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ'।

নির্দেশিকা

গ্রন্থাগার

জন্ম : ২১ অক্টোবর, ১৯২৮। হাওড়ায়।
হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ।
শিক্ষা : বিবেকানন্দ ইনস্টিট্যুশন, রিপন কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম।
কর্মজীবনের শুরু থেকেই অধ্যাপনা। ১৯৬২ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
সাহিত্যের একাধিক শাখায় প্রবিষ্ট। মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে একাধিক গ্রন্থের অন্যতম 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য'। এমনই সমাদৃত দুটি গ্রন্থ—'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' এবং 'কবি ভারতচন্দ্র'। ছোটদের বই—'আমাদের নিবেদিতা', 'কৃষ্ণ'।
বিবেকানন্দের ইংরেজী গদ্য ও বিবেকানন্দ-বিষয়ে কিছু বিশিষ্ট ইংরেজী রচনাকে কাব্যে রূপান্তরিত করে লিখেছেন 'বিবেকানন্দ কবি চিরন্তন'। এভাবেই, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম-র উক্তি কবিতায় সাজিয়ে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথা ও কাব্য'।
সাতটি সুরম্য ক্রিকেট-বই। পরে দু-খণ্ডে 'ক্রিকেট অমনিবাস'।
রাজনৈতিক সাহিত্যে আগ্রহী। সুভাষচন্দ্র-সম্বন্ধে দীর্ঘ সন্ধানকর্মে নিয়োজিত। একটি গ্রন্থ এখন পর্যন্ত বেরিয়েছে, 'সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং'।
সম্পাদিত গরচ্ছনথ : 'বিশ্ববিবেক', 'নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ' (২ খণ্ড), গিরিশচন্দ্র রচিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ।'। অন্যতম সম্পাদক : 'Vivekananda in Indian Newspapers 1893-1902', 'Letters of Sister Nivedita'। জীবন-উপন্যাস : 'সুরনৃত্যের উর্বশী'।

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার : 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের জন্য। সাত খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থ।
পেয়েছেন : আনন্দ (১৯৭৯) ও বিবেকানন্দ পুরস্কার (১৯৮৬)।
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা। পত্র-পত্রিকায় গবেষণামূলক নানা রচনা।
মুখ্য গবেষণার বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণ আন্দোলন।

প্রচ্ছদ ☐ প্রবীর সেন